أُسْوَةٌ لِلْعَالَمِينَ

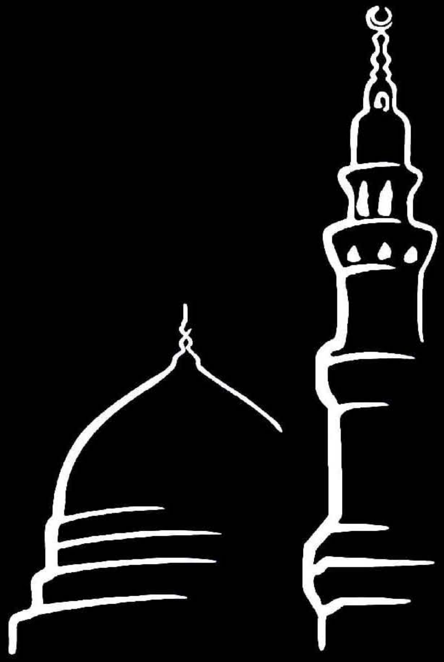

উসওয়াতুল লিল আলামিন

PDF Boier Somahar

ড. রাগিব সারজানি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চয় আপনি সর্বোন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের দিকে লক্ষ করলে মনে হবে, এটা যেন স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী কোনো ঝরনা এবং সকল মানবীয় মহানুভবতার উচ্ছল কোনো উৎস। আর এমনটা হবেই-না বা কেন! আল্লাহ তাআলা নিজে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁর দ্বারা সমাপ্তি ঘটিয়েছেন নবী-রাসুলদের আগমনের ধারা। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল শুভ্র, স্বচ্ছ ও পবিত্র। মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এ কারণেই তিনি উপযুক্ত হয়েছেন আল্লাহপ্রদত্ত সেই মহান গুণের, যার কথা তিনি নিজেই কুরআনুল কারিমে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

নিশ্চয় আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। [সুরা কলাম : ৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক পূর্ণতাই তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। শুধু তাঁর এই অমায়িক চরিত্রমাধুর্য প্রত্যক্ষ করেই বহু মানুষ ইসলামগ্রহণ করেছে। এমনকি তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর জীবনী পড়েও অসংখ্য মানুষ ঈমান এনেছে। এটা ছিল তাঁর বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র। মানবীয় গুণাবলির যতগুলো দিক আমাদের নিকট জ্ঞাত ও পরিচিত, তাঁর সবগুলো দিকের অতি উত্তম এবং পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মাঝে। সামনের আলোচনা থেকে আমরা তাঁর মহান চরিত্রের দীপ্তিময় প্রান্তগুলোর কয়েকটি দিক অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

2024/11/05 12:44
CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলির পূর্ণতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের জন্য উত্তম আদর্শ। জীবনের প্রতিটি কাজে ও কর্মে একজন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর আখলাক-চরিত্র ব্যক্তি ও সমাজের জন্য উদাহরণ এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি সক্ষম হয়েছেন আল্লাহপ্রদত্ত ওহির আলোকে একেবারে শূন্য থেকে একটি মহান জাতি গড়ে তুলতে। যুগের প্রতিকূলতার ওপর দাঁড়িয়েও তৈরি করেছেন এমন এক অনন্য সভ্যতা, যা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় এবং যার ভিত্তি হলো উত্তম আখলাক ও চরিত্র। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে চরিত্রমাধুর্যের পূর্ণতা প্রদানের জন্য।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 'নিশ্চয় আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন'। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীর প্রতি এই মহান সাক্ষ্যটিই প্রমাণ করে, জীবনের সূচনা হতেই তাঁর চরিত্র ছিল মহান ও শ্রেষ্ঠ। এজন্য তিনি তাঁর জাতির নিকট পরিচিত ছিলেন 'বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী' হিসেবে। কেউ কখনো তাঁকে 'মিথ্যাবাদী বা খিয়ানতকারী' বলার দুঃসাহস দেখায়নি। বরং তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য কাফেররা তাঁর সম্পর্কে অন্য অনেক অপবাদ আরোপ করেছে... পাগল, জাদুকর ইত্যাদি। কিন্তু 'মিথ্যাবাদী বা খিয়ানতকারী' বলার দুঃসাহস কেউ করেনি।

[illegible] হাকেম : ৪২২১, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ২০৫৭১

2024/11/05 12:45
CamScanner

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার জন্যই কেবল এই উত্তম চরিত্রের কথা উল্লেখ করেননি, বরং তিনি এ সাক্ষ্যের মাধ্যমে এদিকেও ইশারা করেছেন যে, মানুষেরা তাঁর সম্পর্কে যে খারাপ মন্তব্যগুলো করে—পাগল, জাদুকর ইত্যাদি বলে এ ত্রুটিগুলো কিছুতেই এমন উত্তম চরিত্রের সাথে একত্র হতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি এমন সব মহান চরিত্রের অধিকারী, অতি অবশ্যই তিনি সকল প্রকার পাগলামি থেকে মুক্ত হবেন।[১০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্রে বিমুগ্ধ হয়েছেন বহু মানুষ—তাঁর সাহাবিরা, এমনকি তাঁর শত্রুরাও। শুধু এই চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের অনেকে ইসলামগ্রহণ করেছিল। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক ওমানের বাদশাহ জুলানদি[১১] নবীজির চরিত্রের কথা শুনে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে বলেছিলেন,

«واللهِ لَقَدْ دَلَّنِيْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ إِلَّا كَانَ أَوَّلَ آخِذٍ بِهِ، وَلَا يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ أَوَّلَ تَارِكٍ لَهُ، وَأَنَّهُ يَغْلِبُ فَلَا يَبْطَرُ وَيُغْلَبُ فَلَا يَضْجَرُ وَيَفِيْ بِالْعَهْدِ وَيُنْجِزُ الْمَوْعُوْدَ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ»

আল্লাহর কসম! সে আমাকে এমন একজন উম্মি নবীর কথা বলেছে, তিনি যখনই কোনো ভালো কাজের আদেশ করেন, প্রথমে তিনিই সেই কাজটি করেন। আর যে কাজ হতে তিনি নিষেধ করেন, প্রথমে তিনিই তা বর্জন করেন। তিনি বিজয়ী হয়েও অহংকার করেন না। কেউ তাঁর ওপর প্রতাপ দেখালেও তিনি রুষ্ট হন না। তিনি ওয়াদা পালন করেন। চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্য নবী।[১২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র ছিল পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত। এটা ছিল তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব। এ কারণে তাঁর চরিত্রের সকল দিক ছিল সমপর্যায়ের। তাঁর ছিল যেমন পাহাড়সম ধৈর্য, তেমনই ছিল

---

১০. শিহাবুদ্দিন আলুসি রহ. রচিত *রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আজিম* : ২৯/২৫। (ঈষৎ পরিমার্জিত)

১১. ওমানের বাদশাহ। তার কাছেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতে দূত হিসেবে হজরত আমর ইবনে আসকে পাঠিয়েছিলেন। দেখুন, *আল-ইসাবা* : ১/৫৩৮।

১২. কাজি ইয়াজ : *আশ-শিফা* : ১/২৪৮।

2024/11/05 12:45 CamScanner

দুর্বার সাহসিকতা। দয়ার মতোই ছিল তাঁর পূর্ণ আমানতদারি। তাঁর সততার মতোই ছিল তাঁর অপরিসীম সহনশীলতা এবং সময়ের আবর্তনে তাঁর চরিত্রের মাঝে কখনো কোনো তারতম্য ঘটেনি। জীবনের কোনো সময়ে একটু বেশি আবার কখনো একটু কম এমন কখনো হয়নি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত জগতের আর কোনো মানুষের মাঝে একসঙ্গে এতগুলো চারিত্রিক গুণ কখনো পরিলক্ষিত হয়নি।[১৩]

এ কারণে বিখ্যাত জার্মান লেখক ও কবি জোহান গ্যোটে বলেছেন, 'ইতিহাসের পাতায় আমি তন্নতন্ন করে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ মানুষের দৃষ্টান্ত খুঁজেছি, অবশেষে তা পেয়েছি আরব নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে।'[১৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রাবলির মূল উৎস ছিল পবিত্র কুরআন। কুরআনুল কারিম থেকেই তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি আহরণ ও সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব, এই কুরআনই তাঁর পূর্ণ গুণাবলিকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বোচ্চ পূর্ণতায়। তাঁর সুন্দর শিষ্টাচারকে করেছে আরও সৌন্দর্যময়। আর এটা সম্ভব হওয়ার কারণ হলো, কুরআনুল কারিমে বর্ণিত সকল কল্যাণের দিকে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কুরআনের নির্দেশনার সকল-কিছুই তিনি তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জমিনে বিচরণকারী এক জীবন্ত কুরআন। হয়ে উঠেছিলেন কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি ভালো কাজ ও কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণ। এ কারণে হজরত সাদ ইবনে হিশাম ইবনে আমের রা. যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের ব্যাপারে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন আয়েশা রা. তার উত্তরে বলেছিলেন, 'তুমি কি কুরআন পড়োনি?'

সাদ ইবনে হিশাম বললেন, 'পড়েছি।'

হজরত আয়েশা রা. বললেন,

«فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»

---

১৩. মুহাম্মাদ সাদেক আরজুন (محمد الصادق عرجون) : *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ* : ১/২১১, ২১২।

১৪. সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরাব তাসতায়ু আলাল গারব* : ৪৬৫।

CamScanner

কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র (অর্থাৎ তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনে বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ)।(১৫)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'নবীজির চরিত্র ছিল কুরআনের বর্ণনার অনুরূপ' এই বলে হজরত আয়েশা রা. সুরা মুমিনুনের ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ প্রথম ১০টি আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, 'কুরআনে বর্ণিত এই গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বিদ্যমান ছিল।'(১৬)

কত সূক্ষ্মভাবেই না উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করে দিয়েছেন!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলামের চাহিদার অনুরূপ। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল উত্তম চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে। ইসলামের দিকে তাঁর দাওয়াতের শুরুলগ্ন থেকেই আরবরা এটা বুঝতে পেরেছিল। অনেক সময় তাঁর এই ব্যক্তিত্বই হয়ে উঠেছে তাদের জন্য দাওয়াত। যেমন তিনি যখন শাইবান ইবনে ছালাবার জনপ্রতিনিধিদলকে দাওয়াত প্রদান করেন, তখন তাদের মধ্যে ছিল মাফরুক ইবনে আমর, মুছান্না ইবনে হারেসা, হানি ইবনে কাবিসাহ, নুমান ইবনে শরিক। এদের সকলের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে মহান আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿﴾

CamScanner

(তাদেরকে) বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন, আমি তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না, পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্র্যের কারণে তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করো না, আমি তোমাদেরও রিজিক দেবো এবং তাদেরও, আর তোমরা প্রকাশ্য হোক বা গোপন কোনোরকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেয়ো না, আর আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। হে মানুষ! এই হচ্ছে সেইসব বিষয়, যা আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করো। [সুরা আনআম : ১৫১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তিলাওয়াত শুনে মাফরুক ইবনে আমর বলল, 'এটা জগতের কোনো মানুষের রচিত কথা নয়, যদি এগুলো মানুষের কথা হতো, তাহলে তা আমাদের বোধগম্য হতো।' অতঃপর নবীজি আবার তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন, আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [সুরা নাহল : ৯০]

এবার এই আয়াত শুনে মাফরুক ইবনে আমর আরও আশ্চর্য হলো এবং নবীজিকে বলল, 'আল্লাহর কসম! হে আমার কুরাইশি সঙ্গী, তুমি উত্তম চরিত্রবান হওয়ার প্রতি আহ্বান করেছ। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। তোমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তোমার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে।'[১৭]

2024/10/05 12:45
CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিসেও উত্তম চরিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে। যেমন নিচের হাদিসটিতে তিনি তাঁর সাহাবিদের উত্তম চরিত্রবান হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ»

নিশ্চয় মুমিনদের মধ্যে তার ঈমান পরিপূর্ণ, যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে তার স্ত্রী-পরিবারের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল।[১৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি শুধু তাঁর গোত্রের সীমিত কিছু মানুষের মধ্যে কিংবা বিশেষ কোনো দলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো ক্ষেত্রেই তাঁর আচার-ব্যবহারে চরিত্রের এই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পেত। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় সাহাবিদের মাঝে অতিবাহিত করতেন। তিনি কখনো নিজেকে তাদের থেকে আলাদা মনে করতেন না। তিনি গরিবদের সাথে ওঠাবসা করতেন। মিসকিনদের সাহায্য করতেন। যেকোনো দাসী বা চাকরানি তাঁকে মদিনার রাস্তায় যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত। তিনি অসুস্থকে দেখতে যেতেন। জানাজায় উপস্থিত হতেন। সাহাবিদের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন। তারাও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাড়িতে আসতেন। তিনি সর্বদা হাসিমুখ থাকতেন। তাঁর ছিল প্রশস্ত কপাল। চওড়া কাঁধ। বলিষ্ঠ শরীর। প্রফুল্ল চেহারা। তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য অতিশয় দরদি। কঠিন ও সহজ এমন দুটি বিষয়ের মধ্যে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে তিনি সহজটাই গ্রহণ করতেন, যদি না সেটা গুনাহের কোনো কাজ হতো। আর যদি কোনো গুনাহের কাজ হতো, তাহলে সবার তুলনায় তিনিই সবচেয়ে বেশি তা থেকে দূরে থাকতেন। তিনি বেশি বেশি ক্ষমা করতেন। এমনকি যে তাঁর ওপর জুলুম করেছে এবং জুলুমের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে, তাকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর পরিবারের সাথে, সমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে, এমনকি যুদ্ধরত শত্রুদলের সাথেও তাঁর সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাপূর্ণ

১৮. সুনানে তিরমিজি : ২৬১২, মুসনাদে আহমাদ : ২৪২৫০, ২৪৭২১।

CamScanner

আচরণ তাঁর চরিত্রকে নিয়ে গেছে অনন্য এক উচ্চতায়। যেমন আবু সুফিয়ান রা. ইসলামগ্রহণের পূর্বে তাঁর উত্তম চরিত্রের নমুনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি যখন কাফেরদের সর্দার। ইসলামগ্রহণের পর তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেছিলেন,

«فِداكَ أبِي وأمّي، واللهِ إنّكَ لكريمٌ، ولقَدْ حاربْتُكَ؛ فنِعْمَ مُحَارِبِي كُنتَ، ثُمَّ سَالَمْتُكَ؛ فنِعمَ المُسالِمُ أنتَ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيرًا»

আপনার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আপনি একজন মহান ব্যক্তি। আমি যুদ্ধ করেছি আপনার বিরুদ্ধে, আপনি কতই-না উত্তম যোদ্ধা ছিলেন! আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, আপনি কতই-না উত্তম চুক্তিকারী ছিলেন! মহান আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।[১৯]

মূলকথা, গ্রন্থের এই গুটিকয়েক পাতায় কিছুতেই আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রের ব্যাপকতা ব্যক্ত করতে সক্ষম নই। এটা যেন এক বিশাল দরিয়া। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে বারবার বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছে মুসলিম থেকে শুরু করে বিশ্বের অনেক অমুসলিম পণ্ডিত পর্যন্ত। যেমন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম ম্যুর (William Muir : ১৮১৯-১৯০৫ খ্রি.)[২০] নবী-জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তাঁর পুরো জীবন ছিল সহজ ও স্বাভাবিকতার নান্দনিক চিত্র। তাঁর অনন্য রুচি ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বহু অনুসারীর কথায়। বিনয়, নম্রতা, সহানুভূতি, ধৈর্য, অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্যদান এবং প্রচুর দানশীলতা তাঁর চরিত্রকে দিয়েছিল এক অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য। তাঁর ভালোবাসার আকর্ষণ চারপাশের সকলকে মোহিত করে রাখত। কোনো সামান্য-সাধারণ ব্যক্তির দাওয়াতও তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি। অতি স্বল্প হলেও হাদিয়া গ্রহণে কখনো অস্বীকৃতি জানাননি। বৈঠকে তিনি কখনো নিজের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ

---

১৯. আবু নুয়াইম ইস্পাহানি : *মারিফাতুস সাহাবাহ* : ৩/১৫০৯।

২০. স্যার উইলিয়াম ম্যুর (William Muir : ১৮১৯-১৯০৫ খ্রি.)। তিনি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ। ইসলাম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণ ও আখলাক নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। এডিনবার্গ এবং গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং পরে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

CamScanner

করেননি। কেউ কখনো অনুভব করেনি যে, দারিদ্র্যের কারণে তার আগমনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বরং যখনই কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে, তিনি হাসিমুখে তাকে সাদরে গ্রহণ করে কাছে টেনে নিয়েছেন। সবার সুখে অংশগ্রহণ করতেন আবার অসহায় ও দুঃখী মানুষের সাথে তাদের কষ্টকেও ভাগ করে নিতেন। তাদের প্রতি সমবেদনা জানাতেন। তিনি সর্বদা এই কর্ম ও চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন যে, কীভাবে তাঁর চারপাশের মানুষকে আরও বেশি সুখে, শান্তিতে ও স্বস্তিতে রাখা যায়।'[২১]

তিনিই আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি এবং আমাদের সাথে গর্ব করে সমগ্র মানবসভ্যতা। জগতে একমাত্র তিনিই ছিলেন এই কথার যোগ্য 'নিশ্চয় তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছবি'।

---

২১. হায়াতু মুহাম্মাদ : উইলিয়াম ম্যুর। তার থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন সাইদ হাওওয়া। তার কিতাব : আর-রাসূল : ১৪৭।

2024/11/05 12:46
CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা

মানুষের মহান গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো সততা। এ কারণে কুরআনুল কারিমেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে সততার প্রতি। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের সততার প্রতি আহ্বান করে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। [সুরা তাওবা : ১১৯]

অর্থাৎ কুরআনুল কারিম মুসলিম সমাজকে আহ্বান করছে সততার মতো এই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গী হওয়ার প্রতি। কেননা সততাই হলো সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

এই মহান গুণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন উত্তম দৃষ্টান্ত এবং আদর্শ। তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তিরও বহু আগে কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁকে 'আস-সাদিক, আল-আমিন' (সত্যবাদী ও আমানতদার) উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। এই বিশ্বস্ততার কারণেই তারা তাদের মূল্যবান প্রয়োজনীয় সম্পদ তাঁর নিকট গচ্ছিত রাখত। তাদের গোপন বস্তুসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁকেই তারা নিরাপদ মনে করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে যখন নবুয়ত প্রদান করলেন, তখন তাঁর আত্মীয় ও তাঁর বংশ (কুরাইশ) তাঁর সাথে শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিরোধিতা প্রকাশ করতে শুরু করে। এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি তাঁর মহান সততা ও আমানতদারির প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাদের সেই গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।[২২]

---

[২২]. *আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি* : ১২৪৭৭, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৩/২১৮, ২১৯; আল্লামা তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক* : ১/৫৬৯।

2024/11/05 12:46
CamScanner

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে নিজের নিকটাত্মীয়দের আখিরাতের ব্যাপারে সতর্ক করার আদেশ দিলেন, তখন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করে সকলকে ডেকে বললেন,

«أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا»

বলো তো, আমি যদি তোমাদের বলি, অশ্বারোহী শত্রুসেনা উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সর্বদা তোমাকে কথা ও কাজে সত্যবাদী পেয়েছি... ।[২৩]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততার সাক্ষ্য দিয়েছিল তাঁর চরম শত্রু নজর ইবনে হারেস। সে কুরাইশ গোত্রের সামনে এসে অকপটে স্বীকার করে বলেছিল, 'হে কুরাইশরা, আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর এমন একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যের বাইরে। মুহাম্মাদ যখন তোমাদের মধ্যে একজন তরুণ যুবক, তখন সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে আমানতদার। অবশেষে যখন তোমরা তাঁর মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখলে এবং সে একটা অভিনব মতাদর্শ তোমাদের কাছে নিয়ে এলো, তখন তোমরা বললে, সে জাদুকর। অথচ আল্লাহর কসম! সে জাদুকর নয়। আমরা তো জাদুকরের ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবজ দেখেছি। তোমরা আবার বললে, সে একজন গণক, কিন্তু আল্লাহর কসম! সে গণক নয়। আমরা গণকের সূক্ষ্ম হেঁয়ালি ও ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা অনেক শুনেছি। এরপর তোমরা বললে, সে একজন কবি। অথচ আল্লাহর কসম! সে কবি নয়। আমরা সবরকম কবিতা শুনেছি ও দেখেছি। আবার তোমরা বললে, সে একজন পাগল। অথচ আল্লাহর কসম! সে পাগলও নয়। আমরা অনেক পাগল দেখেছি। তাঁর মধ্যে পাগলামির কোনো চিহ্ন নেই। অতএব, হে কুরাইশরা, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো। আল্লাহর

---

২৩. *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭০, *সহিহ মুসলিম* : ৫০৮।

CamScanner

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে নিজের নিকটাত্মীয়দের আখিরাতের প্রতি সতর্ক করার আদেশ দিলেন, তখন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করে সকলকে ডেকে বললেন,

«أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا»

বলো তো, আমি যদি তোমাদের বলি, অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সর্বদা তোমাকে কথা ও কাজে সত্যবাদী পেয়েছি... ।[২৩]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততার সাক্ষ্য দিয়েছিল তাঁর চরম শত্রু নজর ইবনে হারেস। সে কুরাইশ গোত্রের সামনে এসে অকপটে স্বীকার করে বলেছিল, 'হে কুরাইশরা, আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর এমন একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যের বাইরে। মুহাম্মাদ যখন তোমাদের মধ্যে একজন তরুণ যুবক, তখন সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে আমানতদার। অবশেষে যখন তোমরা তাঁর মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখলে এবং সে একটা অভিনব মতাদর্শ তোমাদের কাছে নিয়ে এলো, তখন তোমরা বললে, সে জাদুকর। অথচ আল্লাহর কসম! সে জাদুকর নয়। আমরা তো জাদুকরের ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবজ দেখেছি। তোমরা আবার বললে, সে একজন গণক, কিন্তু আল্লাহর কসম! সে গণক নয়। আমরা গণকের সূক্ষ্ম হেঁয়ালি ও ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা অনেক শুনেছি। এরপর তোমরা বললে, সে একজন কবি। অথচ আল্লাহর কসম! সে কবি নয়। আমরা সবরকম কবিতা শুনেছি ও দেখেছি। আবার তোমরা বললে, সে একজন পাগল। অথচ আল্লাহর কসম! সে পাগলও নয়। আমরা অনেক পাগল দেখেছি। তাঁর মধ্যে পাগলামির কোনো চিহ্ন নেই। অতএব, হে কুরাইশরা, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো। আল্লাহর

---

২৩ *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭০, *সহিহ মুসলিম* : ৫০৮।

CamScanner

কসম! তোমাদের ওপর অবশ্যই একটি ঘোরতর দুর্যোগ নেমে এসেছে।'(২৪)

সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁর সততার ব্যাপারে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে এসেছে এবং নিজেও তা বিশ্বাস করে, এরূপ লোকই মুত্তাকি। [সুরা যুমার : ৩৩]

যিনি সত্য কথা নিয়ে এসেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যিনি তাঁর আনীত বাণীর সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনিই হলেন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁর সেই বাণী কুরআনুল কারিমে, যা সপ্তাকাশ থেকে জমিনে নাজিল হয়েছে।

ইমাম ইবনে আশুর রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন তিনি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সত্য হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন।'(২৫)

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাঁর কথা ও কাজে অন্যদেরও সত্য ও সততার প্রতি উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন,

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»

---

২৪. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* (السيرة النبية) : ১/২৯৯-৩০০, সুহাইলি (السهيل) : *আর-রওজুল উনুফ* (الروض الأنف) : ৩/৬৮, ইবনে সাইয়েদিন নাস (ابن سيد الناس) : *উয়ুনুল আছার* (عيون الأثر) : ২/৪২৭।

২৫. ইবনে আশুর (ابن عاشور) : *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির* (التحرير والتنوير) : ২৪/৮৬

2024/11/05 12:46 CamScanner

তোমরা সততাকে গ্রহণ করো। কেননা সত্য সৎকাজের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং সৎকাজ বেহেশতের পথ দেখায়। আর কোনো ব্যক্তি সত্য বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় এবং পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।[২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সম্বোধন করে আরও বলেছেন,

«اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ؛ اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ»

তোমরা নিজেদের ব্যাপারে ৬টি জিনিসের দায়িত্ব নাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব। ১. তোমরা যখন কথা বলবে সত্য বলবে। ২. ওয়াদা করলে পূরণ করবে। ৩. আমানত রাখলে তার যথাযথ সংরক্ষণ করবে। ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। ৫. তোমাদের দৃষ্টি (হারাম দৃশ্য থেকে) অবনত রাখবে। ৬. এবং জুলুম থেকে নিজেদের বিরত রাখবে।[২৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, তিনি সন্দেহপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলতেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি অন্য মুসলমানকেও সচেতন থাকার শিক্ষা দিতেন। সত্য ও সততার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তিনি এমনটা করতেন এবং বলতেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হলো হজরত আবুল হাওরা সাদি রহ.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, 'আমি একবার হজরত হাসান ইবনে আলি রা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কী কী বিষয়

---

[২৬]. *সহিহ মুসলিম* : ২৬০৭, *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৯৮৯, *সুনানে তিরমিজি* : ১৯৭১, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৮৪৯।

[২৭]. *মুসনাদে আহমাদ* : ২২৮০৯, ২২৭৫৭; *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ২৭১।

2024/11/05 12:46 CamScanner

সংরক্ষণ করেছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি সংরক্ষণ করেছি এই কথাটি—

> «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ»
>
> যাতে তোমার দ্বিধা আছে তা পরিত্যাগ করো, যাতে তোমার দ্বিধা নেই তা গ্রহণ করো। সত্য হলো প্রশান্তিময় আর মিথ্যা হলো দ্বিধাপূর্ণ।(২৮)

সত্যের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আগ্রহ ও ভালোবাসা সাময়িক ছিল না। বরং তিনি সর্বদা জীবনের সকল কাজ ও কর্মে সত্যের ওপর অবিচল থেকেছেন। সত্য ছিল তাঁর স্বভাবজাত। এ কারণে তিনি মজা ও হাস্যরসের সময়ও সত্য বলতেন। অথচ কেউ কেউ মনে করেন, এইসব ক্ষেত্রে একটু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া দোষের কিছু নয়। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে একটা বাহনের ব্যবস্থা করে দিন।’

তখন তিনি তাকে বললেন, ‘আমি তোমাকে বাহনের জন্য একটা উটনীর বাচ্চা দেবো।’

লোকটি বলল, ‘উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব?’

তিনি বললেন, ‘সকল উটকে তো উটনীই জন্ম দেয়!’(২৯)

আত্মিক নৈকট্য, সহজ সাবলীলতা ও প্রীতিকর সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষের সাথে কখনো কখনো এমন হাস্যরস করতেন। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদা সত্যই বলতেন।

এ একই অবস্থা ছিল তাঁর যুদ্ধের ময়দানেও। যদিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুবাহিনীর ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য এবং হামলা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার বৈধতার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনো এমন অবস্থাতেও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেননি। বদর যুদ্ধের শুরুর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ

---

২৮. *সুনানে তিরমিজি* : ২৫১৮, ২৫২০; *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭২৩, *সুনানে নাসায়ি* : ৭২৭৬।

২৯. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৯৯৮, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৩৮৪৪।

CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকবাহিনীর খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বের হলেন। সাথে ছিলেন আবু বকর রা.। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা এক বৃদ্ধ আরবের সাক্ষাৎ পেলেন। (বৃদ্ধ লোকটি নবীজিকে চিনত না) তারা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কুরাইশ গোত্রের কোনো তৎপরতার কথা জানে কি না, কিংবা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের কোনো খবর রাখে কি না।

বৃদ্ধ বলল, 'তোমরা কারা সেটা আগে বলো, নইলে আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমরা যা জানতে চেয়েছি, সেটা আগে বলো। তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দেবো।'

বৃদ্ধ বলল, 'অর্থাৎ খবরের বিনিময়ে পরিচয়।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।'

তখন বৃদ্ধ বলল, 'শুনেছি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিরা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছে। খবর সত্য হলে তাদের এখন অমুক জায়গায় থাকার কথা, আর আমি এও খবর পেয়েছি যে, কুরাইশরা অমুক দিন বের হয়েছে। এ খবর যদি সঠিক হয়, তবে তারা আজ অমুক স্থানে থাকার কথা।'

বস্তুত, বৃদ্ধ লোকটি যে স্থানের কথা বলেছিল, কুরাইশরা তখন সেখানেই অবস্থান করছিল। বৃদ্ধ তার খবর দেওয়া শেষ করে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'نَحْنُ مِنْ مَاءٍ–আমরা পানি থেকে এসেছি।' এ কথা বলে তিনি বৃদ্ধের কাছ থেকে চলে এলেন। লোকটি তখন নিজে নিজে বলতে লাগল, 'আমরা পানি থেকে এসেছি'-এর তাৎপর্য কী? পানি থেকে, ইরাকের পানি থেকে নাকি?[৩০]

আমাদের এই পরিচ্ছেদের একটি চমৎকার সমাপ্তি ঘটাতে চাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ঘটনাটি বর্ণনার মাধ্যমে, যা সংঘটিত হয়েছিল হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে। হাওয়াজিন

---

৩০. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৩৯৬, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৬১৫, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৫/৭৩, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৩২৯।

CamScanner

গোত্রের লোকেরা ইসলামগ্রহণের দিন যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো, তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের মহান আদর্শ সততার মূল্য শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন,

«أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ»

কথার মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো সত্য কথা...।[৩১]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রই ছিল সত্য ও সততায় পরিপূর্ণ। এ কারণে থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle)-এর মতো দার্শনিক বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আপনারা ভেবে বলুন তো, একজন মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞ ব্যক্তি কি কখনো এমন একটি অনিন্দ্য সুন্দর স্থায়ী ধর্ম তৈরি করতে পারে? আর মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞ ব্যক্তি তো ইটের তৈরি একটি ঘরও বানাতে পারে না! যে ব্যক্তি ভবনের চুন, সিমেন্ট, মাটি ও বিল্ডিংয়ের নকশা বা ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে যদি একটি ভবন নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভবনের অবস্থা কেমন হয়? সেটা হয় অতি ভঙ্গুর একটি টিলার মতো। সেটা হয় বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত বিশৃঙ্খল একটি স্তূপ। সেটা কিছুতেই এমন স্থায়িত্বের গুণ পেতে পারে না, যার আশ্রয়ে দুইশ মিলিয়ন (২০ কোটি)[৩২] মানুষ বারোটি শতাব্দীরও বেশি (এখন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শতাব্দী) সময় বসবাস করবে। বরং হওয়ার কথা তো ছিল, সময়ের পরিক্রমায় কিছুদিনের মধ্যেই এর স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়বে এবং সেটা এমনভাবে বিলীন হয়ে যাবে, মনে হবে যেন এখানে কোনোদিন এ জাতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ইসলামের ভবনের ক্ষেত্রে তেমনটি কখনো হয়নি।

---

৩১. *সহিহ বুখারি* : ২৩০৭, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬৯৩, ২৬৮৪; *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৯৩৪।

৩২. থমাস কার্লাইল মুসলমানদের এই জনসংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন তার গ্রন্থ *আল-আবতাল* প্রকাশের সময়ের হিসেবে। কিন্তু এখন, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১.৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। এর জন্য দেখুন, আরবি সংবাদপত্র *'আশ-শারকুল আওসাত'*-এর ওয়েবসাইট : www.asharqalawsat.com।
(বর্তমান ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে www.worldpopulationriview.com-এর তথ্যমতে মুসলমানদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১.৯ বিলিয়নে। শিয়া-কাদিয়ানি ইত্যাদিসহ [illegible] ছাড়া ১.৫ বিলিয়ন।-অনুবাদক)

CamScanner

আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একজন মানুষের জন্য উচিত হবে তার জীবনের সকল বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়মাবলির অনুসরণ করা। নতুবা কখনো তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। অথচ এ সকল অবিশ্বাসী মানুষ প্রাকৃতিক সত্যকে অস্বীকার করে শুধু মিথ্যাকেই ছড়িয়েছে। তারা এতটা সুশোভিতভাবে মিথ্যার ফুলঝুরি ছড়িয়েছে যে, আজ সেটাকেই মানুষ সত্য বলে ভাবতে শুরু করেছে... পরিতাপের বিষয় যে, এইসব বিভ্রান্তির কারণে বহু দল ও জাতি প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়েছে...।[৩৩]

৩৩. থমাস কার্লাইল : আবতাল : ৪৩।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও অনুগ্রহ

দয়া ও অনুগ্রহ, আল্লাহ তাআলার মহান গুণাবলির একটি। সৃষ্টির প্রতি তাঁর সবচেয়ে বড় দয়া হলো, তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

(হে নবী,) আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি। [সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

এজন্য অধিকাংশ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«يا أَيُّها النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»

হে মানুষেরা, নিশ্চয় আমি উপহার হিসেবে প্রদত্ত এক রহমত।(৩৪)

তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল সকল মানুষের জন্য সমান ও ব্যাপক, বিশেষত এই উম্মতের জন্য। নিচের হাদিসটির দিকে লক্ষ করলেই আমরা এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হব। তিনি বলেন, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালাল; যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গের দল আগুনে এসে পড়তে লাগল। সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টেনে ধরতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রজ্বলিত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তেমনইভাবে আমিও তোমাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি অথচ তোমরা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছ।(৩৫)

এ এক অভূতপূর্ব দয়া ও মমতার নিদর্শন। গোটা জগতে দয়া ও মমতার এমন দৃষ্টান্ত কিংবা তার কাছাকাছি দৃষ্টান্তও কোথাও পাওয়া যাবে না।

---

৩৪. *সুনানে দারেমি* : ১৫, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ১০০।

৩৫. *সহিহ বুখারি* : ৬৪৮৩, ৬০৩৯; *সহিহ মুসলিম* : ৬০৯৫।

CamScanner

তাঁর সীমাহীন দয়া ঘিরে রেখেছিল ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, কাছে-দূরের সকলকেই, এমনকি বন্ধু এবং শত্রুকেও। তাঁর দয়া বা অনুগ্রহ কোনো স্থান বা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল জগৎ অর্থাৎ মানুষ, জিন এবং সকল প্রাণীর জন্যই তাঁর দয়া ছিল অবারিত। এভাবে তাঁর দয়া বা অনুগ্রহ কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা সময়ের সাথেও সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর জন্মের শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যই এটি পরিব্যাপ্ত। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর উম্মতকেও দয়ার গুণ অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালু ও স্নেহপরায়ণদের প্রতি দয়া করেন।[৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কাজে দয়া ও মমতার যে নিদর্শন ফুটে উঠত, তা কোনো লৌকিকতাপূর্ণ দয়া ছিল না যে, সামাজিকতা ও লোক দেখানোর জন্য তা করা হয়েছে। বরং তাঁর দয়া ও মমতা ছিল তাঁর সত্তাগত ও স্বভাবজাত, যা সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানের পার্থক্য এবং বিষয়ের ভিন্নতার ক্ষেত্রেও তা একইরকম ছিল। এমনকি দয়া ও মমতার গুণটি তাঁর চরিত্রের অন্য সকল গুণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই এটাই সব জায়গায় সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এটা আশ্চর্যেরও কোনো বিষয় নয়। কেননা কুরআনুল কারিমে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপ্রদানকারী যে-কেউ দেখতে পাবে, তাতে বর্ণিত সকল গুণের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম গুণ হলো দয়া বা অনুগ্রহ। **(চিত্র নং-১)**

বয়স্ক ও ছোটদের প্রতি নবীজির দয়ার কথা আমরা এই হাদিসের মাঝে লক্ষ করতে পারি। তিনি বলেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا»

যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৭]

---

৩৬. *সহিহ বুখারি* : ১২৮৪, *সহিহ মুসলিম* : ৯২৩।

৩৭. *সুনানে তিরমিজি* : ১৯১৯, ১৯২৫; *মুসনাদে আহমাদ* : ৬৭৩৩, *আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারি* : ৩৫৮।

2024/11/06 12:49
CamScanner

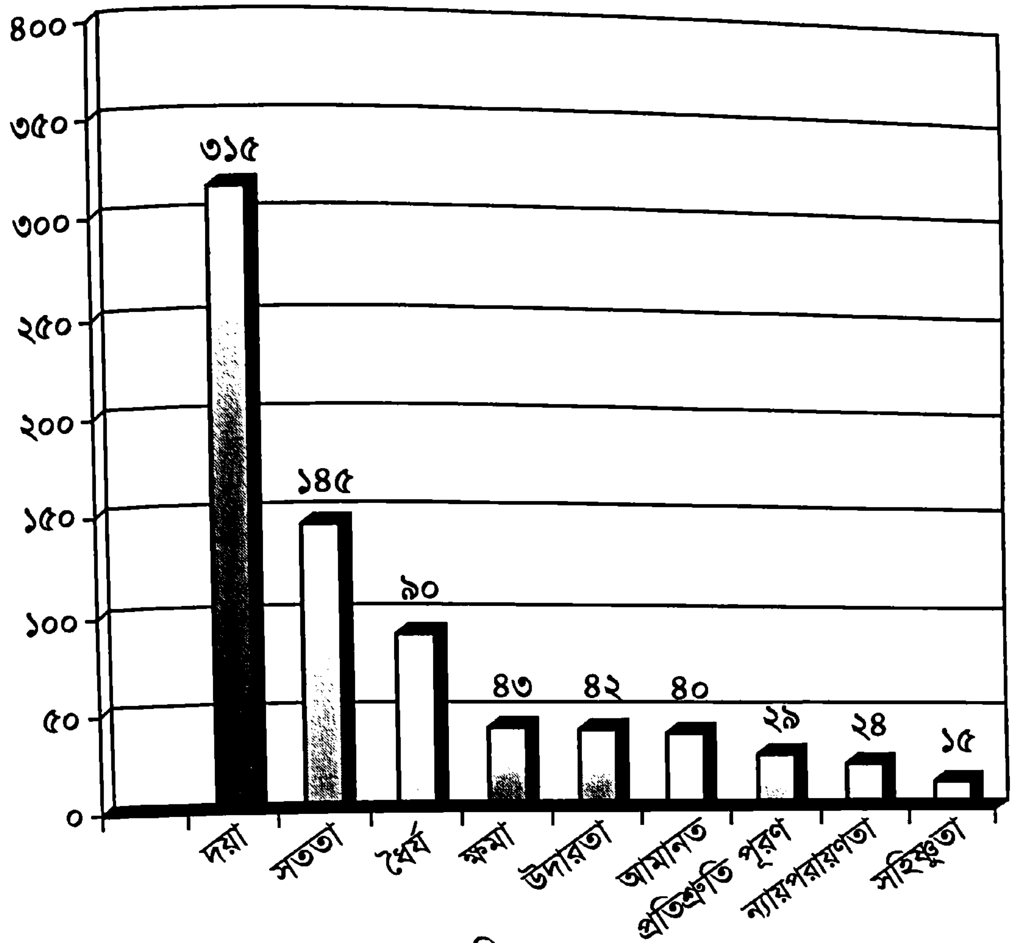

চিত্র নং-১
আল-কুরআনে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর চারিত্রিক গুণাবলি

সেই সমাজের চেয়ে মহান সমাজ আর কোনটি হতে পারে, যে সমাজের সকলকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কর্মের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন!

আমরা আরও দেখি, তিনি এমন অপরাধীর প্রতিও দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছেন, যারা তাঁর নিকট এসে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। সাহাবিদের মধ্যে কেউ যদি নিজের গুনাহের কাফফারা (অপরাধের ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে অক্ষম হতো, সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে আসত এই আশায় যে, তিনি অপরাধের কাফফারা আদায় করে দেবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত একটি ঘটনা। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি!'

CS CamScanner

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

লোকটি বলল, 'আমি রোজা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করে ফেলেছি।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আজাদ করার মতো তোমার কি কোনো ক্রীতদাস আছে?'

সে বলল, 'না।'

নবীজি বললেন, 'তাহলে তুমি কি একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?'

সে বলল, 'না।'

নবীজি বললেন, 'তাহলে কি ষাটজন মিসকিন খাওয়াতে পারবে?'

সে বলল, 'না।'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। আমরাও তখন তাঁর নিকট বসে আছি। এ সময় তাঁর নিকট খেজুরভরতি একটি ঝুড়ি পেশ করা হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়?'

সে বলল, 'এই যে আমি।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এগুলো নিয়ে সদকা করে দাও।'

লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এটা কি আমি আমার চেয়েও বেশি অভাবগ্রস্তকে সদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদিনার দুই প্রান্তে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই।'

এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এগুলো তুমি তোমার পরিবারকে খাওয়াও।'(৩৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আচরণটি কতই-না দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। কোনো ধরনের ক্রোধ বা ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়াই তিনি বারবার লোকটিকে কাফফারা আদায়ের উপায় বলে দিচ্ছিলেন। তার বিষয়টাকে মৃদু হেসে সহজ-স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, যা অপরাধীকে একপ্রকার মানসিক প্রশান্তি দেয়। এরপর লোকটি যখন

---

৩৮. *সহিহ বুখারি* : ১৯৩৬, ১৮১২; *সহিহ মুসলিম* : ১১১১।

2024/11/06 12:49 CamScanner

কাফফারা আদায়ের সকল পদ্ধতিতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করল, তখনও নবীজি বিরক্ত হননি। বরং কেউ যখন তাঁর জন্য খেজুর হাদিয়া নিয়ে এলো, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সেটা সেই সাহাবির হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও খেজুর, এর দ্বারা তুমি তোমার গুনাহের কাফফারা আদায় করে দাও।

ইবাদতের ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, অমুক ইমাম নামাজ দীর্ঘ আদায় করেন। এ কারণে আমি ফজরের নামাজে উপস্থিত হতে পারি না। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো বয়ানের মধ্যে সেদিনের চেয়ে বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। এরপর তিনি বললেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ»

> তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী আছে। সুতরাং যে জামাতের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তার পেছনে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে।[৩৯]

যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন হাতিম তায়ির মেয়ের[৪০] ক্ষেত্রে ঘটেছে। তায়ি গোত্রের বন্দিদের সাথে তাকেও বন্দি করা হয়েছিল। পরে তাকে মসজিদের সামনে একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হাতিম-তনয়া তাঁকে দেখে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও স্পষ্টভাষিণী। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার অভিভাবকও (ভাই আদি ইবনে হাতেম রা.) অনুপস্থিত। সুতরাং আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ তাআলাও আপনার প্রতি সদয় হবেন।'

---

৩৯. *সহিহ বুখারি* : ৭০৪, ৬৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ৪৬৬।

৪০. তার নাম সাফফানাহ বিনতে হাতিম তায়ি। তার পিতা ছিলেন আরবের বিখ্যাত দানবীর হাতিম তায়ি। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৬/১৪৬, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : জীবনী নং : ১১২৯১।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিম-কন্যার এ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। কিন্তু তুমি এখনই চলে যাওয়ার ইচ্ছা করো না। বরং তুমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত কাউকে পাও, যে তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবে, তখন আমার নিকট এসো, তারপর যেয়ো।'

হাতিমের মেয়ে বলেন, এরপর আমি সেভাবেই অবস্থান করতে থাকলাম। অবশেষে একদিন শুনতে পেলাম, বালি অথবা কুজাআ থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসেছে। আমিও শামে অবস্থানকারী আমার ভাইয়ের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করছিলাম। এবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার সম্প্রদায়ের একটি কাফেলা এসেছে। তাতে এমন নির্ভরযোগ্য লোক আছে, যে আমাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।' তখন নবীজি আমাকে কাপড়, বাহন ও পথখরচ প্রদান করলেন। আমি সেগুলো নিয়ে কাফেলার সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং শামে চলে এলাম।[৪১]

বিষয়টি একটু ভেবে দেখুন! এই বন্দিনির সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা দয়াপূর্ণ মানবিক আচরণ করেছেন! তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। শুধু তাই নয়, একজন নারী হিসেবে তার কল্যাণ চিন্তা করে তার একাকী রওয়ানা হওয়ার প্রতি সম্মত ছিলেন না। বরং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি এখনই বের হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ো না; বরং তোমার গোত্রের নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি পেলে তার সাথে চলে যেয়ো।' তারপর যাওয়ার সময় তাকে বাহন, পোশাক ও রাস্তাখরচ দিয়ে দিলেন!

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে সকল প্রাণী, পশু, পাখি ও কীটপতঙ্গের প্রতিও। তাঁর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি এমন এক ব্যভিচারিণী মহিলার সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন, যে একটি কুকুরের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছিল। কুকুরটিকে পানি পান করিয়েছিল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন![৪২]

---

৪১. আল্লামা তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক* : ২/১৮৮, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৫/২৭৬, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/১২৩, ১২৪।

৪২. *সহিহ বুখারি* : ৩৩২১, *সহিহ মুসলিম* : ২২৪৫।

CS CamScanner

এভাবে নবীজির করুণার পরশ পেয়েছে জীব-জানোয়ার থেকে শুরু করে ছোট পাখি পর্যন্ত, যদিও অন্য প্রাণীগুলোর মতো এগুলো বাহ্যত মানুষের তেমন কোনো উপকারে আসে না। সামান্য একটি চড়ুই পাখির প্রতি আমরা তাঁর অগাধ মমতা ও ভালোবাসা লক্ষ করি! তিনি বলেন,

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ»

কেউ যদি অনর্থক কোনো চড়ুই পাখিকে হত্যা করে, তবে সেই পাখি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট অনুযোগ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনার অমুক বান্দা আমাকে অনর্থক হত্যা করেছিল। কোনো প্রয়োজনে সে আমাকে হত্যা করেনি।[৪৩]

এই হলো প্রবৃত্তির কোনো চাহিদা ছাড়াই একনিষ্ঠ দয়া ও ভালোবাসা। এই দয়ার পেছনে পার্থিব কোনো স্বার্থ নেই। কত চমৎকার এই দয়া ও ভালোবাসা, যার অনাবিল স্পর্শে ব্যথিতের যাতনা কমে; লাঘব হয় দুঃখীর দুঃখ।

---

৪৩. *সুনানে নাসায়ি* : ৪৪৪৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯৪৮৮, ১৯৪৭০; *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৯৯৩।

CamScanner

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা মানুষের শ্রেষ্ঠতম চারিত্রিক গুণাবলির একটি। অন্যের প্রতি একটি দরদি মনের বহিঃপ্রকাশ ও মজলুমের জন্য আশা ও সান্ত্বনার আশ্রয়। এ কারণে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ করার (ন্যায়পরায়ণতা) হুকুম দেন।

[সুরা নাহল : ৯০]

ন্যায়পরায়ণতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম শত্রুদের বিভিন্ন অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ (ন্যায়পরতা) পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ন্যায়পরতা অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। [সুরা মায়িদা : ৮]

ন্যায়পরতা সকল বিষয়ের যথাযথ মূল্য প্রদান করে। ন্যায়পরতার মাধ্যমেই মানুষের যথাযথ অধিকার নিশ্চিত হয়। যে জাতির মাঝে ন্যায়পরতা রয়েছে, তারা সৌভাগ্যবান এবং উন্নত। আর যে জাতি ন্যায়পরতার গুণ থেকে বঞ্চিত, তারাই সবচেয়ে দুর্ভাগা এবং অনুন্নত জাতি হিসেবে গণ্য।

CamScanner
2024/11/06 12:50

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের ন্যায়পরতার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদানের পাল্লা ভারী হয়। তিনি বলেন,

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا»

নিশ্চয় দুনিয়ায় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট মুক্তাখচিত মিম্বারে অবস্থান করবে, যেহেতু তারা দুনিয়াতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে।[৪৪]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রত্যেক সাহাবির অন্তরে ন্যায়পরতার বীজ বপন করেছেন। সেই শৈশব থেকেই ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল উপমা। যেমন তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির আগেই অত্যাচারিতের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে 'হিলফুল ফুজুল'[৪৫] নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশের কিছু যুবক তা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ ছাড়া কাবাঘর পুনর্নির্মাণের সময় 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করা নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল, তখনও তারা তাঁর বিচার ও ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা রেখেছিল, যদিও সেই বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে তাঁর গোত্র বনু হাশেমও ছিল। তবুও তাঁর ন্যায়পরতা ও সততার প্রতি আস্থার কারণে সকলেই তাঁকে বিচারক হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শনের জন্য নবুয়ত প্রদান করেন। তখনও তিনি তাঁর সাহাবিদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্থানে ন্যায়পরতাকে বিচারিক মানদণ্ড বানিয়েছেন। তাঁর জীবনের ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার ঘটনাসমূহের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা সেটাই, যা হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনার মাঝে তাঁর ন্যায়পরতা এবং সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। হজরত আয়েশা রা. বলেন, 'মাখজুম

---

৪৪. *সহিহ মুসলিম : ১৮২৭, সুনানে নাসায়ি : ৫৩৭৯, মুসনাদে আহমাদ : ৬৪৮৫, মুসতাদরাকে হাকেম : ৭০০৬।*

৪৫. হিলফ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার আর ফুজুল অর্থ মজলুমের প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং হিলফুল ফুজুল অর্থ মজলুম ও অত্যাচারিতের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।-সম্পাদক

2024/11/06 12:50 CamScanner

সম্প্রদায়ের এক মহিলার চুরির ঘটনায় কুরাইশ বংশের লোকেরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। (প্রকাশ্যে হাত কাটা হলে একটা মানসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা শাস্তিটা কমাতে চাচ্ছিল।) তারা বলল, বিষয়টা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলবে? অতঃপর তারাই বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ রা. ছাড়া এমন সাহস কে করতে পারে? অবশেষে উসামা রা. নবীজির সাথে কথা বললেন। উসামার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এসেছ আল্লাহ তাআলার শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করতে!' এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন,

«إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

হে মানব সকল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছেন এ জন্য যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তাঁর ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেবো।[৪৬]

আমরা দেখতে পাই, তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন, যেন মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় বা অবিচার না হয়ে যায়। যেমন হজরত সুওয়াইদ ইবনে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি ও মাখরাফা আবদি রা. একবার 'হাজর' (একটি স্থানের নাম) থেকে কাপড় কিনে বিক্রির জন্য মক্কায় নিয়ে আসি। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পায়জামার দরদাম করেন। সে সময় আমাদের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যে টাকার বিনিময়ে মানুষের জিনিসপত্র মেপে দিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে

[৪৬]. *সহিহ বুখারি : ৬৭৮৮, সহিহ মুসলিম : ১৬৮৮।*

CamScanner

উদ্দেশ্য করে বললেন, يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ হে মাপ নিরূপণকারী, তুমি মাপবে এবং তা সঠিক করবে।[৪৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ জীবনে ন্যায়পরতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ ন্যায়পরতার হাজারো উপমায় সিরাত গ্রন্থসমূহ পূর্ণ হয়ে আছে। একজন পাঠক সেগুলো পড়ার সময় নিজের মধ্যে শিহরণ ও পুলক অনুভব করবে। যখন সে নিজের ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজন ও চারপাশের মানুষের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা দেখতে পাবে। চাই সেই ন্যায়পরতা আল্লাহ তাআলার কোনো দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে হোক অথবা সন্ধি ও যুদ্ধের কোনো বিষয়ে। অথবা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত সামান্য কোনো ব্যাপার হোক। একবার এক মুনাফিক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরতায় কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছিল। তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রতাপের সাথে মুনাফিকের সেই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,

«وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ»

হতভাগা! আমিই যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে আর কে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে? আমি যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠা না করি, তবে তো আমি হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।[৪৮]

এমনইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন, এমনকি সংসারের সামান্য ছোটখাটো বিষয়েও। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর নিকট অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর কোনো এক স্ত্রী তাঁর জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। এটা দেখে, যে স্ত্রীর ঘরে তিনি অবস্থান করছিলেন, তিনি পাত্র বহনকারী খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন

---

৪৭. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৩৩৬, *সুনানে তিরমিজি* : ১৩০৫, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২২২০।
৪৮. *সহিহ বুখারি* : ১১৩৮, *সহিহ মুসলিম* : ১০৬৩, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৭২, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৪১৫১।

2024/11/06 12:59
CamScanner

পাত্রের ভাঙা টুকরাগুলো একত্র করলেন। তারপর খাদ্যগুলো একত্র করে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজানের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। এরপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তার থেকে একটি ভালো পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙেগিয়েছিল, তাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙা পাত্রটি যিনি ভেঙেছিলেন তার কাছে রেখে দিলেন।[৪৯]

অমুসলিমদের প্রতিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরতা সদা প্রসারিত ছিল। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর অত্যধিক রাগান্বিত থাকবেন।'

হজরত আশআস ইবনে কায়েস রা.[৫০] বলেন, আমার ও এক ইহুদি ব্যক্তির মাঝে যৌথ মালিকানায় একখণ্ড জমি ছিল। একবার সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে?' আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি ইহুদিকে বললেন, 'তুমি কসম করো।'

আমি তখন বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, সে তো (গুনাহের তোয়াক্কা না করে মিথ্যাভাবে) কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে।' তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন–

---

৪৯. *সহিহ বুখারি* : ১১৩৮, ৫২২৫; *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৫৬৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ১২০৪৬।

৫০. পুরো নাম আশআস ইবনে কায়েস আল-কিন্দি। নবুয়তের দশম বছরে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। তিনি ছিলেন 'কিন্দাহ' গোত্রের প্রধান। রাসুলের ইনতেকালের পর তিনি মুরতাদ হয়ে যান। অবশ্য এরপর আবার তিনি ইসলামে ফিরে আসেন। তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. তার সাথে নিজের বোনের বিবাহ দেন। তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিফফিনের যুদ্ধের সময় তিনি আলি রা.-এর সঙ্গে ছিলেন। হজরত আলি রা.-এর হত্যার চল্লিশ দিন পর তিনি ইনতেকাল করেন। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ১/৯৭। ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : জীবনী নং : ২০৫।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (সদয় দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য থাকবে কেবল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[সুরা আলে ইমরান : ৭৭][৫১]

সকলের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিশ্চয় এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত! ঘটনাটিতে দেখা যাচ্ছে দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি, অন্যজন ইহুদি কাফের। তারা তাঁর নিকট বিচার নিয়ে এলেন সমাধানের জন্য। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে শরিয়তের সত্য বিধান প্রয়োগ করেছেন, কারও প্রতি কোনো ধরনের টান বা পক্ষপাতের দিকে খেয়াল করেননি। উল্লিখিত বিষয়ে শরিয়তের বিধান হলো, নিজের দাবির পক্ষে বাদী প্রমাণ উপস্থাপন করবে। এখানে বাদী হলেন আশআস ইবনে কয়েস রা.। বাদী যদি দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে। এখানে বিবাদী হলো একজন ইহুদি কাফের। তার কর্তব্য হবে বাদী তার ব্যাপারে যে অভিযোগ আরোপ করছে, তা অস্বীকার করে কসম করা। আর এতে তাকে সত্যায়িত করা হবে। অথচ আমরা জানি, চিরাচরিত অভ্যাস হিসেবে ধর্মীয় ভীতি না থাকায় সেই ইহুদি মিথ্যা কসম করে সম্পদ নিয়ে নিতে পারে। তবুও বিচার সেভাবেই করা হয়েছে যেটা নিয়ম।

---

৫১. *সহিহ বুখারি* : ২৩৫৭, ২৪১৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৮, *সুনানে আবু দাউদ* : ৩২৪৩, *সুনানে তিরমিজি* : ২৯৯৬, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৩২৩।

CamScanner

এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূলনীতি হলো এই হাদিস,

«البيِّنةُ على المُدَّعِي واليمينُ على مَن أنكرَ»

বাদী নিজ দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করবে, অন্যথায় বিবাদী কসম করবে।[৫২]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যেক শাসক, প্রশাসক ও বিচারকের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রেখে গেছেন। এমনকি তাঁর পুরো জীবন পরিচালিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশমতো। এ কারণে প্রতিটি মানুষ তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। প্রতিটি অন্তর তাতে শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে এবং তাঁর ন্যায়নিষ্ঠায় পুরো মানবজাতি হয়েছে ধন্য।

---

৫২. *সহিহ মুসলিম* : ১৭১১, *মুয়াত্তা মালেক* : ৮৪৪।

CamScanner

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে দয়া ও দানশীলতার ওপর। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দয়া ও দানশীলতার গুণে গুণান্বিত করেছেন। তিনি কুরআনুল কারিমে বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾

এটা (কুরআন) এক মহানুভব বার্তাবাহকের বাণী। এটা কোনো কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমরা খুব অল্পই ঈমান আনো।

[সুরা আলহাক্কা : ৪০-৪১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য মহান গুণের মধ্যে শুধু তাঁর মহানুভবতার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা এই গুণের মাঝেই নিহিত রয়েছে তাঁর অন্য সকল গুণ। তাঁর চরিত্রে সমাহার ঘটেছিল বহু উত্তম গুণের, যেগুলোর ভিত্তি ছিল উদারতা, দানশীলতা এবং বদান্যতা। আসমান থেকে তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার আগ থেকেই তিনি এসব গুণে গুণান্বিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেমন আমরা দেখতে পাই হজরত খাদিজা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বলেছিলেন,

«كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»

আল্লাহর কসম! কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং সত্যপথের বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করেন।[৫৩]

---

[৫৩]. *সহিহ বুখারি* : ৩, *সহিহ মুসলিম* : ১৬০।

2024/11/06 12:53
CamScanner

এ সকল চারিত্রিক গুণের উৎস হলো 'উদারতা ও বদান্যতা'। কারণ এই গুণগুলো উদারতা ও বদান্যতার কথাই ব্যক্ত করে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। এ ছাড়া রমজানে তিনি আরও বেশি বেশি দান করতেন, যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাসের থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।[৫৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত-পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর সাহাবিদের সর্বদা দান ও বদান্যতার প্রতি উৎসাহ দিতেন। দানের দ্বারা অন্তর প্রশস্ত হয় এবং সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল সাহাবি ও অনাগত উম্মতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বলেছেন,

«ما مِن يومٍ يُصبحُ العِبادُ فيه إلَّا ملَكانِ يَنزِلان فيقولُ أحدُهما : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنفقًا خلفًا، ويقولُ الآخر : اللَّهُمَّ أَعطِ مُمسكاً تلفًا»

বান্দার জীবনের প্রতিটি সকালে আসমান থেকে দুজন ফিরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অন্য ফিরেশতা বলেন, হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।[৫৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবন যা বিশ্বাস করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর সবকিছুই বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। সেইসব মুসলমান কতই-না সৌভাগ্যবান, যারা তাঁর এই শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. বলেন, একবার এক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চাদর নিয়ে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, পরিধানের জন্য আমি আপনাকে এটি হাদিয়া দিলাম।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৫৪]. *সহিহ বুখারি* : ৬, *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৮।
[৫৫]. *সহিহ বুখারি* : ১৪৪২, ১৩৫৮; *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭২৯৪।

2024/11/06 12:5
CamScanner

ওয়াসাল্লাম চাদরটি এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন এটি তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি এটি পরিধান করলেন। তখন সাহাবিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নবীজির পরিধেয় চাদরটি দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এটা কতই-না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ (দিয়ে দিলাম)।' এরপর নবীজি যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন অন্য সাহাবিরা উক্ত সাহাবিকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, 'তুমি ভালো করোনি। তুমি দেখলে যে নবীজি চাদরটি এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন এটি তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। এরপরও তুমি এটি চেয়ে বসলে! অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে, তাঁর কাছে কখনো কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন না।

তখন সেই সাহাবি বললেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চাদরটি পরিধান করেছেন, এ কারণে তাঁর বরকত অর্জন করার আকাঙ্ক্ষায় আমি এমনটি করেছি, যাতে আমি এ চাদরটাকে আমার কাফন বানাতে পারি।' অন্য বর্ণনায় আছে, সাহল রা. বলেন, (পরবর্তী সময়ে) এটি তার কাফন হয়েছিল।[৫৬]

এ বিষয়ে আমরা হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। তিনি বলেন–

«مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا»

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কোনো জিনিস চাওয়া হয়নি, যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন।[৫৭]

এই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব আমলের কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাধ্যের মধ্যে তিনি কখনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেননি এবং নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার চাওয়াকে পূরণ করেছেন।

দানশীলতার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য অনেক অনুপম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রেখে গিয়েছেন। যেমন, একবার বাহরাইন থেকে তাঁর কাছে কিছু সম্পদ এলো। তাঁর নিকট ইতিপূর্বে যত

---

৫৬. *সহিহ বুখারি* : ৫৬৮৯, ১৯৮৭; *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৫৫৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ২২৮৭৬।

৫৭. *সহিহ বুখারি* : ৬০৩৪, *সহিহ মুসলিম* : ২৩১১, *সুনানে দারেমি* : ৭০।

CamScanner

সম্পদ আনা হয়েছে, এটার পরিমাণ তারচেয়ে বেশি ছিল। সম্পদগুলো আসার পর তিনি সাহাবিদের বললেন, 'এগুলো মসজিদে রেখে দাও।' (পরে মসজিদ থেকেই তিনি সেগুলো দান করে দেন।)[৫৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক অভ্যাস ছিল, কারও চাওয়ার আগেই তিনি তাকে দান করতেন। এটা ছিল তার দানশীলতার এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা হোক আর ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্য ব্যতীত সেগুলোর একটি দিনারও আমার কাছে জমা থাকুক এবং এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক, তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে.. এভাবে... এভাবে... বিলিয়ে দেবো।' তিনি তার হাত দিয়ে ডান, বাম ও পেছনের দিকে ইশারা করলেন।[৫৯]

অনেক মানুষের ইসলামগ্রহণের মাধ্যম ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দানশীলতার গুণ। কেননা তিনি এভাবে দান করতেন, যাতে দরিদ্রতার ভয় ছিল না। যেমন হজরত আনাস রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলামগ্রহণের শর্তে যখনই কিছু চাওয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই তা দান করেছেন। আনাস রা. আরও বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এসে কিছু চাইল। তখন তিনি তাকে এত বিপুল পরিমাণ বকরি দান করলেন, যাতে দুই পাহাড়ের মাঝের জায়গা ভরে যাবে। ওই ব্যক্তি সেগুলো নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলতে লাগল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলামগ্রহণ করো। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উজাড় করে দান করেন যে, নিজের অন্ন-কষ্টের কোনো ভয়ই করেন না।'[৬০]

তাঁর দানশীলতার অনেক ঘটনা রয়েছে। যেমন রুবাইয়া বিনতে মুআওয়িজ ইবনে আফরা রা. বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একপাত্র ভেজা খেজুর, একঝুড়ি শাকসবজি হাদিয়া হিসেবে পেশ করলাম। এরপর তিনি আমাকে একমুষ্টি অলংকার

---

৫৮. *সহিহ বুখারি : ৪১১, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ১২৮০৭।*
৫৯. *সহিহ বুখারি : ৬০৭৯, ৬০০০।*
৬০. *সহিহ মুসলিম : ২৩১২, মুসনাদে আহমদ : ১২৮১৩, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৩৭৩।*

CamScanner

দান করলেন...। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমাকে স্বর্ণ দিলেন' এবং বললেন, 'এর দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করো।'[৬১]

এটা হলো তাঁর অপরিসীম দানের কিছু নমুনা। অথচ তিনি নিজে কঠিন দরিদ্রতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করতেন, কখনো কোনো সম্পদের মালিকানা রাখতেন না। কিন্তু যখনই তাঁর নিকট কোনো সম্পদ আসত, দুহাত উজাড় করে তা মুমিনদের দান করে দিতেন। অপরদিকে তিনি একজন অতি সাধারণ মুসলিম মহিলার বিনম্র উপহারও সম্মানের সাথে গ্রহণ করতেন এবং এই গ্রহণ করাটাই ছিল তাঁর বিনয়ের অনন্য নিদর্শন এবং ওই মহিলার চিত্ত-প্রশান্তির কারণ।

দান ও সদকা প্রদানের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক আগ্রহের কথা আমরা জানি। এমনকি ইনতেকালের আগমুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় বিছানায় শায়িত থেকেও তিনি দানের কথা চিন্তা করেছেন! অন্যের প্রয়োজনে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দানশীলতার যে অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর কাছাকাছিও কোনো উপমা নেই। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে গেল। প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন। এ সময় আমাদের ঘরে সাতটি বা নয়টি দিনার জমা ছিল। তিনি বললেন, 'হে আয়েশা, ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো কী করেছ?' আমি বললাম, 'আমার নিকটে আছে।' তিনি বললেন, 'সেগুলো সদকা করে দাও।'

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. বলেন, কাজের ব্যস্ততায় আমি সদকা করতে ভুলে যাই। পরে তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আয়েশা, ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো কী করেছ?' আমি বললাম, 'আমার নিকটে আছে।' তিনি বললেন, 'সেগুলো আমার নিকটে নিয়ে এসো।'

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে এসে তাঁকে দিলাম। তিনি সেগুলো হাতে নিলেন। অতঃপর বললেন, 'মুহাম্মাদের জন্য কি এটি শোভা পায় যে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ এগুলো তাঁর কাছে রয়ে যাবে?'[৬২]

---

[৬১]. *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭০৬৫, *শামায়েল তিরমিজি* : ২০১।

[৬২]. *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৭১৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৬০৪, *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা* : ৮/১৩৪, ১৩৫।

এ সময় সেখানে হজরত উম্মে সালামা রা.[৬৩] প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন তাঁর চেহারা খুবই বিষণ্ণ। তিনি ভাবলেন, হয়তো রোগের তীব্রতায় এমনটা হয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার মুখ এমন মলিন কেন?'

তিনি বললেন, 'এই সাতটি দিনারের জন্য, যা গতকাল আমার নিকট এসেছে। আমি রাত্রযাপন করেছি অথচ এটা আমার বিছানার পাশে ছিল।'[৬৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এগুলো আমার নিকট এসেছে অথচ এখন পর্যন্ত তা দান করতে পারিনি।'[৬৫]

সুন্দর হয়, যদি বদান্যতা ও দানশীলতার আরেকটি চমৎকার ঘটনা দিয়ে আমাদের এই পরিচ্ছেদের ইতি টানি। ঘটনাটি ছিল হুনাইনের যুদ্ধের সময়ের। এই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিরা প্রচুর গনিমত অর্জন করেছিলেন। হুনাইন থেকে ফেরার পথে রাসুলের সাথে ছিলেন হজরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা.। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের ময়দান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। বেদুইন লোকেরা তাঁর কাছে গনিমতের সম্পদ চাইতে এসে তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিলো এবং গাছের কাঁটায় তাঁর চাদর আটকে গেল। সেখানে তিনি থেমে গেলেন। তারপর বললেন, 'আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশুও থাকত, তবুও সেগুলো আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বলচিত্ত পাবে না।'[৬৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের জন্য কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন না। সৈন্যবাহিনীর মাঝেও কিছু বিতরণ করতেন। কিন্তু সেই বিতরণের সময় তাদেরকেও তিনি ভালোভাবে সতর্ক করে

---

৬৩. তিনি হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া হুজাইফা ইবনুল মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখজুম। তিনি ছিলেন একজন কুরাইশি, মাখজুম গোত্রের। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সম্মানিতা স্ত্রী। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ৮/১৫০, জীবনী নং : ১১৮৪৫।

৬৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬৫৫৭, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫১৬০।

৬৫. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬২৭১৪।

৬৬. *সহিহ বুখারি* : ২৯৭৯, ২৯২৭; *সুনানে নাসায়ি* : ৩৬৮৮, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮

CamScanner

বলতেন 'দেখো, এ সকল সম্পদ নিছক একটা উপলক্ষ্য ও উপকরণ, কিছুতেই এগুলো চূড়ান্ত কোনো লক্ষ্য নয়।'

বাস্তবেই সম্পদ সব সময় নবীজির নিকট তুচ্ছ উপলক্ষ্যই মনে হয়েছে। এ কারণে সম্পদগুলো তিনি মক্কার বড় বড় নেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাদের ইসলামগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য ব্যবহার করেছেন। যেমন আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিজাম, হারেস ইবনে হিশাম (আবু জাহালের ভাই), নুজায়ের ইবনে হারেস (কুরাইশের কুখ্যাত দুষ্টলোক ও নবীজির প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণকারী নজর ইবনে হারিসের ভাই) প্রমুখ ব্যক্তিদের ইসলামগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে নবীজি অনেক সম্পদ ব্যয় করেছেন। একইভাবে আরবের কিছু বড় নেতাকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি সম্পদ খরচ করেছেন। যেমন বনু ফাজারার নেতা উয়াইনা ইবনে হাসান, বনু তামিমের নেতা আকরা ইবনে হাবিস।[৬৭] এ সকল ব্যক্তির প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ও দানশীলতা তাদের অন্তরে ইসলামের বীজ বপন করেছিল এবং এটা হয়েছিল তাদের ইসলামগ্রহণের অন্যতম উপলক্ষ্য।

অবশ্য পরে তারাও প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠেন। সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে হজরত আনাস রা.-এর এই উক্তিটি ছিল যথার্থ। তিনি বলেন, এ সময় কোনো ব্যক্তি যখন প্রথম ইসলামগ্রহণ করত, তখন শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলামগ্রহণ করত। প্রকৃতপক্ষে (আন্তরিকতা নিয়ে) ইসলামগ্রহণ করত না। কিন্তু (ক্রমশ ইসলাম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হলে) অবশেষে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে ইসলামই হয়ে উঠত তার নিকট অধিকতর প্রিয়।[৬৮]

---

[৬৭]. ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৪/২৮৬, *তাফসিরে ইবনে আবু হাতেম* : ৬/১৮২২, ১৮২৩, আল্লামা তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক* : ২/১৭৫, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৪/৩৬০।

[৬৮]. *সহিহ মুসলিম* : ২৩১২, ৫৮৪৯।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহসিকতা ও বীরত্ব

কুরআনুল কারিম মুমিনদের সব সময় সাহসী হতে উৎসাহিত করেছে। কুরআনুল কারিমের আয়াতগুলোই হলো সেই উৎসারিত ঝরনাধারা, যার স্রোতধারা থেকেই মুসলিম উম্মাহ পান করে সাহসিকতার পানি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এই উম্মত ও তাঁর রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর নিহত বা জয়যুক্ত হবে (সর্বাবস্থায়), আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দান করব। [সুরা নিসা : ৭৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কথা এবং কাজ ছিল বীরত্বের উচ্চতম নিদর্শন। আমরা যদি তাঁর জীবনচরিতের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখতে পাব, জীবন চলার পথে যেকোনো পরিস্থিতি কিংবা যেকোনো বিপদে তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, প্রবল বিশ্বাসী এবং অসীম সাহসের অধিকারী। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর উদ্দেশে বলেন,

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(হে নবী) আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন। আপনার ওপর আপনার নিজের ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই এবং মুমিনদের উৎসাহ দিতে থাকুন। [সুরা নিসা : ৮৪]

শৈশব থেকেই এ ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। যার

নমুনা হিসেবে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর চাচাদের সাথে 'ফিজার' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যখন তাঁর বয়স পনেরোও পেরোয়নি।[৬৯] এ ছাড়া নির্জন মরুভূমির সুউচ্চ পর্বতের হেরা গুহায় দীর্ঘদিন তিনি একাকী অবস্থান করেছেন।[৭০] এ কারণে নবুয়ত-পরবর্তী সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর যে বীরত্বের প্রকাশ ঘটেছে, তাতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। সাহসিকতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। আর এগুলো নিছক কোনো কথার কথা নয়, বরং তাঁর জীবনজুড়ে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কোনো ধরনের দ্বিধা, সংকোচ ও ভীরুতা ছাড়া তিনি সারাজীবন অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ইসলামি দাওয়াতের শুরুলগ্নেই তিনি মুশরিকদের বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হন। তিনি তাদের এমন বিষয়ের দাওয়াত দেন যা ছিল তাদের নিকট খুবই অপছন্দের। এজন্য তারা এটা গ্রহণ করতে এবং মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা নতুন এই আহ্বানের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। তবে তাদের এই বাধা ও ভীতিপ্রদর্শন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াতের রাস্তা থেকে সামান্যতমও বিরত রাখতে পারেনি। এর মাধ্যমে তিনি উম্মতের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সেটা হলো, দৃঢ় সাহসিকতার সাথে, সাধ্যের সবটুকু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকাশ্যে বাতিলের সামনে সত্যের আওয়াজকে তুলে ধরতে হবে, যদিও শত্রুপক্ষ সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সর্বশক্তি ব্যয় করে সত্যকে প্রতিহত করতে চায়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীম সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে জুলুম প্রতিহত করার ক্ষেত্রে। কোনো ধরনের ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই তিনি জালেমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। তিনিই আমাদের সেই নবী, যিনি অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করে অত্যাচারিতের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইবনে হিশাম রহ. বলেন, ইরাশ গোত্রের এক

---

৬৯. ফিজার (الفجار) : এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির প্রায় ২০-২৫ বছর আগে। কুরাইশ ও তার মিত্রবাহিনী এবং হাওয়াজিন গোত্রের মাঝে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। আবার এটি হয়েছিল পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে। তারা যখন এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করেছে, তখন তারাই বলেছে আমরা অপরাধ করছি। এ কারণে এটাকে বলা হয় فجار বা অপরাধের যুদ্ধ। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ২/২৮৯, ২৯১।

৭০. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩৮৫।

ব্যক্তি উট বিক্রির উদ্দেশ্যে মক্কায় এলে আবু জাহেল তা ক্রয় করে। কিন্তু দাম পরিশোধে সে টালবাহানা শুরু করে। নিরুপায় হয়ে সেই ইরাশি লোক কুরাইশদের একটি সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে মসজিদের একপাশে বসেছিলেন। ইরাশি লোকটি তাদেরকে বলল, 'হে কুরাইশরা, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে আবু জাহেলের নিকট থেকে আমার উটের দাম আদায় করে দেবে? আমি একজন বিদেশি মুসাফির। সে আমার অধিকার (মূল্য) আদায়ে গড়িমসি করছে।'

তখন মজলিসের লোকেরা তাকে বলল, 'তুমি কি ওই বসা লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখতে পাচ্ছ? তুমি তার কাছে যাও। সে আবু জাহেল থেকে তোমার পাওনা আদায় করে দেবে।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু জাহেলের মধ্যকার শত্রুতার কথা জানত বলেই তারা মজা করার জন্য এমনটি বলেছিল। ইরাশি লোকটি নবীজির সামনে এসে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা, আবু জাহেলের কাছে আমার কিছু পাওনা রয়েছে, কিন্তু আমাকে দুর্বল পেয়ে সে তা আদায়ে গড়িমসি করছে। আমি একজন বিদেশি মুসাফির। আমি ওই মজলিসের লোকদের নিকট তার থেকে আমার হক আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। আপনি আমার পাওনা আদায় করে দিন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির কথা শুনে বললেন, 'তার কাছে চলো।'

এ কথা বলে তিনি নিজেও লোকটির সাথে চললেন। এটা দেখে মজলিসের লোকেরা একজনকে বলল, 'তুমি তাঁর অনুসরণ করো আর সে কী করে দেখে এসো।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হয়ে সোজা আবু জাহেলের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন এবং তার দরজার কড়া নাড়লেন।' সে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

নবীজি বললেন, 'আমি মুহাম্মাদ। বাইরে আসুন।'

আবু জাহেল বাইরে বেরিয়ে এলো। এ সময় ভয়ে-আতঙ্কে তার মুখ ছিল বিবর্ণ। প্রাণ যেন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'আপনি এই লোকটির পাওনা দিয়ে দিন।'

আবু জাহেল বলল, 'হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও, আমি এখনই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে সে ভেতরে চলে গেল এবং লোকটির পাওনা এনে তাকে দিয়ে দিলো। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন এবং ইরাশি ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি এবার নিজের কাজে চলে যাও।'

ইরাশি ব্যক্তিটি আবার সেই মজলিসে গিয়ে হাজির হলো এবং তাদের লক্ষ্য করে বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) উত্তম বিনিময় দিন। আল্লাহর কসম! তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।'

এদিকে কুরাইশদের প্রেরিত সেই লোকটিও ফিরে এলো। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী দেখলে বলো?'

লোকটি বলল, 'আমি আজ এক বিস্ময়কর বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি গিয়ে শুধু আবু জাহেলের দরজায় করাঘাত করলেন, তখন আবু জাহেল বেরিয়ে এলো। ভয়ে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মুহাম্মাদ তাকে বললেন, এই লোকটির পাওনা দিয়ে দিন। আর সে বলল, একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে ভেতরে গেল এবং তার পাওনা এনে তাকে দিয়ে দিলো।'

একটু পরে আবু জাহেল নিজেও সেই মজলিসে এসে উপস্থিত হলো। তখন মজলিসের লোকেরা তাকে তিরস্কার করে বলল, 'আপনার কী হলো? আল্লাহর কসম! আজ যা করলেন, আমরা কখনো আপনাকে এমন করতে দেখিনি।'

আবু জাহেল বলল, 'ধিক তোমাদের! আল্লাহর কসম! সে গিয়ে যখন আমার দরজায় করাঘাত করল এবং আমি তার সামনে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম তাঁর মাথার ওপর একটি ভয়ানক উট দাঁড়িয়ে আছে। উটটির মাথা বৃহদাকার, কাঁধ চওড়া এবং দাঁতগুলো ধারালো। এমন ভয়ংকর উট আমি আগে কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম! তখন আমি যদি তার পাওনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করতাম, তবে সেই উট আমাকে আস্ত গিলে ফেলত।'[৭১]

---

৭১. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩৮৯, ৩৯১।

একইভাবে তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের বিপদের সময়ও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সাহসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এ বিষয়ে হজরত আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে দানশীল। এক রাতে মদিনাবাসী এক বিকট শব্দ শুনে ঘাবড়ে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা রা.-এর জিনবিহীন ঘোড়ায় চড়ে তরবারি ঝুলিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি তখন লোকদের লক্ষ্য করে বলছিলেন, 'তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি এটাকে দ্রুতগামী পেয়েছি।' (অর্থাৎ এটি একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার আওয়াজ ছিল।)[৭২]

যুদ্ধের ময়দানেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর বীরত্ব ছিল আলোকিত মশালের ন্যায়। পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরাম যার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আলি রা. বলেন, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, একদল অন্যদলের ওপর তীব্র গতিতে আক্রমণ করত, আমরা তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে চিন্তিত থাকতাম (না জানি তাঁর কোনো ক্ষতি হয়ে যায়)! কেননা, তাঁর চেয়ে শত্রুবাহিনীর অধিক নিকটে আমাদের মধ্যে আর কেউ যেত না।[৭৩]

উহুদ যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে শত্রুবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে মুসলমানরা যখন সাময়িক পরাজয়ের মুখে আপতিত হয়, তখনও আমরা তাঁকে নির্ভীক ও সাহসী দেখতে পাই। তিনি তখনও মুশরিক নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। এ সময় উবাই ইবনে খালফ ময়দানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধান পেয়ে তাঁর নিকট এগিয়ে এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আজ তুমি বেঁচে গেলে আমার আর রক্ষা নেই।'

তখন মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কেউ কি তার দিকে অগ্রসর হব?'

নবীজি বললেন, 'তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও (অর্থাৎ তাকে আসতে দাও)।'

---

৭২. *সহিহ বুখারি* : ২৮২০, *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৭, ৫৮৩৫; *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৯৮৮, *সুনানে তিরমিজি* : ১৬৮৭।

৭৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৩৪৬, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২৬৩৩।

এরপর উবাই ইবনে খালফ যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি চলে এলো, তখন নবীজি হারেস ইবনে সিমমা রা. থেকে একটি বর্শা নিয়ে এমন শক্তিমত্তার সাথে ঝাঁকুনি দিলেন যে, আমরা চারদিকে এমনভাবে ছিটকে পড়লাম, ভীমরুলের ঝাঁক যেমন উটের তাড়া খেয়ে উটের পিঠ থেকে উড়ে যায়। এরপর তিনি উবাই ইবনে খালফের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার ঘাড়ে আঘাত হানলে সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে এবং মাটিতে কয়েকবার গড়াগড়ি খায়। অবশেষে মক্কায় ফেরার পথে মারা যায়।[৭৪]

হজরত মিকদাদ ইবনে আমর রা. উহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন! তিনি যুদ্ধ করতে করতে শত্রুবাহিনীর এত নিকটে পৌঁছে যেতেন যে, তাঁর এবং শত্রুর মাঝে মাত্র এক বিঘতের ব্যবধান থাকত। তিনি একেবারে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যেতেন। সাহাবিরাও যুদ্ধ করতে করতে একসময় তাঁর নিকটে পৌঁছে যেত, আবার তাঁর থেকে দূরে সরে যেত। আমি তাঁকে দেখতাম, তিনি কখনো দাঁড়িয়ে ধনুক থেকে তির নিক্ষেপ করছেন। আবার কখনো পাথর নিক্ষেপ করছেন। ফলে কাফেররা দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন স্থানে) অবিচল আছেন। যেমন তিনি তার সাথে যুদ্ধের কষ্ট সহ্যকারী বাহিনীর মাঝে অবিচল থাকতেন।[৭৫]

এ ছাড়া হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা এক উজ্জ্বল সাহসিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে যাবে। **(মানচিত্র নং-১)**

---

[৭৪]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৮৩।

[৭৫]. বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়া* : ৩/২৪৬।

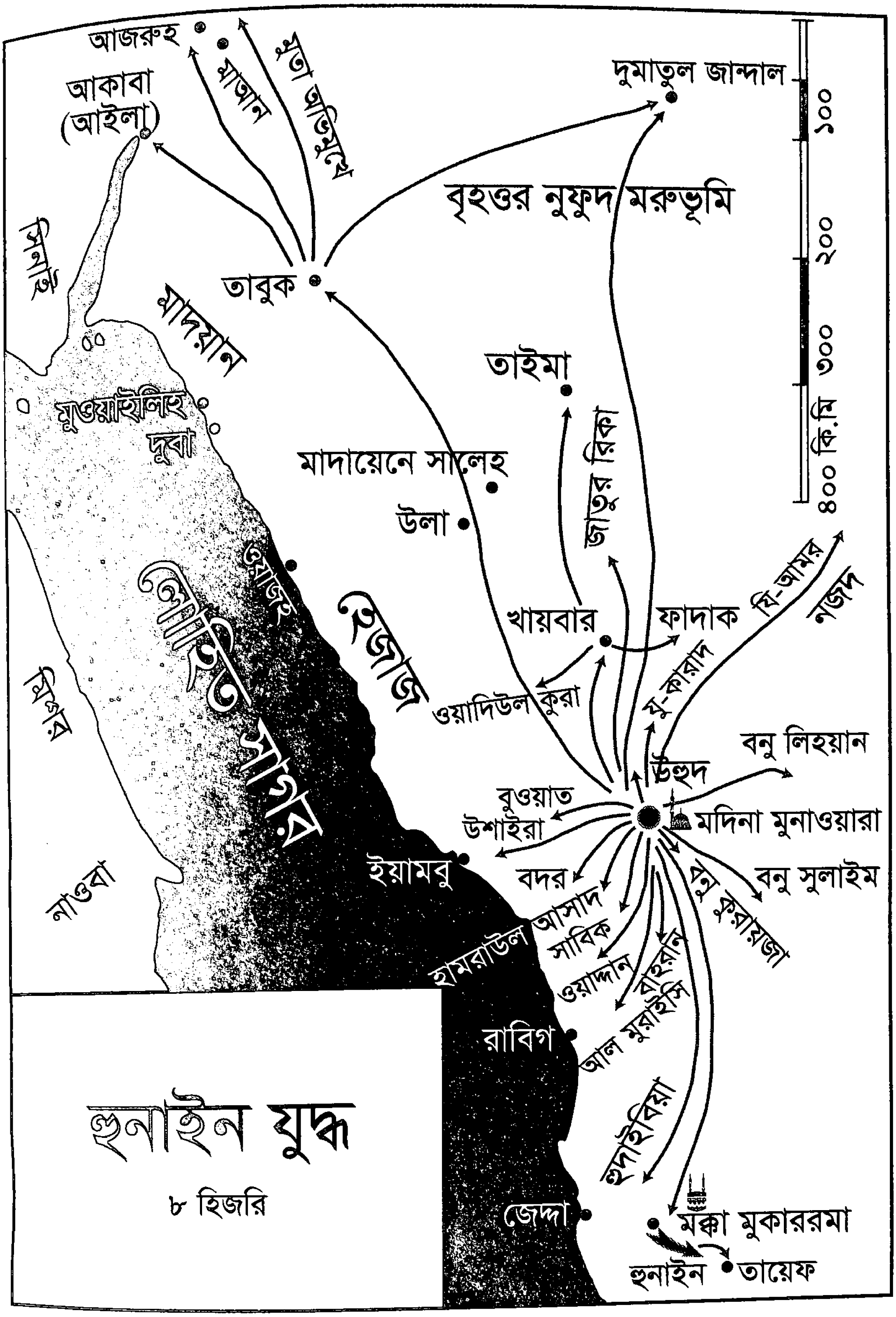

মানচিত্র নং-১

হুনাইন যুদ্ধ (৮ হিজরি)

এটা তখন ঘটেছিল, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে লাগল। তখন তিনি নিজের বাহন থেকে নিচে নামলেন এবং (আল্লাহর কাছে) দোয়া করে সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। আর বলতে থাকলেন,

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

আমি যে নবী, তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।

এবং তিনি দোয়ার মধ্যে বলতে লাগলেন, اَللّٰهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ—হে আল্লাহ, তুমি তোমার সাহায্য নাজিল করো।[৭৬]

সেদিন যুদ্ধের ময়দানে তাঁর চেয়ে দৃঢ় এবং শত্রুর অধিক নিকটবর্তী আর কাউকে দেখা যায়নি।[৭৭] শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় তিনি সেদিন তাদের সামনে একাই দৃঢ়পদ ছিলেন। তিনি জমিন থেকে একমুষ্টি ধুলামাটি তুলে নিলেন, এরপর شَاهَتِ الْوُجُوهُ—'তোমাদের মুখ কালো হোক'[৭৮] বলে তা শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর শত্রুদের কেউ তাঁর সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারেনি।[৭৯]

আমরা আরও দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সকল প্রকার ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা দুনিয়ার হায়াত, রিজিক এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ—সবকিছুই আল্লাহর কুদরতি হাতের নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ...»

> হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা এবং কৃপণতা হতে...।[৮০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সাহসিকতার শিক্ষা দিতেন। সত্যকথন থেকে শুরু করে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই। সাহসিকতা প্রদর্শনের এ সকল বিষয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জুলুমের প্রতিবাদ। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

৭৬. *সহিহ বুখারি* : ২৮৬৪, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৬, ৪৪৬৭; *সুনানে তিরমিজি* : ১৬৮৮।

৭৭. ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ২/৪২২, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৯০।

৭৮. *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭৬২।

৭৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৬২৮, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ১/২২৮, ২২৯।

৮০. *সহিহ বুখারি* : ৬৩৬৭, *সহিহ মুসলিম* : ২৭০৬, *সুনানে নাসায়ি* : ৫৪৮১।

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

স্বৈরাচারী বাদশার সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা হলো সর্বোত্তম জিহাদ।[৮১]

এ ছাড়া জিহাদের ফজিলত এবং নিজের জান ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার ফজিলত সম্পর্কে তিনি বলেন,

«لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তা থেকে উত্তম।[৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল সাহসিকতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহসিকতার মধ্যে কোনো আক্রমণাত্মক দিক কিংবা অদূরদর্শিতা ছিল না, বরং তাঁর সাহসিকতা ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা তায়েফ দুর্গের অবরোধ নিয়ে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়টি লক্ষ করতে পারি। এই অবরোধ স্থায়ী হয়েছিল চল্লিশ দিনেরও বেশি সময়। এর মাঝে তিনি জানতে পারলেন, দুর্গে যে খাদ্য ও পানীয় মজুদ আছে, তা তাদের পুরো এক বছর কিংবা কয়েক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে। তখন আমাদের এই সাহসী নবী ও সেনাপতি অবরোধ অব্যাহত রাখার সম্ভাব্য ক্ষতি ও লাভ সম্পর্কে একটি জরিপ করলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, এই স্থানে তার দীর্ঘদিন অবরোধ ও অবস্থানের মাঝে তায়েফবাসীর চেয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। কারণ, ইসলামি শক্তি বা বাহিনী তো নিছক একটি ইসলামি সৈন্যবাহিনীর দল বা অংশ নিয়ে গঠিত নয়; বরং পুরো ইসলামি সমাজ মিলেই তার বাহিনী। অথচ মদিনায় নারী এবং ঘরবাড়ি পাহারার জন্য খুবই অল্পসংখ্যক পুরুষ রেখে আসা হয়েছে। তাই এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে মদিনায় ইহুদি ও মুশরিকদের আক্রমণের ভয় রয়েছে। এ কারণে বলা যায়, অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নবীজি একটি দূরদর্শী ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৮৩]

---

৮১. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৩৪৪, *সুনানে তিরমিজি* : ২১৭৪, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৪০১১।

৮২. *সহিহ বুখারি* : ২৭৯২, *সহিহ মুসলিম* : ১৮৮০।

৮৩. সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ২৫৫-২৬৬, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৬৫২-৭০৯।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহসিকতা ছিল দয়া ও অনুগ্রহের গুণেও গুণান্বিত। তিনি তার শক্তি ও সাহসিকতা ব্যবহার করেছেন শুধু জিহাদের ময়দানে। আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য। তিনি কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত নিজ হাতে কাউকে কোনোদিন আঘাত করেননি। যেমনটি হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন কাউকে নিজ হাতে আঘাত করেননি। এমনকি তাঁর কোনো স্ত্রী ও খাদেমকেও না। কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্র ছিল এর ব্যতিক্রম। এ ছাড়া নবীজির ওপর (ব্যক্তিগতভাবে) কোনো আঘাত এলে, তিনি প্রতিপক্ষ থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। হ্যাঁ, আল্লাহর কোনো বিধানকে লঙ্ঘন করা হলে, তিনি কেবল আল্লাহর জন্যই দণ্ড প্রয়োগ করতেন।[৮৪]

এমনটাই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহসিকতা, যা প্রতিষ্ঠিত ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র এবং ন্যায়নিষ্ঠার ওপর। এ কারণে বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে সকল প্রজন্মের জন্য এটা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং অনুসরণীয় আদর্শ। জগতে তাঁর সাহসিকতার চেয়ে মহৎ কোনো সাহসিকতা নেই!

* * *

---

৮৪. *সহিহ মুসলিম* : ২৩২৮, ৫৮৭৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণ ছিল এতটাই উচ্চ ও সমুন্নত যে, জগতের কেউ কখনো তাঁর সমপর্যায়ে পৌছাতে পারবে না। স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের সাথে তাঁর আচরণ যেমন আদর্শপূর্ণ ছিল, সাহাবিদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল তেমন অনুসরণীয়। সাহাবিদের সাথে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তাঁর প্রভাব তাদের মেধা ও মস্তিষ্কে পৌছার আগেই তা হৃদয়ের গহিনে পৌঁছে যেত। এ কারণে সাহাবিরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতেন। এভাবে সৈন্যদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল উত্তম ও আদর্শনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন তাদের শিক্ষক এবং অভিভাবক, যিনি তাদের অন্তরে ও মস্তিষ্কে সুউচ্চ মূল্যবোধ রোপণ করে দিয়েছিলেন। মানুষের জ্ঞাত ইতিহাসের সকল রীতিনীতি ও মূল্যবোধের চেয়ে এগুলো ছিল আরও উন্নত এবং শ্রেষ্ঠতর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণের এইসব অনন্য বৈশিষ্ট্যই তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। এই পরিচ্ছেদে কিছু শিরোনামের অধীনে তাঁর সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অনুচ্ছেদ
স্ত্রীদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
বংশধরদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
সাহাবিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
সৈনিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
অপরিচিতদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

CS CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

স্ত্রীদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন। এই দুই শ্রেণির মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন তাঁরই একটি রীতি ও নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।

[সুরা রুম : ২১]

সুতরাং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে শান্তি, স্বস্তি, ও ভালোবাসা অর্জন করা আল্লাহ তাআলার এক অপার নিদর্শন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক জীবন ছিল কুরআনুল কারিমের এই আয়াতগুলোর বাস্তব নমুনা। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর সাহাবিদের বারবার নিজেদের স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণের উপদেশ দিতেন। স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণে উৎসাহ দিতেন, যাতে তাদের জীবনযাপন হয়ে ওঠে পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত অনুপাতে পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও ভালোবাসাময়। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সে, যে তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম।[৮৫]

---

৮৫. সুনানে তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৭৭।

নিজ স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত ও উপমা রয়েছে। আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন যে তিনি স্ত্রীদের বিপদে সান্ত্বনা দিতেন, তাদের অশ্রু মুছে দিতেন। তাদের অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন। তিনি তাদের কারও কথায় উপহাস করতেন না। বরং তাদের সকল অভিযোগ-অনুযোগ মন দিয়ে শুনতেন। তাদের দুঃখ-যাতনা লাঘবের চেষ্টা করতেন...। এভাবেই তিনি দাম্পত্যজীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ফলে তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শ, যুগের পর যুগ মুসলিম পরিবারগুলো যার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম। যেমন হজরত আনাস রা. বলেন, একবার হজরত সাফিয়া রা.-এর নিকট সংবাদ এলো যে, হজরত হাফসা রা. তাকে 'ইহুদির মেয়ে' বলেছেন। এতে হজরত সাফিয়া রা. অপমানিত বোধ করে কাঁদতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নিকট এলেন, তখনও তিনি কাঁদছিলেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

সাফিয়া রা. বললেন, 'আমাকে হাফসা 'ইহুদির মেয়ে' বলেছেন।' নবীজি তখন তাঁকে বললেন, 'তুমি তো একজন নবীর কন্যা। তোমার চাচাও একজন নবী। আবার এখন তুমি একজন নবীর স্ত্রী। তাহলে কীভাবে সে তোমার ওপর গর্ব করতে পারে?'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রা.-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে হাফসা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো।'[৮৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন—তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হজরত আয়েশা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের সময় নিজের জুতা নিজেই ঠিক করে নিতেন, নিজের কাপড়ে নিজেই তালি দিতেন।[৮৭]

স্ত্রীদের সাথে রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল সহানুভূতিপূর্ণ এবং ভালোবাসামিশ্রিত। তিনি স্ত্রীদের সাথে সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক আচরণ করতেন। তিনি স্ত্রীদের কাজে

---

[৮৬]. *সুনানে তিরমিজি* : ৩৮৯৪, *মুসনাদে আহমাদ* : ১২৪১৫।

[৮৭]. *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৭৯৩, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৭৬৯।

সহযোগিতা করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করতেন না। তাই প্রয়োজনে স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন।

স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তাদের সাথে একই পাত্রে খাবার খেতেন এবং একই পাত্রে পানি পান করতেন। যেমন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. বলেন, আমি পানি পান করতাম এবং পরে নবীজির জন্য বাকিটুকু রেখে দিতাম। আমি পাত্রের যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনি পাত্রের সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হাড়ের যেখানে মুখ লাগিয়ে গোশত খেতাম, তিনিও সেখানে মুখ লাগিয়ে গোশত খেতেন।[৮৮]

ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো স্ত্রীদের সাথে নিয়ে রাতের নির্জনে ভ্রমণে বা হাঁটতে বের হতেন। যেমন সহিহ বুখারির বর্ণনা রয়েছে, রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা.-এর সাথে হাঁটাহাঁটি করতেন এবং কথোপকথন করতেন।[৮৯]

তিনি স্ত্রীদের অনেক প্রশংসা করতেন। যেমন আয়েশা রা.-এর প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সকল নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা ঠিক তেমন, যেমন সকল খাদ্যের ওপর সারিদের (আরবদের প্রিয় খাবার) মর্যাদা (বেশি)।[৯০]

এমনইভাবে স্ত্রীদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা ও সহানুভূতিরও প্রকাশ ঘটেছে। যেমন একদিন তিনি হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রা.[৯১]-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, দুটি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি ঝুলানো রয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ রশিটি কী কাজের?' তারা বলল, 'এটি যয়নাবের রশি, তিনি (নামাজ পড়তে পড়তে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে আটকে রাখেন।'

[illegible] সুনানে নাসায়ি, ৭০
[illegible] সহিহ মুসলিম, ২৪৪৭
[illegible] সহিহ মুসলিম, ২৪৪৬
[illegible] যয়নাব বিনতে জাহাশ রা., রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
[illegible]

এটা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, ওটা খুলে ফেলো। তোমাদের সকলের জন্যই প্রফুল্ল ও সজীব থাকা পর্যন্ত নামাজ পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন বিশ্রাম নেবে।'[৯২]

স্ত্রীদের সাথে বিভিন্নপ্রকার আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। তাদের ছোট ছোট দুষ্টুমিগুলোকে প্রশস্ত অন্তরে, প্রফুল্ল চিত্তে এবং ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করতেন। যেমন একবার হজরত আবু বকর রা. এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এই সময় তিনি ভেতর থেকে আয়েশা রা.-এর উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলেন। আবু বকর রা. ভেতরে প্রবেশ করে আয়েশা রা.-কে চড় মারতে উদ্যত হলেন এবং বললেন, 'আমি কি লক্ষ করিনি তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ?'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা.-কে নিবৃত্ত করলেন। এরপর আবু বকর রা. রাগান্বিত অবস্থায় কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবু বকর রা. চলে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-কে (কৌতুকের ছলে) বললেন, 'দেখলে তো, আমি তোমাকে ওই লোকটার হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করলাম!'

এই ঘটনার দীর্ঘদিন পর আবারও একদিন হজরত আবু বকর রা. এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং ভেতরে এসে উভয়কে সন্তুষ্ট অবস্থায় পেয়ে বললেন, 'আজ আমাকেও তোমাদের শান্তির অংশীদার বানিয়ে নাও, যেমনটি তোমাদের আগেকার কলহে আমাকে অংশীদার বানিয়েছিলে।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমরা তাই করলাম... আমরা তাই করলাম।'[৯৩]

অনেক সময় স্ত্রীদের ছোট ছোট আত্মাভিমানের সময়েও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সহনশীলতার পরিচয় দিতেন। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করতেন। যেমন তিনি হজরত খাদিজা রা.-এর কথা বেশি বেশি বলতেন এবং তার প্রতি অনেক

---

[৯২]. *সহিহ বুখারি* : ১১৫০, *সহিহ মুসলিম* : ৭৮৪।
[৯৩]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৯৯৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৪১৮।

ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এটা নিয়ে হজরত আয়েশা রা. প্রায়ই অভিমান করতেন। অথচ নবীজির সাথে আয়েশা রা.-এর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার অনেক আগেই হজরত খাদিজা রা. ইনতেকাল করেছেন। এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে আমি এতটুকু ঈর্ষাবোধ করিনি, যতটুকু ঈর্ষাবোধ করেছি খাদিজা রা.-এর প্রতি; অথচ আমি কখনো তাকে দেখিনি। প্রায়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা আলোচনা করতেন। কখনো কখনো বকরি জবাই করে গোশত ছোট ছোট ভাগ করে খাদিজা রা.-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোনো কোনো সময় অভিমানের সুরে তাঁকে বলতাম, '(আপনার অবস্থাদৃষ্টে) মনে হয়, খাদিজা ব্যতীত পৃথিবীতে আপনার যেন আর কোনো স্ত্রীই নেই!' প্রতি-উত্তরে তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ। সে এমন ছিল... সে তেমন ছিল। তার গর্ভেই আমার সন্তান জন্মেছিল।'[৯৪]

অবশ্য এটা বাস্তব যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীদের কোনো কোনো আচরণে ব্যথিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবনে তিনি কখনো তাদের কাউকে প্রহার করেননি। যেমন হজরত আয়েশা রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি, তার কোনো স্ত্রীকেও না...।'[৯৫]

বরং স্ত্রীদের কেউ কখনো কোনো কারণে ব্যথিত হলে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। যেমন বর্ণনা করা হয়, একবার সাফিয়া রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলেন। একসময় তার ঘোড়াটি আরোহী বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়ার নিকটে গিয়ে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। তিনি নবীজিকে বললেন, 'আপনি একটি অক্ষম ঘোড়ায় আমাকে আরোহী করেছেন!' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাফিয়াকে কাছে টেনে নিজ হাতে তার চোখ মুছে দিলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন..।[৯৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্ত্রীদেরকে অংশীদার করেছেন। উম্মতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে

---

৯৪. *সহিহ বুখারি* : ৩৬০৭, *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩৬।

৯৫. *সহিহ মুসলিম* : ২৩২৮, *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৭৮৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪০৮০।

৯৬. *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬৯০৮, *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি* : ৫/৩৬৯ (৯১৬২)।

আলোচনা করেছেন। জাতির বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে স্ত্রীদের পরামর্শ নিয়েছেন। তেমনই একটি জটিল সময় উপস্থিত হয়েছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা ওঠো, কুরবানি করো এবং মাথা কামিয়ে ফেল।' কিন্তু সাহাবিদের কেউ এমনটা করল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা তিনবার বললেন। তবুও সাহাবিদের কেউ তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশের প্রতি সাড়া দিলেন না। এভাবে তিনবার বলার পরও কারও সাড়া না পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে হজরত উম্মে সালামা রা.-এর কাছে এসে সাহাবিদের এই আচরণের কথা বললেন। উম্মে সালামা রা. বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি এটা চান, তাহলে এবার বাইরে যান। তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনিই প্রথম আপনার উটটি কুরবানি করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করে নিন।'

উম্মে সালামা রা.-এর পরামর্শ অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং কারও সাথে কোনো কথা না বলে আগে নিজের পশু কুরবানি দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করালেন। সাহাবিরা যখন এটা দেখলেন, তখন তারা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন এবং তারাও নিজেদের পশু কুরবানি করলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভিড় ও দ্রুততার কারণে একে অপরের ওপর যেন আছড়ে পড়তে লাগলেন।[৯৭]

দেখুন, এখানে অবস্থাটা ছিল অত্যন্ত জটিল। এ ক্ষেত্রেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রী উম্মে সালামা রা.-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আর এটা উম্মতের জন্য হয়েছিল কল্যাণকর ও বরকতময়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের প্রতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তিমাত্রই দেখতে পাবে, তিনি স্ত্রীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছেন। অনন্য সহযোগিতা এবং পরম ভালোবাসা নিয়ে তিনি তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন। স্ত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন অতি উত্তম স্বামী!

---

৯৭. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১, ২৭৩২; *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮৭২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বংশধরদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

পিতামাতা ও সন্তানসন্ততির সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি বাস্তবসম্মত মানদণ্ড রয়েছে। সেই মানদণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সন্তানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতার ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, পরম যত্ন, বিশুদ্ধ পরিচর্চা এবং সঠিক প্রতিপালনের ওপর। সন্তানদের জন্য পিতা হলো একটি নিরাপদ দুর্গ, যেখানে সন্তানরা সর্বদা আশ্রয় ও নিরাপত্তা খুঁজে পায়। কুরআনুল কারিম সম্পর্কের এই দৃঢ় বন্ধনকে স্থায়িত্ব দান করেছে, সন্তানের উদ্দেশে হজরত লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ উল্লেখ করে সেখানে সন্তানকে প্রতিপালন করার সকল পদ্ধতিও শিখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, পুত্র আমার, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিত জেনো, শিরক করা চরম জুলুম। [সুরা লুকমান : ১৩]

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে পিতা ও কন্যার এক চমৎকার হৃদয়স্পর্শী সম্পর্ক দেখতে পাই। সেই সম্পর্কের শোভা-সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা রা.। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গিতে ফাতেমা রা. আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাকে দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ।' তারপর তাকে তাঁর ডান পাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং তার সাথে চুপিচুপি (কী যেন) কথা বললেন। তখন ফাতেমা রা. কেঁদে দিলেন। আমি তাকে বললাম, 'কাঁদছেন কেন?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তার সাথে চুপিচুপি কী যেন বললেন। এবার তিনি (ফাতেমা রা.) হেসে উঠলেন। আমি বললাম, 'আজকের মতো দুঃখের সাথে সাথে এমন খুশি আমি আর কখনো দেখিনি।' আমি তাকে (ফাতেমা রা.) জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে কী বললেন?' ফাতেমা রা. বললেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা এখন প্রকাশ করতে পারব না।'

অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর আমি আবার ফাতেমাকে সেদিনের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন, 'জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর একবার আমার সাথে কুরআন পাঠের দাওর (শোনাশুনি) করতেন, কিন্তু এ বছর তিনি তা দুইবার করেছেন। আমার মনে হয়, আমার বিদায়কাল ঘনিয়ে এসেছে এবং আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।' এ কথা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতি মহিলাদের অথবা মুমিন মহিলাদের তুমি প্রধান (নেত্রী) হবে!' তখন এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।[৯৮]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যাকে স্নেহ-ভালোবাসা, আদর ও মমতার সাথে লালনপালন করেছেন। নিজের কন্যাকে গড়ে তুলেছেন।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পুত্র ইবরাহিম[৯৯] যখন ইনতেকাল করেন, তখনও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার গভীরতা। তিনি যখন নিজের সন্তানকে সম্বোধন করে নিচের কথাগুলো বলেন, তখনও দেখা গিয়েছিল সন্তানের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহের অপার নিদর্শন। তিনি সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে ইবরাহিম, যদি তা (মৃত্যু) অবধারিত ও সত্য ওয়াদা না হতো, কিয়ামতের দিন একত্র হওয়ার কথা না থাকত এবং যদি তা

---

৯৮. *সহিহ বুখারি* : ৩৬২৩।

৯৯. ইবরাহিম : তিনি মারিয়া কিবতিয়া রা.-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের সাথে তার চেহারা অনেক মিল ছিল।-সম্পাদক

সীমাবদ্ধ কিছু কাল ও সত্য সময় না হতো, তাহলে ইবরাহিম! আমরা তোমার জন্য যে কষ্ট পেয়েছি, তারচেয়ে আরও অধিক কষ্ট পেতাম। আমরা তোমার জন্য অবশ্যই দুঃখিত। চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে। হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তবে আমরা এমন কিছু বলছি না, যা আমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে।'

নবী-পুত্র ইবরাহিমের ইনতেকালের পর তিনি সাহাবিদের বলেছিলেন, 'আমি না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাকে কাফনে মুড়ে দিয়ো না।' এরপর তিনি তার নিকট এলেন, শায়িত ইবরাহিমের মৃত শরীরের দিকে ঝুঁকলেন এবং কেঁদে ফেললেন।[১০০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রেও অনেক যত্নবান ছিলেন। তাদেরকে অনেক আদর করতেন। ভালোবাসতেন। তাদের জন্য সুন্দর সুন্দর নাম নির্বাচন করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আলি রা. বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করল আমি তার নাম রাখলাম 'হারব'। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং বললেন, 'আমার নাতিকে নিয়ে এসো, তোমরা তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, 'হারব।' তিনি বললেন, 'না, বরং তার নাম হাসান।' অতঃপর যখন হুসাইন জন্মগ্রহণ করল, তখনও আমি তার নাম 'হারব' রেখেছিলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং বললেন, 'আমার নাতিকে আমার নিকট নিয়ে এসো, তোমরা তার কী নাম রেখেছ?' আমি বললাম, 'হারব।' তিনি বললেন, 'না, বরং তার নাম হুসাইন।' এভাবে যখন আমার তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখনও আমি তার নাম রেখেছিলাম 'হারব'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নাতিকে নিয়ে এসো, তোমরা তার কী নাম রেখেছ?' আমি বললাম, 'হারব।' তিনি বললেন, 'না, বরং তার নাম মুহসিন।'

---

১০০. *সহিহ মুসলিম* : ২৩১৫। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন শিশু ইবরাহিমকে নিয়ে আসা হলো, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাই বললেন। আনাস রা. বলেন, আমি দেখলাম ইবরাহিম অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছে। (এ করুণ দৃশ্য দেখে) নবীজির দুচোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বললেন, 'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, হৃদয় অস্থির হচ্ছে, তবে আমার প্রভুর যাতে খুশি, তার বিপরীত কিছু বলব না। আল্লাহর কসম! হে ইবরাহিম, তোমার জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।' *সহিহ মুসলিম* : ৫৮৫৩।

এরপর তিনি বললেন, 'আমি তাদের এই নাম রেখেছি হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সন্তানদের নামানুসারে। হারুন আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের নাম রেখেছিলেন শাবার, শুবাইর ও মুশবির।'[১০১]

নাতি-নাতনিদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ছিল অত্যধিক প্রগাঢ় ও গভীর। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রা.-এর একটি বর্ণনা থেকে। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় হজরত হাসান ও হুসাইন রা. লাল ডোরাবিশিষ্ট জামা পরিধান করে সেদিকে আসছিলেন। কিন্তু আসতে গিয়ে (কম বয়সী হওয়ায়) হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা বন্ধ করে মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষাস্বরূপ। [সুরা তাগাবুন : ১৫]

আমি উভয়কে (পড়ে যেতে) দেখে আর সহ্য করতে পারিনি।' এরপর নবীজি আবার খুতবা দেওয়া শুরু করলেন।[১০২]

এমন ভালোবাসা তাঁর অন্য নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রেও ছিল। যেমন হজরত আবু কাতাদা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যায়নাবের কন্যা উমামা রা.-কে কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। তিনি যখন সেজদায় যেতেন, তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন, তখন তাকে কাঁধে তুলে নিতেন।[১০৩]

স্নেহ ও ভালোবাসার এমনই আরেকটি চমৎকার ঘটনা আছে। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা.। তিনি বলেন, একদিন বিকেলের কোনো এক নামাজের সময় (অর্থাৎ জোহর বা আসরে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তিনি হাসান বা হুসাইন রা.-এর মধ্য থেকে একজনকে

---

[১০১]. *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৬৯, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৪৭৭৩।
[১০২]. *সুনানে আবু দাউদ* : ১১০৯, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৬০০।
[১০৩]. *সহিহ বুখারি* : ৫১৬, *সহিহ মুসলিম* : ৫৪৩।

বহন করে আনলেন। ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ডান পাশে রেখে দিলেন। তারপর নামাজের জন্য তাকবির বললেন ও নামাজ শুরু করলেন। নামাজের মধ্যে একটি সেজদা অনেক দীর্ঘ করলেন। আমার বাবা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দেখলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত আছেন আর বাচ্চাটি (হাসান বা হুসাইন) তাঁর পিঠের ওপর বসে রয়েছে। তারপর আমি আবার সেজদায় চলে গেলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করলে লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আপনার নামাজের মধ্যে একটি সেজদা এত বেশি লম্বা করলেন, যা আগে কখনো করেননি। আমরা ধারণা করলাম, হয়তো এভাবেই আপনাকে আদেশ করা হয়েছে অথবা আপনার ওপর ওহি নাজিল হচ্ছে।'
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এগুলোর কোনোটিই ঘটেনি। বরং আমার নাতি আমাকে বাহন বানিয়েছিল (অর্থাৎ আমার ওপর উঠে বসেছিল)। তাই আমি সেজদা থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যাতে সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।'[১০৪]
এমন স্নেহ-ভালোবাসার ঘটনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে আকস্মিকভাবে দু-একটি ঘটলেও এটি ছিল তাঁর স্বভাবজাত ও উত্তম চরিত্রের অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাসান ইবনে আলি রা.-কে চুম্বন করেন। সেখানে তখন আকরা ইবনে হাবিস তামিমি রা. বসা ছিলেন। এটা দেখে আকরা ইবনে হাবিস রা. বললেন, 'আমার দশটি পুত্র আছে। অথচ আমি তাদের কাউকে কোনোদিন চুম্বন করিনি।' এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না।[১০৫]

তবে, সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের প্রতি এমন অপরূপ ভালোবাসা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারণে কখনো অন্য কোনো মুসলমানকে কষ্টে ফেলেননি। বরং তাদেরকেই অন্য মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতে শিখিয়েছেন। যেমন বর্ণিত আছে,

---

[১০৪]. *সুনানে নাসায়ি* : ১১৪১, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৬০৭৬, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৪৭৭৫।
[১০৫]. *সহিহ বুখারি* : ৫৯৯৭, ৫৫৭১; *সুনানে আবু দাউদ* : ৫২১৮।

হজরত আলি রা. একদিন হজরত ফাতেমা রা.-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, 'কুয়া থেকে মশক (বালতি) দিয়ে পানি টানতে টানতে আমার বুক ব্যথা হয়ে গেছে।' ফাতেমা রা.-ও বললেন, 'আল্লাহর কসম! আটা ভাঙানোর জাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে আমারও হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে।' তখন আলি রা. বললেন, 'ফাতেমা, তুমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তাঁর নিকট কিছু বন্দি গোলাম এসেছে, তুমি চাইলে হয়তো একজন গোলামকে তোমার খাদেম হিসেবে দিয়ে দেবেন।' তখন ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন, কিন্তু শূন্য হাতেই ফিরে এলেন। পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের নিকট আগমন করলেন এবং তাদেরকে বললেন, 'তোমরা একজন খাদেম পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে আমার নিকট গিয়েছিলে। আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলে দিতে পারি, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়েও কল্যাণকর হবে। তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেবো, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়েও কল্যাণকর হবে। সেটা হলো, তোমরা উভয়েই প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এরপর রাতে শোয়ার সময়েও একশবার পড়বে।'[১০৬]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের শিখিয়েছেন যে, (তাদের প্রতি তাঁর অত্যধিক ভালোবাসা সত্ত্বেও) তিনি অন্য মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসেন না। তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের ভালোবাসার বন্ধন মজবুত করার শিক্ষা দিতেন। কেননা তাদের সকল কর্মে আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। শুধু তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনাই একজন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান করে তোলে।

একজন পিতা ও নানা হিসেবে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সাথে এমনটাই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক, যা প্রতিষ্ঠিত ছিল অপার স্নেহ, সহানুভূতি ও ভালোবাসার ওপর। তাঁর মহানুভব ছায়ায় পরিবারের সকলেই শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করত। হে আল্লাহর রাসুল, পিতা ও নানা হিসাবে আপনি কতইনা মহান!

---

১০৬. *সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫৫২৪, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৭/৩৮।*

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সাহাবিদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক ভালোবাসা তথা (الحب في الله)। এই নিয়ামতের কারণে ইসলামের সূচনা হতেই মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে। অথচ এই মানুষগুলোই জাহিলিয়াতের যুগে একজন অপরজনের 'প্রাণের শত্রু' হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা যখন ইসলামে দীক্ষিত হলেন, তখন তারাই হয়ে গেলেন পরস্পরের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী মুসলিম ভাই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

ফলে তাঁর (আল্লাহর) অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। [সুরা আলে ইমরান : ১০৩]

এরপর আল্লাহ তাআলা এই প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকেই একজন বান্দার জন্য তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমানের পরিচয় হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

প্রকৃতপক্ষে সকল মুমিন পরস্পর ভাই ভাই। [সুরা হুজুরাত : ১০]

'আল্লাহর জন্য' একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক প্রশংসা করেছেন। আখিরাতের ময়দানে এই ভালোবাসার মহান সফলতার কথাও ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ ... وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ»

সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না...। (সেই সাত শ্রেণির ব্যক্তির মধ্যে) এমন দুজন ব্যক্তি থাকবে, যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য।[১০৭]

অন্যদিকে সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেন,

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ؛ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»

কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইয়ের (মুসলিম ভাই) সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দুজনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অন্যজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তবে তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথম সালাম প্রদান করবে।[১০৮]

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে দেখতে পাই, তাঁর আচরণে সাহাবিদের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার প্রকাশ ঘটত। ফলে সকল সাহাবিই ধারণা করতেন যে, অন্যদের চেয়ে তাকেই বুঝি তিনি বেশি ভালোবাসেন। তাঁর জীবনচরিতে আমরা আরও পাই, তিনি তাঁর সাহাবিদের এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন, যেগুলো তাঁর এবং সাহাবিদের মাঝে গভীর হৃদ্যতা ও নৈকট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন হজরত জুবাইর ইবনে আওয়াম রা.-এর ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি নবীরই একজন বিশেষ সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী হলো জুবাইর।[১০৯]

হজরত আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই দুনিয়াবাসী থেকে দুজন পরামর্শদাতা থাকে, আমার জন্য তারা হলো আবু বকর ও উমর রা.।[১১০]

---

[১০৭]. *সহিহ বুখারি* : ৬৬০, ৬২৭।
[১০৮]. *সহিহ বুখারি* : ৬০৭৭।
[১০৯]. *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৬।
[১১০]. *সুনানে তিরমিজি* : ৩৬৮০, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৩০৪৬।

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-এর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'কাতিমু সিররিহি', অর্থাৎ গোপন কথার সঙ্গী।[১১১]

আর হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার থাকে, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. হলো এই উম্মতের আমানতদার।[১১২]

এভাবে আমরা তাঁর জীবনীতে আরও দেখতে পাই, সান্নিধ্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য তিনি সাহাবিদের সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদেরকেও তাঁর পানাহারে অংশীদার করাতেন। যেমন হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, একবার আমি আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর আমরা উভয়ে রওয়ানা হলাম। অবশেষে তিনি তাঁর এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। নবীজির স্ত্রী পর্দার আড়ালে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়ার কিছু আছে কি?'

বললেন, 'হ্যাঁ। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনটা রুটি এনে দস্তরখানে রাখা হলো। তিনি একটি রুটি তুলে নিজের সামনে রাখলেন। আরেকটি রুটি তুলে আমার সামনে রাখলেন। এরপর তৃতীয় রুটিটি হাতে নিয়ে দুই ভাগ করে অর্ধেকটা নিজের সামনে এবং বাকি অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। অতঃপর তিনি আবার বললেন, 'কোনো তরকারি আছে কি?'

তারা বললেন, 'না, তবে সামান্য সিরকা আছে।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেটাই নিয়ে এসো। সেটাও তো উত্তম তরকারি।'[১১৩]

---

১১১. *সহিহ বুখারি* : ৩৭৪২।

১১২. *সহিহ বুখারি* : ৪৩৮০।

১১৩. *সহিহ মুসলিম* : ২০৫২।

এমনইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাস্যরস ও মজার আলোচনার মধ্যেও সাহাবিদের শরিক করতেন। তবে তাঁর হাস্যরসও ছিল সত্যাশ্রিত। সাহাবিদের সাথে এই হাস্যরস ছিল তাঁর নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধির অন্যতম উপকরণ। এমনই এক চমৎকার ও মজার হাস্যরসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস রা.। তিনি বলেন, প্রায়ই এক গ্রাম্য বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত। লোকটির নাম ছিল 'যাহির'। সে গ্রাম থেকে আসার সময় নবীজির জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসত। প্রয়োজন সেরে বাড়িতে ফেরার সময় নবীজিও তাকে কিছু হাদিয়া দিয়ে দিতেন। একদিন তিনি মজা করে বললেন, 'যাহির হলো আমাদের গ্রাম আর আমরা হলাম তার শহর।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব ভালোবাসতেন। অথচ লোকটি দেখতে তেমন সুন্দর ছিল না। একবার নবীজি তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে বাজারে পণ্য বিক্রি করছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে তার পেছনের দিকে গিয়ে তার চোখ ধরে বললেন, 'বলো তো আমি কে?'

সে বলতে থাকল, 'আমাকে ছাড়ো। তুমি কে?' পরে মাথা ঘুরিয়ে দেখল এবং নবীজিকে চিনতে পারল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধরে বলতে লাগলেন, 'কে এই গোলামকে (সাহাবি যাহিরকে) ক্রয় করবে?'

তখন বেদুইন যাহির বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! এই গোলাম তো অচল। (এত কুৎসিত গোলামকে কে কিনবে! বিনিময়ে আপনি সামান্য পয়সাও পাবেন না।)'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর নিকট তুমি অচল নও।' অথবা তিনি বললেন, 'বরং আল্লাহর নিকট তুমি অনেক মূল্যবান।'[১১৪]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সাহাবিদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। তাদেরকে মর্যাদা দিতেন। তাদের খুশিতে খুশি হতেন এবং তাদের দুঃখে দুঃখী হতেন।

---

[১১৪]. *মুসনাদে আহমাদ* : ১২৬৬৯।

মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতেও সাহাবিদের সাথে আমরা তাঁকে দেখতে পেয়েছি তাদেরই একজন হিসেবে। যে কারণে তারা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হতেন, তিনিও সে কারণে চিন্তিত হতেন। তারা যে কারণে কষ্ট পেতেন, তিনিও সে কারণে কষ্ট পেতেন। নিজের ক্ষুধার কথা ভুলে তিনি তাদের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করতেন। তাদের দুঃখ ও কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতেন। খন্দকযুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা থাকা অবস্থায়, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর প্রস্তুতকৃত খাবারের স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি সাহাবিদের রেখে নিজে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়াটা পছন্দ করেননি, অথচ জাবির রা. শুধু তাঁকে একাই খাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে ঘোষণা দিলেন, 'হে খন্দকবাসী! জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. তোমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছে, তাই তোমরা সকলেই আমার সাথে চলো।'[১১৫]

সাহাবিদের জীবনে আপতিত যেকোনো বিপদ বা সংকটময় মুহূর্তে তিনি তাদের সঙ্গ দিতেন। বিভিন্নভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান ও সওয়াব অর্জনের সুসংবাদ দিয়ে। আবার কখনো সংকট থেকে উত্তরণের বাস্তব কোনো সমাধানের পথ বাতলে দিয়ে। এমনই এক সংকটময় মুহূর্তে সুসংবাদের মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রদান করেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.-কে, যখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব অন্যায়ভাবে তার জমি দখল করে বিক্রি করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিপদের কথা উল্লেখ করলেন, তখন নবীজি তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'হে আবদুল্লাহ, আল্লাহ জান্নাতে তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বাড়ি দান করবেন, এতে কি তুমি খুশি নও?'

জবাবে তিনি বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল!'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তোমার জন্য সেখানে তা-ই রয়েছে।'[১১৬]

একবার এক সাহাবি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফল খরিদ করে লোকসানের শিকার হলেন। এতে তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং তিনি নিঃস্ব

---

[১১৫]. *সহিহ বুখারি* : ২৯০৫, ২৮৫৩; *সহিহ মুসলিম* : ২০৩৯।

[১১৬]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/২৮, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৪/১৬৬।

হয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকদের বললেন, 'তোমরা তার জন্য সদকা করো।' লোকেরা তাকে দানসদকা করল। কিন্তু সেগুলোও তার সকল ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হলো না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণদাতাদের বললেন, 'এখান থেকে তোমরা যে পরিমাণ পাচ্ছ, সেটা গ্রহণ করে নাও। তোমরা এর অধিক আর কিছু পাবে না।'[১১৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সাহাবিদের উত্তম সঙ্গী। তিনি তাদের সঙ্গ দিয়েছেন তাদের হাসি-কান্নায়, তাদের সুখ-দুঃখে এবং তাদের দুর্বলতা ও শক্তিতে। তিনি নিজেকে কখনো বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদাবান মনে করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন না; বরং তিনি নিজের খাদ্য-খাবার ও পোশাক-আশাকে তাদের মতোই সাধারণ জীবনযাপন করতেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। অনেক অমুসলিম তাঁর এই অসাধারণ চারিত্রিক গুণের কারণে যারপরনাই আশ্চর্যবোধ করত। আরও আশ্চর্য হতো তাঁর জন্য সাহাবিদের সুতীব্র ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা দেখে। এ কারণে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব অমুসলিম অবস্থায় বলেছিলেন, আমি কোনো মানুষকে এত বেশি ভালোবাসতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের সাথিরা মুহাম্মাদকে ভালোবাসে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[১১৮]

---

১১৭. *সহিহ মুসলিম* : ১৫৫৬, ৩৮৩৬, *সুনানে তিরমিজি* : ৬৫৫, *সুনানে নাসায়ি* : ৪৫৩০, *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৪৬৯।

১১৮. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/১৭২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সৈনিকদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

নেতৃত্বের যোগ্যতা এমন একটি গুণ, যার জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছেন। তারা হলেন অন্যদের তুলনায় নেতৃত্ব প্রদানে অনন্য ও অসাধারণ। এই নেতৃত্বপ্রদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য হলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রাসুলগণ। তারা তাদের জাতি-গোষ্ঠীকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করেছেন। কুরআনুল কারিম অনেক নবী ও রাসুলের ঘটনা উল্লেখ করেছে এবং তাদের জাতি-গোষ্ঠীর সাথে নবী-রাসুলদের আচরণের বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছে, যাতে এগুলো আগত এবং অনাগত সকল নেতার জন্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

নিশ্চয় তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ সকল নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি হলেন মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, জীবনের সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ নেতা, হোক তা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামরিক। নিজের সৈন্যদের মানসিকতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ও সঠিক ধারণা ছিল। এজন্য তিনি তাদের অন্তরে ইসলামি মূল্যবোধের প্রধান নীতিগুলোর বীজ বপন করেছেন। তিনি সকল কাজে তাদের জন্য সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে দিয়েছেন। আর সেটা হলো, মানুষকে মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে

CamScanner

বের করে আনা। আর এই ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উত্তম আদর্শ এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ফলে আমরা দেখতে পাই, কুরাইশ নেতৃবর্গ যখন তাঁর নিকট দুনিয়ার বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে দাওয়াত থেকে বিরত থাকার প্রস্তাব পেশ করেছিল, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন,

> 'আমি তোমাদের নিকট যে বার্তা নিয়ে এসেছি, এর মাধ্যমে আমি তোমাদের সম্পদ চাই না, তোমাদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদাও চাই না। তোমাদের ওপর কর্তৃত্বও করতে চাই না। বরং আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসুল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার ওপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ প্রদান করি এবং (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শন করি। আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমরা যদি এটা গ্রহণ করে নাও, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারী হবে। আর যদি না মানো, তাহলে আমি আল্লাহ তাআলার জন্যই ধৈর্যধারণ করব, যতক্ষণ না মহিমান্বিত আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফয়সালা করে দেন।'[১১৯]

অতএব দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার। কাফেরদের শত অস্বীকার ও বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস।

এরপর আমরা দেখি, আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজের আস্থাশীলতার গুণ তিনি তাঁর সাহাবিদের মাঝেও সঞ্চারিত করেছেন। হজরত খাব্বাব ইবনে আরত রা. তার প্রতি কুরাইশদের নির্মম নির্যাতনের বিষয়ে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন, তখন নবীজি তাকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন)। তখন

---

১১৯. *সহিহ বুখারি* : ৪০৮, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪৭৯।

একজন উষ্ট্রারোহী সানআ[১২০] থেকে হাজরামাউত[১২১] পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, (এ দীর্ঘ পথে সে) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা (ওই সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।[১২২]

আমরা আরও দেখতে পাই, তিনি প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত স্থানই প্রদান করতেন। ব্যক্তির যোগ্যতা ও সক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ সকল অনুগত মানুষের ওপর নির্ভর করেই একজন নেতা তার নেতৃত্ব পরিচালনা করবেন। নেতৃত্বের মূল উপাদানই হলো এ সকল যোগ্য মানুষ। সুতরাং সৈন্যদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেতা এবং সৈন্যদের মাঝে একটি পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক তৈরি করে এবং তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে, এমনকি কাজের প্রতি তাদের অগ্রগামিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা তৈরি করে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে দেখতে পাই। বদরযুদ্ধের দিন জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে হজরত হুবাব ইবনে মুনজির ইবনে জামুহ রা. (যিনি যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের বর্তমান এই জায়গাটি ভালো নয়। অতএব আপনি সবাইকে নিয়ে এখান থেকে এগিয়ে চলুন। আমরা ওই কূপের কাছে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করব, যা কুরাইশদের অতি নিকটে। এরপর আমরা সে জায়গার আশপাশের অন্য কূপগুলো বন্ধ করে দেবো। আমরা আমাদের জায়গায় একটি হাউজ তৈরি করে তাতে পানি ভরে রাখব। পরে আমরা শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করব। তখন আমরা পানি পান করতে পারব কিন্তু ওরা পানি পাবে না।'

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ।'[১২৩]

---

[১২০]. ইয়ামেনের রাজধানী।-সম্পাদক

[১২১]. ইয়ামেনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর।-সম্পাদক

[১২২]. *সহিহ বুখারি* : ৩৪১৬, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬৪৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১০৯৫।

[১২৩]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৬২০, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৩/৬২, ইমাম তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক* : ২/২৯।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'[১২৪]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

---

১২৪. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'[১২৪]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

[১২৪]. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'[১২৪]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

---

১২৪. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'[১২৪]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

১২৪. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'(১২৪)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

১২৪. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহাবির সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। কারণ, সাহাবিদের মধ্যে একেকজন একেক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের এই বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে চিনতেন ও বুঝতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিল না। একজন নেতার জন্য এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণে তিনি বিভিন্ন সাহাবির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র হলো আবু বকর রা.। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর রা.। তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলো উসমান রা.। আর সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক হলো আলি ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব রা.। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হলো মুআজ ইবনে জাবাল রা. এবং ফারায়েজ (সম্পত্তি বণ্টন) সম্পর্কিত বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এবং উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমানতদার হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এবং হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. হলো আল্লাহর সিংহ।'[১২৪]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসাধারণ নেতা ও পরিচালক। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্র। বদরযুদ্ধের অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করেন, যাতে কুরাইশবাহিনীর সম্মুখে তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এরপর কুরাইশরা যখন মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল, তখন তিনি তিনজন শক্তিশালী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সফল ও কার্যকরী। আগে থেকেই তিনি তাদের অবস্থা ও মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনজনকে আহ্বান করে বললেন, 'ওঠো, হে উবাইদা ইবনে হারেস। ওঠো, হে

---

১২৪. হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. 'মানাকিবুস সাহাবা' ও মুসলিম রহ. 'ফাজায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. উল্লেখ করেছেন 'মানাকিব' অধ্যায়ে। *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৫৪।

CamScanner

হামজা এবং ওঠো, হে আলি। আল্লাহর হুকুমে তাদের হাতে উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ ইবনে উতবা নিহত হয় আর উবাইদা রা. কিছুটা আহত হন। মুসলমানদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধের আগে এটি ছিল মুশরিকদের জন্য একটি মানসিক পরাজয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা কাফেরদের ৭০ জনকে হত্যা করে আর বন্দি করে আরও ৭০ জনকে।[১২৫]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈনিকদের মাঝে বিভিন্ন উদ্যম, উদ্যোগ ও সৃজনশীল মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। এ সকল গুণ তাদেরকে নতুন কোনো সমস্যায় দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এর কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও আদর্শ স্থাপন করেছেন। যেমন আমরা হুদাইবিয়াতে কুরাইশদের সাথে তাঁর সন্ধির বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারি। এটা ছিল একজন রাসুল ও নেতার পক্ষ থেকে গভীর দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। কারণ, প্রথম এই চুক্তির মাধ্যমেই মুসলমানগণ রাজনৈতিকভাবে কুরাইশদের সমশক্তিসম্পন্ন একটি জাতি-গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মাধ্যমেই আসে সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুদের কাছ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম স্বীকৃতি, যারা আরববিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নেতৃত্ব দিত। এ ছাড়াও এটি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) ছিল সকল গোত্রের সমন্বিত একটি চুক্তি, যা মূলত মুসলমানদের সাহায্য করেছিল নিরাপত্তার সাথে নিজেদের ধর্ম পালন করতে এবং অন্য জাতি ও গোত্রের মাঝে সেটাকে প্রচার ও প্রসার করতে। সুতরাং এই চুক্তিটি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।[১২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর দূরদর্শিতা ও সৃষ্টিশীলতার আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো তাঁর হিজরতের নিখুঁত পরিকল্পনা। শুরুতেই তিনি প্রিয় সঙ্গী আবু বকর রা.-কে নির্বাচন করেন, যিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে মর্যাদাগত দিক দিয়ে সর্বোত্তম। এরপর নির্বাচন করেন হিজরতের পথ। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই পথই নির্বাচন

---

[১২৫]. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪২৩, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৩৭১, ইমাম তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক* : ২/২২।

[১২৬]. মাহমুদ শিত খাত্তাব : *আর-রাসুলুল কায়িদ* : ২৮৮।

করেন, যা ছিল কুরাইশদের পরিচিত পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, সেটি ছিল উপকূলীয় পথ। তিনি জাবালে সওর বা সওর পাহাড়ের গুহায় তিনদিন অবস্থান করেন। যাতে এ সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নির্বাচন করেন এবং আবু বকর রা.-এর ছেলে আবদুল্লাহকে নিযুক্ত করেন কুরাইশদের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য। এরপর পরিপূর্ণ নিরাপত্তার স্বার্থে গুহা-মুখের চারপাশে বকরি চরানোর জন্য তিনি আমের ইবনে ফুহাইরাকে নিযুক্ত করেন। এটি ছিল এক নিখুঁত পরিকল্পনা। এরপর বাহ্যিক এত ব্যবস্থাপনার পরও নবীজির নেতৃত্বের মহত্ত্ব ও অনন্যতা প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভরসা করার মাধ্যমে।(১২৭) তিনি তাঁর সঙ্গী আবু বকর রা.-কে বলেন,

«مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»

> আবু বকর! ওই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যার তৃতীয় হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা! (অর্থাৎ ভয়ের কিছু নেই। তিনি আমাদের সাথেই আছেন। তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।)’(১২৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব মূল্যবোধ ও নীতিমালাকে শুধু মৌখিক শব্দ এবং কর্মহীন কথামালা দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং তিনি এসব ক্ষেত্রে নিজের পরিচালিত কর্মপন্থা এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সকলের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি তাঁর নম্রতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি ও ধৈর্যশীল আচরণে এবং তাঁর সকল কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করেছেন। খন্দকযুদ্ধের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাই, তিনি সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং মানসিক প্রফুল্লতা অব্যাহত রাখার জন্য খন্দক খননের কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন। **(মানচিত্র নং-২)**

---

১২৭. সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ২/৩১৫, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩/১৭৯-১৮২, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৪৫।

১২৮. *সহিহ বুখারি* : ৩৬৫৩, ৩৯২২, ৩৩৯১; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৮১, *সুনানে তিরমিজি* : ৩০৯৬।

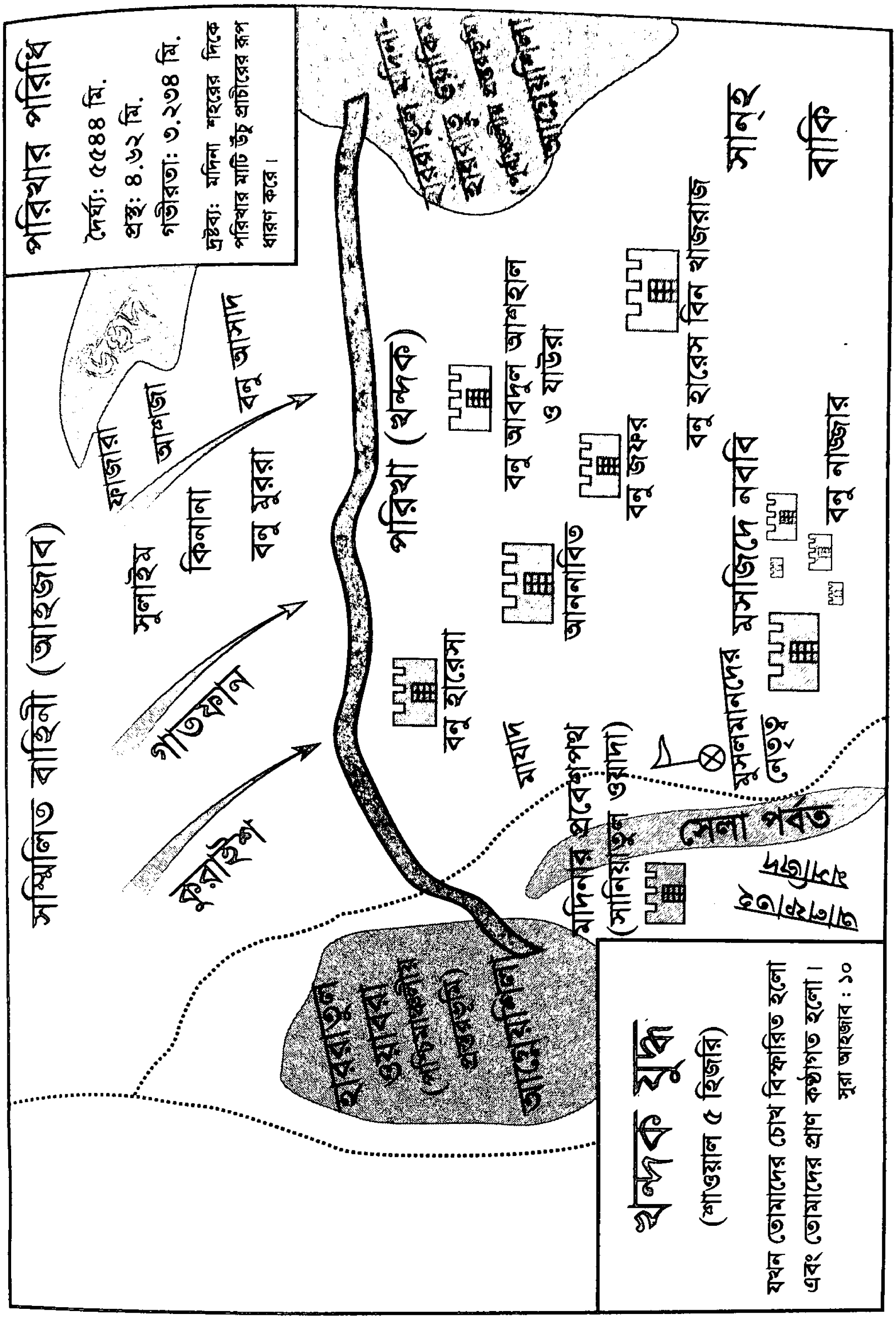

মানচিত্র নং-২
খন্দক যুদ্ধ (শাওয়াল ৫ হিজরি)

এই চিত্রটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর কথায়। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাটি

সরানোর চিত্র বর্ণনা করে বলেন, (আমরা দেখেছি) তিনি তাঁর শুভ্র সুন্দর পেটের ওপরে লেগে থাকা মাটি ঝাড়ছিলেন।[১২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এভাবে সবার সাথে অংশগ্রহণ এবং প্রফুল্লতা প্রদান যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদের কষ্ট লাঘবে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এমনকি শত্রুদের মদিনায় পৌঁছানোর আগেই কাজ শেষ করার প্রতি এগুলো তাদের মাঝে উৎসাহ, উদ্যমতা ও স্পৃহা তৈরি করেছিল। এসব কারণে খুব সহজেই প্রমাণিত হয়, তিনি ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ নেতা ও রাসুল।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মধ্যে অবিচল থাকার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন এবং তিনি নিজেও এই মূল্যবান গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আমরা তাঁর এই অবিচল থাকার উপমা দেখতে পাই খন্দকযুদ্ধের শেষে তাঁর নির্দেশের মধ্যে। তিনি সাহাবিদের বলেন,

«لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

তোমরা কুরাইজা গোত্রের এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ আসরের নামাজ পড়বে না।[১৩০]

এটি ছিল সৈন্যদের প্রতি একজন সেনাপতির সুদৃঢ় নির্দেশ। সেই নির্দেশনায় সাহাবিরা প্রবল উদ্যমে অগ্রসর হয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুদের সাহায্যকারী বনু কুরাইজাকে প্রতিহত করার জন্য।

সৈন্যদের প্রতি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। যেমন, বদরযুদ্ধের দিন তিনি সাহাবিদের কাতার ঠিক করছিলেন। সকলকে সমান কাতারে দাঁড় করাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে থাকা একটি তির দিয়ে কাতার সোজা করছিলেন। এ সময় সাওয়াদ ইবনে গাজিয়া রা.[১৩১]

---

১২৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪৯৫। ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৩০৬। সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ২/৩৩৬।

১৩০. *সহিহ বুখারি* : ৯৪৬, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭০, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ১৪৮৪।

১৩১. তিনি সাওয়াদ ইবনে গাজিয়া আনসারি। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর আরও বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তিনিই বদরযুদ্ধের দিন খালেদ ইবনে হিশাম আল-মাখজুমিকে বন্দি করেছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে খায়বারের গভর্নর

কাতার থেকে একটু সামনে অগ্রসর হয়ে পড়েন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় হাতের তীর দিয়ে তার পেটে সামান্য খোঁচা দিয়ে বললেন, 'সাওয়াদ, তুমি কাতারে সমান হয়ে দাঁড়াও।'

এ সময় সাওয়াদ রা. বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে ব্যথা দিলেন? অথচ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন! আপনি আমাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিন।'

সাওয়াদ রা.-এর এই কাণ্ড দেখে সকল সাহাবিই বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে পড়েন। সাওয়াদ এটা কী বলে! কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাঁর পেটের কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তাকে প্রতিশোধ নিতে বললেন। তখন সাওয়াদ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাওয়াদ, তুমি এমন করলে কেন?'

সাওয়াদ রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের সামনে যে ভয়াবহ অবস্থা, লড়াইয়ের দিন, এটা আপনিও দেখছেন। তাই আমার বড় আকাঙ্ক্ষা জাগল জীবনের এই শেষ মুহূর্তে আমার শরীর আপনার পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য হোক।'

সাওয়াদ রা.-এর এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কল্যাণের জন্য অনেক দোয়া করলেন।[১৩২]

সৈন্যদের প্রতি এমনই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ। এভাবেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান মানুষ এবং মানবিক নেতা। তাঁর এ সকল পরিচালনা ছিল জগতের নিকট এক নতুন ধরনের উন্নত নেতৃত্ব, যা তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল নেতা ও শাসক তাঁর এই আদর্শগুলো অনুসরণ করে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে।

নিযুক্ত হন। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ২/৫৬১, ইবনে আবদুল বার : *আল-ইসতিআব* : ২/৬৭৩।

[১৩২]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৬২৬, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪১০।

CS CamScanner

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

অপরিচিতদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী বা রাসুল হওয়ার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ হলো, অপরিচিতদের সাথেও তাঁর অনন্যসুন্দর আচরণ। কেননা, আমরা সাধারণত পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে ভালো ব্যবহার করি আর অপরিচিতদের সাথে করি রূঢ় আচরণ কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সীমাহীন দয়া করেছেন। তাঁকে একটি বিনয়-নম্র হৃদয় দান করেছেন এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলের সাথেই নম্র ব্যবহারের হৃদয়গ্রাহী গুণে গুণান্বিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

(হে নবী,) এটা আল্লাহর রহমতই ছিল, যার কারণে আপনি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করেছেন। আপনি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। [সুরা আলে ইমরান : ১৫৯]

তাঁর জীবনে অপরিচিতদের সাথে চমৎকার ব্যবহারের অনেক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা রয়েছে। যেমন আমরা এখানে উম্মে মাবাদের সাথে সংঘটিত ঘটনাটি স্মরণ করতে পারি। উম্মে মাবাদের ভাই হুবাইশ ইবনে খালেদ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদিনার পথে বের হলেন, সাথে ছিলেন আবু বকর রা., ছিলেন আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা আর তাদের পথ দেখাচ্ছিলেন আবদুল্লাহ আল-লাইছি। উম্মে মাবাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তার থেকে কিছু খেজুর ও গোশত কিনতে চাইলেন। কিন্তু পরিবারটির নিকট তারা এ জাতীয় কিছু পেলেন না। কেননা পরিবারটি ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তাঁবুর একপাশে একটি শীর্ণকায় বকরি দেখতে

পেলেন। নবীজি সেটা দেখিয়ে বললেন, 'উম্মে মাবাদ, এই বকরিটার কী অবস্থা?'

উম্মে মাবাদ বলল, 'অতি দুর্বলতার কারণে সে বকরির পালের সাথে অগ্রসর হতে পারেনি, তাই এখানে পড়ে আছে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটার কি দুধ দোহন করা সম্ভব?'

উম্মে মাবাদ বলল, 'এমন চেষ্টা করাও অনর্থক হবে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি আমাকে বকরিটির দুধ দোহনের অনুমতি দেবে?'

সে বলল, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি যদি সক্ষম হন তবে দুধ দোহন করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরিটির নিকটে গিয়ে বকরিটির ওলান স্পর্শ করলেন, বিসমিল্লাহ বললেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে তৎক্ষণাৎ বকরিটির ওলান দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। মুখে জাবর কাটতে লাগল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র চাইলেন। পাত্র প্রদান করা হলে তিনি সেই পাত্র পূর্ণ করে দুধ দোহন করলেন, এমনকি দুধ উপচে পড়ার উপক্রম হলো। এরপর তিনি পরিতৃপ্তির সাথে পান করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও পরিতৃপ্তির সাথে পান করলেন। এরপর অন্যরাও (উম্মে মাবাদের পরিবার) তৃপ্তির সাথে দুধ পান করল। অতঃপর পুনরায় তিনি প্রথমবারের মতো দুধ দোহন করে পাত্রটি পূর্ণ করলেন। এরপর এটা উম্মে মাবাদের নিকট অর্পণ করলেন, তার থেকে কিছুটা ক্রয় করলেন অতঃপর আবার সবাইকে নিয়ে সেখান থেকে নিজেদের পথে রওয়ানা করলেন।[১৩৩]

এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি এখানে উম্মে মাবাদের সাথে ন্যায়পূর্ণ আচরণ করেছেন। অথচ তিনি বের হয়েছেন মুহাজির হিসেবে। সাথে তেমন কোনো পাথেয় নেই, না খাবার, না পানি। আর উম্মে মাবাদ তাঁকে চিনত না। খুব সহজেই তিনি তার থেকে সম্পদ নিয়ে নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে

---

১৩৩. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৪২৭৪।

নবীসুলভ আচরণ করেছেন। জোর করে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া ভক্ত ও দস্যুদের মতো আচরণ করেননি।

অপরিচিতদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অনন্যসাধারণ আচরণ অনেক সাহাবির ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অন্যতম প্রধান উপলক্ষ্য হয়েছে। এভাবে তাদের নিকট তাঁর নবুয়তের সত্যতা এবং উম্মতের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসা উদ্ভাসিত হয়েছে। নবীজির এই আচরণ তাদেরকে ইসলামের জন্য উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। যেমন মুনজির ইবনে জারির রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা একবার সকালের দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে জুতাহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং ঝুলন্ত তরবারি সাথে নিয়েই একদল লোকের আগমন ঘটল। এদের অধিকাংশ সদস্য কিংবা সকলেই ছিল মুজার গোত্রের লোক। অভাব-অনটনে তাদের এই করুণ অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি নিজের কামরায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর আবার বেরিয়ে এলেন। বিলাল রা.-কে আজান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল রা. আজান ও ইকামত দিলেন। নামাজ শেষ করে নবীজি উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানবজাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের মাত্র একজন ব্যক্তি থেকে (আদম আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছেন। এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী। এবং তাদের দুজনের মাধ্যমে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের নিকট প্রার্থনা করো। এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেও ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

[সুরা নিসা : ১]

অতঃপর তিনি সুরা হাশরের শেষদিকের এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের (আখিরাতের) জন্য কী সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ করে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।

[সুরা হাশর : ১৮]

এরপর উপস্থিত লোকদের কেউ একটি দিনার, কেউ একটি দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ বা এক সা'[১৩৪] আটা আবার কেউ এক সা' খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অন্তত এক টুকরো খেজুর হলেও তোমরা নিয়ে এসো।' আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বড় থলে নিয়ে এলেন। থলের ভারে তার হাত নুয়ে পড়ছিল। এরপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে লাগল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তূপ হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক স্বর্ণের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো উত্তম কাজের প্রচলন করে, সে তার এই কাজের সওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে, সে এর বিনিময়েও সওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সওয়াবের কোনো অংশ কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলাম পরিপন্থী) কোনো খারাপ কাজের প্রচলন করবে, তাকে এ কাজের বোঝা (গুনাহ ও শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা এই কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ বোঝা তাকেও বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তির কোনো অংশই কমবে না।'[১৩৫]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথেও সুন্দর আচরণ করেছেন। বরং তাঁর এই অমায়িক অনন্যসাধারণ আচরণ অন্যদের ইসলামগ্রহণের কারণ হয়েছিল। যেমন যায়েদ ইবনে সাআনা রা.। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি পাদরি। তিনি নিজের ইসলামগ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নবুয়তের আলামতসমূহের মধ্যে সকল আলামতই আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৩৪. এক সা' = ৩২৭০.৬০ গ্রাম (প্রায়)। সূত্র : *মাসিক আল কাউসার*, জুলাই-আগস্ট ২০১১।-সম্পাদক

১৩৫. *সহিহ মুসলিম* : ২৩৯৮, *সুনানে নাসায়ি* : ২৫৫৪, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯২২৫।

ওয়াসাল্লামের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র দুটি আলামতের পরীক্ষা বা প্রত্যক্ষ দর্শন তখনও আমার বাকি ছিল। আলামত দুটি হলো : ১. সহনশীলতা তাঁর ক্রোধের ওপর প্রবল হবে। ২. তাঁর সাথে যতই মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হবে, ততই তাঁর সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। তারপর যায়েদ ইবনে সাআনা বললেন, আমি নবীজির এই দুটি আলামত পরীক্ষা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। তাঁর সাথে মিশতে লাগলাম, যাতে আলামত দুটি প্রত্যক্ষ করতে পারি। একদিন তিনি নিজের ঘরের বাইরে এলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলেন হজরত আলি রা.। ইতিমধ্যে বেদুইনের মতো দেখতে এক লোক এসে আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার গোত্র ইসলামগ্রহণ করেছে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, মুসলমান হয়ে গেলে তোমাদের রিজিকের আর কোনো অভাব থাকবে না। কিন্তু এখন তারা অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে পড়েছে। ভীষণ অভাব-অনটন তাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ অবস্থায় তারা ইসলাম ছেড়ে না দেয়! তারা হয়তো যে সচ্ছলতার আশা নিয়ে ইসলামগ্রহণ করেছিল, আবার একই আশায় ইসলাম পরিত্যাগ করবে। যদি ভালো মনে করেন, তবে আপনি তাদেরকে কিছু সাহায্য করুন।'

লোকটির এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশের ব্যক্তি উমর রা.-এর দিকে তাকালেন। উমর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, কিছুই তো মজুদ নেই।'

তখন আমি (যায়েদ ইবনে সাআনা) বললাম, 'হে মুহাম্মাদ, যদি আপনি অমুক ব্যক্তির বাগানের এই পরিমাণ খেজুর নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তে আমার নিকট বিক্রি করেন, তবে আমি অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেবো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে খেজুর নিয়ে নেব।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইহুদি, এটা হতে পারে না। বরং তুমি যদি বাগান নির্দিষ্ট না করো (শুধু খেজুরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করো), তবে আমি এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি।'

আমি তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং তিনি আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন আর আমি আমার থলের মুখ খুলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মূল্য হিসেবে আশি মিছকাল (এক মিছকাল=৪.৫ গ্রাম) স্বর্ণ প্রদান করলাম। তিনি এই স্বর্ণ সেই বেদুইন ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো দিয়ে

তাদের অভাব দূর করে দাও।' (যায়েদ ইবনে সাআনা পরবর্তী সময়ে মুসলমান হন এবং তাবুক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।)[১৩৬]

সুন্দর হয়, আমরা যদি অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে নবীজির অমায়িক আচরণের একটি চমৎকার ঘটনা দিয়ে এই পরিচ্ছেদটি শেষ করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। অতিথিদের আপ্যায়নের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী। কিন্তু নিজের দরিদ্রতার কারণে তাঁর এই মনোবাসনা অনেক সময় অপূর্ণ রয়ে যেত। একবার এক অপরিচিত 'আনসারি যুবক' মেহমান হিসেবে তাঁর নিকট আগমন করলেন। ঘটনাটি হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, যুবকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে কোনো খাবার আছে কি না তা খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠালেন। স্ত্রী বলে পাঠালেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, পানি ছাড়া আমার কাছে কোনো খাবার নেই। এরপর তিনি তাঁর আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সেখান থেকেও একই উত্তর এলো। এভাবে একে একে শেষ পর্যন্ত সকলেই একই কথা বলে পাঠালেন যে, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, পানি ছাড়া আমার নিকট এখন কোনো খাবার নেই।

তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, 'এমন কে আছে যে আজ রাতে এই লোকটির মেহমানদারি করতে পারে? আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' এক আনসারি সাহাবি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তার মেহমানদারি করাব...।'[১৩৭]

এভাবেই আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরিচিতদের সাথেও অত্যন্ত সুন্দর ও অমায়িক আচরণ করেছেন। এটা ছিল তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর অন্যতম প্রমাণ। কেননা, তিনি তাঁর জীবনের সকল কাজে সকলের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র এবং উদার মনের অধিকারী।

* * *

---

১৩৬. *সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৮৮, মুসতাদরাকে হাকেম : ৬৫৪৭।*
১৩৭. *সহিহ মুসলিম : ২০৫৪, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫২৮৬।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিভিন্ন প্রকার অধিকার

ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। কারণ, ইসলামের প্রধান একটি নীতিই হলো মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। বরং ইসলাম এটাকে আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যার বাস্তবায়নে মানুষ সওয়াবপ্রাপ্ত হয় আর পরিত্যাগ করলে পাপী ও অপরাধী হয়। এটা মানুষের পক্ষ থেকে নিজের ইচ্ছানুপাতে পালনযোগ্য কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়, বরং এটি তার জন্য আবশ্যক এক কর্তব্য। সেইসাথে এই আচরণ সমানভাবে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ও পালনীয় একটি বিধান, তাতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা গোত্রের কোনো পার্থক্য নেই। এটা হতে পারে মানুষের অধিকার কিংবা প্রাণী বা পরিবেশের অধিকার। এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণে তাঁর পরিচালিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিগতকালে সবাই যথাযথ সম্মানের সাথে একটি সুন্দর ও স্বাধীন জীবনযাপন করেছে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মের মহত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে ইসলাম-নির্ধারিত এমন কিছু অধিকার নিয়ে অলোচনা করব, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সূক্ষ্মভাবে যেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও মানবাধিকার

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও নারী অধিকার

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও শিশু অধিকার

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও শ্রমিক অধিকার

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও অসুস্থ-প্রতিবন্ধীদের অধিকার

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও এতিম-মিসকিন-বিধবাদের অধিকার

সপ্তম অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও প্রাণী অধিকার

অষ্টম অনুচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও পরিবেশের অধিকার

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মানবাধিকার

মানুষের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই উদার, উন্নত ও সর্বজনীন। মানুষের অধিকার রক্ষায় ইসলামের রয়েছে অনন্যসব বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো, অধিকারের ব্যাপকতা।[১৩৮]

ইসলাম মানুষের সকল ধরনের অধিকারকে নিশ্চিত করে, হোক তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক। পাশাপাশি এর সর্বজনীনতাও ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই অধিকারগুলো সকলের জন্যই সমান, হোক সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম। এগুলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা ধর্মের কোনো ব্যবধান নেই। আরও বড় কথা হলো, এই অধিকারগুলো কারও পক্ষে উপেক্ষা বা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। কেননা, এগুলো মহান প্রতিপালক আল্লাহপ্রদত্ত ও নির্দেশিত চূড়ান্ত বিধান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজগুলো ছিল এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের উত্তম নমুনা। এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যেমন অন্যদের উৎসাহিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন তেমনি নিজেও বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যেমন তাঁর বিদায় হজের হৃদয়স্পর্শী ভাষণে, যার পুরোটাই ছিল মানবাধিকার সম্পর্কিত। তিনি এই ভাষণে বলেন,

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»

তোমাদের জান ও মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত, যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এই দিনের, তোমাদের এই মাসের এবং তোমাদের এই শহরের।[১৩৯]

---

১৩৮. ঈষৎ পরিমার্জিত।-সম্পাদক

১৩৯. *সহিহ বুখারি* : ৪৪০৬, ৪৬৬২, ১৬৭১; *সহিহ মুসলিম* : ১৬৭৯, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৯৪৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯৮৭৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি সকল মানবাধিকারকে সন্নিবেশিত করেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের জান, মাল ও সম্মান ইত্যাদির নিরাপত্তা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারণ, মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার হলো তার জীবনের নিরাপত্তা। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহগুলো কী কী। উত্তরে তিনি বলেন, '(সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শরিক করা..., কোনো প্রাণনাশ করা...(ইত্যাদি)।'[১৪০]

'প্রাণ' বলতে এখানে সকল মানুষের প্রাণকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং শরিয়তের বিধান ছাড়া অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে মানুষের জীবনকে স্বয়ং ব্যক্তি নিজের থেকেও রক্ষা করেছেন। এ কারণে তিনি আত্মহত্যাকে হারাম করেছেন। এ ব্যাপারে মানুষকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে এভাবেই লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যেও তার হাতে বিষ থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে সেই লোহা থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[১৪১]

এমনইভাবে যেসব কর্মকাণ্ড মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, ইসলাম সেগুলোও হারাম করেছে। সেই কর্মটি হতে পারে কাউকে ভয় দেখানো, অপমান করা কিংবা আঘাত করা। যেমন হজরত হিশাম ইবনে হাকিম রা. বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

---

[১৪০]. *সহিহ বুখারি* : ২৬৫৩, *সুনানে নাসায়ি* : ৪০০৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ৬৮৮৪।
[১৪১]. *সহিহ বুখারি* : ৫৭৭৮, *সহিহ মুসলিম* : ১০৯।

«إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا»

> যারা দুনিয়াতে মানুষকে (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেবে, আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চিত শাস্তি প্রদান করবেন।[১৪২]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের অধিকারে সমতা বিধানের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন ব্যক্তি ও দলের মাঝে, জাতি ও গোত্রের মাঝে, শাসক ও শাসিতের মাঝে, রাজা ও প্রজার মাঝে। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে সকলের মাঝেই সমতা স্থাপন করতে হবে, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য বা সীমাবদ্ধতা নেই। নেই বিশেষ কোনো বিবেচনা। আরব ও অনারবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, সাদা-কালোর মাঝেও নেই কোনো ভেদাভেদ। নেই শাসক ও শাসিতের মাঝেও কোনো তারতম্য। বরং সকলের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি একটাই, আর সেটা হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয়, নিশ্চয় তোমাদের সকলের পিতা একজন, তোমরা সকলেই আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ওই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহভীতি ব্যতীত একজন অনারবের ওপর একজন আরবের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই।[১৪৩]

আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও মহানুভবতা অনুধাবনের জন্য এ সম্পর্কিত আরও একটি বর্ণনার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। যেমন হজরত আবু উমামা রা. বলেন, একবার হজরত আবু যর রা. হজরত বেলাল রা.-কে তার মায়ের নামে কটুভাবে বলেছিলেন, 'হে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার পুত্র!'

বেলাল রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। এটা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এরপর যখন আবু যর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন, তিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু রাগের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বোধগম্য না হওয়ার কারণে

---

১৪২. *সহিহ মুসলিম* : ২৬১৩, ৬৪৬৯, *সুনানে আবু দাউদ* : ৩০৪৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৫৩৬৬।

১৪৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ২৩৫৩৬। ইমাম তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ১৪৪৪৪।

আবু যর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় আপনার কাছে আমার থেকে অপছন্দনীয় কিছু এসে পৌঁছেছে, যার কারণে আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কেন বেলালের মায়ের নাম তুলে কটু কথা বলেছ! সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদের ওপর কুরআন নাজিল করেছেন, আমল ব্যতীত আমার নিকট কারও কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই। তোমাদের সকলেই পাল্লার দুটি পাট্টার ন্যায় (সমান; কেউ কারও থেকে শ্রেষ্ঠ নয়)।'[১৪৪]

পারস্পরিক সমান অধিকারের পাশাপাশি আরেকটি অধিকার হলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবি ও উম্মতকে ইনসাফ ও ন্যায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিচারক তিন প্রকার। প্রথম প্রকার যাবে জান্নাতে আর বাকি দুই প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে তো এমন ব্যক্তি, যে সত্যকে জানার পর সে অনুযায়ী বিচার করে। পক্ষান্তরে যে বিচারক সত্যকে সত্য হিসেবে জানার পরও বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম করে, সে যাবে জাহান্নামে। আর যে ব্যক্তি না জেনে ভুল বিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে।'[১৪৫]

এমনইভাবে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারককে কোনো দাবিদারের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার বিনষ্ট করতে নিষেধ করতেন, যাতে দুপক্ষের কথা শ্রবণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য তিনি বলতেন,

«فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»

পাওনাদারেরও আছে (কড়া) কথা বলার অধিকার।[১৪৬]

যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মানুষের মাঝে বিচারকার্য সম্পাদন করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশে বলেন, 'যখন দুটি পক্ষ তোমার নিকটে কোনো বিচার নিয়ে আসে, তখন

১৪৪. ইমাম বাইহাকি : *শুআবুল ঈমান* : ৫১৩৫।
১৪৫. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৫৭৩, *সুনানে তিরমিজি* : ১৩২২, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৩১৫।
১৪৬. *সহিহ বুখারি* : ২৩০৬, ২৩৯০, *সহিহ মুসলিম* : ১৬০১, *সুনানে তিরমিজি* : ১৩১৭, *সুনানে নাসায়ি* : ৪৬১৮।

তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত দেবে না, যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করবে, যেভাবে তুমি শ্রবণ করেছ প্রথম ব্যক্তির কথা। তোমার নিকট সঠিক বিচার প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি।[১৪৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত মানুষের অধিকারসমূহের মধ্যে আরেকটি অধিকার হলো, স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস লালনের অধিকার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾

ধর্ম (গ্রহণের) বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। [সুরা বাকারা : ২৫৬][১৪৮]

অতএব, কাউকে নির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী করার জন্য বলপ্রয়োগ করা যাবে না। এ কারণে মক্কা বিজয়ের দিন নিজের ক্ষমতা ও বিজয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ইসলামগ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন,

«اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»

যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত-স্বাধীন।[১৪৯]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা মানুষের প্রাপ্ত অধিকারের তালিকা দীর্ঘায়ত হয়েছে মানুষের স্বাধীন মত ও চিন্তার অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। তিনি অন্যের মতামতকে মূল্যায়ন করতেন এবং নিজের মত প্রকাশে অনুপ্রাণিত করতেন। কোনো বিষয়ে তিনি একটি মত দিলেন পরে তাঁর সাহাবিদের মধ্যে কেউ ভিন্নমত প্রদান করলেন, আর এটার মধ্যেই রয়েছে সম্ভাব্য কল্যাণ, তখন নবীজি

---

১৪৭. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৫৮২, *সুনানে তিরমিজি* : ১৩৩১, *মুসনাদে আহমাদ* : ৮৮২।

১৪৮. স্বাধীন ধর্ম লালনের ক্ষেত্রে 'অধিকার' শব্দের বদলে 'ছাড়/সুযোগ দেওয়া হয়েছে' কথাটুকু এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত। কারণ, ইসলাম নিন্দাহীনভাবে কারও জন্য কুফরি বিশ্বাস লালন করার অধিকার দেয়নি। যেমন, এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াতের পরবর্তী অংশটি হচ্ছে, ﴿قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ (হেদায়েতের পথ পথভ্রষ্টতার পথ থেকে স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে)। অতএব আয়াতটির মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর পথ আর শয়তানের পথের পার্থক্য হয়ে গেছে। এখন দুনিয়ার এই পরীক্ষাগৃহে যার যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করে আখেরাতে আগমন করুক!-সম্পাদক

১৪৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪১১, তাবারি : *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক* : ২/৫৫, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৪/৩০১।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মত থেকে সেই ভিন্নমতের দিকেই ফিরে আসতেন। উহুদের ঘটনাটি ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সেদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরুণ-যুবকদের মত অনুযায়ী (এবং তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারা মদিনার বাইরে এসে কুরাইশদের মুখোমুখি হওয়াটাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। অথচ এটা ছিল তাঁর মতের বিপরীত।[১৫০]

ইসলামি শরিয়ত মানুষের জন্য এমন এক অনন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, মানবরচিত কোনো বিধান যার কথা কখনো বলেনি কিংবা মানুষের অধিকার আদায়ে পৃথিবীতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত কখনো দেখা যায়নি, আর সেই অধিকারটি হলো মানুষের জীবনযাপনের পর্যাপ্ত জীবিকাপ্রাপ্তির অধিকার। অর্থাৎ একটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিক তার জীবনযাপনের আবশ্যকীয় সব উপকরণপ্রাপ্তির অধিকার রাখে, যার মাধ্যমে সে সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। যেগুলোর মাধ্যমে জীবনযাপনের ভারসাম্যপূর্ণ একটি উপযুক্ত অবস্থান তার জন্য নিশ্চিত হবে। মানবরচিত বিধানগুলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম জীবিকাব্যবস্থার যে কথা বলে, ইসলামের এই অধিকার তারচেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই পর্যাপ্ত জীবিকাব্যবস্থার বিষয়টি মূলত কার্যকর হবে নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু কেউ যদি কর্মে অক্ষম হয়, তখন ইসলামি বিধানে তাকে জাকাতের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। আর যদি জাকাতও সকল অক্ষম-অসহায়দের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে রাষ্ট্র নিজের কোষাগার থেকে সেই দায়িত্ব পালন করবে। মানুষের এই অধিকারের প্রতি জোর প্রদান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে আমার প্রতি বিশ্বাসী নয়, যে নিজে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রিযাপন করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। অথচ সে প্রতিবেশীর এই দুরবস্থা সম্পর্কে অবগত।'[১৫১]

---

[১৫০]. বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৩০৬১, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৫/২৪৫, ২৪৬, ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৪১২, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/২৪।

[১৫১]. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৭৩০৭, ইমাম তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ৭৫০, ইমাম বাইহাকি : *শুআবুল ঈমান* : ৩২৩৮।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করে বলেছেন, 'আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে খাদ্য সংকটে পড়ে কিংবা শহরেই থাকাকালীন তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের অবশিষ্ট সকল খাবার একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।'[১৫২]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন অগ্রদূত এবং শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। বিশ্বের সকল মানুষের নিকট তিনি যে মহান বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, এটা এক মানবিকতাপূর্ণ বার্তা। মানুষ হিসেবে একজন মানুষের যত রকম অধিকার রয়েছে, তাঁর এই বার্তা সেই সকল অধিকারকে ধারণ ও লালন করে, প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষণ করে।

হে আল্লাহর রাসুল, আপনার মানবিকতাবোধ কতই-না উত্তম ও মহান ছিল! (আল্লাহ আপনার ওপর রহমত ও শান্তিধারা বর্ষণ করুন।)

---

১৫২. *সহিহ বুখারি* : ২৪৮৬, *সহিহ মুসলিম* : ২৫০০।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নারী অধিকার

ইসলাম নারীকে গুরুত্ব ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। ইসলাম তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। একজন মেয়ে, স্ত্রী, বোন ও মা হিসেবে নারীকে বিশেষ সম্মান ও সদাচারপ্রাপ্তির অধিকারী করেছে। অতি দৃঢ়তার সাথে ইসলাম এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, নারী ও পুরুষ সকলেরই সৃষ্টি হয়েছে একই উপাদান থেকে। এ কারণে মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী।[১৫০] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। [সুরা নিসা : ১]

কুরআনুল কারিমে এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে, মানবিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই।

ইসলাম সে সমস্ত নীতির ওপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী অনেক জাতি-গোষ্ঠী কর্তৃক নারীদের অবমাননার বিষয়গুলো অপসারিত করে নারীদের বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এটি ইসলামের একটি বিশেষ অবদান ও

---

১৫০. উল্লেখ্য, ইসলাম মানুষ হিসেবে মৌলিকভাবে নারী-পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে বিচার করেছে। পক্ষান্তরে আনুষঙ্গিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা ও যোগ্যতা-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্যপূর্ণ অধিকার ও কর্তব্য প্রদান করেছে। আধুনিক নারীবাদী মানসে সকল ক্ষেত্রে সাম্যের যে ধারণা, ইসলাম সেই সাম্য অস্বীকার করে। বস্তুত তা অদূরদর্শী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভূত।-সম্পাদক

মহত্ত্ব। নারীদের অবমাননা দূর করতে এবং তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভূমিকা পালন করেছেন অতীতের তাবৎ সভ্যতায় এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং তাঁর পরবর্তীকালেও কেউ সেই স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। নারীদের জন্য একজন মা, বোন, স্ত্রী ও মেয়ে হিসেবে তিনি প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে যে মহান অধিকারগুলো নিশ্চিত করেছেন, আজকের পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা সেই অধিকার অর্জনের জন্য এখনো চিৎকার করে, তবুও সেগুলো আজও তাদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে! ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকল চেষ্টা!

নারীদের ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল একটি বাক্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটি মূলনীতি ব্যক্ত করেছেন। আর তা হলো, সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। তাই শুধু নারী হওয়ার কারণে তাকে কেউ মর্যাদাহীন মনে করতে পারে না। এজন্য তিনি বলেছেন,

«إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

নারীরা পুরুষদেরই সহোদরা।[১৫৪]

অর্থাৎ নারীরা মানবিক মর্যাদায় পুরুষদের সমতুল্য ও সমকক্ষ। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ দিতেন। তিনি সাহাবিদের বলতেন,

«فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

তোমরা নারীদের সাথে সদ্‌ব্যবহার করবে।[১৫৫]

বিদায় হজের সময়ও তিনি হাজার হাজার সাহাবির সামনে বারবার এই উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের স্থায়ীভাবে যে পরিমাণ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন, সেটা যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করতে চাই, তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে প্রাচীন

---

১৫৪. *সুনানে তিরমিজি* : ১১৩, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৩৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬৩২৮।

১৫৫. *সহিহ বুখারি* : ৩৩৩১, *সহিহ মুসলিম* : ১৪৬৮, *সুনানে তিরমিজি* : ১১৮৮, *মুসনাদে আহমাদ* : ১০৪৭৫।

জাহেলি যুগে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক জাহেলি যুগের নারীদের অবস্থান। তখন আমরা দেখতে পাব জুলুমের সেই প্রকৃত অন্ধকার, যেগুলো সহ্য করেছে প্রাচীন জাহেলি যুগের নারীরা এবং সহ্য করে যাচ্ছে বর্তমান জাহেলিয়াতের নারীগণও। এ সকল আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবস্থান ছিল কতটা মহান ও মর্যাদাকর।

আমরা জানি, তখনকার জাহেলি যুগে আরব সমাজে মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে হত্যা করার প্রথা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে একটি বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হুকুমটি কুরআনুল কারিমের বক্তব্য থেকেই উৎসারিত। কেননা, কুরআনুল কারিমে জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে লাঞ্ছনার মনে করা এবং তাকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করার বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অমানবিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾

> যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? [সুরা তাকভির : ৮-৯]

বরং আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে অন্যতম বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়?'

তিনি বললেন, 'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?'

তিনি বললেন, 'তোমার সাথে খাবে, এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।'

আমি বললাম, 'এরপর কোনটি?'

তিনি বললেন, 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জিনা করা।'[১৫৬]

এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে কন্যাসন্তানের শুধু জীবিত থাকার অধিকারকেই নিশ্চিত করেননি, বরং শৈশব-কৈশোরে তাদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা প্রদর্শনের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

«مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

যাকে কন্যাসন্তান প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়, এরপর সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।[১৫৭]

একইভাবে তিনি কন্যাসন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَانِ»

যে ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসীকে উত্তমভাবে ইলম শিক্ষা প্রদান করে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, এরপর তাকে স্বাধীন করে বিবাহ করে নেয়, তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।[১৫৮]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন, সেদিন তিনি নারীদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসিহত করতেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি আদেশ দিতেন।

এরপর কন্যাসন্তান যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে, তখনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার অধিকার দিয়েছেন। তিনি তাকে কোনোকিছু গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছেন। তার অপছন্দের কোনো পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে তার ওপর বলপ্রয়োগ করাকে অবৈধ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন,

---

১৫৬. *সহিহ বুখারি* : ৬০০১, *সুনানে তিরমিজি* : ৩১৮২, *মুসনাদে আহমাদ* : ৪১৩১।
১৫৭. *সহিহ বুখারি* : ৫৯৯৫, *সহিহ মুসলিম* : ২৬২৯।
১৫৮. *সহিহ বুখারি* : ৪৭৯৫।

«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

স্বামী-পরিত্যক্তা নারীরা (নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে) অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। আর কুমারী মেয়েদের নিকট থেকেও তার বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, আর তার চুপ থাকাটা তার অনুমতি।[১৫৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ»

স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ প্রদান করা হবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, কেমন করে কুমারীর অনুমতি বোঝা যাবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।[১৬০]

এরপর সেই কন্যা যখন কারও স্ত্রী হবে, তখনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে উত্তম আচরণ ও সুন্দর ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। এমনকি স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করাকে পুরুষের সম্মানিত এবং উন্নত চরিত্রবান হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তিনি বলেন, 'স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, তাহলে তাকে এর সওয়াব দেওয়া হবে।'[১৬১]

তিনি আরও বলেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ؛ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

হে আল্লাহ, এতিম ও নারী, আমি এই দুইপ্রকার দুর্বলের হক নষ্ট হওয়া প্রতিহত করব।[১৬২]

আবার কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে অপছন্দ করে এবং স্বামীর সাথে তার জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে ওঠে, সে ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৫৯. *সহিহ মুসলিম* : ১৪২১, *সহিহ মুসলিম* : ৩৩৪০, *সুনানে তিরমিজি* : ১১০৮।

১৬০. *সহিহ বুখারি* : ৫১৩৬, *সহিহ মুসলিম* : ২৬২৯।

১৬১. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭১৯৫, ইমাম তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ১৫৩৫৬।

১৬২. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৬৭৮, *মুসনাদে আহমাদ* : ৯৬৬৪, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২১১।

তার স্বামীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। যাকে ফিকহের ভাষায় বলা হয় (خلعة) 'খুলা'। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একবার সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, চারিত্রিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সাবেত ইবনে কায়েসের ওপর আমি কোনো অভিযোগ আরোপ করছি না। তবে আমি কুফরির (অর্থাৎ, স্বামীর সাথে অমিল হওয়ায় তার অবাধ্যতার) ভয় করছি।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, '(আলাদা হতে পারবে, তবে) তুমি কি তার বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দেবে?'

মহিলা উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ।'

এরপর স্ত্রী বাগানটি সাবেত ইবনে কায়েসকে ফিরিয়ে দিলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনে কায়েসকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দিলেন। ফলে সাবেত ইবনে কায়েস তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলেন।[১৬৩]

নারী যদি সম্পদের মালিক হয়, তাহলে পুরুষদের মতো সেও সেগুলো নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। সম্পদগুলোর মাধ্যমে নিজের ইচ্ছামতো ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্য ও দানখয়রাত করতে পারবে। এতে তার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, যতদিন পর্যন্ত সে সুস্থ-সবল ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্না থাকে। এ বিষয়টি বোঝা যায় আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমেও। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

> তখন যদি উপলব্ধি করো তাদের (অর্থাৎ, এতিম-প্রতিপালিতদের) মধ্যে বুঝ-সময় এসে গেছে, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো। [সুরা নিসা : ৬]

একবার হজরত উম্মে হানি রা. দুজন মুশরিককে আশ্রয় প্রদান করেন। তবে তার ভাই আলি রা. এটা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তিনি সেই মুশরিক

---

১৬৩. *সহিহ বুখারি* : ৫২৭৬।

দুজনকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন, 'হে উম্মে হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় প্রদান করলাম।'[১৬৪]

এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানি রা.-কে নারী হিসেবে এই অধিকার দিলেন যে, সেও কোনো অমুসলিমকে যুদ্ধাবস্থায় কিংবা স্থিতি অবস্থায় নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিতে পারে।

এভাবেই একজন মুসলিম নারী নববি শিক্ষার ছায়াতলে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিরাপদে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শিশু অধিকার

ইসলামি দৃষ্টিকোণে শিশুরা হলো পার্থিব জীবনের পুষ্প এবং হৃদয়কাড়া শোভা-সৌন্দর্য। তারা অন্তরের প্রশান্তি এবং চোখের শীতলতা। তাদের প্রতি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুকোমল মনোযোগী দৃষ্টি। এ কারণে তিনি শিশুদের অধিকার বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই গুরুত্বারোপ এসেছে শিশুর জন্মগ্রহণের আগে থেকেই, এমনকি সেটা ভ্রূণ ও বাচ্চার আকৃতি ধারণ করারও আগে। এ কারণে তিনি বিবাহ-ইচ্ছুক পুরুষকে আদেশ করেছেন, সে যেন একজন দ্বীনদার নেককার নারীকে বিবাহ করে। এতেই রয়েছে সন্তানের কল্যাণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»

> মহিলাদেরকে চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে বিবাহ করা হয়—তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে; তোমার হস্তদ্বয় ধুলোধূসরিত হোক[১৬৫]।[১৬৬]

একইভাবে তিনি নারীদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন ধার্মিক ও সৎ গুণাবলিসম্পন্ন স্বামী নির্বাচন করতে। এতেই রয়েছে সন্তানের কল্যাণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

---

১৬৫. কোনো কিছুর প্রতি আশ্চর্য প্রকাশ বা উৎসাহ প্রদানের জন্য আরবরা এ বাক্যটি ব্যবহার করত।-সম্পাদক

১৬৬. *সহিহ বুখারি* : ৫০৯০, *সহিহ মুসলিম* : ১৪৬৬।

> যদি তোমাদের কাছে এমন কোনো পুরুষ বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তোমরা তাকে বিবাহ করিয়ে দাও। আর যদি এমনটা না করো, তবে পৃথিবীতে অনেক ফেতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[১৬৭]

অতএব, পিতার ওপর সন্তানের প্রথম অধিকার হলো পিতা একজন দ্বীনদার নেককার স্ত্রী (অর্থাৎ সন্তানের মা) নির্বাচন করবে।

সন্দেহ নেই, এই সঠিক নির্বাচন এবং নীতি অনাগত শিশুর কল্যাণ ও সুন্দর আচরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, যে শিশুটি হবে এই দুজন সৎ ও দ্বীনদার মানুষের ঔরসজাত ফসল। এভাবে সেই শিশুটি একটি প্রীতিবন্ধনময় পরিবারে এবং ইসলামি শিক্ষার আলোকে প্রতিপালিত হতে সক্ষম হবে।

এরপর মা যখন সন্তান গর্ভে ধারণ করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মায়ের প্রতি এবং অনাগত শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এজন্য তিনি গর্ভবতী নারীর জন্য রমজানে রোজা না রাখার বৈধতা দিয়েছেন।[১৬৮]

অতঃপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়ার রীতি নির্ধারণ করেছেন, যাতে পার্থিব জীবনের শুরুতেই সন্তানের কর্ণকুহরে পৌঁছে যায় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য ও তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য একটি সুন্দর নাম নির্বাচন করার আদেশ করেছেন। নামটি হতে হবে ভালো গুণবাচক কিংবা সুন্দর অর্থসংবলিত। যে নামটি সন্তানকে স্বস্তি দেবে এবং তার অন্তরকে করবে প্রশান্ত। যেন নামের এই মর্যাদাপূর্ণ অর্থ ও পবিত্র অনুভূতি ছোট থেকেই তার মাঝে একটি সুকুমারবৃত্তি জাগ্রত করতে

---

১৬৭. *সুনানে তিরমিজি* : ১০০৪।

১৬৮. গর্ভবতী মায়ের জন্য রমজানের রোজা না রাখার এ বিধান নিঃশর্ত নয়। যদি রোজা রাখার কারণে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হয়, কিংবা গর্ভবতী মায়ের মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় থাকে, তাহলে রোজা রাখবে না। তার জন্য রোজা না রাখা ও ভাঙা জায়েজ আছে। পরবর্তী সময়ে এর কাজা করে নেবে। (*ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া* : ৭/৪০৪, *ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া* : ৩/৪০৪)-সম্পাদক।

CamScanner

পারে এবং সে যেন এই নামের মাধ্যমে অনুভব করতে পারে তার সম্মান ও মর্যাদা। এই সুন্দর নামটি তাকে মানুষের উপহাস ও ব্যঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ؛ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

তোমরা নবী-রাসুলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আব্দুর রাহমান (দয়াবানের বান্দা); হারেস (অর্জনকারী) ও হাম্মাম (কর্ম-ইচ্ছুক) হলো বাস্তবসম্মত নাম এবং হারব (যুদ্ধ) ও মুররাহ (তিক্ত) হলো নিকৃষ্টতম নাম।[১৬৯]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য আকিকা করাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। নতুন সন্তানের আগমনের কারণে এটি একপ্রকার আনন্দ ও খুশিরও প্রকাশ। তিনি বলেন, 'কারও যদি কোনো শিশুসন্তান জন্ম নেয়, আর সে তার পক্ষ হতে কুরবানি (পশু জবাই) করতে চায়, তবে তার উচিত হবে পুত্রসন্তানের জন্য দুটি একই ধরনের ছাগল এবং কন্যাসন্তানের পক্ষে একটি ছাগল জবাই করা (অর্থাৎ, আকিকা করা)।'[১৭০]

এভাবে সন্তান-জন্মের আনন্দে পিতামাতার সাথে ইসলামি সমাজের সকলেই যেন আনন্দিত হয়ে উঠল।

আবার শিশুর দুধপানের অধিকার নিয়েও পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে। এ সময়কাল তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে

১৬৯. *সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৫০, মুসনাদে আহমাদ : ১৯০৫৪।*
১৭০. *সুনানে আবু দাউদ : ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ : ৬৮২২, মুসতাদরাকে হাকেম : ৭৫৯২।*

CamScanner

চায়। সন্তান যে পিতার, তার কর্তব্য হলো ন্যায়সংগতভাবে মায়েদের খোরপোশের ভার বহন করা। [সুরা বাকারা : ২৩৩]

নিঃসন্দেহে এই পার্থিব জীবনে একজন মানুষের শরীরিক গঠন, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক আচরণে মায়ের দুধের গভীর প্রভাব রয়েছে।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের মাঝে সমতা বিধানের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

«اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ»

কিছু প্রদানের ক্ষেত্রে তোমরা সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো।[১৭১]

আবার তিনি পিতাদেরকে উপদেশ দিতেন,

«وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ»

তোমরা সন্তানসন্ততির প্রতি বদদোয়া করো না।[১৭২]

কারণ, হয়তো পিতামাতার পক্ষ থেকে এমন সময় বদদোয়া করা হলো, যখন তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। তখন এটা সন্তানের সারা জীবনের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেই সাথে ইসলামি বিধানে একটি শিশু জন্ম থেকেই তার পূর্ণ অধিকার ভোগ করার যোগ্যতা লাভ করে। জন্মের পর থেকেই সে যোগ্য হয়ে ওঠে উত্তরাধিকার, ওসিয়ত, ওয়াকফ ও দানের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে এবং সমজাতীয় সকল বিষয়ে। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে ক্রন্দন করলেই তাকে ওয়ারিশ করা হবে।[১৭৩]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্পবয়স থেকেই সন্তানের প্রতি যত্নশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, সহানুভূতি দেখানো, ভালোবাসা প্রদর্শন করা, তার সাথে খেলাধুলা করা, তাকে আনন্দে রাখা। যেমনটি আমরা আগেই মুসলমান শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের ক্ষেত্রে আলোচনা করে এসেছি।

---

১৭১. *সহিহ বুখারি* : ২৫৮৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৬২৩।
১৭২. *সহিহ মুসলিম* : ৩০০৯, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৫৩২।
১৭৩. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৯২০, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৭৫০।

CamScanner

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল শিশুর ইলম ও আমলের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি দেওয়া, অন্যকে সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া, ছোট থেকেই সর্বদা সত্যকথনে অভ্যস্ত করা, ভালো বন্ধুদের সংশ্রবে রাখার চেষ্টা করা, তার জন্য দোয়া করা এবং আচরণগত দিক ও সামাজিকভাবেও তাকে গুরুত্ব দেওয়া।

এ সকল নীতি ও মূল্যবোধের পরিচর্চার মাধ্যমে একটি শিশু সমাজের মধ্যে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়। এজন্য হজরত উমর রা. তার সন্তানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে নিয়ে যেতেন, যাতে নবীজির সান্নিধ্যে সন্তানেরা শিষ্টাচারের বাস্তব শিক্ষা নিতে পারে এবং অন্যকে সম্মান করার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, 'এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলো তো সেটা কোন গাছ?'

লোকজন তখন জঙ্গলের বিভিন্ন গাছগাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। তবে আমার মনে হতে লাগল যে, এটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি জবাব দিতে লজ্জাবোধ করছিলাম। এ সময় সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনিই আমাদের তা বলে দিন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা হলো খেজুর গাছ।'

ইবনে উমর রা. বলেন, অতঃপর (মজলিস থেকে ফিরে আসার পর) আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি যদি (মজলিসে) তা বলতে অমুক অমুক জিনিস অর্জন করার চেয়ে আমি বেশি খুশি হতাম (অর্থাৎ, খুব খুশি হতাম)।'[১৭৪]

এভাবেই আমাদের সন্তানদের ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষা করা উচিত, যেগুলো সমাজকে সুসংহত করে, সভ্যভব্য করে তোলে। তাহলে ধীরে ধীরে সন্তানরাও একদিন সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

---

১৭৪. *সহিহ বুখারি* : ১৩১, *সহিহ মুসলিম* : ২৮১১।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা এক কিশোর উমর ইবনে আবু সালামা রা.[১৭৫]-এর একটি চমৎকার কথার মাধ্যমে আমরা এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটাতে চাই। উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন, আমি শৈশবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনের অধীনে ছিলাম। একদিন খাওয়ার সময় আমার হাত খাবারের বাসনে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে বৎস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার সামনে থেকে খাও।' এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।[১৭৬]

এমনই ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে বর্তমানের শিশু আর ভবিষ্যতের হয়ে ওঠা দায়িত্ববান ব্যক্তিদের শিখিয়েছেন ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ ও শিষ্টাচার।

---

১৭৫. তিনি হলেন উমর ইবনে আবু সালামা রা.। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনে আবদুল বার রহ. রচিত *আল-ইসতিআব* : জীবনী নং : ১৬৯৯, ইবনে হাজার আসকালানি রহ. রচিত : *আল-ইসাবা* : জীবনী নং : ৫৭৪৪।

১৭৬. *সহিহ বুখারি* : ৫৩৭৬।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শ্রমিক অধিকার

ইসলাম দাস-দাসী, কর্মচারী ও শ্রমিকদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দিয়েছে এবং মানব-ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসলামই তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ প্রাচীন কিছু সভ্যতায় শ্রম মানেই ছিল দাসত্ব ও পরাধীনতা, কিছু সভ্যতায় তার অপর নাম ছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। কিন্তু ইসলাম চেয়েছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাদেরকে একটি পূর্ণ সম্মানজনক জীবন প্রদান করতে।

সেবক ও শ্রমিকদের প্রতি ইসলামের মহান দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত। সেখানে আমরা দেখতে পাই, নবীজির পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে সেবক ও শ্রমিকদের সকল অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তিনি মালিকশ্রেণিকে আহ্বান করেছেন শ্রমিকদের সাথে মানবিক আচরণ করতে, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হতে, সদাচারী হতে এবং সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

তোমাদের দাস-দাসীরা (সেবক-সেবিকারা) তোমাদেরই ভাই-বোন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে নিজে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকেও যেন তা পরিধান করায়। তোমরা তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে

দিয়ো না, যা তাদের জন্য অসাধ্য। আর তোমরা যদি তাদেরকে এমন কঠিন কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরা নিজেরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে।[১৭৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বাণী 'দাস-দাসীরা তোমাদের ভাইবোন' এসেছে। যেন তাদেরকে দাস-দাসীর স্তর থেকে ভাই-বোনের মর্যাদায় উন্নীত করে এবং এই সর্বজনীন নীতিমালা মানবজাতির সকল সদস্যের জন্য সম্মানজনক এক জীবনের ব্যবস্থা করে।

অন্যদিকে মালিকের জন্যও ইসলাম আবশ্যক করেছে, তারা যেন সেবক-সেবিকা ও শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করে। পারিশ্রমিক প্রদানে তাদের প্রতি যেন অন্যায় ও বিলম্ব না করে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[১৭৮]

শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক করেন আর জান্নাত হারাম করে দেন।

এ সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, যদিও তা ক্ষুদ্র জিনিস হয়?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তা বাবলা গাছের একটি শাখা হয়, তবুও।'[১৭৯]

তাদের আর্থিক অধিকার সব ধরনের প্রতারণা, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচার থেকে সুরক্ষিত থাকা তাদের অন্যতম অধিকার। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা (হাদিসে কুদসিতে) বলেন,

---

১৭৭. *সহিহ বুখারি* : ৩০, *সহিহ মুসলিম* : ১৬৬১।
১৭৮. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৪৪৩।
১৭৯. *সহিহ মুসলিম* : ১৩৭, *সুনানে নাসায়ি* : ৫৪১৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ২২২৯৩

CamScanner

«ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। ... (তাদের মধ্যে) একজন হলো এমন ব্যক্তি, যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করল অথচ তার পারিশ্রমিক প্রদান করল না।[১৮০]

অতএব, যারা শ্রমিক বা দাস-দাসীর ওপর জুলুম করে, তাদের জেনে নেওয়া উচিত, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বাদী হবেন।

মালিকের জন্য উচিত হলো, শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেওয়া। যার ফলে তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কাজ-কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি তোমার দাস-দাসী বা শ্রমিক থেকে যে পরিমাণ কাজের বোঝা কমিয়ে দেবে, তোমার আমলনামায় সেই পরিমাণ সওয়াব যুক্ত হবে।[১৮১]

ইসলামি বিধানে শ্রমিকদের অধিকারের আরেকটি উজ্জ্বল নিদর্শন হলো, দাস-দাসী ও শ্রমিকদের সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করা। এটা শ্রমিকদের অধিকার। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সে ব্যক্তি অহংকারী নয়, যে তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করে, গাধায় চড়ে বাজারে যায়, ছাগল পালন করে এবং তার দুধ দোহন করে।'[১৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা জীবনে নিজের বলা প্রতিটি কথার বাস্তব নমুনা ছিলেন। যেমন হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজ হাতে কোনো কিছুকে আঘাত করেননি—কোনো স্ত্রীকেও নয়, কোনো সেবককেও নয়।[১৮৩]

---

১৮০. *সহিহ বুখারি : ২২২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৪৪২, মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৬৪৩৬*
১৮১. *সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪৩১৪, মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১৪৭২।*
১৮২. ইমাম বুখারি : *আল-আদাবুল মুফরাদ : ২/৩২১।*
১৮৩. *সহিহ মুসলিম : ২৩২৮, সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৮৪।*

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হজরত আনাস রা. ছিলেন এ বিষয়ের একজন বাস্তব সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজে পাঠাতে চাইলে আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি সেখানে যাব না।' তবে মনে মনে ছিল যে, আল্লাহর নবী আমাকে যে কাজের আদেশ করেছেন, আমি সে কাজে যাব। এই মনোভাব নিয়ে আমি বাইরে বের হলাম। যেতে যেতে একদল বালকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তারা বাজারে খেলাধুলা করছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন। আমি তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'ছোট্ট আনাস! আমি তোমাকে যেখানে যাওয়ার আদেশ করেছিলাম সেখানে যাও।'

আমি বললাম, 'এখনই যাচ্ছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!'

হজরত আনাস রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি দীর্ঘ নয় কি সাত বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোনো কাজের কারণে 'তুমি কেন এমনটা করেছ?' কিংবা কোনো কাজ করতে না পারলে 'তুমি কেন এটা করোনি?' বলেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।[১৮৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেবকদের প্রতি এতটা খেয়াল রাখতেন যে, তাদের বিবাহ-বিষয়েও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিন্তাভাবনা করতেন। যেমন হজরত রবিআ ইবনে কাব আল-আসলামি রা. বলেন, আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিআ, তুমি কি বিবাহ করবে না?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসুল, না। আমার বিবাহের কোনো ইচ্ছা নেই, স্ত্রীর ভরণপোষণের সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া কোনো বস্তু আপনার থেকে আমাকে দূরে রাখুক, আমি তা চাই না। এ শুনে তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

---

১৮৪. *সহিহ মুসলিম* : ২৩১০, *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৭৭৩।

CamScanner

এরপর তিনি আবার আমাকে বললেন, 'হে রবিআ, তুমি কি বিবাহ করবে না?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসুল, না। আমার বিবাহের কোনো ইচ্ছা নেই, স্ত্রীর ভরণপোষণেরও সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া কোনো বস্তু আমাকে আপনার থেকে দূরে রাখুক, আমি তা চাই না। এ শুনে তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

তবে পরমুহূর্তেই আমি এই বিষয়ে কিছুটা চিন্তাভাবনা করলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসুল, আমার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের বিষয়ে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।' আর আমি তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, তিনি যদি তৃতীয়বার আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি 'হ্যাঁ' বলব (অর্থাৎ বিবাহ করতে রাজি আছি)। রবিআ রা. বলেন, তিনি আমাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রবিআ, তুমি কি বিবাহ করবে না?'

এবার আমি বললাম, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যা চান আমাকে আদেশ করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অমুক পরিবারের কাছে যাও।' (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো এক আনসারি গোত্রের কাছে যেতে বলেছেন।)[১৮৫]

এমনইভাবে অমুসলিম সেবক বা খাদেমের প্রতিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ-সহানুভূতি ছিল অবারিত। যেমনটি তিনি করেছেন এক ইহুদি বালকের সাথে, যে তাঁর খেদমত করত। একবার সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন এবং খোঁজখবর নিতেন। তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তার মাথার কাছে বসে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

বালকটি তখন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, 'তুমি আবুল কাসিম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা মেনে নাও।' পিতার সম্মতি পেয়ে বালকটি ইসলামগ্রহণ করল।

---

১৮৫. *মুসনাদে আহমাদ : ১৬৬২৭, মুসতাদরাকে হাকেম : ২৭১৮।*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটির বাড়ি থেকে আসার সময় বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি বালকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।'[১৮৬]

দাস-দাসী ও শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে এখানে অল্প কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে এগুলো এমন একটি সময়ে বাস্তবায়িত করেছেন, যে সময়ে তাদের ওপর শুধু জুলুম, অত্যাচার ও কঠোরতার কথাই শোনা যেত।

---

১৮৬. *সহিহ বুখারি* : ১৩৫৬, *সুনানে তিরমিজি* : ২২৪৭, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ১৩৪২।

CamScanner

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অসুস্থ-প্রতিবন্ধীদের অধিকার

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইসলামের রয়েছে বিশেষ সহানুভূতি ও যত্নশীল মনোভাব। প্রথমত ইসলাম তাদের জন্য শরিয়তের অনেক বিধান সহজ ও শিথিল করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

(জিহাদ না করাতে) কোনো অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, পায়ে সমস্যা আছে এমন ব্যক্তির জন্যও গুনাহ নেই। কোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও গুনাহ নেই। [সুরা নুর : ৬১]

আর চূড়ান্তভাবে ইসলামই তাদের অন্তরে আশা জাগিয়েছে এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক অধিকারগুলোর প্রতি যত্নশীল হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সংবাদ পেতেন, তখন নিজের বহু পেরেশানি ও কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখার জন্য দ্রুত তার বাড়িতে ছুটে যেতেন। তাঁর এই অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার মধ্যে কোনো লৌকিকতা বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। বরং এটিকে তিনি নিজের স্বাভাবিক কর্তব্য বলে গণ্য করতেন। আর কেনই-বা করবেন না! তিনি তো সেই নবী, 'খোঁজখবর' নেওয়াকে যিনি অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে, যেমন সালামের উত্তর প্রদান করা, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নেওয়া, জানাজায় উপস্থিত হওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং হাঁচির উত্তর প্রদান করা।[১৮৭]

---

১৮৭. *সহিহ বুখারি* : ১২৪০, *সহিহ মুসলিম* : ২১৬২।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা অসুস্থ ব্যক্তিকে তার রোগ ও দুর্ভোগ সহজ করে দেখাতেন। কোনোপ্রকার লৌকিকতা ছাড়া সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এগুলো সেই অসুস্থ ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে স্বস্তি ও সুখ প্রদান করত। এ বিষয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সাদ ইবনে উবাদাহ রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে সাথে নিয়ে সাদ ইবনে উবাদা রা.-কে দেখতে এলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে পরিবার-পরিজনবেষ্টিত দেখতে পেলেন। তারা সকলেই ছিল চিন্তিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কি মৃত্যু হয়ে গেছে?'

তারা বললেন, 'না, ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তখন নবীজির চোখে পানি চলে এলো। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরাও কাঁদতে শুরু করল। তখন তিনি বললেন, 'শুনে রাখো! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা চোখের পানি এবং অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আজাব দেন না। তিনি আজাব দেন এটার কারণে (এই বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন), অথবা এটার কারণেই তিনি রহম করেন।'[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন এবং তার ওপর আপতিত অসুস্থতার পরিণামে তাকে সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ শোনাতেন। এভাবে তিনি বিষয়টিকে সহজ করে দেখাতেন এবং এই অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট করে তুলতেন। পরিণামে অসুস্থ ব্যক্তির মনেও শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসত। যেমন উম্মে আলা রা.[১৮৯] বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন, 'হে উম্মে আলা, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, মুসলমানদের

---

[১৮৮]. *সহিহ বুখারি* : ১৩০৪, *সহিহ মুসলিম* : ৯২৪।

[১৮৯]. উম্মুল আলা : তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন এবং বায়াত হন। পুরো পরিচয় : উম্মে খারিজা বিনতে যায়েদ বিন ছাবেত রা.। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৬/৩৮২, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : জীবনী নং : ১২১৬৮।

CS CamScanner

অসুখের মাধ্যমে আল্লাহ এমনভাবে তাদের গুনাহ দূর করে দেন, যেমনভাবে আগুন সোনা-রুপার খাদ দূর করে দেয়।'(১৯০)

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিয়তের অনেক বিষয়ে সহজ পথ বলে দিতেন, তাদের প্রতি কখনোই কঠোরতা আরোপ করতেন না। এ বিষয়ে হজরত জাবের রা. থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা একবার একটি সফরে বের হলাম। পথিমধ্যে আমাদের একজন পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এতে তার মাথা ফেটে যায়। পরে এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি তার সাথিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কি এখন তায়াম্মুমের সুযোগ আছে?' সাথিরা বললেন, 'যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম তাই তোমার তায়াম্মুমের সুযোগ নেই।'

এ কথা শুনে সে গোসল করল এবং মৃত্যুবরণ করল। সফর থেকে ফেরার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দেওয়া হলো। নবীজি তখন বললেন, 'তার সাথিরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! যেহেতু বিষয়টা তারা অবগত ছিল না, তাহলে কেন তারা জিজ্ঞাসা করে নিলো না? নিশ্চয় অজ্ঞতার সমাধান হলো জিজ্ঞাসা করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে তার আহত স্থানে পট্টি বেঁধে তার ওপর মাসেহ করে নিত এবং শরীরের অন্য স্থানগুলো ধুয়ে ফেললেই হতো।'(১৯১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির প্রয়োজনে তার ডাকে সাড়া দিতেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে তার সাথে সাথে চলতেন। একবার তাঁর কাছে এক মহিলা এলো, যার মস্তিষ্কে কিছুটা সমস্যা ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে অমুক! তোমার ইচ্ছামতো যেকোনো রাস্তায় তুমি অপেক্ষা করো, যাতে আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।' এরপর তিনি কোনো এক

---

১৯০. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩০৯২।

১৯১. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৩৬, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৫৭২, *মুসনাদে আহমাদ* : ৩০৫৭।

CamScanner

রাস্তায় মহিলাটিকে একাকী সময় দিলেন[১৯২] এবং মহিলাটি তার প্রয়োজন পূরণ করল।[১৯৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ করাকে তার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন। কেননা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্যে হলো, একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই যেন সুস্থ ও সবল থাকে। একবার কিছু বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ»

হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগেরই ওষুধ সৃষ্টি করেছেন।[১৯৪]

একইভাবে প্রয়োজনের সময় কোনো মুসলিম মহিলাকে কোনো মুসলিম পুরুষের চিকিৎসা করতেও নিষেধ করেননি। যেমন খন্দকের যুদ্ধে যখন সাদ ইবনে মুআজ রা. তিরবিদ্ধ হন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুফায়দা নামের আসলাম গোত্রের এক মহিলাকে সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। মহিলাটি আহতদের চিকিৎসা করতেন এবং এই দুর্বল-আহত মুসলমানদের চিকিৎসা করাকে নিজের জন্য সওয়াব বলে গণ্য করতেন।[১৯৫]

---

১৯২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটির সাথে মানুষ চলাচলের রাস্তায় কথা বলেছিলেন। কিন্তু অন্যদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে। যাতে সেই মহিলা নিঃসংকোচে তার কথা বলতে পারে। সুতরাং এটা গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে একাকী ও নির্জন হওয়া ছিল না। বরং দূর থেকে সকল মানুষই তাদের দেখছিল। কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ, মহিলার কথাটি ছিল এমন, যা সে প্রকাশ্যে বলতে চায় না। দ্রষ্টব্য : ইমাম নববি রহ. রচিত *মিনহাজ* : ১৫/৮৩

১৯৩. *সহিহ মুসলিম* : ২৩২৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৪০৭৮, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৫২৭

১৯৪. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৮৫৫, *সুনানে তিরমিজি* : ২০৩৮, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৪৩৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৩৭৭।

১৯৫. ইমাম বুখারি : *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ১/৩৮৫, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/২৩৯, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/২৩৩।

আমর ইবনে জামুহ রা.-এর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার সহানুভূতির আচরণই না করেছেন! আমর ইবনে জামুহ রা. ছিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু তার ছিল উচ্চ মনোবল এবং নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় সঁপে দেওয়ার অনন্য আকাঙ্ক্ষা। এ কারণে শারীরিক ত্রুটি তার সুউচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার পা ছিল খোঁড়া। তবে তার ছিল সিংহের মতো সাহসী চারজন পুত্র। সকল যুদ্ধেই তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত থাকতেন। উহুদ যুদ্ধের সময় তারা তাদের পিতাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। ছেলেদের কথা শুনে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অনুযোগ করে বললেন, 'আমার ছেলেরা খোঁড়া হওয়ার কারণে আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করছে। আল্লাহর কসম! আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই (শহিদ হয়ে) জান্নাতের ভূমিতে বিচরণ করব।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে অপারগ করেছেন। সুতরাং তোমার ওপর এখন জিহাদ আবশ্যক নয়।'

এরপর তিনি তার ছেলেদেরকে বললেন, 'তোমাদের জন্যও তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাত নসিব করবেন।'

অবশেষে আমর ইবনে জামুহ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং উহুদের ময়দানে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বললেন, 'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তাআলা তাদের কসমকে পূর্ণ করেন। তাদের মধ্যে আমর ইবনে জামুহ অন্যতম। আমি দেখেছি সে জান্নাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।'[১৯৬]

---

[১৯৬]. *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৭০২৪, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৪২৩, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ* : ৪/২১৪।

অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে অমায়িক আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মুসলমানের জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। এজন্য হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুকিম ও মুসাফির হয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি। তিনি অসুস্থকে দেখতে যেতেন। জানাজায় অংশগ্রহণ করতেন। আমাদের সাথেই যুদ্ধে অংশ নিতেন। অল্প বা বেশি—সকল দুঃখ-কষ্টের সময় তিনি আমাদেরকে আন্তরিক সান্ত্বনা দিতেন।[১৯৭]

---

১৯৭. মুসনাদে আহমাদ : ৫০৪।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এতিম-মিসকিন-বিধবাদের অধিকার

ইসলামি শরিয়তের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতিম-মিসকিন ও বিধবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। মুসলিম সমাজের নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানে ইসলাম তাদের মানসিক ও জাগতিক উভয় প্রকার সহযোগিতা-সংহতির সুব্যবস্থা করেছে। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা এতিমদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আমাদের আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

যে এতিম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না। [সুরা দুহা : ৯]

একইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিসকিনের জন্য নির্ধারিত যে অধিকার রয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে অধিকারসমূহ প্রদান করার আদেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (তাদের হক প্রদান করো)। আর নিজেদের অর্থসম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করবে না।

[সুরা বনি ইসরাইল : ২৬]

মিসকিন ও বিধবাদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

«اَلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»

CamScanner

বিধবা ও মিসকিনদের (প্রয়োজন পূরণে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।[১৯৮]

হাদিসটির মাধ্যমে মিসকিন ও বিধবাদের সহযোগিতাকারীদের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই বৃদ্ধি করেছেন, যার কল্পনাও কেউ কখনো করতে পারে না! সওয়াব ও প্রতিদানের দিক দিয়ে এরচেয়ে বড় কিছু হতে পারে না!

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিমদের লালনপালন এবং তাদের যত্ন নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য অনেক সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি ও এতিমের ভরণপোষণকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব।' এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান।[১৯৯]

বলা যায়, এতিমের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও সহানুভূতি এতটা বেশি ছিল যে, তিনি উম্মতকে নিজেদের সন্তানের সাথে একজন করে এতিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সন্তানের মাঝে একজন এতিমকে তার খাদ্য-খাবারে এমনভাবে মিলিয়ে নেয় যে, তার সকল প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়।'[২০০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ হলো, একজন এতিম, মিসকিন ও বিধবাকে এভাবে বিবেচনা করা যাবে না যে, তারা শুধু পার্থিব জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মুখাপেক্ষী এবং এগুলো প্রদান করলেই তাদের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। বরং তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে, তারা আমাদের মতোই মানুষ, তাদেরও সবকিছু পাওয়ার অধিকার রয়েছে, অথচ তারা সবরকম স্নেহ, মায়া ও মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

---

১৯৮. *সহিহ বুখারি* : ৬০০৬, *সহিহ মুসলিম* : ২৯৮৩।

১৯৯. *সহিহ বুখারি* : ৫৩৫৩, *সহিহ মুসলিম* : ২৯৮২।

২০০. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯০৪৭, ইমাম বুখারি : *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৭৮, ইমাম তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ৬৭০।

CamScanner

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এতিমদের লালনপালন ও যত্নের প্রতি সাধারণ উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিষয়গুলোর প্রতি চূড়ান্তরকম উৎসাহিত করেছেন। যেমন একবার এক ব্যক্তি নবীজির নিকট এসে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি কি চাও তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক? তাহলে তুমি এতিমের প্রতি দয়া করো। তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দাও। তোমার খাবারে তাকে শরিক করো। এতে তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার মনের আশা পূরণ হবে।'[২০১]

অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিমদের প্রতি জুলুম না করতে এবং অন্যায়ভাবে তাদের অধিকার খর্ব না করতে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে : ... (তন্মধ্যে একটি হলো) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।'[২০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে এতিম ও মিসকিনদের জন্য খরচ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

«وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ»

নিশ্চয় এই সম্পদ হলো সতেজ, আকর্ষণীয় ও মিষ্ট বস্তু। তবে সে কতই-না ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকিন, এতিম ও মুসাফিরকে দান করে।[২০৩]

আমরা দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ওলিমার ব্যাপারে নিন্দা করেছেন, যেখানে শুধু ধনীদেরই দাওয়াত করা হয় এবং ফকির, মিসকিন, এতিম ও অসহায়দের বঞ্চিত রাখা হয়। তিনি বলেছেন, 'যে ওলিমায় (বিবাহ উপলক্ষ্যে বরের পক্ষ থেকে খাদ্যের আয়োজন) শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদের দাওয়াত করা

---

২০১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৫৬৬, ইমাম বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬৮৮৬।
২০২. *সহিহ বুখারি* : ২৭৬৬, *সহিহ মুসলিম* : ৮৯।
২০৩. *সহিহ বুখারি* : ১৪৬৫, *সুনানে নাসায়ি* : ২৫৮১, *মুসনাদে আহমাদ* : ১১১৭৩।

CamScanner

হয় না, সেই ওলিমা কতই-না নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে নাফরমানি করে।'[২০৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে শুধু উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি নিজেও এতিম, মিসকিন ও অসহায়দের অভিভাবকত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং একজন যোগ্য রাষ্ট্রনায়কের মতো তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহর বিধানানুসারে সকল মানুষের চেয়ে আমিই মুমিনদের অধিক নিকটতর। এতএব, তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ঋণ কিংবা এতিম সন্তান রেখে যায়, তাহলে তোমরা (সেই বিষয়ে) আমাকে আহ্বান করবে। আমিই হব তার অভিভাবক।'[২০৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যা বলতেন, অন্য মানুষদের চেয়ে সর্বাগ্রে এবং অতি দ্রুত তিনিই তা আগে বাস্তবায়ন করে দেখাতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধবা ও গরিবদের সাথে চলাফেরায় কোনো সংকোচবোধ করতেন না। এতে তিনি কোনো অসম্মানবোধ করতেন না। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।[২০৬]

এভাবেই ইসলাম এতিম, মিসকিন ও বিধবাদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণের কিছু মূলনীতি স্থাপন করেছে। এইসব মূলনীতি বাস্তবায়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমুজ্জ্বল উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে তিনিই হলেন অনুসরণীয় আদর্শ ও উত্তম দৃষ্টান্ত। জগতে তাঁর চেয়ে মহান আর কোনো আদর্শ নেই!

---

২০৪. *সহিহ বুখারি* : ৫১৭৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৪৩২, *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৭৪২, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৯১৩।

২০৫. *সহিহ বুখারি* : ২২৯৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৬১৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৮৩৯।

২০৬. *সুনানে নাসায়ি* : ১৪১৪, *সুনানে দারেমি* : ৭৪, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৬৪২৩।

CamScanner

সপ্তম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও প্রাণী অধিকার

জীবজন্তুর প্রতি ইসলামের রয়েছে একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ পার্থিব জীবনে, মানুষের বহুবিধ কল্যাণ অর্জনে, পৃথিবীর নির্মাণ এবং তার স্থায়িত্বে এগুলোর ব্যাপক ভূমিকা স্বীকৃত। এই সীমাহীন গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জীবজন্তুর নামে অনেকগুলো সুরার নামকরণ করেছেন। যেমন সুরা বাকারা (গরু), সুরা আনআম (চতুষ্পদ প্রাণী), সুরা নাহল (মৌমাছি), সুরা আনকাবুত (মাকড়সা), সুরা ফিল (হাতি), সুরা নামল (পিঁপড়া) ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য শীত থেকে বাঁচার উপকরণ এবং তা ছাড়া আরও বহু উপকার এবং তা থেকেই তোমরা ভক্ষণ করো। তোমরা সন্ধ্যাকালে যখন সেগুলোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনো এবং ভোরবেলা যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তার ভেতর তোমাদের জন্য দৃষ্টিনন্দন শোভাও রয়েছে। এবং তারা তোমাদের ভার বয়ে নিয়ে যায় এমন নগরে, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু। [সুরা নাহল : ৫-৭]

প্রাণী বা জীবজন্তুর অধিকারসমূহের মধ্যে অত্যন্ত বড় এক হলো, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া। হজরত জাবের রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি গাধার সামনে

CamScanner

দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। গাধাটির মুখের ওপর আঘাতের দাগ ছিল। এটা দেখে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এটাকে দাগ দিয়েছে, আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।'[২০৭]

হজরত জাবের রা. অন্য আরেকটি বর্ণনায় বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রাণীদের) মুখের ওপর মারতে ও দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।[২০৮]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তি পশুর অঙ্গবিকৃতি ঘটায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর অভিসম্পাত করেছেন।[২০৯]

অর্থাৎ এভাবে জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া, সেগুলোকে অনর্থক আঘাত করা এবং সেগুলোর প্রতি নির্মম আচরণ করা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি বড় রকমের অপরাধ।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবজন্তুর অধিকার প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে জীবজন্তুকে আটক করে ক্ষুধার্ত রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আজাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধার কারণে মারা যায়। সে তাকে খাদ্য-পানিও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।'[২১০]

হজরত সাহল ইবনে হানজালিয়া রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অনাহারে যার পেট ও পিঠ প্রায় একত্র হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা এ বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সেবাযত্নের মাধ্যমে এগুলোতে আরোহণ করো এবং সেবাযত্নের পরই এদের ভক্ষণ করো।'[২১১]

---

২০৭. *সহিহ মুসলিম* : ২১১৭।
২০৮. *সহিহ মুসলিম* : ২১১৬, *সহিহ ইবনে খুজাইমা*: ২৩৪৯।
২০৯. *সহিহ বুখারি* : ৫৫১৩, *সুনানে নাসায়ি* : ৪৪৪২, *সুনানে দারেমি* : ১৯৭৩।
২১০. *সহিহ বুখারি* : ২৩৬৫, *সহিহ মুসলিম* : ২২৪২, *সুনানে দারেমি* : ২৮১৪।
২১১. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৫৪৮, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৬৬২, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৪৬।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও আদেশ করেছেন, যে পশুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের যে ধরনের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে শুধু সেই ধরনের উপকার গ্রহণ করবে। তিনি প্রাণী ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ভারবাহী পশুর পিঠে মিম্বার বানিয়ে বসে থাকা পরিত্যাগ করবে (অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এর পিঠে বসে থাকবে না)। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত যেখানে পৌঁছতে পারতে না, সেখানে তারা তোমাদের সহজে পৌঁছে দিতে পারে।'[২১২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে তির (বা এ-জাতীয় কিছু) নিক্ষেপের 'লক্ষ্য' নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার কিছু যুবকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তারা একটি পাখি বেঁধে তার দিকে তির ছুড়ছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'এ ধরনের কাজ যে করে, আল্লাহ তার ওপর লানত করেন। প্রাণবিশিষ্ট কোনো জিনিসকে যে তির নিক্ষেপের লক্ষ্য বানায়, তার ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।'[২১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবজন্তুর আরেকটি অধিকার নির্ধারণ করেছেন। তা হলো, তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এ সময় তার তীব্র পিপাসা লাগে এবং সম্মুখেই সে একটি কূপ দেখতে পায়। লোকটি তাতে নেমে পানি পান করে। তারপর উঠে এসে সে দেখতে পায় পাশেই একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবে, নিশ্চয় এই কুকুরটি পিপাসায় তেমনই কষ্ট পাচ্ছে, যেমন কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে আবার কূপে নেমে তার মোজার মধ্যে পানি ভরে। তারপর মুখ দিয়ে (কামড় দিয়ে)

---

[২১২]. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৫৬৭, ইমাম বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ১০১১৫।
[২১৩]. *সহিহ বুখারি* : ৫৫১৫, *সহিহ মুসলিম* : ১৯৫৮, *সুনানে নাসায়ি* : ৪৪৪১, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৪০১৪।

ধরে উপরে উঠে আসে। এভাবে সে কুকুরটিকে পানি পান করায়। আল্লাহ এতে খুশি হন এবং তাকে মাফ করে দেন।'

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, জীবজন্তুর প্রতি সদাচরণেও কি আমাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে?'

উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

হ্যাঁ, প্রতিটি আর্দ্র হৃদয়ের (প্রাণবিশিষ্ট) অধিকারীর ক্ষেত্রেই পুরস্কার রয়েছে।[২১৪]

জীবজন্তুর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল পরম দয়া ও সহানুভূতি। তাঁর এই দয়া ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনায়। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। তিনি একসময় নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটু নির্জনে চলে গেলেন। এদিকে আমরা একটি ছোট পাখি দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে ছিল দুটি বাচ্চা। আমরা বাচ্চা দুটিকে ধরে নিয়ে এলাম। তখন মা পাখিটি আমাদের কাছে এসে ডানা ঝাপটাতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে এই অবস্থা দেখে বললেন, 'বাচ্চা ধরে রেখে কে এই পাখিটিকে কষ্ট দিয়েছে? তোমরা তার বাচ্চা তার কাছে ফিরিয়ে দাও।'[২১৫]

এমনইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন জীবজন্তুর জন্য শস্যশ্যামল চারণভূমি নির্বাচন করি। যদি এমন জায়গা না পাওয়া যায়, তবে এইসব পশুর মালিকদের উচিত হবে পশুকে ভিন্ন কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া, যেখানে তাদের জন্য ভালো খাদ্য পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কোমল। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। কোমলতায় সন্তুষ্ট হন। তিনি কোমলতার জন্য যেভাবে সাহায্য করেন, কঠোরতার ক্ষেত্রে তা করেন না। তাই তোমরা যখন এই বাক্‌শক্তিহীন পশুর ওপর আরোহণ করো, তখন তাকে তার উপযুক্ত স্থানে চরাও (যেখানে পর্যাপ্ত ঘাস ও লতাপাতা

---

২১৪. *সহিহ বুখারি* : ৫৬৬৩, *সহিহ মুসলিম* : ২২৪৪।

২১৫. *সুনানে আবু দাউদ* : ৫২৬৮, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৭৫৯৯।

CamScanner

আছে)। যেখানে বিশ্রাম করবে, সেখানকার জায়গা যদি অনুর্বর হয়, ঘাস না থাকে, তবে দ্রুত সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।'(২১৬)

এ ছাড়া জীবজন্তুর প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি ও ভালোবাসার চেয়েও আরও মূল্যবান ও উচ্চ একটি অনুভূতির বিষয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন আর তা হলো, জীবজন্তুর প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করা এবং তাদের অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাণী জবাই করা হলেও, সেটিকে তিনি কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন, চাই সেটা ভুলভাবে জবাই কিংবা জবাইয়ের অস্ত্রের ধারহীনতার কারণে শারীরিক কষ্ট হোক অথবা ছুরি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানসিক কষ্ট। এগুলোর মাধ্যমে তাকে একাধিক মৃত্যুর কষ্ট প্রদান করা হয়। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে দুটি কথা আত্মস্থ করে রেখেছি। সেই দুটি কথা হলো, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের সাথে কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব যখনই তোমরা হত্যা করবে (কিসাসস্বরূপ) তখন হত্যার মধ্যে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর যখন (জীবজন্তুকে) জবাই করবে, তখন সহজভাবে জবাই করবে এবং ছুরি, তরবারি ইত্যাদি ভালোভাবে ধার করে নেবে; যাতে জাবাইযোগ্য প্রাণীটিকে সহজেই জবাই করা যায়।'(২১৭)

এ বিষয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জবাই করার উদ্দেশ্যে তার পশুকে আগে শুইয়ে দিলো, এরপর সে তার ছুরি ধার দিতে শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তাকে একাধিক মৃত্যু দিতে চাও? তাকে শুইয়ে দেওয়ার পূর্বেই কেন তুমি তোমার ছুরি ধার দিয়ে নিলে না?'(২১৮)

---

২১৬. *মুয়াত্তা মালেক* : ১৭৬৭।
২১৭. *সহিহ মুসলিম* : ১৯৫৫, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৮১৫, *সুনানে তিরমিজি* : ১৪০৯।
২১৮. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৭৫৬৩।

CamScanner

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা ও কাজের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবেশে জীবজন্তুর অধিকারগুলো সংরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাদেরকে শান্তি, নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তির উপভোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে।

CamScanner

অষ্টম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরিবেশ অধিকার

আল্লাহ তাআলা জগতের প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল ও উপকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর এটিকে তিনি মানুষের অধীন করেছেন এবং মানুষকে আদেশ করেছেন, সে যেন এই প্রকৃতি ও পরিবেশের উপযোগিতা সংরক্ষণ করে। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে এই নির্দেশও করেছেন যে, সে যেন আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জাগতিক এইসব সুন্দর ও মনোরম নিদর্শনাবলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ﴾

তবে কি তারা তাদের ওপর দিকে আকাশমণ্ডলী দেখেনি যে, আমি তাকে কীভাবে নির্মাণ করেছি? আমি তাকে শোভা দান করেছি এবং তাতে কোনো রকমের ফাটল নেই। আর ভূমিকে আমি বিস্তার করে দিয়েছি, তাতে স্থাপিত করেছি পর্বতমালার নোঙর। আর তাতে সবরকম নয়নাভিরাম বস্তু উদ্গত করেছি। [সুরা কাফ : ৬-৭]

মানুষকে পরিবেষ্টন করে রাখা জগতের এই নির্মল পরিবেশ ও প্রকৃতি প্রাণহীন ও প্রাণসম্পন্ন সবকিছুর সাথেই মানুষের একটি বন্ধন ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে। সুতরাং এখন মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, জগতের এই প্রকৃতি ও পরিবেশের নির্মলতা বজায় রাখা। কেননা এর মধ্যেই যেমন রয়েছে মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থান, সুস্থতা ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার উপকরণ; আবার আখিরাতের জীবনেও তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত পুরস্কার ও প্রতিদান।

CS CamScanner

জগৎ বিষয়ে কুরআনুল কারিমের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা, মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও নির্মলতার ওপর নির্ভর করে মানুষের পার্থিব জীবন এবং তার স্থায়িত্ব। সেইসাথে আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় মাধ্যম। কারণ, মানুষ যখন ব্যাপকভাবে প্রকৃতির উপাদানগুলোর অপব্যবহার করবে এবং নির্বিচারে এর কার্যক্ষমতাগুলো ধ্বংস করতে থাকবে, গোটা জগৎ তখন বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অনিবার্য কারণেই মানুষের পার্থিব জীবনও তখন বিপন্ন ও বিপদ্গ্রস্ত হয়ে পড়বে।

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর সবুজ সমারোহে বেঁচে থাকতে চাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আর তা হলো, এই মহাবিশ্বে কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়ের উদ্ভব না ঘটানো। এ জন্য তিনি মূলনীতি হিসেবে বলেছেন,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

> না সাধারণ অবস্থায় অন্যের ক্ষতি করা যাবে আর না প্রতিশোধের ভিত্তিতে একে অপরের ক্ষতি করার সুযোগ আছে।[২১৯]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশ দূষণ থেকেও উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কর্ম থেকে বিরত থাকো। সেগুলো হচ্ছে, মানুষের সমাগমস্থল, চলাচলের পথ ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা।'[২২০]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের, যারা রাস্তার ওপর বসার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন তাদেরকে বললেন, 'তোমরা রাস্তার ওপর বসা ছেড়ে দাও।'

সাহাবিরা বললেন, 'এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের ওঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে

---

২১৯. *মুসনাদে আহমাদ : ২৭১৯, মুসতাদরাকে হাকেম : ২৩৪৫।*

২২০. *সুনানে আবু দাউদ : ২৬, মুসনাদে আহমাদ : ২৭১৫, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩২৮।*

CamScanner

থাকি।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'একান্তই যদি তোমাদের সেখানে বসতে হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করো।'

সাহাবিরা বললেন, 'রাস্তার হক কী?'

নবীজি বললেন, '...কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা... ।'(২২১)

এখানে 'কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা' কথাটি এমন সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যা রাস্তা ও পথ ব্যবহার করতে মানুষদের কষ্ট দেয়। পরিবেশ দূষণ এর অন্যতম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে আমরা দেখতে পাই, তিনি পরিবেশ রক্ষার সাথে আল্লাহ তাআলার প্রতিদানের একটি যোগসূত্র তৈরি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সব আমল আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি দেখলাম, তাদের সকল উত্তম কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণকে একটি উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর আমি এও দেখলাম যে, তাদের খারাপ কাজসমূহের মধ্যে মসজিদে কাশি বা থুথু ফেলা এবং তা দাফন না করাকেও (পরিষ্কার না করা) একটি খারাপ আমল বা মন্দ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।'(২২২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবেই আমাদের আবাসস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أُرَاهُ، قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা উত্তম, তিনি উত্তমতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। তিনি সম্মানিত, সম্মাননাকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে

---

২২১. *সহিহ বুখারি* : ২৪৬৫, *সহিহ মুসলিম* : ২১২১, *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৮১৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ১০৯১৬।

২২২. *সহিহ মুসলিম* : ৫৫৩, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৫৮৯, *সুনানে ইবনে মাজাহ* :৩৬৮৩।

CamScanner

> ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ির আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, তোমরা ইহুদিদের মতো হয়ো না।(২২৩)

কত সুন্দর আর চমৎকার এই নববি শিক্ষা! যার মাধ্যমে তিনি আমাদের সকল ধরনের দূষণ থেকে আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুরক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। এটা যদি যথাযথভাবে মান্য করা হয়, অবশ্যই আমাদের পৃথিবীতে মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বস্তি ও শান্তি সুরক্ষিত হবে।

পরিবেশ ও তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা তাঁর অভিজাত রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাই। এ কারণে তিনি নিজেও সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। একবার এক সাহাবি এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতাজোড়াও সুন্দর হোক, এটা কি তার অহংকার বলে গণ্য হবে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»

> আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।(২২৪)

সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাআলার এই অপরূপ সৃষ্টি, নয়নাভিরাম প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা পোষণ মানুষের মনের সৌন্দর্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে আমরা দেখতে পাই, তিনি নিজে সুগন্ধি পছন্দ করতেন। অন্যদের তা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিতেন এবং মানুষের মাঝে এটিকে ছড়িয়ে দিতে এবং পরস্পর হাদিয়া প্রদান করতে উৎসাহিত করতেন। এর দ্বারা পরিবেশ সুন্দর ও সুরভিত হয় এবং দূষণ থেকে পরিবেশ মুক্ত হয়। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

২২৩. *সুনানে তিরমিজি* : ২৭৯৯, *মুসনাদে আবু ইয়ালা* : ৭৯০, *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪৪১৩।

২২৪. *সহিহ মুসলিম* : ৯১, *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৭৮৯, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৪৬৬।

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»

কাউকে সুগন্ধি ফুল দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, তা সহজেই বহন করা যায় এবং তা সুগন্ধিযুক্ত।[২২৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বেশি বেশি শস্য ফলাতে এবং বৃক্ষরোপণ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি (ফলবান) গাছ রোপণ করে, তবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে, সেটা তার জন্য সদকা, তা থেকে যা কিছু চুরি হবে, তাও তার জন্য সদকা। চতুষ্পদ প্রাণী যা খাবে, তাও তার জন্য সদকা, পাখি যা খাবে, সেটাও তার জন্য সদকা এবং যে কেউ তা থেকে কিছু নেবে সেটাও তার জন্য সদকা (অর্থাৎ এগুলোর মাধ্যমে সে সদকার সওয়াব পাবে)।[২২৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এই ভালো কাজ তার জন্য কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সদকা হিসেবে গণ্য হবে। এটা ইসলামের একটি অনন্য মহিমা, পরিবেশের জন্য উপকারী এ বৃক্ষরোপণের পর এ বৃক্ষ থেকে যতদিন উপকৃত হওয়া যাবে, ততদিন রোপণকারী সওয়াবপ্রাপ্ত হবে এমনকি বৃক্ষ যদি হাতবদল হয়ে অন্যের মালিকানায় চলে যায় অথবা বৃক্ষরোপণকারী বা শস্য ফলনকারী যদি মারাও যায়, তবুও সে এর থেকে সওয়াব পেতে থাকবে।

এমনইভাবে ইসলাম পতিত জমিকে চাষাবাদের উপযোগী করে ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই চাষাবাদ হতে পারে গাছ রোপণ করে, অথবা বীজ বপন করে কিংবা শুষ্ক জমিতে পানি সিঞ্চন করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত জমিকে ফসল চাষের উপযোগী করে তোলে, তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। সেই ফসল থেকে পশুপাখি যা খাবে, তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।[২২৭]

এখানে পানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে পানিই হলো প্রধান উপাদান। পানির পরিমিত ব্যবহার এবং তার পবিত্রতা রক্ষা করা এই দুটি বিষয় ছিল

---

[২২৫]. *সহিহ মুসলিম* : ২২৫৩, *সুনানে তিরমিজি* : ২৭৯১।

[২২৬]. *সহিহ মুসলিম* : ১৫৫২, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭৪০১।

[২২৭]. *সুনানে নাসায়ি* : ৫৬৫৭, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫২০৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৪৩১০।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমরা দেখি, তাঁর নিকট কখনো পর্যাপ্ত পানি থাকলেও, তিনি তার পরিমিত ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার হজরত সাদ রা.[২২৮] অজু করার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (হয়তো তিনি একটু বেশি পানি খরচ করছিলেন এ কারণে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'হে সাদ! এই অপচয় কেন?'

সাদ রা. বললেন, 'অজুতেও কি অপচয় আছে?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো।'[২২৯]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি দূষণ করতেও নিষেধ করেছেন। এ কারণে ইসলামে আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।[২৩০]

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত কিছু নীতিমালা উপস্থাপন করা হলো। এগুলো আমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমরা যদি পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সক্রিয়তার সাথে এই নীতিগুলো মান্য করি এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসি, তাহলে আল্লাহপ্রদত্ত এই সুন্দর পৃথিবীকে আমরা আরও স্বাস্থ্যকর, আরও পরিচ্ছন্ন এবং আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারব।

* * *

---

[২২৮]. তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বিন উহাইব যুহরি রা.। তিনি আশারায়ে মুবাশশারা বিল জান্নাত বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্যতম। তিনি তাদের সবার শেষে ইনতেকাল করেছেন। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ২/৪৩৩, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ৩/৭৩, জীবনী নং : ৩১৯৬।

[২২৯]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৪২৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ৭০৬৫।

[২৩০]. *সহিহ মুসলিম* : ২৮১, *সুনানে আবু দাউদ* : ৬৯, *সুনানে তিরমিজি* : ৬৮।

CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ

এই ছোট্ট পৃথিবীতে কত মানুষের সমাগম! কতরকম তাদের সম্মান ও মর্যাদার বাহার! এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় কারণ হলো, তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসুল। এ কারণে তাঁর পরিচয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾

আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন রাসুল ছাড়া অন্য কিছু নন! [সুরা আলে ইমরান : ১৪৪]

তিনি ছাড়া আরও অনেক রাসুল (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) মানুষকে তাঁর প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জগতে আগমন করেছেন। তাঁরা আনুগত্যশীল মানুষদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর অবাধ্য ব্যক্তিদের জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর এটাই ছিল সকল রাসুল ও নবীর দায়িত্ব-কর্তব্য। যেমনটা আমাদের প্রতিপালক কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন,

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

এ সকল রাসুল এমন, যাদেরকে (সওয়াবের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসুলগণের (আগমনের) পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাত বাকি না থাকে। আর আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।

[সুরা নিসা : ১৬৫]

কিন্তু তাঁর রিসালাত প্রমাণিত হবে কীভাবে? কারণ, খুব সহজেই যেকোনো মানুষ দাবি করে বসতে পারে যে, সে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসুল।[২৩১] এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেক রাসুলকে বিশেষ কিছু মুজিজা প্রদান করেছেন। এগুলোই প্রমাণ করে প্রকৃতই তাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল ও বার্তাবাহক। এ মুজিজাগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, জগতের সকল মানুষ মিলেও এ ধরনের মুজিজা বা অলৌকিক কিছু দেখাতে বা উপস্থিত করতে পারবে না। এ কারণে জগতের সকলেই এই মুজিজাগুলোর মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও অনন্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একজন রাসুল ছিলেন, এ কারণে তাঁর প্রতিপালক তাঁকেও এমন অনেক মুজিজা প্রদান করেছেন, যেগুলো তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা এখানে খুবই সংক্ষেপে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজার প্রধান ও শক্তিশালী কিছু দিক উপস্থাপন করতে চাই। তবে সেইসাথে এটাও বলে রাখি, আসলে এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল মুজিজা একত্র করা কিংবা উপস্থাপন করার ইচ্ছা আমরা রাখি না। কারণ, সকল মুজিজা একত্র করতে গেলে বড় বড় অনেকগুলো খণ্ডের প্রয়োজন পড়বে, একটি বিশাল বিশ্বকোষ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি, বিষয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী এ সকল মুজিজা কয়েক প্রকার। এগুলো আমরা নিচের কয়েকটি শিরোনামে উপস্থাপন করার ইচ্ছা রাখি।

---

২৩১. পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে। অনেকেই মিথ্যা দাবি করে বসেছে যে, সে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নবী বা বিশেষ বার্তাবাহক। কিংবা বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত, সাধারণ মানুষের মতো নয়। এটা সুদূর অতীতে যেমন ঘটেছে, ঘটেছে নিকট অতীতেও, এমনকি বর্তমানেও ঘটে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও নবীদের বিশেষ মুজিজার মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রমাণিত করেছেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এ কারণে তাঁর পরবর্তী নবুয়তের দাবিদার সকলেই মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতারক ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে।-অনুবাদক

CamScanner

নিচের পরিচ্ছেদগুলোয় আমরা তাঁর কিছু মুজিজা ও নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিরন্তন মুজিজা (কুরআনুল কারিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি ﷺ-এর কথামালা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা সমাধানে নববি পদ্ধতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীজি ﷺ-এর জীবনাচার তাঁর নবুয়তের প্রমাণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি ﷺ-এর আলোচনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীজি ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্যসমূহ

CS CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিরন্তন মুজিজা (কুরআনুল কারিম)

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সর্বশেষ রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। যেহেতু সকল যুগেই কিছু মানুষ তাদের নিকট প্রেরিত রাসুলদের অস্বীকার ও অমান্য করত, এ কারণে আল্লাহ তাআলা রাসুলদের এমন কিছু মুজিজা (অলৌকিক বিষয়) প্রদান করতেন, যেগুলো নবীদের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা যে বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, সেগুলোও প্রমাণিত হতো। এ মুজিজাগুলো তখন অবাধ্য ও অস্বীকারকারীদেরও ঈমান ও বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য করে তুলত। আর প্রত্যেক নবীকে মুজিজা প্রদান করা হতো তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত বিষয়াবলির সাথে সংগতি রেখে। এ কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও এমন এক মুজিজা প্রয়োজন ছিল, যেটা বিশ্ববাসীর নিকট আল্লাহর সর্বশেষ বার্তার সত্যতা প্রমাণ করে। ফলে সর্বশেষ নবীকে অনেক ধরনের মুজিজা প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে এগুলো সকল মানুষের বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রিসালাতের সত্যতার ওপর সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর সর্বশেষ নবী। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুয়ত পরিব্যাপ্ত। এ কারণে তাঁর মুজিজা পূর্ববর্তী নবীদের মুজিজাগুলোর মতো সাময়িক ছিল না, ছিল না শুধু তাঁর সমকালের জন্য নির্দিষ্ট। কারণ, সাময়িক মুজিজা এই সুদীর্ঘ কালের জন্য কোনো উপকারে আসবে না এবং এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বশেষ রিসালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সেটা উপযুক্তও হবে না। এ কারণে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য মুজিজাগুলোর সাথে দেওয়া হয়েছে একটি চিরন্তন মুজিজা, 'কুরআনুল কারিম'। এ কুরআনের মাধ্যমেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল আরবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অথচ সে কালে ভাষায়, সাহিত্যে ও অলংকারশাস্ত্রে আরবরা পৌঁছে গিয়েছিল উৎকর্ষের শীর্ষে। তবুও তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এই মুজিজা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

CamScanner

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তা আমাদের সময় পর্যন্ত আগের মতো এখনো বিদ্যমান এবং একইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

বস্তুত এ উপদেশবাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা। [সুরা হিজর : ৯]

আমরা এই অধ্যায়ে কুরআনুল কারিম থেকে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে দেখাব যে, এটি (কুরআনুল কারিম) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর একটি বাস্তব ও যুক্তিনির্ভর দলিল এবং তাঁর সত্যতার ওপর একটি অকাট্য প্রমাণ। যেমনটি আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾

হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়েছি, (যা পথকে) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে। [সুরা নিসা : ১৭৪]

CamScanner

আমরা কুরআনুল কারিমে বিদ্যমান মুজিজাগুলো নিচের কয়েকটি শিরোনামে উপস্থাপন করতে পারি।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভাষা ও বর্ণনার অলৌকিকতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আইনপ্রণয়নে অলৌকিকতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ইতিহাস বর্ণনায় অলৌকিকতা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ভবিষ্যৎ বর্ণনায় অলৌকিকতা

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা

CS CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভাষা ও বর্ণনার অলৌকিকতা

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কুরআনুল কারিমের বর্ণনা-ছন্দ সাহিত্যের অন্য সকল গদ্য ও পদ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবুও কুরআনুল কারিম নিজের মধ্যে একইসাথে গদ্য-পদ্যের দুটি বৈশিষ্ট্যই এমনভাবে ধারণ করে আছে যে, সকল শ্রোতাকেই তা মুগ্ধ ও বিমোহিত করে।[২৩২] কুরআনুল কারিমের অলৌকিক বর্ণনা-ছন্দের উজ্জ্বলতর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

প্রথম বৈশিষ্ট্য : কুরআনের বর্ণনাশৈলী

কুরআনের বর্ণনাশৈলীরও রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলী এমনই এক নতুনতর চমৎকার রীতিতে বিন্যস্ত, যা আরবি ভাষার প্রচলিত সকল রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, আরবি ভাষাভাষীদের সমুদয় প্রকাশভঙ্গি ও পদ্ধতি পদ্য ও গদ্যরীতির মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআনুল কারিমের বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। উদাহরণ হিসেবে আমরা আল্লাহ তাআলার এই বাণীগুলোর প্রতি লক্ষ করে দেখতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿حٰمٓ ○ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُوْنَ﴾

---

২৩২. কুরআনুল কারিমের বিস্ময়কর বিন্যাস ও মুজিজা সম্পর্কে অধিক অবগতির জন্য দেখুন–

- محمد السيد شيخون : الإعجاز في نظم القرآن الكريم
- المحمدي عبد العزيز الحناوي : دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن
- عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : إعجاز القرآن البياني

১. হা-মিম। ২. এ বাণী সেই সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। ৩. আরবি কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। ৪. যা অবতীর্ণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা শুনতে পায় না। ৫. (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তারা বলে, তুমি আমাদের যার দিকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর গিলাফে ঢাকা, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে এক অন্তরায়। সুতরাং তুমি আপন কাজ করতে থাকো আমরা আমাদের কাজ করছি। [সুরা হা-মিম সাজদা : ১-৫]

হজরত উতবা ইবনে রবিআ রা. ছিলেন সাহিত্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ আরবি ভাষার বিশিষ্ট এক পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআনুল কারিমের এই বিস্ময়কর বিন্যাস এবং নতুনতর চমৎকার বর্ণনাভঙ্গির এই আয়াতগুলো শুনলেন, মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়লেন। আয়াতগুলো যেন তাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে ফেলল। তিনি যেন হতভম্ব ও হতবাক হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তার এই হতবুদ্ধি ও হতভম্বতা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন,

«وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِن مُحَمَّدٍ قَوْلًا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَاللهِ مَا هُوَ بِالشِّعْرِ وَلَا بِالسِّحْرِ وَلَا بِالْكِهَانَةِ ... فَوَاللهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ»

আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদ থেকে এমন কথা শুনেছি, যা আমি আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা কোনো কবিতা নয়, কোনো জাদু নয়; নয় কোনো জ্যোতিষবাণী... আল্লাহর কসম! আমি তাঁর থেকে যে বাণী শুনেছি তা এক মহান বার্তা।[২৩৩]

কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, বিষয় যেমনই হোক, হোক তা শরিয়তের কোনো বিধানের বর্ণনা, কোনো ঘটনা, কোনো উপদেশ, প্রমাণ উপস্থাপন, ভীতি প্রদর্শন কিংবা পুরস্কারের কোনো

---

২৩৩. ইমাম বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* : (৫০৯) ২/৭৯, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/২৯৪, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/ ৫০৪, ৫০৫।

CamScanner

ঘোষণা, সকল অবস্থাতেই কুরআনুল কারিমে তার ভাষার সৌন্দর্য, অর্থের গভীরতা, কথামালার বর্ণনার সূক্ষ্ম বিন্যাস এবং বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন এবং অভিন্ন থেকেছে। এটি খুবই কঠিন ও জটিল এক বাস্তবতা। বরং সর্বযুগের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকটও এটা ছিল অসম্ভব। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কুরআনুল কারিমে সেটা সম্ভব হয়েছে।

কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলীর বিশেষত্ব হলো, তার অর্থগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যা সকল মানুষের জন্য সহজেই বোধগম্য, তাদের পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অনুধাবনশক্তি যেমনই হোক, সময় ও স্থানের যত দূরত্ব আর পার্থক্যই থাকুক, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যতটা উন্নত আর অনুন্নতই হোক, সকলেই সমানভাবে এর অর্থ অনুধাবনে সক্ষম।

উদাহরণ হিসেবে, আপনি কুরআনুল কারিমের এমন একটি আয়াত নিন; যার মর্ম অনুধাবনে জ্ঞান ও বুদ্ধি হবে বিভিন্ন স্তরের। এরপর আপনি সেই আয়াতটি সেই বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানুষদের নিকট পড়ে শোনান। দেখতে পাবেন, আয়াতটি সকলকেই তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুপাতে নিজের অর্থপ্রদানে সক্ষম। সকলেই তাদের জ্ঞান অনুপাতে আয়াত থেকে তার অর্থগ্রহণ করতে পারছে এবং সেটা সঠিকও। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا﴾

মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে নক্ষত্রমালা বানিয়েছেন এবং তাতে এক উজ্জ্বল প্রদীপ ও আলো বিস্তারকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।

[সুরা ফুরকান : ৬১]

এই আয়াতটি সূর্য ও চাঁদ উভয়টির অবস্থা বর্ণনা করছে। এখন একজন সাধারণ আরব এর দ্বারা বুঝবে সূর্য ও চাঁদ উভয়টিই পৃথিবীকে আলোকিত করার কাজে নিয়োজিত। আর আরবি সাহিত্যে পারদর্শী যেকোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবে আয়াতটি বোঝাচ্ছে, সূর্যের আলোটি উষ্ণতা ধারণ করে। এ কারণে সূর্যকে বলা হচ্ছে 'সিরাজ' তথা প্রদীপ। আর চাঁদের আলো হলো স্নিগ্ধ ও মনোরম, তাতে কোনো উষ্ণতা নেই। এ কারণে তাকে বলা হচ্ছে 'মুনির' তথা আলোদানকারী। আর যে ব্যক্তি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে অবগত, সে এই আয়াত দ্বারা আরও বুঝতে পারবে, একটি

CamScanner

প্রদীপের মতো সূর্যের আলোটি হলো নিজস্ব আর চাঁদের আলোটি নিছক তার প্রতিবিম্ব বা ধার করা...। নিজের জ্ঞান, শিক্ষার স্তর ও পরিধি অনুপাতে বুঝে নেওয়া সকলের অর্থই কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ।[২৩৪]

এমনইভাবে কুরআনুল কারিমের বাহ্যিক কিছু পুনরাবৃত্তিও তার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলোর মাধ্যমে কুরআনুল কারিম ধারণ করে কাঙ্ক্ষিত কিছু অলংকৃত অর্থ ও লক্ষ্য। এটি করা হয় বাড়তি কোনো ভয়াবহতা, সতর্কতা, ব্যাপকতা বোঝাতে এবং চোখের সামনে একটি সচিত্র আবহ ফুটিয়ে তুলতে। কুরআনুল কারিমে এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾

অবশ্যম্ভাবী সত্য! কী সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য? তোমার কি জানা আছে সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কী? [সুরা হাক্কাহ : ১-৩]

অন্য আয়াতে এসেছে এভাবে,

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾

অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে। তুমি কি জানো জাহান্নাম কী জিনিস? [সুরা মুদ্দাছছির : ২৬-২৭]

কুরআনুল কারিমে আরেক ধরনের কিছু পুনরাবৃত্তি রয়েছে। সেটা হলো, কোনো ঘটনার কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তির পেছনে বিশেষ কিছু অর্থ ও লক্ষ্য রয়েছে। যেমন কুরআনের কোনো এক স্থানে কোনো ঘটনার দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হলো। এভাবে আরও কিছু স্থানেও এমনটি করা হলো। অতঃপর একটি জায়গায় এসে সেটাকে এমনই বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করা হলো যে, তখন সবমিলিয়ে সেখানে একটি পূর্ণ ঘটনার রূপ পরিদৃষ্ট হলো...। আর এ ধরনের ঘটনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। এটি কুরআনুল কারিমে প্রায় ত্রিশ জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি জায়গায় এটি এমন একটি নতুন অর্থ প্রদান করেছে, যা সেই স্থানের জন্য ছিল খুবই সংগতিপূর্ণ এবং এমন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে, যা এর

---

২৩৪. দেখুন, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দিরাজ : *আন-নাবাউল আজিম* : ১৪৭, ১৪৮।

CamScanner

আগে অন্য কোনো স্থানে উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে এই পুনরাবৃত্তি যেন আমাদের এক নতুন ঘটনার মুখোমুখি করে, যা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। যেমন সুরা আলা-এর মধ্যে এসেছে। নাজিলের ধারাবাহিকতায় সুরাটি অষ্টম। এখানে মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

> নিশ্চয় এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানি) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে—ইবরাহিম ও মুসার গ্রন্থসমূহে। [সুরা আলা : ১৮-১৯]

এরপর মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিভিন্ন সুরায় অল্প অল্প করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সুরা আরাফ, শুআরা ও নামল। এরপর সুরা 'কাসাস'-এ এসে ঘটনার সূচনা করা হয়েছে একেবারে শুরু থেকে—ফিরাউন যখন মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে নির্যাতন করছে, সেই কঠিন সময়ে মুসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণ, তাকে বাক্সের মধ্যে রেখে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, ফিরাউনের পরিবার তাকে সমুদ্র থেকে তুলে নেওয়া। এরপর মুসা আলাইহিস সালামের নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ। এরপর ফিরাউন ও তার বাহিনীর উদ্ধত অহংকার প্রকাশের ফলস্বরূপ শাস্তির বর্ণনা দিয়ে ঘটনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এভাবে অন্য প্রায় ত্রিশটি স্থানে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায়, কুরআনুল কারিমের এ সকল পুনরাবৃত্তি নিছক কোনো পুনরাবৃত্তি নয়; বরং এগুলোর একটা নতুন লক্ষ্য থাকে, তাতে কিছু শেখানোর ও বোঝানোর উদ্দেশ্য থাকে।[২৩৫]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : শব্দের সৌন্দর্য

কুরআনুল কারিমের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য তার বিস্ময়কর বর্ণনা-ছন্দ উজ্জ্বল করে তোলে সেটি হলো, কুরআনের শব্দের সৌন্দর্য। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনন্যতা হলো শব্দের সৌন্দর্য, শ্রুতিমধুরতা, অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসংগতি এবং ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ প্রদান। অন্য সাধারণ কোনো শব্দ এত অর্থ ও বক্তব্য ধারণ করতে সক্ষম নয়।

---

২৩৫. সাইয়েদ কুতুব : *আত-তাসবিরুল ফান্নিয়্যু ফিল কুরআন* : ১৫৬-১৬২।

CamScanner

অবশ্য এটাও ঠিক যে, অনেক কবি, সাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পীর রচনারীতির শব্দের মাঝেও এ সকল বৈশিষ্ট্যের খানিকটা দেখা মেলে। কিন্তু একসঙ্গে এর সকল বৈশিষ্ট্য একত্র হওয়া এবং এমন বহুলপ্রচলিত হওয়া যে, এমন আর কখনো হবে না কিংবা একেবারে স্বতন্ত্র হওয়া—এটা শুধু কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়েছে। এখানে আপনার সামনে এ বিষয়ে কুরআনুল কারিমের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। এটা আমাদের কথার বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলবে। যেমন আল্লাহ তাআলা রাত ও প্রভাতের বর্ণনায় উল্লেখ করেন,

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ○ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾

এবং শপথ করছি রাতের! যখন তা গভীর হয়ে আসে। এবং ভোরের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে। [সুরা তাকবির : ১৭-১৮]

এই যে দুটি শব্দ ﴿عَسْعَسَ﴾ ও ﴿تَنَفَّسَ﴾ আপনি নিজেই অনুধাবন করতে পারবেন শব্দ দুটি কোনো অভিধানের সাহায্য ছাড়াই আপনার অন্তরের মধ্যে সজীব সপ্রাণ একটা অনন্যসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলছে। রাতের আগমন এবং পৃথিবীর এই বিস্তৃত বিশাল দিগন্তজুড়ে তার কৃষ্ণতা ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসার চিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে 'عَسْعَسَ'-এর চেয়ে সূক্ষ্ম ও উপযুক্ত কোনো শব্দের কল্পনাও কি আপনি করতে পারেন? পারেন না! আবার রাতের আঁধার-কালো বন্দিদশা থেকে ধীরে ধীরে প্রভাত উদ্ভাসিত হওয়ার চিত্রের বর্ণনায় 'تَنَفَّسَ'-এর চেয়ে অতি চমৎকার কোনো শব্দের কল্পনা কি আপনি করতে পারেন? পারেন না![২৩৬]

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : বাক্যের বিন্যাস

কুরআনুল কারিমের বিস্ময়কর বর্ণনারীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনের বাক্য এবং তার অসাধারণ বিন্যাস। এগুলোর স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কুরআনের শব্দ, হরকত এবং সাকিনের মাঝে পরিপূর্ণ মিল ও সংগতির ক্ষেত্রে। এ কারণে কুরআনুল কারিমে বাক্যের মাঝে শব্দ, অক্ষর ও

---

২৩৬. এই বিষয়ে অধিক অবগতির জন্য দেখুন : লেখক তাম্মাম হাসসান রচিত *আল-বায়ান ফি রাওয়ায়িয়িল কুরআন* : ২৮৯-৩২৮।

উচ্চারণে চমৎকার সুসংগতি দেখতে পাবেন। এই মনোরম গঠনের কারণে তার শ্রবণ, উচ্চারণ এবং কথা ও তিলাওয়াতেও তৃপ্তি আসে। এগুলোর সম্মিলিত উপাদানে এমন একটি সুন্দর ও শোভামণ্ডিত রচনারীতির সৃষ্টি হয়, যা তাকে দান করে চমৎকার এক অতুলনীয় অবয়ব। কুরআনের সেই বিন্যাস থেকে যদি একটি শব্দ কিংবা একটি বর্ণও কম করা হতো, অথবা যে আকৃতি রয়েছে তার থেকে যদি সামান্যতমও পরিবর্তন করা হতো, তাহলে কিছুতেই এই মনোরম রূপটি পূর্ণতা পেত না। যেমন আল্লাহ তাআলার এই কথাগুলোর দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾

সুতরাং আমি ভেঙে নামা পানি দ্বারা আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম। এবং ভূমিকে ফাটিয়ে প্রস্রবণে পরিণত করলাম আর এভাবে (উভয় প্রকারের) সমুদয় পানি মিলে গেল এক স্থিরীকৃত কাজের জন্য।

[সুরা কমার : ১১-১২]

প্রতিটি বাক্যে শব্দগুলোর মাঝে মিল ও সামঞ্জস্যের বিষয়টা চিন্তা করে দেখুন। খেয়াল করুন, বর্ণগুলোর মাঝেও কেমন চমৎকার মিল ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান! বাক্য ও শব্দের মাঝে এই অসাধারণ মিল ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে ইমাম বাকিল্লানি বলেন, এই শব্দগুলো কতই-না চমৎকার এবং ব্যবহারের সূক্ষ্মতায়, শ্রেষ্ঠত্বে ও উৎকর্ষে সবগুলোই সমান। মানুষের পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট বাক্যরীতির ব্যবহার সীমাহীন কষ্টকর বরং অসম্ভব।[২৩৭]

এ ছাড়া কুরআনুল কারিমের বাক্যবিন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, অতি সংক্ষিপ্ত কথায় বা বাক্যে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ ধারণ করা। যে কথাটি বোঝানোর জন্য একটি পূর্ণ লাইন কিংবা অনেকগুলো বাক্য প্রয়োজন, তেমনই একটি কথা কুরআনুল কারিম খুব সংক্ষেপেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। আর এই সংক্ষিপ্ততার মাঝেও কোনো বিচ্যুতি থাকে না অথবা থাকে না প্রমাণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতা।[২৩৮]

---

[২৩৭]. ইমাম বাকিল্লানি : *ইজাজুল কুরআন* : ৪২।

[২৩৮]. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দিরাজ : *আন-নাবাউল আজিম* : ১৫৩, তাম্মাম হাসসান : *আল-বায়ান ফি রাওয়ায়িয়িল কুরআন* : ৩৯৫-৪২১।

CamScanner

যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি দেখুন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন। [সুরা বাকারা : ১৭৯]

সামাজিক জীবনযাপনে কিসাসের মূল্য বোঝাতে 'হায়াত বা জীবন' শব্দ ছাড়া আর কোনো সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অভিব্যক্তিবাচক শব্দ হতে পারে না। কারণ, কিসাসের কারণে প্রথমত হত্যা-ইচ্ছুক ব্যক্তির হত্যা থেকে অন্যের জীবন রক্ষা পায়। কারণ, যে ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে যে, সে যদি হত্যা করে তাহলে পরিণামে কিসাসের মাধ্যমে তাকেও হত্যা করা হবে, তাহলে সে অবশ্যই হত্যার সময় থমকে যাবে। হত্যা করা থেকে বিরত হবে। এরপরও যদি সে বাস্তবে হত্যা করেও ফেলে, তখন কিসাসের মাধ্যমে হত্যাকারীর শাস্তিতে নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের অন্তর থেকে ব্যথা ও ক্ষোভের নিরাময় হবে। এ ছাড়া কিসাসের মাঝে পাওয়া যায় জীবনের ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ। অর্থাৎ কেউ যদি একজন ব্যক্তির জীবন (প্রাণ) হত্যা করে, সে যেন সকল জীবিত মানুষকে হত্যা করল। এখানে নিহত ব্যক্তির সাথে জীবনের মূল্যটিও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কিসাস যখন কোনো ঘাতকের হাত থেকে একটি জীবনকেও রক্ষা করে, তখন তা যেন সকল জীবনকেই বাঁচিয়ে দিলো।[২৩১]

এ ছাড়া কুরআনুল কারিমের বাক্যের অর্থগুলো খুবই সজীব স্পন্দন সৃষ্টিকারী এবং জলজ্যান্ত চিত্রের মতো উজ্জ্বল। তার প্রতিটি অর্থে যেন রুহ সঞ্চারিত হয়, সপ্রাণ বস্তুর মতো আন্দোলিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾

তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো, তারপর যখন সেই আগুন তার আশপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

[সুরা বাকারা : ১৭]

---

২৩১. সাইয়েদ কুতুব : ফি জিলালিল কুরআন : ১/১৩৭

CamScanner

এখানে কুরআনুল কারিম সত্য ও মিথ্যার মাঝে দ্বিধান্বিত মুনাফিকের অবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়েছে এমন অন্ধের সাথে, যে দেখতে পায় না। আয়াতটি মুনাফিকের দৃষ্টান্ত এমনই সচিত্র সজীবতার সাথে তুলে ধরে যে আপনার মনে হবে, দৃশ্যটি আপনার চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভাসমান, যেন আপনার চোখের সামনেই দৃশ্যটি সংঘটিত হচ্ছে, আর আপনি তাকিয়ে তাকিয়ে তা প্রত্যক্ষ করছেন।(২৪০)

এ ছাড়া লক্ষ করলে দেখা যায়, কুরআনুল কারিম একইসঙ্গে সাধারণ এবং বিশেষ সকল স্তরের ব্যক্তিকেই সমানভাবে সম্বোধন করতে সক্ষম। এ কারণে সকল ব্যক্তিই সাধারণভাবে কুরআন পড়তে, বুঝতে এবং অনুভব করতে সক্ষম। এর জন্য বড় ধরনের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা পোহাতে হয় না। অবশ্য একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, সাধারণ এবং বিশেষ উভয় শ্রেণিকে একইসঙ্গে সম্বোধন করে কথা বলা মানুষের জন্য অসম্ভব এক বিষয়, তাহলে কুরআনুল কারিম কীভাবে এ দুটির মাঝে সমন্বয় করতে সক্ষম হলো?

ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দিরাজ তার চমৎকার গ্রন্থ النبأ العظيم-এ বলেছেন, আপনি যদি শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সামনে এমন স্পষ্ট খোলাখুলি কথা বলেন, যেভাবে কথা বলেন সাধারণ মূর্খ ব্যক্তিদের সাথে, তাহলে আপনি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাধারণ মূর্খদের স্তরে নামিয়ে আনলেন, এ কারণে এ ধরনের সম্বোধন ও কথায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারবে না। আবার আপনি যদি সাধারণ মূর্খদের জন্য কথা বলেন খুবই সংক্ষেপে, বিভিন্ন ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে, যেভাবে বলে থাকেন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে, তাহলেও আপনি সাধারণ মূর্খ ব্যক্তিদের নিকট এমন কিছু উপস্থাপন করলেন, যা তারা বুঝতে ও আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এখানেও আপনার কোনো উপকার সাধিত হবে না। সুতরাং আপনি যদি এই উভয় শ্রেণিকেই আপনার কথায় উপকৃত করতে চান, তাহলে উভয়কেই এমন একটি ভাষায় সম্বোধন করতে হবে এবং কথা বলতে হবে, যেভাবে কোনো শ্রেণিকে সম্বোধন করেন না কিংবা কথা বলেন না। কেননা আপনি শিশু-বাচ্চাদের সাথে যে ভাষায় কথা বলেন, বয়স্কদের সাথে কিন্তু সেভাবে কথা বলেন না। সুতরাং একইসঙ্গে কোনো

---

২৪০. মুহাম্মাদ আবু যাহরা : *আল-মুজিজাতুল কুবরা আল-কুরআন* : ২৭২।

বক্তব্য উপস্থাপন করা পণ্ডিত ও মূর্খদের নিকট, মেধাবী ও বোকাদের নিকট এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট এবং সেই বক্তব্য সকলেই বুঝে নেবে তাদের মেধা-বুদ্ধি অনুপাতে, তাদের আবশ্যক অনুধাবন অনুযায়ী—এই অসাধ্য ও অনন্য বিষয়টি কুরআনুল কারিমে ছাড়া অন্য কোথাও পাবেন না। কুরআনই হলো এমন এক গ্রন্থ যেখানে পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তিরা অতি সূক্ষ্ম উপযুক্ত অভিব্যক্তির বর্ণনা ও বাণী দেখতে পান। আবার সাধারণ ব্যক্তিরাও নিজেদের মনন ও বুদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ কথা ও বক্তব্য খুঁজে পান। এটি তাদের বুঝশক্তি বা মস্তিষ্কের ওপর চাপ প্রয়োগ করে না। বোঝার জন্য তাদের কোনো ব্যাখ্যাকারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কুরআনুল কারিমের অর্থ সাধারণ এবং বিশেষ উভয় শ্রেণির জন্যই সমানভাবে উপযুক্ত ও উপকারী। যে ব্যক্তি এটা শিখতে চায় তার জন্যই এটি অতি সহজ। তাই বলা যায়, কত সত্যই-না বলেছেন আমাদের প্রতিপালক, তিনি যখন বলেন,

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

[সুরা কমার, ১৭][২৪১]

এ ছাড়া, কুরআনুল কারিমের বর্ণনার অলৌকিকতা পরিদৃষ্ট হয় তার শব্দের অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর ব্যবহারেও। সুতরাং কুরআনের বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দ যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যাদের মাঝে এই কুরআন নাজিল হয়েছে, সেই আরব সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ এ বিষয়গুলো কত চমৎকারভাবেই-না অনুধাবন ও উপলব্ধি করেছিলেন! তাদের অব্যাহত অনুসন্ধান ও গবেষণা এখনো কুরআনুল কারিমের এই অসাধারণ শব্দ চয়ন ও চমৎকার ব্যবহারের সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। তারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, কুরআনুল কারিম তার একটি শব্দ যেখানে যে-অর্থ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছে, সেখানে অভিধানে প্রণীত অন্য একটি কিংবা একাধিক শব্দ মিলেও সেই গভীরতর অর্থ দিতে সক্ষম হতো না।

---

[২৪১]. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দিরাজ : *আন-নাবাউল আজিম* : ১৪২, ১৪৩।

CamScanner

উদাহরণ হিসেবে আমরা 'زوج' (যাওজুন) ও 'امرأة' (ইমরাআতুন) শব্দ দুটির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। কুরআনুল কারিম যখন হজরত আদম আলাইহিস সালামের 'স্ত্রী' সম্পর্কে আলোচনা এনেছে, তখন ব্যবহার করেছে 'زوج' শব্দটি, (যেমন সুরা বাকারা : ৩৫, সুরা আরাফ : ১৯, সুরা তাহা : ১১৭)[২৪২] অথচ অনেক জায়গায় 'স্ত্রী' অর্থেই ব্যবহার করেছে 'إمرأة' শব্দটি। যেমন,

امرأة العزيز، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون

এখন আমাদের মনে হতে পারে, দুটি শব্দের অর্থ তো একই। তাই খুব সহজেই একটিকে অন্যটির স্থানে ব্যবহার করা যেত। দুটি শব্দই কুরআনে স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে আমরা زوج آدم -এর স্থানে امرأة آدم বলতে পারি। আবার امرأة العزيز-এর স্থানে বলতে পারি زوج العزيز। কিন্তু আমাদের এমন ব্যবহারে অর্থের সেই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে না, যেদিকে ইঙ্গিত করেছে কুরআনুল কারিম। তাহলে আর মানবজাতির প্রথম স্বামী হজরত আদম ও প্রথম স্ত্রী হজরত হাওয়া আলাইহিস সালামের মাঝে দাম্পত্য সম্পর্কের মৌলিক সেই সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অর্থ প্রদান করত না। কারণ, হজরত আদম আলাইহিস সালামের 'স্ত্রী' অন্য স্ত্রীদের মতো নন। বরং তিনি ছিলেন একক ও একা—জগতের মধ্যে একমাত্র স্ত্রী। তার সৃষ্টি এবং দাম্পত্যজীবন প্রদান করা হয়েছিল, যেন আদম আলাইহিস সালামের নিঃসঙ্গতা দূর হয় এবং স্ত্রী-আসঙ্গের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করেন।

---

২৪২. আয়াতগুলো যথাক্রমে :

﴿وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাকো...। [সুরা বাকারা : ৩৫]

﴿وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

এবং হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো...। [সুরা আরাফ : ১৯]

﴿فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾

সুতরাং আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু...। [সুরা ত্ব-হা : ১১৭]

CamScanner

এখন আমরা কুরআনুল কারিমের এই শব্দ দুটি ব্যবহারের ভিন্নতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে এর অতি সূক্ষ্ম অর্থ ও উদ্দেশ্যের সন্ধান পাব, সেটা হলো এই :

কুরআনের যেখানে 'زوج' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে মূলত 'স্বামী-স্ত্রীর মাঝের দাম্পত্যস্বভাব ও প্রকৃতি (হিকমত হিসেবে, নিদর্শন হিসেবে অথবা শরিয়ত ও হুকুম হিসেবে) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। সেখানে দাম্পত্যগুণ সফল হবে এবং উভয়ের মাঝে মিল-মুহাব্বত বিদ্যমান থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকদের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে। [সুরা রুম : ২১]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

এবং যারা (এই) বলে (দোয়া করে যে), হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করো নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানাও।

[সুরা ফুরকান : ৭৪]

এবং আখিরাতের জীবনের 'زوج'-এর অবস্থা সম্পর্কেও একই কথা (অর্থাৎ যেখানে মিল-মুহাব্বত বিদ্যমান, সেখানে 'زوج' শব্দ ব্যবহার হয়েছে)। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

CamScanner

তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রী আর তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। [সুরা বাকারা : ২৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

বলো, আমি কি তোমাদের এসব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিসের সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং (তাদের জন্য আছে) পবিত্র স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন। [সুরা আলে ইমরান : ১৫]

কুরআনুল কারিমে এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে (যেখানে স্ত্রী অর্থে 'زوج' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)।

সুতরাং স্ত্রীর মধ্যে যখন দাম্পত্যগুণ থাকবে না, স্ত্রীর থেকে যখন শান্তি, স্বস্তি, মুহাব্বত ও সম্প্রীতি দূর হয়ে যাবে—তার কোনো খিয়ানতের কারণে কিংবা বিশ্বাসের মধ্যে ভিন্নতা আসার কারণে, তখন আর সেই স্ত্রীকে 'زوج' বলা হবে না, বলা হবে 'امرأة'। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

আজিজের স্ত্রী বলল, এবার সত্য কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী। [সুরা ইউসুফ : ৫১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

CamScanner

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

ফিরাউনের স্ত্রী (ফিরাউনকে) বলল, এ শিশু আমার ও তোমার পক্ষে নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। আর (এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে) তারা পরিণাম বুঝতে পারছিল না।

[সুরা কাসাস : ৯]

আর হজরত নুহ এবং লুত আলাইহিমাস সালামের স্ত্রী দুজনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের জন্য নুহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা আমার অত্যন্ত নেককার দুজন বান্দার বিবাহাধীন ছিল। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা তাদের কোনো কাজে এলো না এবং তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী দুজনকে) বলা হলো, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। [সুরা তাহরিম : ১০]

আর নিচের আয়াতটিতেও امرأة فرعون ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখন তাদের মাঝে দাম্পত্যের সাধারণ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে- ফিরাউনের কুফরি আর তার স্ত্রীর ঈমানের কারণে। আন্তরিকতাহীন দুজন এখন দুপ্রান্তে অবস্থান করছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

CS CamScanner

আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য পেশ করছেন ফিরাউন-স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং আমাকে ফিরাউন ও তার কর্ম হতে মুক্তি দিন। আর আমাকে নাজাত দিন জালেম সম্প্রদায় হতে। [সুরা তাহরিম : ১১]

এখানে আমাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত, মানুষ এবং সকল জীব তথা প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে দাম্পত্যসম্পর্কের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সন্তানপ্রজননের মাধ্যমে জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। আর এ বিষয়ের সাথে সংগতি রেখেই নারী-পুরুষের প্রতি ইঙ্গিতকারী زوج , زوجين ও أزواج শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

হে লোক সকল, নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার অসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের অধিকার) চেয়ে থাকো। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)-কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি জিনিস জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন—ভূমি যা উৎপন্ন করে তাকেও এবং তাদের নিজেদেরকেও আর তারা (এখনো) যা জানে না তাকেও। [সুরা ইয়াসিন : ৩৬]

CamScanner

এ ছাড়া কুরআনুল কারিমে এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে (যেখানে স্ত্রী অর্থে 'امرأة' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)।

এ কারণে মানুষের মাঝে যখন বন্ধ্যাত্ব বা বৈধব্যের কারণে দাম্পত্যসম্পর্কের মৌলিক উদ্দেশ্য অনুপস্থিত থাকে, তখনও স্ত্রীকে 'امرأة' বলা হবে 'زوج' নয়। যেমন নিচের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইমরান আলাইহিস সালামের স্ত্রীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾

আর ইবরাহিমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। সে হেসে দিলো। আমি তাকে (পুনরায়) ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম। [সুরা হুদ : ৭১]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(সুতরাং দোয়া শ্রবণ-সংক্রান্ত সেই ঘটনা স্মরণ করো) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি (সকল-কিছু) শোনো ও (সকল বিষয়) জানো।

[সুরা আলে ইমরান : ৩৫]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾

তখন তার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলতে সামনে এলো এবং সে তার গাল চাপড়ে বলতে লাগল, এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা (বাচ্চা জন্ম দেবে)?

[সুরা জারিয়াত : ২৯]

CamScanner

যেমন হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নিকট সন্তান প্রার্থনা করেছেন এভাবে,

﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾

> আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তরাধিকারী দান করুন...। [সুরা মারয়াম : ৫]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾

> জাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কীভাবে পুত্রসন্তান জন্ম নেবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার দেহ শুকিয়ে গেছে। সুরা মারয়াম, ৮

এরপর আল্লাহ তাআলা যখন হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক তার মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত হয়ে উঠল, তখন (আবার 'امرأة'-এর পরিবর্তে সেখানে زوج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) সেই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾

> সুতরাং আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়ার মতো পুত্র দান করলাম। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) উপযুক্ত করে দিলাম। [সুরা আম্বিয়া : ৯০]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি দাম্পত্যসম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে) তাহলে শরিয়তের হুকুমগুলো زوج ও أزواج শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়। যেমন উত্তরাধিকারের হুকুম, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' পালনের হুকুম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

CamScanner

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোশ গ্রহণপূর্বক) উপকার ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা হবে না। হ্যাঁ, তবে নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমতো যা করবে, তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সূরা বাকারা : ২৪০।

কিন্তু যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন পরিবারের বিধান সম্পৃক্ত হবে 'نِسَاء' (নিসা) শব্দের সাথে; 'زَوْج' (অবস্থাভেদ)-এর সাথে নয়। অর্থাৎ সেখানে আর زَوْج ও زَوْجَة শব্দ ব্যবহৃত হবে না; 'نِسَاء' শব্দ ব্যবহৃত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, তোমরা স্ত্রীদের এমন সময়ে তালাক দেবে যে, তখনও পর্যন্ত তোমরা তাদের স্পর্শ করোনি এবং তাদের মোহরও ধার্য করোনি। (এরূপ অবস্থায়) তোমরা তাদের (কিছু) উপহার দিয়ো, সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী; উত্তম পন্থায় এ উপঢৌকন দিয়ো। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতি এক অত্যাবশ্যকীয় করণীয়। সূরা বাকারা : ২৩৬।

আর নিচে সুরা বাকারার আয়াতে 'زوج' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও দাম্পত্যসম্পর্কের মৌলিকতা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আসঙ্গ বা মিলন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

অতঃপর সে (স্বামী) যদি (তৃতীয়) তালাক দিয়ে দেয় তবে সে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামীকে বিবাহ করবে। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ নেই যে, তারা (নতুন বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে। শর্ত হলো, তাদের প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, (এবার) তারা আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। [সুরা বাকারা : ২৩০]

সুতরাং এখানে 'زوج' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারী এবং হালালকারী স্বামীর মাঝে প্রকৃত অর্থেই দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে। অর্থাৎ মিলন হতে হবে। নতুবা হালালকারী দ্বিতীয় স্বামীর সাথে নিছক বাহ্যিক বিবাহ-চুক্তি তাকে তার প্রথম তালাকদানকারী স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়াকে হালাল করবে না।

আর জিহারের[২৪৩] যে আয়াতের মধ্যে এক মুসলিম মহিলা তার স্বামীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে ও অভিযোগ করছে, যে স্বামী তার সাথে জিহার করেছে। (অর্থাৎ অসন্তুষ্ট স্ত্রী নিজের স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করছে) এবং এখনো তাদের মাঝে দাম্পত্যসম্পর্ক বিদ্যমান। কুরআনুল কারিমে এর হুকুম সম্পর্কে এসেছে,

---

[২৪৩]. জিহার (ظهار) হলো, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মা বা অন্য কোনো মাহরাম তথা বিবাহ হারাম এমন মহিলার সাথে সাদৃশ্য প্রদান।-সম্পাদক

CamScanner

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾

আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে...।

[সুরা মুজাদালা : ৩]

অর্থাৎ জিহার করার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যসম্পর্কের মাঝে অকার্যকরতা চলে এসেছে। তাই এখানে 'أزواج' ব্যবহার না করে 'نِساء' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[২৪৪]

কুরআনুল কারিমের অলৌকিক বর্ণনার আরেকটি দিক হলো, কুরআনের ঘটনা বর্ণনা। কুরআনুল কারিমে অনেকপ্রকার ঘটনার বর্ণনা এসেছে। কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়। যে-সকল মানুষ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা এবং চমৎকার বিবরণের প্রতি আগ্রহী, বিচিত্র এ সকল ঘটনা তাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়।

এ ক্ষেত্রে আমরা কুরআনুল কারিম থেকে এমন একটি উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি, যা সকল লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের নির্ধারিত সাহিত্যমান থেকেও বহুগুণ উন্নত ও উচ্চাঙ্গের। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর খলিল ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভাষায় বলেন,

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এমন পুত্র দান করুন, যে হবে সৎলোকদের একজন। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে পুত্র যখন ইবরাহিমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হলো—তখন সে বলল, বাছা, আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। এবার চিন্তা করে বলো,

---

২৪৪. আয়েশা আবদুর রহমান : *আল-ইজাজুল বায়ানিয়্যু লিল-কুরআন* : ২১২-১১৪।

> তোমার অভিমত কী। পুত্র বলল, আব্বাজি, আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিলো। আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এবং আমি এক মহান কুরবানির বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম। [সুরা সাফফাত : ১০০-১০৭]

এভাবে মাত্র বাটটির মতো শব্দের মাধ্যমে এত বিস্ময়কর ও চমৎকার একটি ঘটনার বিবরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সময়ের বিচারেও খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি বর্ণিত হয়েছে, একজন পিতা, যিনি তার পুত্রকে জবাই করার ইচ্ছা করেছেন এবং তাকে ছুরি হাতে জবাই করার জন্য কাত করে শুইয়ে দিয়েছেন, তখন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশনা এলো, হয়েছে, তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। এভাবে তিনি তার পুত্রকে জবাই করা থেকে রক্ষা করলেন।

আর বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঘটনার সারমর্ম এই যে, পিতা তার পুত্রকে বলছেন, তার নিকট নির্দেশ এসেছে তাকে জবাই করার। আর পুত্রও ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে বলে উঠলেন, আব্বাজি! আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনি সেটাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। এতএব, বিষয়বস্তু থেকে ঘটনাটি এক চুলও দূরে সরে যায়নি।

আর ব্যক্তির সংখ্যার দিক দিয়ে এখানে মাত্র দুজন ব্যক্তি রয়েছে, তৃতীয় কেউ নেই। শুরু, মধ্যখান এবং শেষ—পুরোটা সময় ঘটনার ভয়াবহতা শুধু এই দুজনের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয়েছে।[২৪৫]

অন্যদিকে কুরআনুল কারিমে কিছু দীর্ঘ ও বিস্তারিত ঘটনাও এসেছে। সেখানেও চমৎকার বর্ণনাগত ইঙ্গিত ও অর্থ রয়েছে। যেমন সুরা ইউসুফ।

---

২৪৫ উমর সুলায়মান উমর : উসলুবুল কুরআনিল কারিম বাইনাল হিদায়াতি ওয়াল ইজাজিল বায়ানি : ৩১০, ৩১১

এটি একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ। এখানে সন্নিবেশিত হয়েছেন অনেক ব্যক্তি, স্থান, সময়, ঘটনা, বর্ণনা, চিত্র, সমস্যা এবং সমাধান। এই ঘটনায় রয়েছে শ্রোতাকে আগ্রহী করে তোলার অলৌকিক ক্ষমতা। শ্রোতাকে ধরে রাখার অসাধারণ আকর্ষণ। এ কারণে বারবার শোনার পরও এটি শ্রোতাকে ক্লান্ত অথবা বিরক্ত করে তোলে না। কারণ, কুরআনুল কারিমে ঘটনা বর্ণনার অনেক উদ্দেশ্য ও হিকমত থাকে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা শুধু এই কথাটি বোঝার জন্য যে, কুরআনুল কারিম হলো আল্লাহ তাআলার অলৌকিক এক বাণী। এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বর্ণ নিজের স্থানে স্থাপিত হয়েছে একটি বিশেষ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সামনে রেখে। জগতের কারও পক্ষে এমন একটি আয়াত রচনা কিংবা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এমনকি সকল জিন-ইনসান একত্র হলেও সম্ভব নয়।

এই হলো কুরআনুল কারিমে বিদ্যমান ভাষা ও সাহিত্যের অলৌকিকতার কিঞ্চিৎ বর্ণনা। আজকের আধুনিক যুগের অনেক খ্রিষ্টানও কুরআনুল কারিমের এই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছেন এবং এ বিষয়ে তারা তাদের সত্যসংবলিত বিভিন্ন সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ড. জোসেফ চার্লস মারড্রাস (Joseph Charles Mardrus)[২৪৬]-এর কথাই ধরুন। তিনি দীর্ঘদিন দেশের পররাষ্ট্র ও ফরাসি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তিনি কুরআনুল কারিমের মহত্ত্ব অনুভব করতে পেরে সাতাশটি সুরা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তিনি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তার অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, অবশ্যই কুরআনুল কারিমের বর্ণনারীতি *স্রষ্টার* বর্ণনারীতি। কারণ, যে বর্ণনারীতি নিজের অস্তিত্ব দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে, সেটা স্রষ্টার রচনা না হয়ে যায় না। সত্য ও বাস্তবতা হলো, বহু সন্দেহবাদী ও সংশয়ী লেখকও কুরআনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের সামনে মাথা নত না করে পারেননি।[২৪৭]

---

২৪৬. জোসেফ চার্লস মারড্রাস (Joseph Charles Mardrus 1868-1949) : তিনি একজন ফরাসি ডাক্তার ও প্রাচ্যবিদ। জন্মগ্রহণ করেছেন কায়রোতে। এরপর প্যারিসে গিয়ে সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন এবং ফরাসি ভাষায় কুরআনুল কারিম অনুবাদের কাজ করেন। এ ছাড়া বিখ্যাত আরব্যোপন্যাস *আলফু লাইলাতিন ওয়া লাইলা*-ও অনুবাদ করেন। দেখুন, নাজিব আকিকি লিখিত *আল-মুসতাশরিকুন* : ১/ ২৪১।

২৪৭. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা *আল-মানার* (আরবি সাময়িকী : সংখ্যা : ৩৩, পৃষ্ঠা : ২৮২)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আইনপ্রণয়নে অলৌকিকতা

কুরআনুল কারিম নিজের মধ্যে আরও একপ্রকার অলৌকিকত্ব ধারণ করে। আরবি না জানলেও সকল সচেতন ব্যক্তিই কুরআনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করে। কারণ, এটি কুরআনুল কারিমের ভিত্তিগত বিধান ও আলোচ্য বিষয় হওয়ায় সকলের জন্য তা উপলব্ধি করা সহজ হয়। আর সেটা হলো, কুরআনের সমাজ সংস্কার ও আইন প্রণয়নের বিধানাবলির অলৌকিকতা। এর মাঝেই রয়েছে মানুষের জন্য মহান ও উন্নত শিক্ষা। এর মাঝেই রয়েছে মানুষের সবচেয়ে সঠিক পথ প্রদর্শনের নির্ভুল ব্যবস্থাপনা। ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, পারিবারিক দায়িত্বপালন, সমাজ পরিচালনা, রাষ্ট্র গঠন, মজবুত ভিত্তির ওপর আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি সকল বিধান বিবৃত হয়েছে এই কুরআনের মাঝে।[২৪৮]

আমরা জানি, ইসলামি সংবিধানের প্রধান ও প্রথম উৎস হলো কুরআনুল কারিম। কুরআনুল কারিমের ভাষা, বক্তব্য ও কথা সবই অকাট্য ও অখণ্ডনীয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এটি আমাদের নিকট অকাট্য, অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুসলমানরা লিখে এবং হিফজ তথা মুখস্থ করে পরবর্তীদের নিকট এটা পৌঁছে দিয়েছেন। এই সাড়ে চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কোথাও সেই লিখিত বিষয় এবং মুখস্থ রূপের মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও সাধিত হয়নি।

কুরআনুল কারিম ইসলামের জন্য একটি সর্বজনীন অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে আর সেটা হলো, মানুষের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। কুরআনের এই বিধান আত্মা ও শরীর উভয়ের অধিকার রক্ষা করে। দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের পথ দেখায়। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেন,

---

২৪৮. ইউসুফ কারজাবি : *মাদখালুন লি দিরাসাতিশ শারিআতিল ইসলামিয়া* : ৩৬

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসুল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী। [সুরা বাকারা : ১৪৩]

এ কারণে কুরআনুল কারিমের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিশুদ্ধ ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত, সৎকর্ম, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন ও ভালো কার্যাবলি দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া এবং আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করা। কুরআনের এই বিধান নিছক কোনো আশ্বাস ও ভরসা প্রদানের কথা বলে না এবং কোনো সুপারিশ বা অস্বাভাবিক কাজকর্মের দিকেও আহ্বান করে না। বরং কুরআন মুমিনদের ঈমান ও আমলের মাঝে সমন্বয় করার আহ্বান করে, ঈমানের পাশাপাশি তার বিধানও মেনে চলার কথা বলে।

কুরআনুল কারিমের এই বিধান খুব সহজ ও স্পষ্ট, এর মধ্যে নেই কোনো কাঠিন্য বা কঠোরতা, বাধ্য করা কিংবা কষ্টে ফেলা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

[সুরা বাকারা : ২৮৬]

এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾

আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট চাপাতে চান না।

[সুরা মায়িদা : ৬]

কুরআনুল কারিমের বক্তব্যের এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা হয়, যদি আবশ্যক কাজটি আদায় করা কোনো ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে সেই কাজের পরিবর্তে সে অন্য কাজ করবে কিংবা সেটা তার জন্য রহিত হয়ে যাবে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি দু ধরনের : ১. যার সুস্থতার আশা আছে ২.

CamScanner

যার সুস্থতার আশা নেই। প্রথম ব্যক্তি মুসাফিরের মতো রোজা ভঙ্গ করে অন্য সময় তা আদায় করবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা আবশ্যক হবে না। বরং সে মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে তার প্রতিদিনের রোজার ফিদয়া আদায় করে দেবে, যদি আর্থিকভাবে সক্ষম হয়।

ইসলাম সব সময় তার অনুসারীকে ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি কিংবা নিজেকে অনর্থক কষ্টের মধ্যে ফেলতে বারণ করে। বরং কোনো ধরনের অপচয় ও অহংকার ব্যতীত ভালো খাওয়াদাওয়া করা, ভালো জিনিস ব্যবহার করা, সাজসজ্জা করাকে বৈধতা প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يٰبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

হে আদমের সন্তানসন্ততিগণ! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং খাও ও পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলো, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনইভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ?

বলো, এগুলো পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য (এবং) কিয়ামতের দিনে বিশেষভাবে (তাদেরই)। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজসমূহ, প্রকাশ্য হোক বা গোপন এবং সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে (কারও প্রতি) সীমালঙ্ঘন, আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনো

> প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, এমন জিনিসকে আল্লাহর শরিক সাব্যস্তকরণ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলাকে, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। [সুরা আরাফ : ৩১-৩৩]

আল্লাহ তাআলা বাড়াবাড়ি না-করা সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾

> (এবং তাদেরকে এটাও) বলে দাও যে, হে কিতাবিগণ! নিজেদের দ্বীন নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। [সুরা মায়িদা : ৭৭]

সুতরাং কুরআনে নিষেধ করা হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে, ভালো জিনিস বর্জন করা থেকে এবং বৈরাগ্য গ্রহণ করা থেকে।

এভাবেই কুরআনুল কারিম তার বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের প্রতি লক্ষ রেখেছে। তাদের মনোবলের উচ্চতা ও নিচুতা সম্পর্কে খেয়াল রেখেছে। কুরআনুল কারিমের স্বাভাবিক বিচারে সকলেই সাধারণ—মধ্যম মানের। আর ব্যতিক্রমভাবে কিছু মানুষ রয়েছে ভিন্ন—উচ্চমানের। তবে তাদের মাঝেও মেধা-জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য রয়েছে। এ কারণে প্রতিটি ব্যক্তি সেভাবেই কোনো বিষয়কে গ্রহণ করে, তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাকে যতটুকু অনুধাবন করায়। সুরা বাকারার মধ্যে মদ ও জুয়া হারাম হওয়া নিয়ে যখন অস্পষ্টভাবে প্রথম আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের তাদের নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে সুরা মায়িদার মধ্যে অকাট্যভাবে এগুলো হারাম করা হয়। জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে রয়েছে এমনই তারতম্য। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ﴾

> আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান। [সুরা আনকাবুত : ৪৩]

সুতরাং দ্বীনের সকল সাধারণ আবশ্যক কর্ম এবং দ্বীনের সকল নিষিদ্ধ বিষয় অকাট্য দলিল দিয়েই সাব্যস্ত ও প্রমাণিত, যাতে সকলেই খুব সহজে সেগুলো বুঝতে পারে।

এ ছাড়া কুরআনুল কারিম মানুষের সাথে আচারব্যবহারের মূলনীতি স্থির করেছে মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। অন্যদিকে মানুষের অভ্যন্তরীণ

CamScanner

বিষয়াবলি অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার নিকট। এ কারণে কোনো শাসক, কোনো সাংবিধানিক নেতা বা খলিফার জন্য অধিকার নেই মানুষের অন্তরের এবং গোপন কোনো বিষয়ের হিসাব নেওয়ার কিংবা শাস্তি প্রদান করার। বরং শাস্তি প্রদান করা হবে সে সকল প্রকাশ্য ও বাস্তব অপরাধের বিষয়ে, যেগুলো বাহ্যিকভাবে মানবাধিকার ও তাদের স্বার্থের সাথে জড়িত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিধানাবলির বাহ্যিক অনুসরণ ও অনুকরণই হলো ইসলামি শরিয়তে ইবাদতের ভিত্তি। এ কারণে, ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কারও ব্যক্তিগত বক্তব্য, মন্তব্য বা কর্তৃত্বের কোনো সুযোগই নেই। তবে এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এটা কাউকে দেখানো সম্ভব নয়।

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই ওহির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং এগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এভাবেই কুরআন তার সকল বিধানের ক্ষেত্রে অলৌকিকতার পরিচয় বহন করে। সেইসাথে বান্দার সমূহ কল্যাণও প্রতিষ্ঠা করে।[২৪৯]

কুরআনুল কারিমের বিধানগত অলৌকিকতা শুধু ব্যক্তির নিজের অবস্থা ও পালনীয় বিষয়াবলিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনুল কারিম জনসাধারণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কথাও বিবৃত করেছে। সুতরাং ইসলামি বিধান হলো, নেতা বা শাসকগণ রাষ্ট্রীয় কোনো কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। একটি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান নেতা বা খলিফা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়। [সুরা শুরা : ৩৮]

এ কারণে ইসলামের নির্দেশনা হলো, যেখানে মুসলমানদের উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে ইমাম বা শাসক জনগণের কল্যাণ সাধনে এমন মুসলমানদের পরামর্শ নেবেন, যাদের পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ততা

---

২৪৯. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা : *আল-ওয়াহয়ুল মুহাম্মাদি* : ২৮৩-২৮৭।

CamScanner

রয়েছে। ইমাম বা শাসক তাদের পরামর্শ নেবেন, যাদের প্রতি সাধারণ জনগণ আস্থা রাখেন, যাদের কথা ও বক্তব্যকে তারা মান্য করে। আর এই পরামর্শ গ্রহণে প্রথম দৃষ্টান্ত বা আদর্শ হলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে এবং জনপ্রশাসনের কোনো বিষয়ে যোগ্য ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনো কাজ সম্পাদন করেননি। নবীজির এমন করার কারণ হলো, যাতে তিনি পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারেন।

এরপর কুরআনুল কারিম আর্থিক বিষয়েও সঠিক পথ অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ কারণে কুরআনুল কারিম ধনসম্পদের যে বাস্তবতা বর্ণনা করেছে। মানুষের এটা খুব ভালো করে বুঝে রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾

অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। [সুরা আলে ইমরান : ১৮৬]

সুতরাং সম্পদ মানবজাতির জন্য একটি ফেতনা বা পরীক্ষার বিষয়। এটা যেমন মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতার মাধ্যম, আবার এটাই মানুষের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালো কাজে ব্যবহার করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় খরচ করবে, সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করো না। এবং সৎকর্ম অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। [সুরা বাকারা : ১৯৫]

অতএব, যারা মানুষদের আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা প্রদানের জন্য নিজেদের সম্পদ খরচ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

CamScanner

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থসম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সেসব তাদের মনস্তাপের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরি করে, তাদের (আখিরাতে) জাহান্নামে একত্র করা হবে। [সুরা আনফাল : ৩৬][২৫০]

এরপর ধনসম্পদের প্রতি মানুষের লোভ নির্মূলে কুরআনুল কারিম নিছক কিছু নির্দেশ ও দর্শন বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এর জন্য বাস্তব কিছু কার্যকর দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতিও বর্ণনা করে দিয়েছে। অর্থাৎ সম্পদে জাকাতের বিধান দিয়েছে এবং সেগুলো খরচ করার বিভিন্ন ক্ষেত্রও বর্ণনা করেছে। সুদ হারাম করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।

[সুরা আলে ইমরান : ১৩০]

একইসাথে কুরআনুল কারিম ঘুষ দিতে নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করতে এবং মানুষকে ওজনে কম দিতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

---

২৫০. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা : *আল-ওয়াহয়ুল মুহাম্মাদি* : ২৯৯-৩০৫।

CS CamScanner

বহু দুর্ভোগ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়। তারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়, আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কমিয়ে দেয়।

[সুরা মুতাফফিফিন : ১-৩]

এভাবে আমরা দেখতে পাই, ইসলামি বিধান প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানেই উপযুক্ত। ইসলামি ইতিহাসের ধারাবাহিক সূত্রে এই মূলনীতি অথবা এই দর্শনটি অকাট্যভাবে সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কত প্রজন্ম গত হয়ে গেল। কত শ্রেণির মানুষ এই ধর্মে দীক্ষিত হলো। যাদের নানারকম ভাষা, সংস্কৃতি এবং বংশ ও দেশ। অথচ ইসলামি শরিয়ত, যার প্রথম উৎস হলো কুরআনুল কারিম, তাদের সকলের জীবনের ছোট-বড় বিচিত্র সকল বিষয়ে সঠিক, সুন্দর ও উপযুক্ত সমাধানে সর্বদা সক্ষমতা প্রদর্শন করে এসেছে।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি, ইসলামের এই সংবিধান (কুরআনুল কারিম) মানুষের সকল অধিকার ও কর্তব্যগুলোকে সন্নিবেশিত করতে অসাধারণ সক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়েছে। অথচ এটি তো নাজিল হয়েছে উম্মি নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। অধিকাংশ বিধান নাজিল হয়েছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মদিনায় অবস্থানের মাত্র দশ বছরের মধ্যে। আর সেটাও হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে!

অর্থাৎ মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়, সাধারণ জীবনযাপনের সকল নিয়মকানুন ও রীতিনীতি এবং শরিয়তের বিধানাবলিকে কুরআনুল কারিম পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে উপস্থাপন করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

আমি এই কিতাবে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। [সুরা আনআম : ৩৮]

বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন। আল্লাহর বাণী,

CamScanner

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। [সুরা মায়িদা : ৩]

সুতরাং ইসলামি বিধান একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এটি তার অভ্যন্তরে এমন এক অলৌকিতা ধারণ করে, যেটা প্রমাণ করে তার মহত্ত্ব, উচ্চতা এবং নব-রচিত নিয়মকানুন থেকে তার ভিন্নতা ও অনন্যতা। কারণ, নব-রচিত নিয়মাবলি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। বরং জগতে মানুষের এমন বিধানও আছে, যা বছরে বছরে পরিবর্তিত হয়, মাসে মাসে হয়। আবার নিয়মগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নরকম হয়ে যায়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারি আইনের প্রতি যদি লক্ষ করেন, আপনি দেখতে পাবেন, সেখানে এক রাজ্যের বিধান অন্য রাজ্যের বিধান থেকে ভিন্নতর। হয়তো একটি রাজ্যের বিধানে কোনো অপরাধের প্রেক্ষিতে অপরাধীকে কোনো শাস্তিই প্রদান করা হয় না। অথচ সেই একই অপরাধে অন্য রাজ্যে অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু কুরআনের বিধান খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার, তাতে কোনো অস্পষ্টতার মিশ্রণ নেই। এটি অতীতের সকল সময়ে, সকল স্থানে সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল এবং একইভাবে ভবিষ্যতেও আগের মতোই অবিকৃতভাবে প্রযোজ্য হবে। এটা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, সকল সময় ও স্থানের জন্য সমানভাবে কার্যকরী এবং প্রযোজ্য। এর মাঝে কোনো বিচ্যুতি, ত্রুটি বা কমতি নেই।

কুরআনে বর্ণিত বিধানের আরেকটি অলৌকিকতা হচ্ছে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এই বিধানের প্রয়োগকে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মান্য করা হয়। যেমন নবুয়তের যুগ। এ যুগে সামান্য কিছু দণ্ডবিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়, যে সমাজেই ইসলামি বিধান প্রয়োগ করা হোক না কেন, সেটা সমাজের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা এবং তার স্থিতি বজায় রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। খলিফা হজরত আবু বকর রা.-এর যুগে হজরত উমর রা. ছিলেন বিচারক। তখন ইসলামি বিধানকে সমাজে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা

হয়েছিল। এ সময় একবার হজরত উমর রা. বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন। কারণ, তিনি দীর্ঘ একটি বছর বিচারকের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন, অথচ এখন পর্যন্ত তার নিকট কোনো বাদী-বিবাদী বিচার নিয়ে আগমন করেনি। এর দ্বারা ইসলামি সমাজের মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পায়। প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি সমাজ তার সাধারণ ব্যক্তিদের মাঝে শান্তি ও সমতা স্থাপন করতে পেরেছিল।[২৫১]

তেমনই খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ে ইসলামি সভ্যতা তার সর্বোচ্চ শক্তিমত্তা ও মর্যাদায় উপনীত হয়েছিল। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি ইসলামি শরিয়তকে ন্যায়-ইনসাফের সাথে, প্রজ্ঞার সাথে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে আমরা আরও বিভিন্ন যুগের দিকে লক্ষ করে দেখি, যে-সকল রাষ্ট্র তাদের সময়ে আল্লাহর শরিয়তের প্রয়োগ ঘটিয়েছে এবং কুরআনুল কারিমের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সে সকল রাষ্ট্রই তার সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার আসনে আরোহণ করেছে। যেমন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, তার পূর্বে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি এবং আন্দালুসে উমাইয়া শাসন...। এমনই আরও বহু রাজ্য। এর সকল কিছুই কুরআনুল কারিমের মহত্ত্ব ও তার সীমাহীন প্রভাবের প্রমাণ বহন করে।

কুরআনের বিধান সকল যুগ ও অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত উদাহরণ এত বেশি যে, সেগুলো গুনে শেষ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে এখানে আমরা একটি উল্লেখ করছি। যেমন কুরআনুল কারিমে বর্ণিত উত্তরাধিকারের বিধান। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রাচীন সকল জাতিই অন্তত দশবার তার উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করেছে। কিন্তু উত্তরাধিকার বিষয়ে কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত একইরকম উপযুক্ত, কার্যকরী এবং অপরিবর্তিত রয়েছে। আমরা সুরা নিসার মধ্যে দেখতে পাই, এই সুরাকে আল্লাহ তাআলা 'সুরা নিসা' হিসেবে নামকরণ করেছেন নারীদের সম্মান এবং সমাজে তাদের অবস্থানের প্রতি লক্ষ রেখে। এই সুরায় যে উত্তরাধিকারের সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই

২৫১. ইমাম তাবারি : *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক* : ২/৩৫১।

CamScanner

বিধানকেই আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর ধরে কোটি কোটি মুসলমানের উত্তরাধিকার আইন হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতামাতার মধ্য হতে প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার পিতামাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে

তার মায়ের প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মায়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা (তার যদি কোনো) দেনা (থাকে, তা) পরিশোধ করার পর। তোমরা আসলে জানো না, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। (এসব) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের, যদি তাদের কোনো সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে, তবে তারা (যে) ওসিয়ত (করে যায় তা) কার্যকর করার এবং তারা যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে, যদি তোমাদের (জীবিত) কোনো সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং (তোমাদের) দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মিরাছ বণ্টন করা হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতামাতা জীবিত আছে, না সন্তানসন্ততি আর তার এক ভাই বা এক বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা করার পর, যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তির দ্বারা) কারও ক্ষতি না করে থাকে। (এসব) আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল। [সুরা নিসা : ১১-১২]

কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকারের এই বিধান আমাদের নিকট আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে, যখন এটাকে আমরা বিশ্বের কিছু প্রাচীন রীতি এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতির সাথে তুলনা করি। রোমানদের উত্তরাধিকার আইন অনেকাংশে ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, সেখানেও উত্তরাধিকারের মৌলিক ভিত্তি ছিল রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা। তারা আত্মীয়তার মধ্যে অধস্তন ব্যক্তিদের তথা মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি ও

সন্তানদের সন্তানাদিদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল কিন্তু তারা বৈবাহিক আত্মীয়তার দিকে দৃষ্টি দেয়নি। আর তাদের নিকট কন্যার উত্তরাধিকার ছিল নিছক বাহ্যিকতা। কারণ, কন্যার সকল অংশই পরিশেষে তার ভাইদের অধিকারে চলে যেত। এ ছাড়া তারা অধস্তনদের জন্য কোনো আড়াল বা প্রতিবন্ধকতা রাখত না। এবং অধস্তনরা বিদ্যমান থাকতে ঊর্ধ্বতনদের অর্থাৎ পিতা, দাদা এবং আরও ঊর্ধ্বের ব্যক্তিদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকার রাখত না। কিন্তু ইসলাম অধস্তনরা থাকা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতনদের উত্তরাধিকার প্রদান করে এবং বৈবাহিক সম্পর্ককে উত্তরাধিকারের একটি মৌলিক কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করে।

এদিকে ইহুদিদের উত্তরাধিকার আইনানুসারে তারা শুধু পরিবারের বড় ছেলের উত্তরাধিকার স্বীকার করে। আর বড় ছেলে না থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি চলে যায় অধস্তন নারীর নিকট, নতুবা পিতার নিকট নতুবা দাদার নিকট অথবা ভাইদের নিকট। তারা স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের থেকে উত্তরাধিকার স্বীকার করে না, যাতে পরিবার থেকে সম্পদ বাইরে চলে যেতে না পারে। তবে তারা এটা সাব্যস্ত করে যে, স্বামী তার স্ত্রী থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারবে। অর্থাৎ শুধু স্বামীই স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারবে, কিন্তু স্ত্রী কখনো স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না।

আর আমরা পাশ্চাত্যের উত্তরাধিকার আইনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব, পশ্চিমাদের মধ্যে ফ্রান্সের উত্তরাধিকার আইন ইসলামের সবচেয়ে কাছাকাছি। বিশেষ করে উত্তরাধিকারের যোগ্য হওয়ার মাধ্যম বা উপকরণের দিক থেকে। কিন্তু ইসলামের সাথে এর পার্থক্য হলো, ইসলামি আইনে অধস্তন নারী-পুরুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের থেকে সম্পত্তি পায়, যদিও উপস্থিতির সময় অনুপস্থিতির চেয়ে পরিমাণে কম পায়। কিন্তু ফরাসি উত্তরাধিকার আইন স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর জন্য কোনো উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে না। বরং স্বামী স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সামাজিকভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও দেখাশোনার পারিশ্রমিক হিসেবে।

আর ব্রিটিশ উত্তরাধিকার আইন স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের থেকে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে না। অধস্তনদের উপস্থিতিতে ঊর্ধ্বতনদের

CamScanner

উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। বরং তারা বড় ছেলেকে উত্তরাধিকারী বানায় এবং তাকে সকলের ওপরে প্রাধান্য দেয়।

আর জার্মান উত্তরাধিকারনীতি ইসলামি নীতি এবং ফরাসি উত্তরাধিকারনীতির কাছাকাছি। তবে তারা ছেলে ও মেয়ের মাঝে সমান অংশ সাব্যস্ত করে। সেইসাথে তারা অন্য নিকটাত্মীয়দেরও উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। যেমন ফুফু, মামা ও খালা।[২৫২]

অন্যদিকে গোটা ইসলামি বিশ্ব প্রায় দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দশ বছর কুরআনের এই উন্নত বিধানটি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে আসছে এবং তাদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সমস্যা সমাধান করে আসছে। এটাতে তারা কখনো সমস্যা অনুভব করেনি। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে মানবরচিত অন্য নীতিগুলো বারবার নবায়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছে। অবশেষে সেগুলোও এখন প্রায় ইসলামি বিধানের কাছাকাছি এসে গেছে।

অমুসলিমদের মধ্য থেকেও অনেক সুবিবেচক লেখক কুরআনুল কারিমের এই ব্যতিক্রমী চমৎকার বিধানের অনন্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন অলফ্রেড ভন ক্রেমার (Alfred von Kremer)[২৫৩]। তিনি বলেন, ইসলামি বিধানাবলির মধ্যে ইসলামের উত্তরাধিকার-বিধানটি খুবই মৌলিক এবং অনন্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক বিধান।

অন্য আরও দুজন ব্যক্তি ইসলামের এই উত্তরাধিকার-বিধানের চমৎকারিত্ব ও অনন্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তারা হলেন, গানার (جانار) এবং ব্যারি (بري)। তারা তাদের গ্রন্থে (الاقتصاد الهندي : *ভারতীয় অর্থনীতি*) উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক আদান-প্রদান ছাড়াও একজন মুসলমান যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সে তার সকল

---

২৫২. ফিলিস্তিনভিত্তিক আরবি অনলাইন নিউজ পোর্টাল (دنيا الوطن) *দুনয়াল ওয়াতান*-এ ড. আবদুল ওয়াহহাব মুহাম্মাদ আল-জুবুরির কলাম : قراءة موجزة في فلسفة الميراث قبل الإسلام و بعده। ওয়েবসাইট লিংক : https://pulpit.alwatanvoice.com/content-179367.html

২৫৩. অলফ্রেড ভন ক্রেমার Alfred von Kremer (১২৪৩-১৩০৬ হি./১৮২৮-১৮৮৯ খ্রি.): তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ এবং রাজনীতিবিদ। মিশর এবং বৈরুতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রায় বিশটির মতো আরবি কিতাব লিখেছেন। ইসলাম, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জার্মান ভাষায়ও অনেক বই লিখেছেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন দামেস্কে অবস্থান করেছেন।-অনুবাদক।

পক্ষান্তরে একজন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বশীল থাকে। একজনের মৃত্যুর পর তার সম্পদগুলো বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরাধিকারীদের নিকট স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ভারতীয় আইনে সম্পদ এত প্রকারের উত্তরাধিকারীরা পায় না।[illegible]

ধারণা করি, পাঠকের বিস্ময় আরও বেড়ে যাবে, যখন তিনি জানবেন যে, এমন চমৎকার উত্তরাধিকার-বিধানের পেছনে ইসলাম ও কুরআনুল কারিমের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। ১. সম্পদের বিভাজন বা বিস্তৃত বণ্টন। আমাদের জানা আছে, আল্লাহ তাআলা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের বৈধতা দিয়েছেন। মানুষের জন্য দুহাতে যত ইচ্ছা সম্পদ অর্জনের দরজা খুলে দিয়েছেন। এতে কোনো অসুবিধা কিংবা বাধা নেই, তবে শর্ত হলো, এই অর্জনটা হতে হবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত বৈধ পন্থায়। মানুষের এভাবে বিপুল সম্পদ অর্জনের কারণে অনেক সময় অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে প্রচুর সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর এই সীমাহীন পুঞ্জীভূত সম্পদের অহমিকা কখনো কখনো তাদেরকে অল্পসংখ্যক দরিদ্রের প্রতি স্বেচ্ছাচারিতার দিকে ঠেলে দেয়। তারা তখন ন্যায় ও ইনসাফের মাপকাঠিতে শূন্যের কোঠায় চলে যায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَآ أَفَآءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে জনপদবাসীদের থেকে 'ফাই' হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, (রাসুলের) আত্মীয়বর্গের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই

[illegible]. মির্জা মুহাম্মাদ হুসাইন রচিত, আবদুর রহমান আইয়ুব কর্তৃক আরবি ভাষায় অনূদিত *আল-ইসলাম ওয়াল-ইশতিরাকিয়্যা* : ২২২। (ড. মুহাম্মাদ শরিফ-এর الميراث والوصية ودراسات قرآنية গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

> আবর্তন না করে। রাসুল তোমাদের যা দেয়, তা গ্রহণ করো আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
> [সুরা হাশর : ৭]

এভাবেই ইসলাম চেয়েছে, ব্যক্তির পুঞ্জীভূত সম্পদ অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। ফলে কুরআনুল কারিম সকলের মাঝে এই সম্পদ ছড়িয়ে দেওয়ার অনেকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এই উত্তরাধিকারের নীতি। এর মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় সম্পাদিত হয়। সম্ভবত তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনভাগে, চারভাগে এবং আটভাগে বণ্টিত হওয়ার বিধান প্রদান করা। পরিত্যক্ত সম্পত্তির শুধু একজনই উত্তরাধিকারী হয়, এমন খুবই কম সংঘটিত হয়। কুরআনুল কারিমে এই বণ্টিত অংশগুলো তার প্রাপককে অনিবার্যভাবে আদায় করে দেওয়ার প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

> পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতামাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতামাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত। [সুরা নিসা : ৭]

বৈবাহিক বা দাম্পত্যসম্পর্কের মাধ্যমে সম্পদের অনেক অংশ একটি পরিবার থেকে অন্য পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। আর ইসলাম তার সকল অনুসারীর মাঝে সমতা বিধান করেছে। হয়তো কখনো কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো দরিদ্র নারীকে বিবাহ করেন আবার কখনো এর উলটোটাও হয়। আর এভাবেই সম্পদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এবং সমতা স্থাপনের পথ তৈরি হয়।

আরেকটি আশ্চর্যকর বিষয় হলো, ইসলামের এই উত্তরাধিকারের মাঝে অনেক সামাজিক প্রভাব ও ভালো ফলাফল দেখতে পাওয়া যায়। এই

CamScanner

[সুরা বাকারা : ১৮০]

এমনকি যাদের জন্য উত্তরাধিকারে কোনো অংশ নেই এবং যে-সকল নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসিয়ত করা হয়নি, কুরআনুল কারিম তাদের ক্ষেত্রে আহ্বান করেছে যে, তাদের যেন সহমর্মিতার ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সামান্য হলেও প্রদান করা হয় এবং তাদের সাথে যেন ভালো আচরণ করা হয়। এভাবেই তারা সম্পদের উত্তরাধিকারে শরিক হতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

> আর যখন (মিরাস) বণ্টনের সময় (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তাদেরও তা থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। [সুরা নিসা : ৮]

এবার ওসিয়তের কথা বলি, এটা কার্যকর করা হয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর। আর্থিকভাবে সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ওসিয়তের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেটা হলো, ওসিয়ত কখনো সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। যাতে এটা উত্তরাধিকারীদের অংশে ক্ষতিসাধন না করে। শরিয়ত আরও শর্ত করেছে, এই ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না এবং সেটা ভালো কাজের জন্য হতে হবে। অর্থাৎ কোনো সওয়াবের কাজে হতে হবে। ওসিয়তের বিধানের যৌক্তিকতা হলো, মানুষ কখনো কখনো তার প্রতি অনুগ্রহকারীর প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে আগ্রহী হয়। তা ছাড়া উত্তরাধিকারীদের বাইরেও নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কারও জন্য নিজের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে আগ্রহী হয়। যাতে সে তাকে একটি সম্মানজনক জীবনযাপনে সহযোগিতা করতে পারে। কিংবা কখনো সে নিজের জীবদ্দশায় যেমন সাহায্য করত, সেভাবেই সমাজের কাউকে নিজের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সেই সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে

CamScanner

আগ্রহী হয়। আর এ কাজগুলো শুধু ওসিয়তের মাধ্যমেই সম্পাদন করা সম্ভব।[২৫৬]

ড. রিফআত আওয়াদি বলেন, মিরাসের হুকুমের মাধ্যমে ইসলাম শুধু সম্পদগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাই করেনি, বরং এর সাথে ওসিয়তের ব্যবস্থা রেখে বিষয়টাকে পূর্ণতা দান করেছে। ইসলাম ওসিয়ত সম্পাদনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, যাতে এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অন্য অনেক প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা করা যায়। এই পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মুসলিম সমাজের চাহিদাগুলো পূরণ করতে ইসলাম মুসলমানদের দায়িত্ব দিয়েছে। হতে পারে সেই চাহিদা কোনো ব্যক্তির, অথবা সামাজিক কোনো সংগঠন কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। এভাবে ওসিয়তের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থসমাগমের একটি নতুন উৎস তৈরি হয়। এখন সম্পদের মালিক যদি সামাজিক কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করে কিংবা ইচ্ছা করে, তাহলে সে এমন সব ব্যক্তি কিংবা বিষয়ের খেদমত করতে সক্ষম হবে, যারা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীদের বাইরে রয়ে গেছে।[২৫৭]

আর যে বিষয়টি কুরআনের বিধানাবলির অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার দিকে ইশারা করে, সেটা হলো, এগুলো অমুসলিমদের নিকটও তার সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এমনকি উন্নত ইউরোপের বহু দেশের বিধান, নিয়ম ও সংবিধানের মধ্যেও তার অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। যেমন ব্রিটিশ সংবাদপত্র *ডেইলি মেইল*[২৫৮] জানিয়েছে, ব্রিটেনের অন্তত ৮৫টি আদালত ইসলামি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। পত্রিকাটি আরও জানাচ্ছে যে, বর্তমানে এই সংখ্যা অতীতের চেয়ে ১৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্রিটিশ লেখক, গবেষক ডেনিস ম্যাক ইয়ন (Denis MacEoio)-এর গবেষণামতে ব্রিটেনে কমপক্ষে ৮৫টি শরিয়া আদালত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং শরিয়া আইনের বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলছে।

---

২৫৬. আহমাদ ইউসুফ সুলাইমান : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২৭, ১২৮।
২৫৭. রিফআত আওয়াদি : *নাযরিয়্যাতুত তাওযি* : ৩৩০।
২৫৮. *ডেইলি মেইল*, ২৯ জুন, ২০০৯

ক্যানটারবেরির আর্চবিশপ ড. রোয়ান উইলিয়ামস (Rowan Williams) বলেন, ব্রিটেনে ইসলামি বিধান প্রয়োগের বিষয়টা এমনই একটি বিষয়, ভবিষ্যতে যা প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। এ ছাড়া জুলাই ২০০৮ সালে ব্রিটেনের প্রধান বিচারপতি লর্ড ফিলিপস (Lord Phillips) ঘোষণা করেন, দাম্পত্যকলহ এবং সম্পদবিষয়ক সমস্যা নিরসনের জন্য অবশ্যই এখানে ইসলামি বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে।[২৫৯]

এ ছাড়া সে সকল ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অর্থনীতি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, কুরআনুল কারিমে বর্ণিত বিধান সে সকল চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা মোকাবিলায় নিজের শক্তি ও সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং সংস্থা ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। যেমন ইসলামি অর্থব্যবস্থার জন্য মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সেন্টারের একটি গবেষণায় ইসলামি ব্যাংকগুলোর অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, গতানুগতিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধস ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। গবেষণাটি আরও জানিয়েছে যে, অধিকাংশ পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে দ্রুত মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে 'ইসলামি অর্থব্যবস্থা' একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। গবেষণাটি দৃঢ়তার সাথে এটাও জানাচ্ছে যে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমান সংকটকালে এবং ভবিষ্যতের জন্যও বিনিয়োগকারী এবং কোম্পানিগুলোর মাঝে নিজেদের একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।

খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ভ্যাটিকান সিটি ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানের প্রশংসা করেছে। কারণ, এর মূলনীতির মধ্যে রয়েছে উন্নত নৈতিক গুণাবলি।[২৬০]

আমাদের এতক্ষণের এই দীর্ঘ বর্ণনা শুধু এটা প্রমাণ করার জন্যই যে, ইসলামি বিধান হলো একটি ঐশী ও চিরন্তন বিধান। এটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সময়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য ও উপযুক্ত। নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য এটি একটি বিস্ময়কর ঐশী অলৌকিকতা।

---

২৫৯. বিস্তারিত এই লিংকে : https://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165

২৬০. সূত্র : আরব আমিরাতভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক *দ্য ন্যাশনাল*।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

কুরআনুল কারিমের আরেকটি ইজাজ বা অলৌকিকত্ব হলো তার বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা। কুরআনুল কারিমের এই দিকটা নিয়ে প্রাচীন কালের আলেমগণ তেমন একটা আলোচনা করেননি। বরং তাদের সকল গুরুত্ব ও আলোচনা আবর্তিত হয়েছে কুরআনুল কারিমের বাগ্মিতা, ভাষা, তার বিস্ময়কর বিন্যাস ও ইতিহাস নিয়ে। তারা কুরআনুল কারিমের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় বিষয়ে পর্যালোচনা করেননি। এখানে কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআনুল কারিম এমন কিছু বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক সূত্র ও নিয়ম বর্ণনা করেছে, যেগুলোর আবিষ্কার ও উন্মোচনে বহু জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছেন।

তবে আমাদের মনে রাখা উচিত, কুরআনুল কারিম কখনোই নিছক কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ তার মৌলিক কোনো উদ্দেশ্যও নয়। বরং মানুষের হেদায়েতের নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা বা সূত্র বর্ণিত হয়েছে। আমরা সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

১. পরাগায়ন[২৬১]

কুরআনুল কারিম উদ্ভিদের মাঝে মিশ্র পরাগায়নের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। যে পরাগায়নটি হয়ে থাকে পরাগের স্থানান্তরের মাধ্যমে। আর এর একটি প্রধান মাধ্যম হলো বাতাস। আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে,

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾

এবং আমি পাঠিয়েছি সেই বায়ু, যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ...।

[সুরা হিজর : ২২]

---

২৬১. জীববিজ্ঞানের ভাষায় পরাগায়ন হলো পরাগধানী হতে পরাগরেণু সেই ফুলে বা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া।

CamScanner

২. বিশ্বজগতের বিস্তৃতি

আল্লাহর কিতাব কুরআনুল কারিমে যে-সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার আরেকটি উত্তম দৃষ্টান্ত হলো বিশ্বজগতের বিস্তৃতি। আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন প্রায়োগিক পরীক্ষা ও প্রমাণের মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করেছে। এই যে কুরআনুল কারিম—প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছে, যখন জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরে, ঠিক সেই সময়ে কুরআনুল কারিম বিশ্বজগতের বিস্তৃতির এই দর্শন বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

> আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয় আমি বিস্তৃতি দানকারী। [সুরা জারিয়াত : ৪৭]

এ আয়াতে যে ﴿وَالسَّمَاءَ﴾ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এটি কুরআনুল কারিমের অনেক স্থানেই বিশ্বজগৎ ও মহাশূন্য বোঝানোর জন্য এসেছে। কুরাআনুল কারিমের এই আয়াত বোঝায় যে, এই বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হচ্ছে। আর আমাদের সময়ের আধুনিক বিজ্ঞানও অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেও বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসেবে বিশ্বে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল যে, এই বিশ্বজগৎ একেবারে স্থির। অনাদি কাল থেকে তা এভাবেই অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বহু গবেষণা, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও হিসাবনিকাশ আর পরীক্ষানিরীক্ষার পর সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই বিশ্বজগতের একটি সূচনা রয়েছে এবং তখন থেকেই এটি একটি নিয়মের অধীনে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বেলজিয়ান পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ জর্জ লি ম্যাইট্রি[২৬২] এই থিউরি প্রদান করেন যে, এই বিশ্বজগৎ সর্বদা গতিশীল এবং এটি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

---

২৬২. জর্জ লি ম্যাইট্রি (George Le Maitre : 1894-1966)। বেলজিয়ান জ্যোতির্বিদ ও মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাবিস্ফোরণের একজন শক্তিশালী প্রচারক। তার দর্শন হলো, এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিশ্বজগতের সূচনা ও সৃষ্টি হয়েছে।

CamScanner

১৯২৯ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল[২৬৩] এই থিউরিকে আরও শক্তিশালী করেন। তিনিও সাব্যস্ত করেন মহাশূন্যের সকল তারকা-নক্ষত্র এবং ছায়াপথ (Galaxy) একে অপর থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। এই বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিস একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তা প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিতও হচ্ছে।[২৬৪]

৩. সূর্যের আবর্তন

কুরআনুল কারিমের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার আরেকটি আয়াত হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

> সূর্য আপন গন্তব্যের দিকে পরিভ্রমণ করছে। এসব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তার স্থিরীকৃত (ব্যবস্থাপনা)। [সুরা ইয়াসিন : ৩৮]

বাস্তবিকই এই আয়াতের মধ্যে এক মহাবিস্ময় লুক্কায়িত রয়েছে। কারণ, এই আয়াতে ﴿تَجْرِي﴾ (পরিভ্রমণ করছে) শব্দ দ্বারা সূর্যের সেই গতি বা নড়াচড়াকে বোঝানো হয়নি, সূর্য উদিত হওয়ার সময় মানুষ বাহ্যিকভাবে যা দেখে। বরং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেই বাস্তব ও মহাজাগতিক গতিশীলতা, যা আজকের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ আবিষ্কার করেছে ও গবেষণা জানাচ্ছে যে, সূর্য প্রতি পঁচিশ দিনে একবার তার অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে।[২৬৫] এভাবে আমাদের পৃথিবীর ছায়াপথেরও গতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিশাল ছায়াপথের একটি সদস্য হলো সূর্য। এই ছায়াপথটি সেকেন্ডে প্রায় ৯৮০ কিলোমিটার গতিতে বিশ্বজগতের অন্য ছায়াপথগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।[২৬৬]

৪. পানির বিভাজন

কুরআনুল কারিমের আরেক বৈজ্ঞানিক বিস্ময় হলো পানির বিভাজনের বর্ণনা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

২৬৩. এডউইন হাবল (Edwin Hubble : 1889-1953)। মার্কিন জ্যোতির্বিদ। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ ছাড়াও আরও ছায়াপথের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি প্রমাণ করেন।

২৬৪. হারুন ইয়াহইয়া, *আল-মুজিজাতুল কুরআনিয়্যা* : ১২, ১৩।

২৬৫. খলিল বাদাবি : *আল-মাওসুআতুল ফালাকিয়্যা* : ২১।

২৬৬. ইবরাহিম গাওরি : *আশ-শামস* : ১৮।

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾

তিনিই দুই সাগরকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, তারা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তাদের মধ্যে থাকে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। [সুরা আর-রহমান : ১৯-২০]

বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে ভূমধ্যসাগর এবং অতলান্তিক সাগর জাবালে তারেক বা জিব্রাল্টার প্রণালির যে স্থানে মিলিত হয়েছে, দুটি ধারার মাঝে সেখানে একটি অন্তরাল রয়েছে। এই দুই ধারার পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে দুটি পানির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভূমধ্যসাগরের পানি অতলান্তিক সাগরের পানির চেয়ে বেশি লবণাক্ত এবং বেশি উষ্ণ। এভাবে সকল জীবের ক্ষেত্রে এ দুই সাগরের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে।[২৬৭] যেমন ব্রিটিশ পদার্থবিদ জন এমিরি (Victor John Emery-1934-2002) এবং মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলের আকাবা উপসাগরের পানিবিষয়ক একটি যৌথ গবেষণা প্রকাশ পায়। তাতে দেখা যায়, আকাবা উপসাগরের পানির সাথে লোহিত সাগরের পানির রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক গঠন, কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা রয়েছে।[২৬৮]

৫. ভূতত্ত্ববিদ্যা

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়কর আয়াতের আরেকটি হলো এই ভূতত্ত্ববিদ্যা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾

এবং পাহাড়সমূহকে কী (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক বানাইনি?।

[সুরা নাবা : ৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾

---

২৬৭. মারওয়ান তাফতানাযি : *আল-ইজাজুল কুরআনি ফি দাওয়িল ইকতিশাফিল ইলমিল হাদিস* : ৩৮৪।

২৬৮. ইয়াকুব ইউসুফ : *লাফাতাতুন ইলমিয়্যাতুন মিনাল কুরআন* : ৫৭

আমি জমিনের মধ্যে পাহাড়গুলো স্থাপন করেছি যাতে জমিন তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। [সুরা নাহল, ১৫; সুরা লুকমান, ১০]

আধুনিক যুগে এসে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর বিশাল বিশাল পাহাড়ের নিচেও তার বিস্তৃত শিকড় আছে এবং উপরের পাথরের স্তরের নিচে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও প্রলম্বিত পাহাড় প্রোথিত হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রে উপরের উচ্চতার চেয়েও নিচের শিকড় ও বিস্তৃতি অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা এই বিস্তৃতি প্রদান করেছেন, যাতে করে এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে ভূখণ্ডের ঘূর্ণনকে আটকে রাখতে পারে। অথচ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভূতত্ত্বের এই বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না।[২৬৯]

বিভিন্ন গবেষণা আরও আবিষ্কার করেছে, পৃথিবীর যে-সকল ভূভাগে পাহাড় রয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে সেসব ভূ-খণ্ডের আলাদা রকমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, সকল পাহাড়ের উচ্চতা তার জমিনের অভ্যন্তরের অংশের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সেখানকার অবস্থিত পাথরের সাথে এবং চারপাশের জমিনের চরিত্রের সাথেও এগুলো সামঞ্জস্য রাখে। এভাবে বিজ্ঞানীরা এটাও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, এই যে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে পাহাড়গুলোকে স্থাপন করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জমিনকে ঝুঁকে পড়া এবং নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করা।[২৭০] অথচ কুরআনুল কারিম প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই এই বাস্তবতা বর্ণনা করেছে। সত্যই বলেছেন আল্লাহ তাআলা এবং সত্যই বলেছেন তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এরপর আমরা লক্ষ করতে পারি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর দিকে,

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾

উত্তপ্ত সমুদ্রের শপথ! [সুরা তুর : ৬]

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে শপথ করা হয়েছে। তিনি সেখানে সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সমুদ্র উত্তপ্ত। আমরা জানি, শপথ করা হয় কোনো কথার দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য। আল্লাহর

---

২৬৯. আবদুল মাজিদ যানদানি : *কিতাবুত তাওহিদ* : ৭২।

২৭০. *মারওয়ান তাফতানাযি : আল এজাজুল কুরআনি ফি দাউইল ইকতিশাফিল ইলমিল হাদিস* : ৩৫২।

CS CamScanner

কথায় এমন বাড়তি দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা, তাঁর সকল কথাই সত্য ও সুদৃঢ়। এ জন্য কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

এবং আল্লাহ অপেক্ষা কথায় বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে?

[সুরা নিসা : ১২২]

এরপরও মাঝে মাঝে আল্লাহ তাআলা শপথ সহকারে কোনো কথা বলেন। কেন বলেন? উদাসীনদের সতর্ক করার জন্য। ত্রুটি অন্বেষণকারীদের পথ দেখানোর জন্য এবং অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমন এখানে করেছেন।

আয়াতে ﴿الْمَسْجُورِ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেটা আগুন দ্বারা প্রজ্বলিত ও উত্তপ্ত। আল্লাহ তাআলা এখানে শপথ করেছেন এ কথা বোঝানোর জন্য যে, আগুনে প্রজ্বলিত ও উত্তপ্ত সাগরের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, এখানে উত্তপ্ত সাগর বলতে দুনিয়ার সাগরকেই বোঝানো হয়েছে, আখিরাতের সাগর নয়। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন কুরআনুল কারিমের এই সত্য আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার আলোয় একদিন উদ্ভাসিত হবে। তখন মানুষ সত্যটা বুঝবে। এতদিন পর এখন সমুদ্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন, সমুদ্রের নিচে উত্তপ্ত বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব রয়েছে, এ কারণে পানিও সেখানে ফুটন্ত ও উত্তপ্ত থাকে।

ড. জামালুদ্দিন ফিন্দি তার গ্রন্থ *তবিইয়্যাতুল বাহরি ওয়া জাওয়াহিরুহু* (طَبِيْعِيَّاتُ الْبَحْرِ وَظَوَاهِرُهُ)-এ উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে যে, সমুদ্রের তলদেশে অনেক গভীর গর্ত ও ছিদ্র রয়েছে। তাপমাত্রা ওজনের তারতম্যের ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে গিয়ে এসব ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তারতম্যগুলো সংঘটিত হয় উত্তাপের মাধ্যমে সম্প্রসারিত এবং ঠান্ডার কারণে সমুদ্রের তলদেশ সংকুচিত হয়ে পড়ার কারণে। এভাবে সেই সম্প্রসারিত দীর্ঘ জায়গাজুড়ে একটি দুর্বল স্তরের সৃষ্টি হয়। তখন ভূগর্ভ থেকে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত গলিত পদার্থগুলো সমতলের এই দুর্বল জায়গাগুলো দিয়ে উপরে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। এভাবেই সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়। এরপর আগ্নেয়গিরির সেই উত্তপ্ত গলিত

CS CamScanner

পদার্থগুলো সমুদ্রের মাঝে সবেগে নির্গত হতে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের পানির চাপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেগুলো আর জমিনের উপরে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের পানিকে ঠিকই গরম ও উত্তপ্ত করে তোলে।

এতৎসত্ত্বেও সমুদ্রের আগ্নেয়গিরিগুলো ক্রমাগত উত্তপ্ত গলিত পদার্থ উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করতে থাকে। তার কূপের মতো সংকীর্ণ গর্ত থেকে ক্রমাগত উপরের দিকে উত্তপ্ত গলিত পদার্থগুলো উদ্‌গিরণ করতে থাকে। এমনকি কখনো কখনো আগ্নেয়গিরিগুলোর এসব অগ্ন্যুৎপাত সমুদ্রের স্বাভাবিক জোয়ারভাটার মাঝে তারতম্য ঘটিয়ে দেয়। কখনো হঠাৎ সুনামি বা জলোচ্ছ্বাসের উদ্ভব ঘটায়। এমনই একটি সুনামি সংঘটিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। এতে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয় ক্রাকাতোয়া দ্বীপ।[২৭১] ভারত সাগরের পুরো পূর্বাঞ্চল এর ফলে আন্দোলিত হয়ে পড়ে। সেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে যে সুনামির সৃষ্টি হয় তাতে দুদিনেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪০০ ফিট উপরে অবস্থিত এই দ্বীপটি প্লাবিত হয়ে যায়। তখন সামান্য অংশ ব্যতীত অক্ষত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না দ্বীপটির।[২৭২]

রাশিয়ান-মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জর্জ গামু (George Gamow) তার গ্রন্থ *কাওকাবুন ইসমুহুল আরদ* (كَوْكَبٌ اِسْمُهُ الْأَرْضُ)-এ একটি অধ্যায় রচনা করেছেন 'আমাদের পায়ের নিচে জাহান্নাম' শিরোনামে। এই অধ্যায়ে তিনি সমুদ্রের তলদেশ উত্তপ্ত হওয়া, তার আগুন এবং সেখানে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এর সূচনায় বলেছেন, 'গভীরতার সাথে উষ্ণতার বৃদ্ধি, বিক্ষুব্ধ সকল আগ্নেয়গিরির গর্তগুলো থেকে উৎক্ষিপ্ত সাদা ধোঁয়াগুলো যদি টেনে সামনে আনা হয় তাহলে তার চারপাশে উৎক্ষিপ্ত তপ্ত গলিত প্রজ্বলিত পদার্থগুলো এবং উত্তপ্ত পানির ঝরনাগুলো, অবশ্যই পৃথিবীতে হেঁটে চলা মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যে, প্রজ্বলিত আগুন আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়;

---

২৭১. ক্রাকাতোয়া (Krakatoa or Krakatau)। ইন্দোনেশিয়ার জাভা এবং সুমাত্রার মাঝে সুন্দা প্রণালির নিকট অবস্থিত একটি দ্বীপ। ১৮৮৩ সালের এই জলোচ্ছ্বাসে দ্বীপটির দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এটিকে জানা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জলোচ্ছ্বাস হিসেবে গণ্য করা হয়, যার সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। এতে দ্বীপটির ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়।-অনুবাদক

২৭২. মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন ফিন্দি : *তবিয়িয়্যাতুল বাহরি ওয়া জাওয়াহিরুহু* : ২১০।

CamScanner

সেটা বরং অবস্থান করছে আমাদের পায়ের নিচেই, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছে বিচ্যুত বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য।[২৭৩]

এখানে কুরআনিক অলৌকিকতার বিষয়টি সুস্পষ্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআনুল কারিম সাব্যস্ত করছে যে, সমুদ্রের নিম্নদেশ আগুনের কারণে উত্তপ্ত। এটি ইতিপূর্বে কখনো জানা যায়নি। এমনকি কুরআনুল কারিম নাজিল হওয়ার পরও এতদিন এই বাস্তবতা আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃত ছিল। পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিভিন্ন ঘটনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের নিকট প্রতিফলিত হয় যে, আগ্নেয়গিরির প্রজ্বলিত আগুনের কারণে সমুদ্রের তলদেশ উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত ও বিস্ফোরিত হয়ে থাকে। অথচ সামুদ্রিক এই বাস্তবতাটি আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কথার মাঝে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন,

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾

উত্তপ্ত সমুদ্রের শপথ। [সুরা তুর : ৬]

এটা তখন মানুষের অজ্ঞাত ছিল। তাহলে কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো সমুদ্রের তলদেশ এমন উত্তপ্ত এবং তা আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে বিস্ফোরক ও উত্তপ্ত হয়ে আছে যেগুলো গলিত অগ্নিলাভা উৎক্ষিপ্ত করে![২৭৪]

আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয় আমি এর বিস্তৃতি দানকারী। [সুরা যারিয়াত : ৪৭]

এদিকে লক্ষ করলে, জানতে পারি কুরআনুল কারিমের এই আয়াত, যা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে নাজিল হয়েছে। তা আলোচনা করছে বিশ্বজগতের অব্যাহতভাবে সম্প্রসারিত হওয়া নিয়ে, যখন পৃথিবীর কোথাও এই ধারণা বা থিউরি জ্ঞাত ও প্রমাণিত ছিল না।

---

২৭৩. জর্জ গামু (George Gamow) : *কাওকাবুন ইসমুহু আল-আরদ* : ৭৪

২৭৪. মারওয়ান তাফতানাযি : *আল-ইজাজুল কুরআনি ফি দাওয়িল ইকতিশাফিল ইলমিল হাদিস* : ৩৯০, ৩৯১।

অথচ এই বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন আরও শতশত বছর আগে। আর জ্যোতির্বিদ ও মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সেটা আবিষ্কার করল বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এসে। অথচ এর আগে মহাশূন্যবিজ্ঞানীরা দাবি করত বিশ্বজগৎ স্থির, অনাদি এবং অপরিবর্তনীয়। তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে নাকচ করার জন্য এমন আরও অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কিন্তু বারবার অস্বীকারকারীদের বিপরীত বিষয়টিই জগতের সামনে সাব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সি ডপলার (C Doppler) আমাদের ছায়াপথের বাইরে অন্যান্য ছায়াপথের নড়াচড়া প্রমাণ করেন। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানজগতের আগের অনেক ধারণাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়।

থিউরিটি আবিষ্কারের পেছনে সি ডপলারের চমৎকার কিছু পর্যবেক্ষণ কাজ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। অস্ট্রিয়ান এই বিজ্ঞানী লক্ষ করে দেখেন, দ্রুতগামী ট্রেনগুলো তার চলার সময় হুইসেল বা সাইরেন বাজিয়ে যায়। স্টেশনে ট্রেনের পর্যবেক্ষণকারী তার এই আওয়াজ একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গধ্বনির সাথে শ্রবণ করে। কিন্তু ট্রেনটি যখন পর্যবেক্ষণকারীর নিকটবর্তী হয়, তখন সেই আওয়াজ অনেক জোরে ও তীব্রতার সাথে শুনতে পায়। আর দূরে চলে গেলে আওয়াজও ক্রমেই ধীর ও ক্ষীণ হয়ে আসে। ডপলার এর কারণ ব্যাখ্যায় বললেন, ট্রেনের সাইরেন বাতাসের মাঝে কিছু শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। তাই শব্দের উৎস যখন কাছে থাকে, তখন এই শব্দতরঙ্গগুলো নিজেদের মাঝে ভীষণ রকমের চাপাচাপির মধ্যে থাকে, এ কারণে তখন শব্দতরঙ্গ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আর এর বিপরীতে শব্দের উৎস যখন দূরে সরে যায়, তখন সেই শব্দতরঙ্গ চারদিকে বিস্তৃতভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তার কিছু কিছু তরঙ্গ পর্যবেক্ষণকারীর নিকট এসে পৌঁছে, এ কারণে তখন শব্দতরঙ্গ নিম্নমানের হয়, আওয়াজ কম হয়।

বিজ্ঞানী ডপলার ঠিক একই অবস্থা সংঘটিত হতে দেখতে পান আলোর তরঙ্গের ক্ষেত্রে। আলো যখন যথেষ্ট গতিশীল কোনো উৎস থেকে পর্যবেক্ষণকারীর চোখে এসে পড়ে, তখন সেই আলোর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যায়, আলোর তীব্রতা কমে যায়। আর যদি আলোর উৎসটি পর্যবেক্ষণকারীর খুবই কাছে বিদ্যমান থাকে, তখন আলোর তরঙ্গ পরস্পরের সাথে ঘন হয়ে থাকে এবং অনুভূত আলোর মাঝে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। (এটা তখন নীল বর্ণের দিকে ধাবিত হয়।) এটাকে নীলাভ

আভা বলে অভিহিত করা হয়। আর যখন দূর থেকে আলোর উৎসটি আন্দোলিত হয়, আলোর তরঙ্গ তখন চারদিকে বিস্তৃত ও বিকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং অনুভূত আলোর তরঙ্গ নিম্নমানের হয়ে পড়ে (অর্থাৎ ক্রমে এটা তখন লাল বর্ণের দিকে ধাবিত হয়)। আর বাহ্যিক এই অবস্থাটিকে লাল আভা বলে অভিহিত করা হয়।

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ ও থিউরি। পরে জ্যোতির্বিদরা যখন আমাদের ছায়াপথের বাইরের তারকাগুলো থেকে আগত আলোর বিশ্লেষণ ও গবেষণার নিয়ম-রীতি প্রয়োগের চেষ্টা করতে থাকেন, তখন এই থিউরি বা দর্শনের গুরুত্ব আরও বহুগুণে বেড়ে যায়।

১৯১৪ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ স্লিফার (Slipher) আমাদের থেকে সুদূরবর্তী কিছু ছায়াপথের দূরবর্তী তারকাগুলো থেকে আগত আলোর ওপর ডপলারের এই থিউরি প্রয়োগ করেন। এর মাধ্যমে তার কাছে প্রমাণিত হয়, তিনি যে ছায়াপথগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তার অধিকাংশই ক্রমে আমাদের থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকি অতি দ্রুততার সাথে তারা নিজেরাও একে অন্যের থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিদরা এটা নিয়ে গবেষণায় লেগে পড়লেন। তারা বুঝতে চেষ্টা করলেন, তবে কি বিশ্বজগৎ নিজেও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে? অর্থাৎ বিশ্বজগতের ছায়াপথগুলো কি আমাদের থেকে এবং পরস্পর থেকে অতি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে?

১৯২৫ সালের দিকে এসে জ্যোতির্বিদ স্লিফার প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, তার পর্যবেক্ষণে থাকা চল্লিশটা ছায়াপথ বাস্তবেই অকল্পনীয় দ্রুততার সাথে আমাদের ছায়াপথ Milky Way (মিল্কিওয়ে) থেকে দূরে চলে গেছে এবং নিজেরাও পরস্পর থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে প্রখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল (Edwin Hubble) মহাকাশ সম্বন্ধে একটি অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন। যার মূল বক্তব্য হলো, ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে দূরবর্তী হওয়ার দ্রুততার অনুপাতেই সেগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এই থিউরি Hubble's Law বা হাবলের সূত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সূত্র প্রয়োগ করে বিজ্ঞানী হাবল অনেক ছায়াপথের দূরত্ব এবং সেগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতি অনুমান করতে সক্ষম হন। আর এটা তিনি করেন আরেক মার্কিন জ্যোতির্বিদ মিল্টন হিউম্যাসন

CamScanner

(Milton Humason)-এর সহযোগিতায়। তিনি হাবলের সাথে ক্যালিফোনিয়ার মাউন্ট উইলসন পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে কাজ করেন। অবশেষে ১৯৩৪ সালে তারা দুজন একসঙ্গে এই থিউরি প্রকাশ করেন।

এভাবে ছায়াপথগুলোর আমাদের থেকে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া বিশ্বজগতের সম্প্রসারিত হওয়ার বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। এই বিষয়টি জ্যোতির্বিদদের মাঝে অনেক বড় প্রভাব ফেলে। বহু বিতর্কের সৃষ্টি করে। এমনকি তারা এটাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিহত করার ব্যাপারে বিপরীত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু অবশেষে বিভিন্ন গাণিতিক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ব্যাপক জানাশোনা ও পর্যালোচনার পর বিষয়টি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭৫]

যাচাই করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বিজ্ঞানীরা অতি শক্তিশালী বিভিন্ন বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তারকাগুলোর আলোর বর্ণালি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে শুরু করেন।[২৭৬]

অনেক দিনের দীর্ঘ বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের পর তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, আলোর বর্ণালি রেখাগুলো সর্বদাই লালের দিকে ঝুঁকে চলেছে। যখনই জমিনের উপরে অবস্থিত পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে আলোর উৎস দূরে সরে যায়, তখনই আলোর প্রতিফলন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে আসে। সর্বশেষ লাল বর্ণটিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন, আলোর বর্ণালি রেখাগুলোর ঝোঁক লালের দিকেই। তাই তারকাগুলোর আলো ক্রমে লালে পরিণত হওয়া এটাই ইঙ্গিত করছে যে, সকল তারকা ক্রমে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার অনিবার্য পরিণতি হলো, বিশ্বজগৎ প্রতিনিয়ত তার স্বাভাবিক নিয়মে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

আমরা তারই পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাদের এই বাস্তবতা জানিয়ে দিয়েছেন আরও প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই।[২৭৭]

---

২৭৫. মারওয়ান তাফতানাযি : *আল-ইজাজুল কুরআনি* : ১৮৯-১৯২।
২৭৬. জোয়েল ডো রুনি ও অন্যান্য : *মাহনু ওয়াল কাওন* : ২৪
২৭৭. মুখলিছ রাইস ও আলি মুসা : *কিসসাতু মুতামিল কাওন* : ৪১

CamScanner

৬. লোহার উৎস

কুরআনুল কারিমের আরেকটি বৈজ্ঞানিক বিস্ময় হলো লোহার উৎস বর্ণনা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ডশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। [সুরা হাদিদ : ২৫]

কেউ কেউ ধারণা করে, এখানে আয়াতের মধ্যে লোহার ক্ষেত্রে ﴿أَنزَلْنَا﴾ (অবতীর্ণ করেছি) ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে রূপক অর্থে। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। কিন্তু আমরা ক্রিয়াটির আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকালে তখন অর্থ হবে, লোহা আসমান থেকে নাজিল করা হয়। তাই আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব যে, আয়াতটি একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের সংবাদ প্রদান করছে। আধুনিক মহাকাশ গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আমাদের বিশ্বে যে লোহা আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই, তা মূলত আসে পৃথিবীর বাইরের মহাশূন্যের বিশাল কোনো নক্ষত্র থেকে।

বিশ্বজগতের ভারী খনিজ পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় বড় কোনো নক্ষত্রের পরমাণু থেকে। এগুলো উৎপন্ন হতে অত্যধিক ভর ও প্রজ্বলন প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের সৌরজগৎ এমন উপযুক্ত পরিমাণ বিক্রিয়া ধারণ করতে পারে না, যার মাধ্যমে সে নিজেই লোহা উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং লোহা উৎপন্ন হতে হলে আমাদের সূর্য থেকেও বড় কোনো নক্ষত্রের প্রয়োজন হয়। যেখানে শত কোটিগুণ বেশি তাপ বিকিরণ হতে পারে। তাই মহাশূন্যের কোনো নক্ষত্রে যখন স্বাভাবিকের তুলনায় তার লোহার পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন সেই বাড়তি পরিমাণের সাথে নক্ষত্রটি আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। পরিণামে সেটা বিস্ফোরিত হয় এবং গোটা নক্ষত্রটি প্রজ্বলিত জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়, অথবা সুপারনোভার সৃষ্টি হয়। (এটা এমন এক নক্ষত্র, হঠাৎ যার আলোর ঝলকানি বহুগুণে বেড়ে যায় এবং কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর পর আবার সেটা প্রশমিত হয়ে আসে।) আর এই বিস্ফোরণের কারণে বিশ্বজগতের মহাশূন্যের বিভিন্ন দিকে উল্কাপিণ্ড ছড়িয়ে পড়ে, এগুলোর

CS CamScanner

মাঝেই লোহা থাকে। এগুলো মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায় এবং আসমানের নক্ষত্রগুলোর কোনো আকর্ষণকারী শক্তি এটাকে নিজের দিকে টেনে নেয়।[২৭৮]

অর্থাৎ এই পুরো পদ্ধতিটা প্রকাশ করছে, লোহা জমিন থেকে উৎপন্ন হয় না। জমিন থেকে বেরও হয় না। বরং মহাশূন্যের বিশাল কোনো তাপবাহী নক্ষত্রের বিস্ফোরণের কারণে উৎপন্ন উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে লোহা জমিনে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আয়াতটিও সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। এ কথা স্পষ্ট যে, লৌহকেন্দ্রিক এই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নিয়ে পৃথিবীতে কুরআনুল কারিম যখন নাজিল হয়েছিল, সেই খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এটা কারও নিকট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে একেবারেই পরিচিত ছিল না।[২৭৯]

---

২৭৮. লোহার উৎস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কারণ, লোহা আমাদের পৃথিবীতে সৃষ্ট নয়। আমাদের সৌরজগতেও এর সৃষ্টি হয়নি। জেনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীসহ আমাদের সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সূর্য থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সূর্যে কোনোপ্রকার লোহার উৎপাদন হয় না। কারণ, তাপক্ষরণের মাত্রার বিবেচনায় সূর্য একটি মধ্যবর্তী নক্ষত্র। সাধারণভাবে এর উপরিতলের তাপমাত্রা ৬,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর অভ্যন্তরের সাধারণ তাপমাত্রা ১,৫০,০০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লোহার গঠনের জন্য এরূপ তাপমাত্রা যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি প্রমাণ করা হয়েছে, আমাদের সূর্যের থেকে দশগুণ বেশি ভরসম্পন্ন নক্ষত্রসমূহে তাদের উন্নতির শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে লিথিয়ামের থেকে অধিক ভারী বিভিন্ন পদার্থের উদ্ভব ঘটে। অধিক ভরসম্পন্ন এই নক্ষত্রসমূহে হিলিয়াম পুড়ে কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন, সালফার এবং সর্বশেষ লোহার উদ্ভব ঘটে। এভাবে লোহার যখন উদ্ভব ঘটতে থাকে, নক্ষত্রসমূহের নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়া তখন আর অব্যাহত থাকতে সক্ষম হয় না। আরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া-ঘটনার কারণে নক্ষত্রসমূহে অপরিমেয় শক্তির নিঃসরণ ঘটে। পরে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণ সুপারনোভা নামে পরিচিত। সুপারনোভা সংগঠনের পর লোহাসহ এই ভারী পদার্থগুলো মহাবিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রে পরে এই ভারী পদার্থসমূহ আপতিত হয়।-অনুবাদক

২৭৯. হারুন ইয়াহইয়া : *আল-মুজিজাতুল কুরআনিয়্যা* : ৩৪।

CamScanner

৭. মানবসৃষ্টি

কুরআনুল কারিমের আরেকটি আয়াতে আমরা স্পষ্ট অলৌকিকতা খুঁজে পাই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে।

[সুরা দাহর : ২]

সকল মুফাসসির একমত যে ﴿نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ বলতে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত পানিকে বোঝায়। ﴿أَمْشَاجٍ﴾ অর্থ নারী-পুরুষের মিশ্র পানি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে, যা কুরআনুল কারিম নাজিল হওয়ারও হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন কেউই জানত না উৎপাদনশক্তিসম্পন্ন ডিম্বাণু (Fertilized Egg) থেকে ভ্রূণের সৃষ্টি হওয়া যাকে তুলনা করা হচ্ছে ﴿نُّطْفَةٍ﴾-এর সাথে। অর্থাৎ ﴿نُّطْفَةٍ﴾ বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের মিশ্রিত অতি সূক্ষ্ম পানিবিন্দু, যার মাঝে পিতামাতা উভয়ের জিনগত উপাদান বিদ্যমান থাকে। আজকের সময়ে যাকে আমরা ক্রোমোজম (Chromosome) বলে থাকি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। [সুরা হুজুরাত : ১৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন, তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী হতে। অবশ্য কিছু মানুষ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভ্রূণ শুধু পুরুষের বীর্য থেকেই উৎপন্ন হয়। সেটা পরে মায়ের উদরে এসে প্রতিপালিত হয় এবং সেখানকার রক্ত আহরণ করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো, মানবশিশুর সকল সৃষ্টিই পুরুষ ও নারী, উভয়ের পানি থেকে উৎপন্ন হয়।

CamScanner

উল্লিখিত আয়াতটিও সে কথাই বোঝায়। এটি এমনই স্পষ্ট আয়াত, যার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।[২৮০]

তবে মানবসৃষ্টির স্তরগুলো শুরু হয় পিতার শুক্রকীটের জন্মের মধ্য দিয়ে। কারণ, মায়ের ডিম্বাণুগুলো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকে। শুক্রাণুর সংস্পর্শে এসে তা ভ্রূণে পরিণত হয়। আর নির্গত বীর্যকে তুলনা করা যায় কিছু শুক্রাণু অর্থাৎ পানিবিন্দুর সাথে। কুরআনুল কারিম এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে এভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾

আর তিনি মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা হতে। অতঃপর তার বংশধারা চালু করেছেন নিঃসারিত তুচ্ছ পানি থেকে।

[সুরা সাজদা : ৬-৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾

আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

[সুরা মুরসালাত : ২০]

কিন্তু নির্গত বীর্য বা শুক্রাণুর সকল বিন্দুই সন্তানগঠনে সক্ষম বা উপযুক্ত হয় না, বরং মাত্র একটি শুক্রাণু (Drop-like Embryo) সন্তানগঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। কুরআনুল কারিম এই বিষয়টিকে কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে বিবৃত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ﴾

মানুষ কি মনে করে তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি ছিল না এক বিন্দু বীর্য, যা (মাতৃগর্ভে) স্খলিত করা হয়?

[সুরা কিয়ামাহ : ৩৬-৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ﴾

---

২৮০. ইমাম কুরতুবি : *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন* : ১৬/৩৪২, ৩৪৩।

তিনি মানুষকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন। [সুরা নাহল : ৪]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ﴾

মানুষ কি লক্ষ করেনি আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু দ্বারা?
[সুরা ইয়াসিন : ৭৭]

আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি, কুরআনুল কারিম বীর্যের উপাদান বর্ণনার ক্ষেত্রে কর্মকারকের (ইসমুল মাফউল) পরিবর্তে কর্তৃকারক (ইসমুল ফায়িল) পদ উপস্থাপন করেছে। অথচ তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এর গতি ও প্রকৃতি পৃথিবীর কেউই প্রত্যক্ষ করেনি! আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾

সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কীসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি দ্বারা। [সুরা তারিক : ৫-৬]

প্রাথমিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা কষ্টসাধ্য হওয়ায় ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ডালিমপাটিয়াস (Dalempatius) পুরো মানবদেহকে শুক্রাণুর মাথায় অঙ্কন করেছেন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার মাত্র এক বছর আগে। অথচ পৃথিবীর মানুষ পিতামাতার ভ্রূণগঠনের স্তরকে দেখার আগেই কুরআনুল কারিম আমাদের সেই সপ্ত শতাব্দীতেই ভ্রূণের বেড়ে ওঠার স্তরগুলো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে স্বীকার করতে চাও না? অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে।
[সুরা নুহ : ১৩-১৪]

ভ্রূণ বেড়ে ওঠার প্রথম ধাপ নিয়ে আপনি অবাক হবেন। কুরআনুল কারিম প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন হওয়ার স্থান হিসেবে بطن (উদর/গর্ভ) শব্দ ব্যবহার করেছে, যা খুবই যথার্থ হয়েছে। (জরায়ু বা গর্ভাশয় বলেনি। কারণ

CamScanner

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, প্রথম ধাপটি পেটের ভেতরে, জরায়ুর বাইরে সম্পন্ন হয়ে থাকে।) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾

> তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করেন যে, তিন অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজনস্তর অতিক্রম করো। [সুরা যুমার : ৬]

আর বাস্তবেও ভ্রূণকে তিনটি প্রকাশ্য স্তর বা আবরণ পরিবেষ্টন করে রাখে।

কুরআনুল কারিম বিস্তারিতভাবে ভ্রূণগঠনের বিভিন্ন ধাপ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছে এবং বাস্তবেই সেগুলো ভ্রূণগঠনের প্রকৃত স্তরের সাথে হুবহু মিল রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

> ১২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ দ্বারা।
>
> ১৩. তারপর তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি।
>
> ১৪. তারপর আমি সেই শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দিই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান! [সুরা মুমিনুন : ১২-১৪]

মাতৃগর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ একটি জমাট রক্তের (Leech-like Embryo) মতো অবস্থান করে। এই সময়ে তার আকৃতির উল্লেখযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত হয় না। সেটা নিছক একটি লম্বাটে আকৃতি নিয়ে অবস্থান করে। তাতে কোনো স্পন্দিত কলব বা হার্ট থাকে না। তখন সেটি যার

সাথে সংলগ্ন থাকে, তার রক্ত থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাতৃগর্ভে এটি ভ্রূণের একদম প্রাথমিক অবস্থা। এরপর ধীরে ধীরে তার প্রাথমিক অঙ্গগুলো গঠিত হতে থাকে। তখন ভ্রূণ কিছুটা কুঁকড়ে ভাঁজযুক্ত হয়। তার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ভাঁজ ও সংকোচনের সৃষ্টি হয়। শারীরিক অবয়ব স্পষ্ট হতে থাকে, যেটা আসলে প্রথমে মেরুদণ্ডের হাড় গঠন করে। সেটার অবস্থা তখন যেন মানুষের মুখের মধ্যে প্রথম দাঁতের সৃষ্টি হওয়ার মতো অথবা একটি গোশতের টুকরার মতো। এ সময় ভ্রূণটা এমন অবয়ব ধারণ করে, দেখে মনে হবে যেন তাকে চিবানো হয়েছে। এভাবে সেটা একটি আকৃতির দিকে ঝুঁকতে থাকে। সুতরাং এই স্তরে এসে তার যে গঠন হয়, তার পরিচয়ে ﴿مُضْغَةً﴾ বা গোশতপিণ্ড (Chewable mass-like Embryo) খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। এরপর সপ্তম সপ্তাহে অস্থি-হাড় গঠনের সূচনার মাধ্যমে প্রাথমিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো গঠনের স্তরটি সমাপ্ত হয়। এরপর অষ্টম সপ্তাহে এসে মাংসপেশী সেগুলোকে আবৃত করে নেয়। এই অবস্থাকেই আল্লাহ তাআলা ব্যক্ত করেন এভাবে,

﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا﴾

তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই।' [সুরা মমিনুন : ১৪]

এটা খুবই অসাধারণ এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এর আগে অন্য কোনো গ্রন্থে, এমনকি কোনো ঐশী গ্রন্থেও এই বর্ণনা উপস্থাপিত হয়নি। এভাবে অষ্টম সপ্তাহে প্রাথমিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (Organogenesis) গঠনের স্তর সমাপ্ত হয়। আর মূলত সপ্তম সপ্তাহের পরে প্রাথমিক আকৃতি সম্পন্ন হওয়ার পর ভ্রূণটি ধীরে ধীরে মানবাকৃতি ধারণ করতে থাকে। এরপর আর নতুন কিছু গঠিত হওয়ার বাকি থাকে না। বরং শুধু আকৃতিটা বাড়তে থাকে, গঠনটি সামঞ্জস্যশীল হতে থাকে এবং মাথা ও শরীরের মাঝে যোগসূত্র তৈরি হতে থাকে। এই অবস্থাটিকে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন এভাবে,

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ﴾

তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান! [সুরা মমিনুন : ১৪]

এখন একজন স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও দৃঢ় বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে, বিষয় থেকে সামান্যতম বিচ্যুত না হয়ে এ সকল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নিয়ে কুরআনুল কারিম এমন সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা না দেখে এগুলোর এমন নিখুঁত বর্ণনা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ অন্যরা এটা জেনেছে এই কিছুদিন আগে, বৈজ্ঞানিক রেনেসাঁসের যুগে এসে। বিশেষ করে সর্বশেষ তিন শতাব্দীতে। এ কারণে ইসলামে ত্রুটি অন্বেষণকারীরা যে-সকল কথা বলে, তারা অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও বিজ্ঞানের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এবং কুরআনুল কারিমে বর্ণিত ওহির প্রমাণাদি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণের কারণে এ সকল কথা বলে।[২৮১]

এ ছাড়া আমরা যদি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত বিজ্ঞানবিষয়ক আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, তখন সেখানে বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মতো চমৎকার সব বিষয় পাই। যেমন আমরা দুধভাইয়ের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার হিকমত এবং এই আয়াতের মধ্যে যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সূত্র রয়েছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি। আমরা জানি, কুরআনুল কারিম দুধভাইকেও রক্তের সম্পর্কের আপন ভাইয়ের মতো সাব্যস্ত করেছে। এ কারণে দুধভাইয়ের জন্য দুধবোনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজী, তোমাদের ভাগনি, তোমাদের সেই সকল মা, যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোন।

[সুরা নিসা : ২৩]

---

[২৮১]. ড. মুহাম্মদ দাহদুহ। কলাম : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾। বিস্তারিত পড়তে : https://bit.ly/2HSum73

আধুনিক কালের পরীক্ষিত বিজ্ঞান প্রমাণ করে, মায়ের দুধে এমন উপাদান রয়েছে, তিন কি পাঁচ ঢোক পরিমাণ দুধপান করার মাধ্যমে দুধপানকারী সন্তানের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। মানবশিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দুধকে উপযুক্ত ধরা হয়। এমনকি এই পরিমাণ দুধ সদ্যভূমিষ্ঠ অন্য কোনো প্রাণীর মাঝেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করে এবং এমন প্রাণীর ক্ষেত্রেও করে যার শারীরিক গঠন এখনো পূর্ণতায় উপনীত হয়নি। সুতরাং শিশু যখন দুধপান করবে, স্বাভাবিকভাবেই দুধদানকারী নারীর দুধ থেকে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাধ্যমে বিশেষ জিনগত বৈশিষ্ট্য সেই শিশুর মাঝে সঞ্চারিত হবে। আর এই কারণেই সে তার দুধভাই বা বোনের সাথে জিনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে। আর হতে পারে সেই বোনের সাথে দাম্পত্যসম্পর্ক সৃষ্টি হলে এই রোগ প্রতিরোধকারী কণাগুলো তাদেরকে বিভিন্ন রোগের দিকে ঠেলে দেবে।[২৮২]

কুরআনুল কারিমের আলোচ্য আয়াতে এভাবেই আমরা দুধবোনের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার একটি সূক্ষ্ম কার্যকারণ দেখতে পাই। আর হাদিসে এই দুধপানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ ঢোক বা চুমুক।[২৮৩]

এই হলো কুরআনুল কারিমে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার অল্প কিছু নমুনা। এগুলো অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে, এটি এমন এক ওহি, যা আল্লাহ তাআলা শব্দ ও অর্থসহ তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিল করেছেন। এগুলো নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জাহানের মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন বান্দা। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনুল কারিমের এই চিরন্তন মুজিজা বা অলৌকিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। সে সকল পণ্ডিতদের মধ্যে

---

২৮২. 'জাদিদুল ইলম' (আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক) ওয়েবসাইট : এখানে ড. মার্ক কোরিগান (Mark Corrigan) শিশুদের ওপর মায়ের দুধের প্রভাব প্রমাণ করেন।

২৮৩. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে কুরআনুল কারিমের নাজিলকৃত বিধানে হারাম হওয়ার জন্য দশ চুমুক বিধান ছিল। পরে জ্ঞাত পাঁচ চুমুকের মাধ্যমে সেটা রহিত হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের এই বিধানের ওপর রেখেই ইনতেকাল করেছেন। সূত্র : *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫২।

CamScanner

একজন হলেন এমিল ডারমেনহেম (Emule Dermenghem)। তিনি কুরআনুল কারিম সম্পর্কে বলেন,

> সকল নবীরই তার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ থাকে এবং তার এমন একটি মুজিজাও থাকে, যার মাধ্যমে তিনি অন্যদের চ্যালেঞ্জ করতে পারেন... আর কুরআন হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ধরনের মুজিজা। এর বিস্ময়কর বর্ণনারীতি এবং আলোচনার শক্তিমত্তা আমাদের যুগের পাঠকের অন্তরকেও প্রশান্ত করে দেয়, যদিও সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতি এবং জিনজাতিকে এমন একটি রচনা উপস্থাপনের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন। আর এই চ্যালেঞ্জটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ।[২৮৪]

---

২৮৪. এমিল ডারমেনহেম : *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ২৮৯।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ইতিহাস বর্ণনার অলৌকিকতা

কুরআনুল কারিম অতীত ব্যক্তিদের ইতিহাস বর্ণনায় অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এগুলোর মাধ্যমে তার বিরোধিতাকারীদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এ কারণে কুরআনুল কারিম এমন জনগণের জীবন সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে, যারা হাজার বছর ধরে প্রজন্ম পরিক্রমায়, দীনহীন ভোগবিলাস ও শৌখিনতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। অথচ কোনো ঐতিহাসিকই ইতিহাসের এই দিকে এতদূর পৌঁছাতেই পারেনি, তার বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ প্রদান তো দূরের কথা।

কুরআনুল কারিম অনেকগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস বর্ণনা করেছে। স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তার উদ্দেশ্য নিছক কোনো সান্ত্বনা প্রদান বা সময় পার করা নয়; বরং এ সকল ঘটনা উপস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপদেশ ও ইবরত বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

নিশ্চয় তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে। এটা এমন কোনো বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

কুরআনুল কারিমের ঐতিহাসিক অলৌকিকতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন, এই কুরআন বর্ণনা করেছে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা ও অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস এবং যুগে যুগে আবর্তিত বিভিন্ন ধর্মের বিবরণ। আহলে কিতাবদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হাতেগোনা কিছু ধর্মগুরু ছাড়া এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে আর কেউ জানত না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অজানা অনেক

ঘটনাগুলো নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর যথাযথ বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন অথচ তিনি ছিলেন একজন উম্মি, পড়তে ও লিখতে জানতেন না।[২৮৫]

মানুষ আসলে মানুষই, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে, হয়তো সামনে আরও বহু শতাব্দী আসবে, কিন্তু কিছুতেই মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হওয়ার নয়। তার মৌলিকতা বদল হওয়ার নয়। এ কারণে কুরআনুল কারিম নবীদের বিবরণের সাথে সাথে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনাও সংরক্ষণ করেছে। বহু যুগ-শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর কুরআনুল কারিম আবার নতুনভাবে তাদের কথা মানুষের সামনে এনেছে, যাতে করে একই রোগে আক্রান্ত মানুষেরা এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। কুরআনে বহু ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সামাজিক সে সকল ব্যাধি ও রোগের চিকিৎসার জন্য এবং শিক্ষা ও সতকর্তার মাধ্যমে এর রোগজীবাণুগুলো দূর করার জন্য।[২৮৬]

উদাহরণ হিসেবে আমরা হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করতে পারি। কুরআনে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। ঘটনার শুরু হয়েছে এভাবে—নুহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সীমাহীন হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। অল্পসংখ্যক মানুষই তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে তিনি জাহাজ বানানো শুরু করেন। পূর্বপ্রতিশ্রুত সেই মহাপ্লাবনের সময় মুমিনরা তাতে আরোহণ করেন। আরও আছে মহাপ্লাবনের ভয়াবহ বর্ণনা। নুহ আ.-এর ছেলে ও স্ত্রীর নিমজ্জিত হওয়া এবং এরপর পৃথিবীতে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম এবং মুমিনদের কর্তৃত্ব ও বসবাস শুরু এসব ঘটনার বিস্তারিত নির্ভুল বিবরণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে জানতে পারলেন? যেখানে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে শুধু ঘটনার কিছু দিক বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য দিকগুলো সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছুর বিবরণ দিয়েছেন পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে। এ কারণে আমাদের প্রতিপালক নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনার সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে,

---

২৮৫. জালালুদ্দিন সুয়ুতি : *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন* : ২/৩২৩।
২৮৬. ইমাম গাজালি : *নাজারাত ফিল কুরআন* : ৯৫-৯৮।

CamScanner

﴿تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

(হে নবী,) এগুলো গায়েবের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি ওহির মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি। এসব বৃত্তান্ত আপনিও ইতিপূর্বে জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করুন। শেষ পরিণাম মুত্তাকিদেরই অনুকূলে থাকবে। [সুরা হুদ : ৪৯]

কুরআনুল কারিমের ঘটনাগুলোর মধ্যে এই যে ঘটনার নিশ্চিত বিবরণ এবং নির্ভুল ইতিহাস, এটাই প্রমাণ করে, কুরআনুল কারিম তার ঐতিহাসিক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে এক মহাবিস্ময়। এর মাঝে রয়েছে অসংখ্য বিবরণ, যেগুলো অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং মানুষের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে।

কুরআনুল কারিমের ঐতিহাসিক অলৌকিতার বিবরণের মধ্যে আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো, কুরআনের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালাম ও ফিরাউনের সাথে হামানের নাম উল্লেখ করা এবং হামানকে ফিরাউনের একজন নৈকট্যশীল হিসেবে উপস্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের ভাষায় বলেন,

﴿فَأَوْقِدْ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

আর হে হামান, তুমি আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি জ্বালাও (অর্থাৎ ইট তৈরি করো) এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত তৈরি করো, যাতে আমি তার ওপর উঠে মুসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমি মনে করি সে একজন মিথ্যাবাদী।

[সুরা কাসাস : ৩৮]

কুরআনুল কারিম হামানের যে চিত্র তুলে ধরেছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের এক গ্রন্থে[২৮৭] তার বিপরীত চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সেই গ্রন্থে হামানকে বাবেলের (ইরাক) এক বাদশার সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

---

২৮৭. كتب اليهود المقدسة (ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ)

এবং সে বনি ইসরাইলের অনেক ক্ষতি সাধন করে। অথচ এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ইনতেকালের প্রায় এগারোশ বছর পর। কিন্তু ফিরাউনকেন্দ্রিক বর্তমান সকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কার কুরআনুল কারিমের বর্ণনাকেই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করছে। বিভিন্ন লিখিত বর্ণনা এবং হাইরোগ্লিফিক চিত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচয় তুলে ধরেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রাচীন মিশরীয় লিপিগুলোতে হামানের নাম এসেছে। যে পাথরের ওপর তার নাম অঙ্কিত, সে পাথরটি বর্তমানে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত হফ (هوف) জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এমনইভাবে তার নাম উল্লেখিত হয়েছে معجم أسماء الأشخاص في الإمبراطورية الجديدة বা Dictionary of personal name of the New Empire সংকলন গ্রন্থে, যেটা লিখিত হয়েছে প্রাচীন মিশরের সকল পাথর ও ফলকে অঙ্কিত জ্ঞাত নামগুলোর ওপর ভিত্তি করে। সেখানে হামানের দায়িত্বের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হামান পাথর তোলার স্থানে কর্মী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।[২৮৮]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরের শাসনকর্তার উপাধি হিসেবে 'মালিক' শব্দ ব্যবহার করাটাও কুরআনুল কারিমের আরেক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক বিবরণ।[২৮৯] আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾

বাদশা বলল, আমি দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভি...।

[সুরা ইউসুফ : ৪৩]

এই আয়াতে মিশরের বাদশাহকে 'মালিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এই একই শাসকের ক্ষেত্রে তাওরাত 'ফিরাউন' উপাধি ব্যবহার করেছে। কিন্তু হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ের শাসকের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমে 'ফিরাউন' উপাধি ব্যবহার না করার কারণ হলো, সেই সময়ে (হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ে) মিশরের শাসকের জন্য 'ফারাউ' (এটাই ছিল 'ফিরআউন' এর আসল উপাধি)

---

২৮৮. হারুন ইয়াহইয়া : *আল-মুজিজাতুল কুরআনিয়্যা* : ৭১, ৭২।
২৮৯. সুরা ইউসুফ : ৪৩, ৫০, ৫৪, ৭২।

উপাধি ব্যবহার করা হতো না। বরং তখনকার সম্রাট নিজেকে 'মালিক' (রাজকীয় প্রাসাদের মালিক) উপাধিতে পরিচয় প্রদান করতেন। আর মিশরের শাসকের জন্য 'ফিরাউন' উপাধি ব্যবহার শুরু হয় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইনতেকালের অন্তত দুইশ বছর পর থেকে।[২৯০]

এই হিসেবে মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরের শাসকের উপাধি 'ফিরাউন' ব্যবহার করা হতো। এটাই সঠিক ব্যবহার। এভাবেই কুরআনুল কারিমের ঐতিহাসিক অলৌকিকতা প্রকাশিত হয়। বিষয়টা ছিল খুবই সূক্ষ্ম এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে কুরআনুল কারিম শুধু মুসা আলাইহিস সালামের সময়ের শাসকের ক্ষেত্রে 'ফিরাউন' উপাধি ব্যবহার করেছে, তার আগের শাসকের ক্ষেত্রে এই উপাধি ব্যবহার করেনি। অথচ তাওরাতে বাছবিচার ছাড়াই ব্যাপকভাবে ইবরাহিম, ইউসুফ ও মুসা আলাইহিমুস সালামের যুগের মিশরের সকল শাসকের ক্ষেত্রে 'ফিরাউন' উপাধি এসেছে। বাস্তবতা হলো, মিশরবাসী ইবরাহিম ও ইউসুফ আলাইহিমাস সালামের যুগের মিশরের শাসকদের ক্ষেত্রে 'ফিরাউন' উপাধি ব্যবহার করত না।[২৯১]

আমাদের এই আলোচনাটি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহ.-এর একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়ে সমাপ্ত করতে চাই। তিনি বলেন, এ সকল ঘটনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি ছিলেন একজন উম্মি, কোনো কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং কোনো শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেননি। তাই তিনি যখন কোনো ধরনের বিকৃতি ও ভুল ছাড়া এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন, তাহলে বোঝা যায়, এগুলো তিনি কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। আর এটাই তাঁর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।[২৯২]

---

২৯০. অথচ এদিকে 'বিট্রিশ এনসাইক্লোপিডিয়া' জানাচ্ছে, 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করা হতো সেই সকল যাযাবর গোত্রের লোকদের ক্ষেত্রে, যারা ১৬৪৮ থেকে ১৫৪০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস সালামের মিশরে আগমনের সময়ে জোর করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল।

২৯১. হারুন ইয়াহইয়া : *আল-মুজিজাতুল কুরআনিয়্যা* : ৭৪, ৭৫।

২৯২. ইমাম রাজি : *মাফাতিহুল গাইব* : ১৪/১১৯।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ভবিষ্যৎ বর্ণনায় অলৌকিকতা

কুরআনুল কারিমের অলৌকিকতার উজ্জ্বলতম প্রমাণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তার ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ কুরআনুল কারিম এমন কিছু বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছে, যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এবং কুরআনুল কারিম যেভাবে যা সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেছিল, তা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে, তার কোনো পরিবর্তন বা অন্যথা হয়নি। কোনো মানুষের জন্য কিছুতেই এটা সম্ভব না। অথচ কুরআনুল কারিমে এ ধরনের অনেক বিষয় রয়েছে। আমরা সেগুলোর মাত্র কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করার ইচ্ছা রাখি, যাতে অন্যগুলোর সাথে এগুলোও প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভবিষ্যৎ বর্ণনার অলৌকিকতার উদাহরণ হিসেবে কুরআনুল কারিমের নিচের আয়াতগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الٓمٓ ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ۝ فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾

১. আলিফ-লাম-মিম। ২-৩. রোমানরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয় অর্জন করবে। ৪. বছর কয়েকের মধ্যেই। সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। ৫. আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়ের কারণে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও বটে। [সুরা রুম : ১-৫]

মূল ঘটনা হলো, অগ্নিপূজক পারস্যজাতি আহলে কিতাব খ্রিষ্টান রোমানদের পরাজিত করে। তখন মক্কায় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিদের এটা শুনিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। বলতে থাকে, অগ্নিপূজক রোমানরা যেমন কিতাবধারী খ্রিষ্টানদের

পরাজিত করেছে, আমরাও তেমন কিতাবধারী তোমাদের পরাজিত করব। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো নাজিল করেন। এতে আরবদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয় এবং মুমিনদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়। কারণ, এতে অন্তত কিতাবের প্রতি ঈমান স্থাপনকারী লোকদের বিজয় অর্জিত হবে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার আগ্রহের বিষয় হলো, কুরআনুল কারিম এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে। ওই সময়ের কেউ এটাকে পরিবর্তন করতে পারেনি কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতেও সক্ষম হয়নি। এটা অতি অবশ্যই কুরআনুল কারিমের একটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্‌বাণী, যার মাধ্যমে কুরআন তার সকল বিরোধীকে এবং অস্বীকারকারীকে চ্যালেঞ্জ করেছে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, সেটাই সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ অবশেষে রোম পারস্যের ওপর বিজয়ী হয়। এদিকে আরবে তখন চলছিল বদরের যুদ্ধ, যেখানে মুমিনরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।[২৯৩]

কুরআনুল কারিমের যে আয়াতগুলো মক্কার দুর্বল মুসলমানদের ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করেছিল, অচিরেই তারা তাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী হবে এবং তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, সে আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾

(সত্য কথা এই যে,) এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে। [সুরা কমার : ৪৫]

ইবনে কাছির রহ. তার তাফসিরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন হজরত উমর রা. বললেন, কোন দলটি পরাজিত হবে? আর কোন দলটি বিজয়ী হবে? এরপর যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো, সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে হজরত উমর রা. বললেন, আমি দেখলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ম পরে আছেন আর মুখে বলছেন,

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾

এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে।

---

২৯৩. ওয়াহিদি : *আসবাবুন নুজুল* : ২৩১, ২৩২।

উমর রা. বলেন, ওইদিন আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝতে পারলাম।[২৯৪]

ভবিষ্যদ্‌বাণীর অলৌকিকতার আরেকটি ঘটনা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশ এবং পবিত্র কাবার তাওয়াফ করার অগ্রিম সুসংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

> বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা (কিছু সংখ্যক) মাথা কামানো থাকবে এবং (কিছু সংখ্যক) থাকবে চুল ছাঁটা। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না, আল্লাহ এমন সব বিষয় জানেন, যা তোমরা জানো না। সুতরাং সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগে স্থির করে দিলেন এক আসন্ন বিজয়। [সুরা ফাতহ : ২৭]

হুদাইবিয়া থেকে ফেরার সময় এই আয়াত নাজিল হয়।

ইমাম ইবনে কাছির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয়, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। পরে তিনি এই স্বপ্নের কথা মদিনায় সাহাবিদের বললেন। এরপর তারা যখন হুদাইবিয়ার বছরে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন, তাদের সকলেই প্রবল ধারণা করল, এই বছরই সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। এরপর হুদাইবিয়ায় যা ঘটার তা তো ঘটল। তাদের বাধা প্রদান করা হলো। সন্ধি সম্পাদিত হলো। এই বছর তাদের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েই মদিনায় ফিরে আসতে হলো, এই শর্তে যে, আগামী বছর তারা আবার আসবে। অর্থাৎ তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এ কারণে কিছু সাহাবির অন্তরে কিছু সংশয় সৃষ্টি হলো। এমনকি

---

২৯৪. ইবনে কাছির : *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম* : ৭/৪৮২।

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাদের সংবাদ প্রদান করেননি, আমরা বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব?'

উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাকে সংবাদ দিয়েছি। কিন্তু কোন বছর আমরা আসব তা কি বলেছি?'

উমর রা. বললেন, 'না।'

নবীজি বললেন, 'তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং তাওয়াফ করবে।'[২৯৫],[২৯৬]

এই প্রতিশ্রুতি পরের বছরই বাস্তবায়িত হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর সকল সাহাবি ঠিক সেভাবেই ওমরা পালন করেন, যেভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। অর্থাৎ মাসজিদুল হারামে নিরাপদে তাওয়াফ করা, মাথা মুণ্ডানো, চুল ছাঁটা। আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের সপ্তম বছরে, জিলকদ মাসে।[২৯৭]

নিশ্চয় কুরআনুল কারিম যেভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে এবং সুসংবাদ প্রদান করেছে, কোনো ধরনের ব্যতিক্রম এবং সময়ের হেরফের না হয়ে মুসলমানদের জীবনে সেই বিষয়গুলো হুবহু সেভাবেই সংঘটিত হওয়া, স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলার কথা এবং তাঁর রাসুলের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

যেমন কুরআনুল কারিম মুসলমানদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাদের খিলাফত কায়েম করার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى

---

২৯৫. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১, ২৭৩২।
২৯৬. ইবনে কাছির : *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম* : ৭/৩৫৬।
২৯৭. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/২৭০।

لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। [সুরা নুর : ৫৫]

পঁচিশ বছরেরও কম সময়ে মুসলমানদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। চারপাশে তাদের একের পর এক বিজয় অর্জিত হয়েছে। সকলে তাদের আনীত মূল্যবোধ ও সভ্যতায় অবগাহন করেছে। তাদের খিলাফত বিস্তৃতি লাভ করেছে পূর্বে চীন এবং পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর পর্যন্ত। এমনকি উত্তরে ইউরোপ পর্যন্ত তাদের খিলাফত বিস্তৃতি লাভ করে।

এই হলো কুরআনুল কারিমের অসাধারণ অলৌকিকতার কিছু দিক। এগুলো এমনই অলৌকিক, যার অলৌকিকতা বা বিস্ময় কখনো শেষ হবার নয়। বারবার জানা ও চর্চার মাধ্যমেও যেগুলো কখনো জীর্ণ ও মলিন হবে না। এটি এমনই এক গ্রন্থ, যার কোনো প্রান্তেই কোনো ভুল-ভ্রান্তি-বিচ্যুতি বা ত্রুটি নেই। অবশ্যই এটি সর্বদিক দিয়ে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন মুজিজা হওয়ার উপযুক্ত।

CamScanner

অলৌকিক বিধানের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, এটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে নৈকট্য স্থাপন করতে সক্ষম। এটি তার কার্যকারিতার মাধ্যমে সম্পদকে বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। এ কারণে এখন আর সম্পদ শুধু কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণেই আবর্তিত হয় না। যিনি আজকে অনেক ধনী, এক কি দুই প্রজন্মের পরই তার সম্পদ তার সন্তানসন্ততি, নাতি-নাতনি এবং নিকটাত্মীয়দের নিকট স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। আর প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় যে ব্যক্তিটি আজ নিঃস্ব ও দরিদ্র, হয়তো তার সন্তানদের দ্বিতীয় প্রজন্মে কিংবা তার সময়েই সে তার বংশধরকে মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হতে দেখবে। এটা হতে পারে, নিজের কোনো নিকটাত্মীয়ের ইনতেকালের মাধ্যমে কিংবা এমন কোনো নারীকে বিবাহের মাধ্যমে, যার অনেক সম্পদ রয়েছে। এভাবে কেউ কেউ তার নিজের জীবনেও বহু সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়।[২৫৫]

তা ছাড়া কুরআনের উত্তরাধিকার আইনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখি। পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পিতা এবং স্ত্রী উত্তরাধিকারী হয়। মেয়ে তার আপন বোন কিংবা বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে উত্তরাধিকারী হয়। আর যে-সকল ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্ত হয় না, কুরআনুল কারিম তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ওসিয়তের মাধ্যমে সম্পদ প্রদানের প্রতি আহ্বান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্থসম্পদ রেখে যায়, তবে যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন নিজ পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষে ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করবে। এটা মুত্তাকিদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

---

২৫৫. কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত الإعجاز العلمي في القرآن والسنة তথা *'কুরআন ও হাদিসের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা'* শীর্ষক অষ্টম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আহমাদ ইউসুফ সুলাইমান কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ– الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي : পৃষ্ঠা : ১২৫-১২৬।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা

আল্লাহ তাআলা এই শরিয়ত প্রদান করেছেন কিছু শব্দের অধীনে। তিনি এই শব্দগুলোকে করেছেন বিস্ময়কর ও বিমুগ্ধকর। আপনি বিশুদ্ধ নিয়তে এবং পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে আল্লাহ তাআলার কিতাবের যেখানেই দৃষ্টি দেবেন, প্রতি আয়াতের মাঝেই আপনি একটি সুউচ্চ বিস্ময় এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাবেন। এগুলো পরিদৃষ্ট হবে কুরআনের বর্ণনা-বক্তব্যের মাঝে, তার প্রদত্ত অর্থের মাঝে। এরই মাধ্যমে মুসলিমরা শরিয়তের হুকুমগুলো এমন বিস্ময়কর উজ্জ্বল আলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে, যার আলো সকল প্রান্তর ও অন্তরকে উদ্ভাসিত করে। তার পরশে বক্ষসমূহ উন্মোচিত ও উৎসারিত হয়। আর অন্তরগুলো ঈমানের জন্য হয় উন্মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾

> বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসিবে কোনো আলো নেই। [সুরা নুর : ৪০]

মানুষের মন ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে কুরআনে এমন অনেক সূক্ষ্ম বিবরণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে, যা শুধু সৃষ্টিকর্তাই জানতে পারেন। এ কারণে মানুষের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কুরআনুল কারিমের গভীর ভূমিকা রয়েছে। মনের ব্যাপারে কুরআনের আলোচনা কয়েক প্রকার, তন্মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকারটি হলো, মন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, মনের ওপর কুরআনুল কারিমের প্রভাব এবং মনের সকল পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা ইত্যাদি।

সুতরাং কুরআনুল কারিমে মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতার বিষয়টা এই যে, কুরআনুল কারিমের আয়াতগুলো দৃষ্টি প্রদান করেছে মানুষের সকল শ্রেণি এবং তাদের সকল অবস্থার দিকে, তাদের অন্তরের সকল গোপন বিষয় এবং তাদের সকল প্রতিবন্ধকতার দিকে। কখনো কখনো মুসলমানদের শত্রুদের প্রতিও ইশারা করেছে এবং কোনো আয়াত যখন কোনো দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরেছে, তখন তার সকল অবস্থা তথ্যসহ তুলে ধরেছে।

CamScanner

সেগুলোর জন্য স্পষ্ট এবং নির্ধারিত সীমারেখা এঁকে দিয়েছে। এভাবে মানুষের অন্তরের মধ্যে কুরআনুল কারিম একটি প্রশান্তিদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

কুরআনুল কারিমের এ ধরনের অলৌকিকতার বিষয়ে প্রথম যিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি হলেন ইমাম খাত্তাবি রহ. (মৃত্যু : ৩৮৮ হিজরি)। তিনি তার আলোচনার শিরোনাম দেন: تأثير القرآن في القلوب অর্থাৎ অন্তরে কুরআনের প্রভাব। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন, কুরআনুল কারিমের আরেকটি অলৌকিক দিক রয়েছে। ব্যতিক্রম দু-একজনের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে একদম অবগত নয়। বিষয়টা হলো, অন্তরে কুরআনুল কারিমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি। আপনি কুরআন ব্যতীত এমন কোনো গদ্য-পদ্য পাবেন না, যা শুনলেই সর্বাবস্থায় আপনার অন্তর তার স্বাদ ও মিষ্টতার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। একমাত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে। এর শোভা-সৌন্দর্য এবং ভীতি ও সতর্কতার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ রয়েছে। কুরআনের মাধ্যমে অন্তরসমূহ সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়, বক্ষসমূহ সম্প্রসারিত হয় আর অন্তরসমূহ যখন কুরআনের কোনো অংশ নিজের মধ্যে ধারণ করে, অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। অন্তরে ভয় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্তর হয় বিচলিত। জাহান্নামের ভয় ও শঙ্কা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। শরীরের চামড়া কাঁপতে থাকে। অন্তরসমূহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এটা তখন ব্যক্তি এবং তার গোপন বিষয়াবলির মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আরবের কত বীর সাহসী ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোপনে কিংবা প্রকাশে হত্যার ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেও যখন তারা কুরআনের কিছু আয়াত শুনেছে, অমনি তারা তাদের পূর্ব ইচ্ছা থেকে ফিরে এসেছে। অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে। শত্রুরা শান্তিস্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অবশেষে তারা কুরআনের ধর্মে প্রবেশ করেছে। তাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। আর তাদের কুফরি রূপান্তরিত হয়েছে ঈমানে।[২৯৮]

পৃথিবীর অনেক আলেম অন্তরে কুরআনুল কারিমের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম জারকাশি রহ. বলেন, কুরআনুল

---

২৯৮. খাত্তাবি : সালাসু রাসায়িলা ফি ইজাজিল কুরআন : ৬৪।

CamScanner

[redacted]

কারিমের এই অসাধারণ সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব শ্রোতা এবং পাঠকদের অন্তরে অনেক প্রভাব ফেলে। সেই ব্যক্তি কুরআনে বিশ্বাসী হোক কিংবা না হোক। আরেকটি বিস্ময় হলো, শ্রোতাদের কানে এবং পাঠকদের জিহ্বায় এটা সব সময়ই সজীব ও সতেজ মনে হতে থাকে।[২৯৯]

ওহিকে বলা হয় অন্তরের প্রাণ। আর দেহের প্রাণের চেয়ে অন্তরের প্রাণ শ্রেষ্ঠ।

কাজি ইয়াজ[৩০০] বলেন, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব, আরবের অনেক কাফেরের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কুরআনুল কারিমে রয়েছে এমন এক চমৎকারিত্ব, যা শ্রবণের সময় শ্রোতাদের অন্তরসমূহকে নিমগ্ন করে। তিলাওয়াতের সময় এর প্রভাব তাদের পুরো সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পৃথিবীর অনেক মানুষ শুধু এর আয়াত শুনেই ইসলামগ্রহণ করেছে। যেমন হজরত যুবায়ের ইবনে মুতইম রা.। তিনি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিব নামাজে সুরা 'তুর' তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি বলেন, সুরাটি পড়তে পড়তে নবীজি যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾

৩৫. তারা কি কারও মাধ্যম ছাড়াই আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?

৩৬. নাকি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না, বরং (মূলকথা হচ্ছে) তারা বিশ্বাসই রাখে না।

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদের কাছে, না তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক? [সুরা তুর : ৩৫-৩৭]

---

২৯৯. জারকাশি : *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন* : ২/১০৭।

৩০০. কাজি ইয়াজ। মালিকি মাজহাবের একজন বড় শাইখ (৪৪৬-৫৪৪ হি.)। তিনি বহু বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেমন, الشفاء، شرح مسلم، مشارق الأنوار ইত্যাদি। মদিনায় ইনতেকাল করেন। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ১২/২২৫।

CS CamScanner

এগুলো শুনে আমার অন্তর যেন উড়ে গেল। ইসলাম আমার অন্তরে প্রভাব ফেলার এটাই প্রথম ঘটনা।[৩০১]

মানবমনের বিভিন্ন রোগ ও ব্যাধির চিকিৎসা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রেও কুরআনুল কারিমের এই মনস্তাত্ত্বিক বিস্ময়কর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

> আমি নাজিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শিফা ও রহমত। তবে জালিমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮২]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

> হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হেদায়েত ও রহমত। [সুরা ইউনুস : ৫৭]

মানুষের শারীরিক চিকিৎসা করা হয় খাদ্য ও ওষুধের মাধ্যমে। আর আত্মার চিকিৎসা হয় তারই মতো কিছু আত্মিক বিষয় দ্বারা যা তাদের অন্তরের মধ্যে যে-সকল অন্যায় বিষয় উত্থিত হয়, সেগুলোকে দমন করবে। কুরআনুল কারিমও ঠিক সেটাই করে। সুতরাং কুরআনের মধ্যে রয়েছে অন্তরের শিফা, নিরাময় ও প্রতিষেধক। আর কুরআনের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য রহমত, যাদের অন্তরের সাথে মিশ্রিত হয়েছে ঈমানের প্রফুল্লতা। পরিণামে তাদের অন্তর হয়েছে আলোকিত। কুরআনের মাঝে নিহিত আরাম-প্রশান্তি, নিরাপত্তা, শান্তি এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য তাদের অন্তর হয়েছে উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত।

---

৩০১. কাজি ইয়াজ : *আশ-শিফা বি-তারিফি হুকুকিল মুসতাফা* : ১/২৭৪।

কুরআনের মাঝে আরও রয়েছে অন্তরের ওয়াসওয়াসা, দ্বিধা, অস্থিরতা ও পেরেশানি থেকে পরিত্রাণ। রয়েছে অতি দুঃখ এবং প্রচণ্ড কষ্ট থেকে মুক্তির উপায়। কুরআন তার অমিয় বাণীর মাধ্যমে অন্তরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। তখন অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। কষ্ট প্রশমিত হয়। হৃদয়ে শান্তি আসে। অন্তর তখন এক অপার্থিব সহায়তা ও নিরাপত্তা অনুভব করে এবং সন্তুষ্ট থাকে। ফলে জীবন সম্পর্কে আল্লাহপ্রদত্ত সন্তুষ্টি দ্বারা সে শান্তি লাভ করে। কেননা, অস্থিরতা হলো ব্যাধি, পেরেশানি হলো ক্লান্তি আর ওয়াসওয়াসা হলো রোগ।

এভাবেই কুরআনুল কারিম মুমিনদের জন্য রহমত বলে গণ্য হয়। কুরআন তার জীবন পালটে দেয়। কারণ, মানব-অন্তরের ওপর কুরআনের রয়েছে সীমাহীন প্রভাব। একজন কুরআন তিলাওয়াতকারী ক্রন্দনের আয়াত পড়ে ক্রন্দন করে। আবার সুসংবাদের আয়াত তিলাওয়াত করে আনন্দিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতার ক্ষেত্রে এটাই হলো কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এ ছাড়া কুরআনুল কারিম চিন্তা ও দর্শনের বিভিন্ন বিরূপ ঝোঁক থেকেও নিরাপদ রাখে। তার মস্তিষ্ককে বিভিন্ন সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত রাখে। তার অস্থিরতা ও নিরাশাকে ফলদায়ক কর্মের দিকে ধাবিত করে। অনর্থক ও অনুপকারী বিষয়ে শক্তি ব্যয় করা থেকে তাকে রক্ষা করে। তাকে প্রদান করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও শক্তিশালী জীবনপদ্ধতি। তার উদ্যমকে করে ফলপ্রসূ এবং নিরাপদ। তাকে রক্ষা করে অন্যায় ও অধঃপতন থেকে।

এমনইভাবে এই কুরআনের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সে সকল বিচ্যুতি ও রোগের নিরাময়, যেগুলো সমাজের সদস্যবৃন্দকে ধ্বংস করে, যেগুলো তাদের নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও স্বস্তি দূর করে দেয়। কুরআনুল কারিমের এই চিকিৎসার কথা অনুধাবন করেছেন ইবনুল কাইয়িম রহ.। এ কারণে তিনি বলেছেন, অন্তরের রোগসমূহের প্রধান উপাদান হলো দুটি, সন্দেহ ও যৌনস্পৃহা। আর কুরআনুল কারিম এই দুটি বিষয়কেই প্রশমিত করে।(৩০২)

৩০২. ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ : ১/২৫০।

কুরআনুল কারিমের মাঝে এমন অনেক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, যেগুলো সত্য-মিথ্যাকে স্পষ্ট করে। সেগুলো জ্ঞান, চিন্তা ও অনুধাবনের দূষিত সন্দেহগুলো বিদূরিত করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কুরআনকে রুহের সাথে তুলনা করে এই বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন। কারণ, রুহ না থাকলে জীবন শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

এভাবেই আমি আমার নির্দেশে আপনার প্রতি ওহিরূপে নাজিল করেছি এক রুহ। ইতিপূর্বে আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং (জানতেন) না ঈমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নুর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়েত দান করি। নিশ্চয় আপনি মানুষকে দেখাচ্ছেন হেদায়েতের সরল পথ। [সুরা শুরা : ৫২]

এই আয়াতের মধ্যে দুটি মৌলিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। রুহ ও আলো। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা অন্তরের প্রাণ ও আলো হিসেবে প্রেরিত তাঁর ওহিকে তুলনা দিয়েছেন আসমান থেকে বর্ষিত সেই পানির সাথে, যা জমিনের প্রাণ এবং সেই আগুনের সাথেও তুলনা করেছেন, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় আলো। আর এগুলো তিনি তাঁর বাণীর মাঝে প্রকাশ করেছেন এভাবে,

﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে, তারপর পানির ধারা স্ফীত ফেনাসমূহ উপরিভাগে তুলে এনেছে। এ রকমের ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এ রকমেরই দৃষ্টান্ত আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন।[৩০৩] [সুরা রাদ : ১৭]

এ ছাড়া কুরআনুল কারিম তার ঐশী অলৌকিক ইশারার মাধ্যমে কিছু মানুষের মনোবৃত্তি প্রকাশ করেছে। যেমন কুরআনুল কারিম আমাদের নিকট চিত্রিত করেছে রাজা-বাদশাদের মনোবৃত্তি। তারাই সবচেয়ে বেশি দরিদ্র, কারণ তাদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ও চাহিদা, তারাই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। মানুষের রক্তপ্রবাহের (মানুষ হত্যা) ওপর আসক্ত থাকে। এগুলো তারা কেন করে? করে, নিজেদের সম্পদের আধিক্যের কারণে কিংবা উচ্চাভিলাষের কারণে। আল্লাহ তাআলা ইয়ামেনের রানির ভাষায় বলেন,

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

রানি বলল, প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে বরবাদ করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদের লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে। [সুরা নামল : ৩৪]

কুরআনুল কারিম এখানে রাজা-বাদশাদের স্বভাব ও চরিত্রের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছে।

এরপর ফিরাউন ও তার জাতির সাথে মুসা আলাইহিস সালামের কথোপকথনের মধ্য দিয়েও কুরআনুল কারিম রাজা-বাদশাদের চরিত্রের অতি বাস্তব এক চিত্র তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

[৩০৩]. ইবনে তাইমিয়া : *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১৯/৯৪।

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ○ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ○ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ﴾

২৩. ফিরাউন বলল, রাব্বুল আলামিন আবার কী? ২৪. মুসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমাদের বাস্তবিকই বিশ্বাসী হও। ২৫. ফিরাউন তার আশপাশের লোকদের বলল, তোমরা শুনছ কি না? ২৬. মুসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। ২৭. ফিরাউন বলল, তোমাদের এই রাসুল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সে একেবারেই উন্মাদ। ২৮. মুসা বলল, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিপালক এবং এ দুইয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুরও, যদি তোমরা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করো। ২৯. সে বলল, (মনে রেখো) তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে গ্রহণ করো, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই যারা জেলে পড়ে আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করব। [সুরা শুআরা : ২৩-২৯]

একইভাবে কুরআনুল কারিম চিত্রিত করেছে খারাপ মানুষদের মনোবৃত্তি। বর্ণনা করেছে তাদের হতাশা, অস্থিরতা, ভয়হীনতা এবং তাদের মতোই খারাপ ব্যক্তিদের দিকে তাদের ধাবিত হওয়ার কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهٗ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدٰى ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হয়রান করে—তার কিছু সঙ্গী আছে, যারা তাকে হেদায়েতের দিকে ডাক দেয় যে, আমাদের কাছে এসো। বলো, আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়েতই

সত্যিকারের হেদায়েত। আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা রাব্বুল আলামিনের সামনে নতিস্বীকার করি।

[সুরা আনআম : ৭১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তাদের ভয় করো না। বরং কেবল আমাকেই ভয় করো। [সুরা আলে ইমরান : ১৭৫]

অন্যদিকে কুরআনুল কারিম ভালো মানুষদের চারিত্রিক মনোবৃত্তিও চিত্রিত করেছে, যারা নিজেদের স্বভাবগত উৎকৃষ্টতা এবং কল্যাণকর্মের মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জন করেন। ভালো কাজের মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে সুউচ্চ করেন। ভালো কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের ভেতর ও বাইরে সুসংগতি রাখেন (তাকওয়া অবলম্বন করেন)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখিরাতেও। [সুরা ইউনুস : ৬৩-৬৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়। [সুরা হুজুরাত : ১০][৩০৪]

---

৩০৪. বিলকাসিম মুহাম্মদ গলি : *মালামিহুল ইজাজিন নফসি ফিল-কুরআনিল কারিম* : ১৭

এ ছাড়া, কুরআনুল কারিমের আরেকটি অসাধারণ চমৎকারিত্ব এবং মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে মানুষের আচরণকে খারাপ থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করার সক্ষমতার মাঝে। কারণ, কুরআনুল কারিম মানুষের কঠিন কঠোর ও রুক্ষ অন্তরগুলোকে দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরে পরিবর্তন করতে সক্ষম। তখন তাদের চোখগুলো কুরআনের আয়াত শ্রবণে অশ্রুপ্রবাহিত করে। এই বিষয়ে আমাদের নিকট রয়েছে হজরত উমর রা.-এর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একইভাবে কুরআনুল কারিম ব্যক্তির স্বার্থপরতা থেকে অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের মানসিকতার দিকে ধাবিত করতেও সক্ষম। এই বিষয়টা প্রকাশ পায় আনসার সাহাবিদের পরিবর্তিত গুণাবলির মাধ্যমে। এ সকল মানুষ জাহেলি যুগে ভয়াবহ সব লড়াই করে বেড়াতো গনিমতের সম্পদ এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য। অথচ কুরআনের সংস্পর্শে এসে তাদের কত পরিবর্তন হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(এবং 'ফাই'-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদিনায়) ঈমানের সাথে অবস্থানরত আছে। যে-কেউ হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যা-কিছু তাদের (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা বোধ করে না এবং তাদের তারা নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তিলাভ করে, তারাই তো সফলকাম। [সুরা হাশর : ৯]

তাহলে বোঝা যায়, কুরআনুল কারিম আমাদের খারাপ আচরণ ও চরিত্রকে ভালো, সুন্দর ও কল্যাণে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

CamScanner

বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল ও সঠিক।
[সুরা ইসরাইল : ৯]

এরকম অনেকভাবেই অন্তরের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমের কার্যকর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। আর এটাই তার অলৌকিকতার ওপর একটি বড় দৃষ্টান্ত। ইসলামে আত্মিক পরিশুদ্ধির চূড়ান্ত মাধ্যম হলো আল্লাহর জিকির। এই জিকির হয়ে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যেমন, অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, বিভিন্ন আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজ ও কথার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপস্থিতি অনুভব করার মাধ্যমে। জিকিরের মধ্যে রয়েছে অন্তরের নিরাময়, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি। কারণ, জিকির বান্দা ও তার রবের মাঝে ছিন্ন সম্পর্কের নবায়ন করে। অন্তরকে তার মূল উৎসের সাথে জুড়ে দেয়। সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দেয়। কারণ, আল্লাহ তাআলাই মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। ফলে তিনিই তার রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবগত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সুরা মুমিন : ৬০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। [সুরা বাকারা : ১৫২]

এমনটি করতে পারলে, পুনরায় হেদায়েতের নুর অন্তরকে প্লাবিত করবে। বিরান অন্তরকে আবাদ করবে। এভাবেই অনুগত বান্দার অন্তরে আল্লাহ তাআলার কালিমাসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

CamScanner

কুরআনুল কারিম অন্তরের আরও যে-সকল ব্যাধির উপশম করে সেগুলো হলো, অন্তরের ওয়াসওয়াসা, অন্তরের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। অন্তরের মাঝে আপতিত বিভিন্ন অন্যায় চিন্তাভাবনা। এগুলো অন্তরের সবচেয়ে মারাত্মক ও শক্তিশালী ব্যাধি। এগুলো মানুষের স্বভাবে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। তাকে মানসিকভাবে কষ্ট দিতে থাকে। কুরআনুল কারিম আশ্চর্যজনক কার্যকরভাবে এই মানসিক ব্যাধির নিরাময় করতে সক্ষম। কিন্তু শর্ত একটাই, কুরআনের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তার পথ অনুসরণ করতে হবে। এ ধরনের মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং সৌভাগ্য অর্জন মূলত আল্লাহর জিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ○ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন যা (সত্যকে) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে দেয় এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়।

[সুরা ইয়াসিন : ৬৯-৭০]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়া ও সতর্কতা লাভ করা তারই হবে, যার অন্তর জীবন্ত। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

নিশ্চয় এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে। [সুরা কাফ : ৩৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও রাসুলের দাওয়াত কবুল করো, যখন তিনি (রাসুল) তোমাদের এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদের জীবনদান করে। [সুরা আনফাল : ২৪]

CamScanner

সুতরাং আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, কুরআন আমাদের যে ঈমান ও আমলের দিকে আহ্বান করে, তার প্রতি সাড়া প্রদানের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবন, আমাদের প্রকৃত বেঁচে থাকা। এটা এজন্যই যে, আত্মিক পরিশুদ্ধির পদ্ধতিসমূহের আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে মুসলিহ পির-মাশাইখ তথা আত্মিক চিকিৎসকদের নিকট। পদ্ধতিটি হলো, আত্মিক রোগী যে অবস্থায় আছে তা শিথিল করার অনুশীলন করানো। যেমন কেউ হঠাৎ রাগান্বিত হয়ে উঠল। সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে তাকে বলা হবে বসে যেতে এবং নিজেকে শান্ত ও শিথিল করতে, যতক্ষণ না তার রাগ চলে যায়। এ ধরনের শিক্ষাকে 'সুলুকের পথ' বলে অভিহিত করা হয়। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি বলেন,

«إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ»

তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে আর সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এভাবে যদি তার ক্রোধ প্রশমিত হয়, তবে ভালো, অন্যথায় তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।[৩০৫]

এ ছাড়া আরও কিছু আত্মিক ব্যাধি রয়েছে যেমন, ক্রোধ, দুঃখবোধ, ভয়, অস্থিরতা ইত্যাদি। নিজের অজান্তেই মানুষ খুব বেশি এসব সমস্যায় আক্রান্ত হয়। কুরআনুল কারিম তার অনেক আয়াতে প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের এসব রোগ থেকে নিরাময়ের আবশ্যকতা বর্ণনা করেছে। মানুষ তো খুব সহজেই শারীরিক অসুস্থতা থেকে নিজেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখতে পারে। কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ সময় কিংবা সারাটা জীবনই আত্মিক এসব ব্যাধির মধ্যে নিমজ্জিত ও নিপতিত থাকে। কারণ, তার জীবনযাপনের অধিকাংশ সময় কোনো দুঃখ, ক্রোধ এবং কষ্টের অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকে না। মানুষের মেজাজ, স্বাস্থ্য ও অনুভূতির তারতম্য অনুযায়ী এই ব্যাধিগুলোর কমবেশও ঘটে। কিন্তু কেউ এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩০৫. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৭৮২, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৩৮৬, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৬৮৮।

CS CamScanner

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

প্রকৃতপক্ষে আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে যেসব ভাবনা-কল্পনা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণরূপে অবগত এবং আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী।

[সুরা কাফ : ১৬]

আপনি দেখতে পাবেন, কুরআনুল কারিম মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করেছে এবং খারাপ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। পরিণামে পুরস্কার ও শাস্তির সংবাদ দিয়েছে। এগুলো কেন করা হয়েছে? করা হয়েছে মানুষের মনোবৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য। মানুষের ওপর যেসব দুর্যোগ আপতিত হয়, তার মনের ওপর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে-সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আনাগোনা করে, সে সকল বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং ইসলামি দর্শন বোঝানোর জন্য। যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা ও তাকদির তথা ভাগ্য বিষয়ের দর্শন। এই বিষয়ে মানুষ খুব বেশি বিভিন্ন ধরনের ভুল ভাবনায় আক্রান্ত থাকে। ইসলামের দর্শন হলো, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও অনিবার্য ভাগ্য বিশ্বাসের অর্থ কিছুতেই অক্ষমতা ও অধঃপতনের নিকট আত্মসমর্পণ নয়, কর্মে ক্ষান্ত দেওয়া নয়। বরং কুরআনুল কারিম আপনাকে সফলতার সকল উপকরণ গ্রহণ করার আহ্বান জানায়, ফলে অন্তর আবার আরেকটি সুযোগপ্রাপ্তির বিষয়ে আশান্বিত ও আগ্রহী হয় এবং কর্মের প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে আমরা হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার দিকে লক্ষ করতে পারি। এখানে স্রষ্টা কর্তৃক মানবপ্রবৃত্তির অসাধারণ চিত্রায়ণ বুঝতে পারলে আমরা কুরআনুল কারিমের মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতার বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হব। সুরাটির সূচনা হয়েছে এমন কিছু অপরাধপ্রবণ অন্তরের উপস্থাপনা দিয়ে, যেগুলোর অভ্যাস হলো অপরাধকে আড়াল করার জন্য কাল্পনিক বিভিন্ন বিষয় সজ্জিত করা। আল্লাহ তাআলা হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভাষায় বলেন,

CamScanner

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾

ইয়াকুব বলল, (এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি। [সুরা ইউসুফ : ১৮]

ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনার বিষয়ে চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তি তার ভাইদের অন্তরে স্বার্থপরতা এবং হিংসার সূক্ষ্ম উপস্থিতি দেখতে পাবে এবং দেখতে পাবে পিতার স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আকুতি। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কর্তৃক রবের রহম থেকে নিরাশ না হওয়া। আরও পরিদৃষ্ট হবে মিশরে সেই সময়ে অনৈতিক কাজের সমর্থনে বিচারকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হওয়া কিছু নারীর মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ এবং হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সংযম। এভাবে কুরআনুল কারিম অনেক ঘটনার মধ্যে 'নফসে আম্মারা' বা কুপ্রবৃত্তিকে প্রতিহত করার বিবরণ তুলে ধরেছে। সম্ভবত মানব-ইতিহাসের প্রথম যে ঘটনার মধ্যে 'নফসে আম্মারা'-র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হলো আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তানের ঘটনা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

পরিশেষে তার মন তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করল, সুতরাং সে তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল এবং সে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [সুরা মায়িদা : ৩০]

একটু গভীর দৃষ্টি প্রদান করলে, কুরআনুল কারিমের মাঝে আরও অনেক স্পষ্ট মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিক প্রভাব দেখতে পাবেন। যেমন, বাদশা নাজাশি[৩০৬] এবং তার পুরোহিতদের প্রভাবিত হওয়া। হাবশায় প্রথম

---

৩০৬. নাজাশি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়; বরং তৎকালীন আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অধিপতিকেই সম্মানসূচক সম্বোধন হিসেবে নাজাশি বলা হতো। তদ্রূপ রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কায়সার, পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কিসরা, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসককে মুকাওকিস এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে খাকান বলা হতো। আলোচ্য নাজাশি

CamScanner

হিজরতের পর বাদশার দরবারে হজরত জাফর ইবনু আবি তালিব রা. যখন বাদশার সামনে সুরা মারয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, তখন এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে। আয়াতগুলো শুনে বাদশা ক্রন্দন করতে থাকেন, এমনকি চোখের পানিতে তার দাড়ি সিক্ত হয়ে যায়। তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে থাকে তার পুরোহিতগণও। তাদের সামনে থাকা কিতাব তাদের চোখের পানিতে ভিজে যায়। এরপর বাদশা নাজাশি সত্তরজন খ্রিষ্টান পণ্ডিতকে মদিনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে সুরা 'ইয়াসিন' তিলাওয়াত করে শোনান। তখন তারা কেঁদে ফেলে এবং ইসলামগ্রহণ করে। আর এই ঘটনার দিকে ইশারা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

এবং রাসুলের প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন দেখবে তাদের চোখসমূহকে তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, যেহেতু তারা সত্য চিনে ফেলেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন। [সুরা মায়িদা : ৮৩]

একইভাবে, কুরআনুল কারিমে মনস্তাত্ত্বিক এই প্রভাবের কথা ফুটে উঠেছে ব্রিটিশ নওমুসলিম মেরি ওয়াইল্ডজ (Mery Wyldz)-এর লেখায়। এ নারী তার رحلتي من الكنيسة إلى المسجد، لماذا؟ (গির্জা ছেড়ে আমার মাসজিদে গমন কেন?) গ্রন্থে বদিউজ্জামান সাইদ নুরসির *'রাসায়িলুন নুর'*-এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে লেখক সাইদ নুরসি এই পুস্তিকাগুলোতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে লেখিকা বলেন,

---

বা হাবশা-রাজের নাম ছিল আসহামা বিন আবজার। তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জন্য নবীজি গায়েবি জানাযা আদায় করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।-সম্পাদক

CamScanner

> আমি এতদিন আমার অন্তরের মধ্যে যে অন্ধকার গহ্বর অনুভব করতাম, এখন সেগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার ভেতর থেকে একটার পর একটা অন্ধকারের পর্দা অপসারিত হয়েছে। এগুলো সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কিছু মুসলিম বন্ধুর সহায়তায়, আমার প্রতি তাদের সীমাহীন ধৈর্য প্রদর্শন এবং আমাকে তাদের সহযোগিতার কারণে...। এই পৃথিবী এবং বিশ্বজগতের বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য আমি একটি নতুন ভাষা শিখেছি, আর সেটা হলো কুরআনের ভাষা।[৩০৭]

এমনকি অনারবদের অন্তরেও কুরআনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক যুগোস্লাভিয়ান[৩০৮] খ্রিষ্টান নারীর কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সাইয়েদ কুতুব উল্লেখ করেছেন, এর কারণ হলো কুরআনের বর্ণনারীতি ও বিন্যাস মানুষের সকল বর্ণনারীতি ও বিন্যাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্য এটা অন্তরের ওপর আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলে। এমনকি কখনো কখনো নিছক তিলাওয়াতের মাধ্যমে, যারা একবর্ণও আরবি জানে না, তাদের ওপরও কুরআনুল কারিম সীমাহীন প্রভাব ফেলে থাকে।

এই যুগোস্লাভিয়ান নারী একটি বক্তৃতা শোনেন যাতে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। এরপর তিনি কুরআনের আয়াতসমূহের চমৎকারিত্ব এবং মানুষের অন্য যেকোনো কথা ও বক্তব্য থেকে এটার ভিন্নতা সম্পর্কে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এই কয়েকটি আয়াত শোনার সময় তিনি তার নিজের মধ্যে একধরনের কম্পন ও শিহরণ অনুভব করেন। যে নারী একবর্ণও আরবি জানে না, তার জন্য এটা কি মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা নয়? এমন আরও অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।[৩০৯]

অতএব, এ সকল আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরআনুল কারিম সুস্পষ্টভাবে ও বাস্তবতার সাথে মানুষের প্রকৃতি ও পরিচয় তুলে ধরেছে।

---

৩০৭. মেরি ওয়াইল্ডজ (Mery Wyldz) : *রিহলাতি মিনাল কানিসা ইলাল মাসজিদ লিমাজা*, ভূমিকা : মুহাম্মাদ ইজ্জত তাহতাবি : ১৫।

৩০৮. যুগোস্লাভিয়া : পূর্বে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রে। তারা হলো সার্বিয়ান, ক্রোয়েশিয়ান, বসনিয়ান (বসনিয়া ও কুমান গোত্রগুলো তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভলগা নদীর অববাহিকায় অভিবাসী হয় এবং বলকানের স্থায়ী নাগরিক হয়ে যায়), ম্যাকডোনিয়ান, আলবেনিয়ান, স্লোভেনিয়ান ও মন্টেনিগ্রিন।-সম্পাদক

৩০৯. *আল-ফুরকান* (পত্রিকা) সংখ্যা : ৬ জুলাই ২০০০। পৃষ্ঠা : ৫৯, ৬০।

কুরআন মানুষের নেতিবাচক দিকগুলো যেমন প্রকাশ করেছে, উল্লেখ করেছে তার ইতিবাচক দিকগুলোও। এবং স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মানুষের অভ্যন্তরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই একসঙ্গে মিলেমিশে অবস্থান করে। কখনো একটি অন্যটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার শক্তিমত্তা দ্বারা বিজয়ী হয়। অন্য দিকটি তখন মানুষের অভ্যন্তরে পরাজিত হয়ে পড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

৭. এবং শপথ মানবাত্মার ও তাঁর, যিনি তাকে পরিপাটি করেছেন।
৮. অতঃপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেজগারি, তার ভেতর সেই বিষয়ে জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন। [সুরা শামস : ৭-৮]

তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন, অবাধ্যতা মানুষকে আল্লাহ তাআলার অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার থেকে তাকে বিচ্যুত ও বিদূরিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾

৬. বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে। ৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। [সুরা আলাক : ৬-৭][৩১০]

সন্দেহ নেই, কুরআনুল কারিম অনেক দার্শনিকের চারিত্রিক দর্শনের উর্ধ্বে। কারণ, তারা চরিত্র বা নৈতিকতাকে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির (বা মতবাদের) মাঝে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে কিংবা পার্থিব উপকার অথবা মানুষের স্বভাবজাত আচরণের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআনুল কারিম মানব-মনোবৃত্তির সকল দিক, তার সকল চাওয়াপাওয়া এবং উন্নতি-অগ্রগতির সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ কারণে কুরআন কখনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে থমকে থাকেনি। সুতরাং কুরআনুল কারিমের আদর্শগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হলো, মানবপ্রবৃত্তিকে চারিত্রিক ও মানসিকভাবে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরা এবং আদর্শ পৃথিবী বিনির্মাণে যতটুকু সক্ষমতা তার আয়ত্তে রয়েছে, তার সকল উপযোগিতায় তাকে উন্নীত করা। আর আমরা খুব

---

৩১০. আকরাম উমরি : *আর-রিসালাতু ওয়ার-রাসুল* : ৫১-৫৪।

CamScanner

ভালোভাবেই জানি, মানুষ কোনো সভ্যতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী ও স্থায়ীভাবে লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না তার নিয়মনীতি মানবিক ও যথার্থ হয়।

মানবচরিত্রের পরিবর্তনগুলোয় কুরআনুল কারিমের আরেকটি বিস্ময় হলো, বড় কোনো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়াই কুরআনুল কারিম খুব সহজেই মানবপ্রবৃত্তিকে সত্য ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম, যদিও সে ব্যক্তি ইসলামের সবচেয়ে অগ্রগামী শত্রু হয়। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা হজরত উমর রা. এবং যুবায়ের ইবনে মুতইম রা.-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।[৩১১]

সুতরাং কুরআন শুধু এসব ব্যক্তির ওপর নিজের অলৌকিক প্রভাব বিস্তারই করেনি, বরং তাদেরকে খারাপ থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে এনেছে। ফলে তাদের চোখসমূহ আলোকিত হয়েছে। অন্তর হয়েছে প্রসারিত। এ কারণে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও মুজিজার ওপর ঈমান এনেছে তার থেকে কিছু আয়াত শ্রবণের মাধ্যমেই।

তবে এটা ঠিক যে, কুরআন তাদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, যারা অবাধ্যতা ও মিথ্যাবাদিতার মধ্যে জিদ ধরে বসে ছিল।

বাস্তবতা হলো, ঈমানগ্রহণে অগ্রগামীদের অন্তরেই শুধু কুরআনুল কারিম তার অলৌকিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং যারা তাদের বাপদাদার ধর্মকে আঁকড়ে ধরে উদ্ধত হয়ে নিজেদের মূর্খতা ও শিরকের মাঝে লিপ্ত ছিল। কুরআন তাদের অন্তরেও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কারণে আমরা দেখি, নবুয়তের প্রাথমিক যুগে কুরাইশদের বড় বড় মূর্তিপূজক নেতা নিজেদের অনিচ্ছাতেই এই কুরআন শোনার জন্য গোপনে একত্র হতো![৩১২]

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামালা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ

মুসলিমজাতি তাদের উত্থানের শুরুলগ্ন থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সুন্নাহ' সংরক্ষণে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ এটা আল্লাহপ্রদত্ত ইলম ও শিক্ষার বাস্তবিক ব্যাখ্যা। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ এক নতুন ও অভিনব শাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। সেটা হলো, 'ইলমুল জারহি ওয়াত-তাদিল' বা বর্ণনাকারীদের শুদ্ধ্যশুদ্ধি নির্ণয়। মুসলমানদের আগে আর কোনো জাতির হাতে এই বিশেষ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি। এই শাস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদিসের বর্ণনাকারীদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা। সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা। যার ফলে মানবজাতি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে, কুরআনুল কারিমের পর সবচেয়ে সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য মূল সূত্র হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিস।

অতি গুরুত্বের সাথে হাদিসগুলো সংরক্ষণ করার পেছনে কারণ হলো, মুসলিমজাতি বিশ্বাস করে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত এবং আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সুতরাং সংরক্ষিত এই হাদিসগুলো যাতে এমন এক আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়, যার মাধ্যমে পরবর্তী জগদ্‌বাসী সত্যের আলো পায়। নবীজির এ সকল হাদিস অনেকরকম অলৌকিকতা ধারণ করে। সেটা হতে পারে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে, কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কিংবা হতে পারে বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে। এগুলোও তাঁর নবুয়তের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

CamScanner

এই পরিচ্ছেদে আমরা বিভিন্ন অলৌকিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি দিক উপস্থাপন করার ইচ্ছা রাখি।

প্রথম অনুচ্ছেদ
ভবিষ্যদ্‌বাণীর অলৌকিকতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
বর্ণনারীতির অলৌকিকতা

CS CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভবিষ্যদ্‌বাণীর অলৌকিকতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর সত্যতার অন্যতম প্রধান প্রমাণ। কারণ, তিনি এমন সব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, যা তিনি কখনো দেখেননি বা শোনেননি, অথচ তাঁর অনেকগুলোই ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে কিংবা অচিরেই সংঘটিত হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁকে এই ভবিষ্যতের বিষয়গুলো জানিয়েছেন, যার সমর্থন পাওয়া যায় কুরআনের এই আয়াতের মধ্যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾

> (হে নবী,) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা ওহির মাধ্যমে আপনাকে দিচ্ছি। [সুরা আলে ইমরান : ৪৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক অদৃশ্যের বর্ণনা কিংবা ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করব। কারণ, সেগুলো অসংখ্য অগণিত আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে একত্র করা সম্ভব নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত যে ঘটনা সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো তৎকালীন হাবশা[৩১৩] (বর্তমান ইথিওপিয়া)-এর বাদশা নাজাশির মৃত্যুসংবাদ। হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সেদিনই নাজাশির মৃত্যুর সংবাদ দেন, যেদিন তার মৃত্যু হয়। এরপর তিনি জানাজার স্থানের দিকে গিয়ে সাহাবিদের কাতারবদ্ধ করে (জানাজার নামাজে) চারটি তাকবির দিলেন।[৩১৪]

---

৩১৩. হাবশা : আরব উপদ্বীপ হতে সরাসরি দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল হাবশা বা আবিসিনিয়া। বর্তমান ইরিত্রিয়া, উত্তর ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, জিবুতি, মিশরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের পূর্বাঞ্চল ও ইয়ামেনজুড়ে এর বিস্তৃতি ছিল।-সম্পাদক

৩১৪. *সহিহ বুখারি* : ১১৮৮, *সহিহ মুসলিম* : ৯৫১।

CamScanner

হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর একটি শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, তিনি নাজাশির মৃত্যুর সংবাদ সেদিনই দিয়েছেন, যেদিন তার মৃত্যু হয়। অথচ মদিনা থেকে হাবশা বহুদূরের পথ। জাগতিক কোনো মাধ্যমে নবীজির জন্য সেই মুহূর্তে কিংবা সেই দিনে এটা জানা সম্ভব ছিল না। সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণ করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই তাঁকে নাজাশির মৃত্যু সম্পর্কে জানিয়েছিলেন।[৩১৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি হলো মুসলমানদের পারস্যবিজয় এবং আরব উপদ্বীপের অঞ্চলসমূহে ব্যাপক শান্তি ও নিরাপত্তার সংবাদ প্রদান। হাদিসে এসেছে, আদি ইবনে হাতিম রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে নবীজির নিকট দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উপদ্রবের কথা বলে অনুযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আদি! তুমি কি হিরা নামক স্থানটি দেখেছ?'

আমি বললাম, 'আমি তা দেখিনি। কিন্তু স্থানটি সম্পর্কে আমার জানা আছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখতে পাবে, একজন উষ্ট্রারোহী মহিলা হিরা হতে রওয়ানা হয়ে নিরাপদে বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সে ভয় করবে না।'

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, তখন তায়ি গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে, যারা ফেতনা-ফ্যাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেশকে অস্থির করে তুলছে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে যে তোমরা কিসরার ধনভান্ডার দখল করেছ।'

আমি বললাম, 'কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভান্ডার?'

---

৩১৭. ফাজেল সালেহ সামাররায়ি : নুবুওয়াতু মুহাম্মাদ মিনাশ-শাক্কি ইলাল-ইয়াকিন: ১৬২।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের। তোমার আয়ু যদি আরও দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, মানুষ দু-হাতভরে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে যে তার এ সম্পদ গ্রহণ করবে। কিন্তু সে এমন একটি লোকও খুঁজে পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমার কাছে আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রাসুল প্রেরণ করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধনসম্পদ দান করিনি এবং দয়া ও মেহেরবানি করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, দিয়েছেন। অতঃপর সে ডান দিকে তাকাবে, সেদিকে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে বাম দিকে তাকাবে, সেদিকেও সে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।'

সাহাবি হজরত আদি রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অতএব, আধখানা খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো। আর যদি কেউ আধখানা খেজুরও না পায়, তবে সে যেন মানুষের সাথে ভালো কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা করে।

সাহাবি হজরত আদি রা. (ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, একজন উষ্ট্রারোহী মহিলা হিরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে নিরাপদে কাবা শরিফ তাওয়াফ করে এসেছে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনি। আর পারস্যসম্রাট কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম। তোমরা যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকো, তাহলে আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনটি বলেছেন, এক ব্যক্তি হাতভরে সোনা-রুপা নিয়ে বের হবে, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করার থাকবে না, সেটাও তোমরা দেখতে পাবে।[৩১৬]

খলিফা হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সময়ে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটিও বাস্তবায়িত হয়েছিল। খলিফার কর্মচারীরা

৩১৬. *সহিহ বুখারি* : ৩৫৯৫।

CamScanner

জাকাতগ্রহীতার খোঁজে জাকাত নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু কেউ সেই জাকাত গ্রহণ করেনি। এভাবেই খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. মানুষদের সচ্ছল করে দিয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে মুহাজির ইবনে ইয়াজিদ রহ. বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাদের পাঠাতেন, আমরা মানুষদের মাঝে জাকাত বণ্টন করতাম। আমরা কখনো এমনও পেয়েছি, গত বছর যাকে জাকাত প্রদান করা হয়েছে, পরবর্তী বছর আমরা তার থেকেই জাকাত উসুল করেছি (অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে গরিবরাও সচ্ছল হয়ে গেছে)।[৩১৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর সাক্ষ্য প্রদানকারী আরেকটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী হলো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কুস্তুনতুনিয়া[৩১৮] (কনস্টান্টিনোপল) বিজয়ের সুসংবাদ।[৩১৯] আবদুল্লাহ ইবনে বিশর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, অতি অবশ্যই (মুসলমানদের হাতে) কুস্তুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) বিজিত হবে। কতই-না উৎকৃষ্ট তার সেনাপতি! কতই-না উৎকৃষ্ট সে সৈন্যবাহিনী![৩২০]

ভবিষ্যতের অদৃশ্য সংবাদের ক্ষেত্রে এই হাদিসটি এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে, মুসলমানদের তখনকার বাস্তব অবস্থা দেখে খুব কম মানুষই এটার ওপর আস্থা রাখতে পেরেছিল। কারণ, মুসলমানরা যখন মক্কায় ছিল, তখনও তারা ছিল দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত। আবার মদিনাতে এসেও সব সময় চারপাশে শত্রুদের আক্রমণের ভয়ে ছিল। এই যাদের অবস্থা, সেই মুসলমানরা কীভাবে জয় করবে সেই অজেয় কুস্তুনতুনিয়া! এটা ছিল

---

৩১৭. ইমাম নববি : *তাহজিবুল আসমা ওয়াল-লুগাত* : ২/২১।

৩১৮. কুস্তুনতুনিয়া : তুরস্কের অন্যতম শহর ইস্তাম্বুল আরবদের কাছে কুস্তুনতুনিয়া বলেই পরিচিত ছিল। মুসলমানদের হাতে এ শহর বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিজেতাগণ এটি বিজয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।-সম্পাদক

৩১৯. একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন ইয়ামেন, ইরাক, শাম, বাইতুল মুকাদ্দাস, মিশর, রোম, পারস্য বিজয়ের। দেখুন, *সহিহ বুখারি* : ১৭৭৬, *সহিহ মুসলিম* : ১৩৮৮।

৩২০. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৯৭৭, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৮৩০০, হাইছামি : *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* : ৬/২২৯।

CamScanner

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর পরাশক্তি পারস্যও যেটা কখনো জয় করতে সক্ষম হয়নি। এই দুই শক্তিমান সাম্রাজ্যের মাঝে বারবার ভয়াবহ লড়াই সংঘটিত হয়েছে, কখনো পারস্য বিজয়ী হয়েছে, কখনো রোম। সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা তখন এই দুই পরাশক্তির মাঝে বণ্টিত। তাহলে স্বল্পশক্তির মুসলমানগণ কীভাবে এই শক্তিধর সাম্রাজ্যের ওপর বিজয়ী হতে পারে!

কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি মুসলমানদের ছিল পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়েই ইসলামের অনেক সেনাপতি কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের সম্মান অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল হজরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর সময় থেকেই। তিনি তার পুত্র ইয়াজিদকে সেনাপতি বানিয়ে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, সেই বাহিনীতে অনেক সাহাবি এবং সাহাবিদের সন্তানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা কুস্তুনতুনিয়াবিজয়ী বাহিনীর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত সম্মান ও প্রশংসা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের একাধিক প্রচেষ্টা হয়েছে। অবশেষে ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মহান উসমানি খলিফা মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর হাতে বিজিত হয়। এটা ছিল ইসলামের মহান এক বিজয়। বিরাট এক অর্জন, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহকে প্রদান করা হয়েছিল। আর এই প্রশংসিত বিরাট বিজয়ের মধ্য দিয়েই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়, এরপর আর কোনোদিন তারা উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।

আমাদের আলোচনাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে চাই, যেটা তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর একটি স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সেটা হলো, হেজাজ[৩২১]ভূমিতে অগ্ন্যুৎপাতের ভবিষ্যদ্বাণী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

৩২১. হেজাজ : আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত সারাত পর্বতমালা অধ্যুষিত অঞ্চল। হেজাজ [illegible] তিহামা হতে পৃথক করে রেখেছে।-সম্পাদক

CamScanner

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى»

কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হেজাজভূমি থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুসরা[৩২২]র উটগুলোর গর্দানও আলোকিত করে দেবে।[৩২৩]

৬৫৪ হিজরি মোতাবেক ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার নিকটবর্তী হেজাজভূমিতে এই ভয়াবহ আগুনের প্রকাশ ঘটে। সামসময়িক অনেক ঐতিহাসিক তাদের গ্রন্থে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম কুরতুবি রহ. তার *তাজকিরা* 'تذكرة' গ্রন্থে[৩২৪] এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাছির এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন।[৩২৫]

---

৩২২. বুসরা (بصرى) : বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরী। সিরিয়ার রাজধানী দামেশক হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার।-সম্পাদক

৩২৩. *সহিহ বুখারি* : ৭১১৮, *সহিহ মুসলিম* : ২৯০২।

৩২৪. ইমাম কুরতুবি : *আত-তাজকিরা* : ২২৫।

৩২৫. ইবনে তাইমিয়া : *আল-জাওয়াবুস সহিহ* : ৩/১৬২-১৬৩, ৫/৪২০, ৬/৮৯; ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ২/৩৯৫।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত রয়েছে। এগুলোকে তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসুল হওয়ার ওপর জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে তিনি এমন সব বৈজ্ঞানিক কথা বলেছেন এবং এমন পরিবেশে বলেছেন, যখন পৃথিবীতে এ ধরনের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারই উন্মোচিত হয়নি। এ ছাড়া তাঁর উম্মি হওয়ার কারণে সমালোচকদের এ কথা বলার পথও রুদ্ধ হয়ে গেছে যে, তিনি এসব জ্ঞান অর্জন করেছেন 'বাহিরা' থেকে কিংবা 'ওরাকা ইবনে নওফল' থেকে কিংবা অন্য কারও থেকে। তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল শিক্ষার একমাত্র উৎস হলেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা।

হাদিসের মধ্যে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিশেষ কয়েকটি রীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। যেমন, এমন হাদিস নির্বাচন করা, যেগুলোর মধ্যে এই বিশ্বজগৎ, তার গঠনরীতি এবং তার উপাদানসমূহের বর্ণনা রয়েছে। আবার হাদিসের মান বা বিশুদ্ধতা নিয়েও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। মাওজু বা অশুদ্ধ হাদিস থেকে বিরত থাকা চাই। একই বিষয়ের হাদিসসমূহ একত্র করা চাই। কারণ, কোনো হাদিস একই বিষয়ের অন্য হাদিসকে ব্যাখ্যা করে। কুরআন এবং হাদিসের ভাষ্যকে আরবি ভাষার শব্দগুলোর যথাযথ অর্থ এবং তার নিয়মকানুন অনুযায়ী অনুধাবন করা। নির্দিষ্ট হাদিসের পারিপার্শ্বিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে কুরআনের আলোকে অনুধাবন করা। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং তাঁর আয়াতের অর্থগুলোকে সুস্পষ্টতা দানকারী।[৩২৬] এগুলোর সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৩২৬. জগলুল নাজ্জার : *আল-ইজাজুল ইলমি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা* : ২৬-৩২।

CS CamScanner

ওয়াসাল্লামের হাদিসকে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য ব্যাখ্যা বা তাবিল না করা, যেটা শুদ্ধাশুদ্ধির সম্ভাবনা কিংবা আশঙ্কা রাখে। বরং হাদিসকে ব্যবহার করা যেতে পারে কেবল প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্ষেত্রে।

সামগ্রিকভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিসের মধ্যেই বহু বৈজ্ঞানিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলোর সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে হজরত আবু বুরদা রা. কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদিসটির কথা বলা যেতে পারে। হাদিসটি এমন—আবু বুরদা রা.-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে আমরা বলাবলি করলাম, যদি নবীজির সাথে এশাও আদায় করা পর্যন্ত উপবিষ্ট থাকতে পারতাম (তাহলে কতই-না ভালো হতো)! রাবি বলেন, ফলে আমরা বসে রইলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা এখনো এখানে উপবিষ্ট রয়েছ?'

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার সাথে মাগরিব নামাজ আদায় করেছি। তারপর আমরা বলাবলি করলাম, এশাও আপনার সাথে আদায় করার জন্য বসে থাকি।'

তিনি বললেন, 'তোমরা অনেক ভালো কাজ করেছ কিংবা তোমরা ঠিক করেছ।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবীজি আকাশের দিকে মাথা তুললেন। তিনি এভাবে প্রায়ই আকাশের দিকে মাথা তুলতেন। অতঃপর বললেন, 'তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে এবং আসমান ভেঙে খানখান হয়ে যাবে)। আর আমি আমার সাহাবিদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাস্বরূপ। আমি যখন বিদায় নেব, তখন আমার সাহাবিদের ওপর প্রতিশ্রুত সময় এসে উপস্থিত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ফেতনা-ফ্যাসাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে যাবে)। আর আমার সাহাবিগণ সকল উম্মতের জন্য রক্ষাকবচস্বরূপ। আমার সাহাবিগণ

CS CamScanner

যখন বিদায় হয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের ওপর প্রতিশ্রুত বিষয় উপস্থিত হবে।[৩২৭]

এই হাদিসের মধ্যে এমন একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণিত হয়েছে, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যেটাকে প্রমাণিত ও সত্যায়িত করেছে। আর সেটা হলো, তারকা-নক্ষত্রসমূহের পতন, তাদের ঝরে পড়া এবং বিলুপ্ত হওয়া। এরপর এগুলোর বিস্ফোরিত হয়ে মহাশূন্যের ধোঁয়ায় পরিণত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

যে বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয়, এগুলো তার সীমাহীন আকর্ষণশক্তির মাধ্যমে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, ধূমকেতু এবং এ ছাড়া আরও বহু মহাজাগতিক বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে। নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে। তারকাগুলোও একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে অবস্থান করে। এভাবে সকল তারকা একত্রে মিলে বহু বড় বড় জগৎ তৈরি করে। সেখানেও নিজেদের মাঝে পারস্পরিক একটি আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন এসব আকর্ষণ আলগা হয়ে যাবে কিংবা ভেঙে পড়বে, সেদিন তারকাগুলোও ধ্বংস হবে। তারকাগুলো ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার আসমানও ধ্বংস হবে। দুনিয়ার আসমান ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে পুরো বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই কথাটিই হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

«اَلنُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ»

> তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে এবং আসমান ভেঙে খানখান হয়ে যাবে)।[৩২৮]

হাদিসটি স্পষ্টভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা ধারণ করছে। নতুবা বিশ্বজগতের এমন গঠন এবং তার ভারসাম্য সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে জানিয়েছে? এগুলো কীভাবে সেই উম্মি নবী

---

[৩২৭]. *সহিহ মুসলিম* : ২৫৩১।
(অর্থাৎ বিদআত ছড়িয়ে পড়বে, ফেতনা-ফ্যাসাদের আবির্ভাব হবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মক্কা ও মদিনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।-অনুবাদক)

[৩২৮]. জগলুল নাজ্জার : *আল-ইজাজুল ইলমি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা* : ১৩৪-১৩৫।

CamScanner

জানবেন, যিনি নিজেও এমন এক মূর্খ-অজ্ঞ জাতির মাঝে জীবনযাপন করতেন, যেখানে এসব চিরন্তন বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোনো ঝান্ডাই ওড়েনি? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই তাঁর নবীকে ওহির মাধ্যমে এসব বিষয় জানিয়েছেন। ফলে তাঁর রাসুল যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিসগুলো আধুনিক যুগের বহু অমুসলিম পণ্ডিতকেও হতবুদ্ধি করে দিয়েছে এবং তাদের অসংখ্য মানুষের ইসলামগ্রহণের কারণ হয়েছে, তেমনই একটি হাদিস হলো এই,

«قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ...»

> নিশ্চয় তোমাদের সকলের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রাণুরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে ওভাবে অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে ওভাবে অবস্থান করে।[৩২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস আমাদের নিকট স্পষ্ট করছে, গর্ভাশয়ে মানুষের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া তিনটি ধাপ অতিক্রম করে। তা হলো, শুক্রাণু, রক্তপিণ্ড এবং মাংসপিণ্ড। মাতৃগর্ভে গর্ভসঞ্চার-প্রক্রিয়ার শুরু থেকে প্রথম চল্লিশ দিনে প্রথম ধাপটি পূর্ণ হয়। মানবভ্রূণবিদ্যা নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগুলো এই বক্তব্যকেই সুদৃঢ় করে।

সাম্প্রতিক কিছু বিজ্ঞানী হাদিসে বর্ণিত সময়কে (তথা ৪০ দিন) তার তিনগুণ বুঝেছেন। অর্থাৎ একশ বিশদিন ধরেছেন। কারণ, তারা হাদিসের 'مِثْلَ ذٰلِكَ' ওভাবে শব্দ দ্বারা মনে করেছেন, এখানে ভ্রূণ, জমাট রক্ত এবং মাংসপিণ্ড গঠনের প্রতিটি ধাপের সময়কে চল্লিশ দিন করে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দেয়। হাদিসটি এই,

৩২৯. *সহিহ বুখারি* : ৩২০৮, ৩৩৩২; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৪৩।

«إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا»

যখন (মাতৃগর্ভে) শুক্রাণুর ওপর বিয়াল্লিশ রাত চলে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা একজন ফিরেশতা প্রেরণ করেন। তখন তিনি সেটাকে একটি রূপ দান করেন, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করেন।(৩৩০)

তবে মাংসপিণ্ডের সাথে মানবাকৃতির নিকটতম কিংবা দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। (সুতরাং হাদিসটির অর্থ হলো,) মাংসপিণ্ডটি মাংসপিণ্ড হিসেবে গঠিত হওয়ার পরবর্তী পাঁচদিন থেকে ধীরে ধীরে মানবাকৃতি ধারণ করতে থাকে। অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হওয়ার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে এটা গঠিত হওয়া শুরু করে। পঁয়তাল্লিশতম দিনে এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হাড়ের আকৃতির প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করে। এরপর কেবল বিভিন্ন কোষ এবং গঠন-আকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো তৈরি হয়।

মানবভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাংসপিণ্ডের গঠন সম্পূর্ণ না হলে এই ধাপগুলোর সূচনা হয় না। অর্থাৎ গর্ভধারণের পর ষষ্ঠ সপ্তাহ (হাদিসের ভাষায় বিয়াল্লিশ রাত) অতিবাহিত হওয়ার পর আকৃতিগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই এই দুটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং তাঁর বলা সকল হাদিসেই তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে জানলেন এই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়াদি এবং ভ্রূণসৃষ্টির জটিলতা? আর কীভাবেই-বা জানলেন সেই শুক্রাণুর অবস্থা, অথচ বীর্যের মাত্র এক মিলিলিটারে অবস্থান করে দশহাজার শুক্রাণু! একবার স্খলিত সেই বীর্যের পরিমাণ এক মিলিলিটার থেকে দশ মিলিলিটার পর্যন্ত উপনীত হতে পারে!(৩৩১)

৩৩০. সহিহ মুসলিম : ২৬৪৫।

... নাবাবিয়্যা : ২১৬-২২২।

CamScanner

ভ্রূণ যদি অসম্পূর্ণ ও রক্তের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় গর্ভপাতও হয়ে যায়, তাহলেও মানুষের জন্য তা বোঝা সম্ভব নয়। আর তা দেখতে পাওয়া, তার বিবরণ দেওয়া এবং তার স্তরের বিশুদ্ধ নামকরণ করা তো দূরের কথা। স্বাভাবিকভাবে খালি চোখে দেখে এবং তার সম্পর্কে কিছু না জেনে কিছুতেই তার সার্বিক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। অথচ বর্ণিত হাদিসের মধ্যে ভ্রূণসৃষ্টির ধাপগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৎকালের প্রেক্ষিতে অবশ্যই এটি এক বৈজ্ঞানিক বিস্ময় বা অলৌকিকতা। অতএব, বলা যায় নিঃসন্দেহে হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলির প্রতি সামান্য কিছু ইশারা। আমাদের গ্রন্থের পরিসর এর চেয়ে অধিক বিষয় উপস্থাপনের উপযোগী নয়, তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তবে উদাহরণ হিসেবে এই দু-একটি উপস্থাপনই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা-কিছু আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তার সব ব্যাপারেই তিনি সত্য ও সঠিক বলেছেন।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বর্ণনারীতির অলৌকিকতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার আরেকটি উজ্জ্বলতম প্রমাণ হলো তাঁকে দান করা হয়েছে جوامع الكلم (জাওয়ামিউল কালিম) বা স্বল্প শব্দে অধিক অর্থসমৃদ্ধ কথার যোগ্যতা। তাঁর পূর্বে বা পরে আর কাউকে এই যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়নি। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন,

«أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَارًا»

আমাকে প্রদান করা হয়েছে 'জাওয়ামিউল কালিম' (স্বল্প শব্দে অধিক অর্থসমৃদ্ধ কথার যোগ্যতা) এবং আমার জন্য কথাকে খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।[৩৩২]

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন,

«بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»

আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' সহকারে প্রেরিত হয়েছি।[৩৩৩]

'জাওয়ামিউল কালিম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বল্প শব্দে অনেক অর্থসমৃদ্ধ কথা প্রদান করেছিলেন (অর্থাৎ শব্দ কম, কিন্তু তার অর্থ, মর্ম বা ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত)। এ কারণে আপনি দেখতে পাবেন, হাদিসের কথাগুলো খুবই স্বল্প শব্দবিশিষ্ট। তবুও এগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে অনেক বিধান, উপদেশ, শিক্ষা ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই বৈশিষ্ট্য আর কারও নেই। নবীজির আগেও আর কাউকে এই বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁর কথার একটি নির্দিষ্ট দিক বা তাঁর কিছু হাদিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং তাঁর সকল কথা, সকল হাদিসই এই

---

৩৩২. *কাশফুল খফা* : ১/২৬৩।

৩৩৩. *সহিহ বুখারি* : ২৯৭৭।

CamScanner

বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। অবশ্যই এটি একটি অতি বিস্ময়কর এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

আমরা এটাও জানি, শব্দের সংক্ষিপ্ততা হাদিসগুলোকে মুখস্থ করতে ও স্মরণ রাখতে সহজ করে। আরেকটি বড় উপকার হলো, স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে এই নিগূঢ় অর্থসমৃদ্ধ কথা থেকে নতুন নতুন বিষয় ও বিধান উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। এভাবেই ইসলামি শরিয়ত সকল যুগ ও স্থানের জন্য প্রযোজ্য ও উপযুক্ত হিসেবে গণ্য হতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অনন্য-অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক মুসলিম ফিকহবিদ বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। যেমন কেউ কেউ তাঁর ছোট ছোট বাক্যের এমন কিছু হাদিস নির্বাচন করেছেন, যেগুলোর একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে নিলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে। ইসলামি শরিয়তকে অভিনব ও সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত করতে পারে। এমন একটি কাজ করেছেন হজরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি বলেন, ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদিস। যথা :

১. হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»–সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[৩৩৪]

২. হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»–যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা এর মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।[৩৩৫]

৩. হজরত নুমান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

«اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ»–হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।[৩৩৬], [৩৩৭]

---

৩৩৪. *সহিহ বুখারি* : ১, *সহিহ মুসলিম* : ১৯০৭, *সুনানে আবু দাউদ* : ২২০১, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৪২২৭।

৩৩৫. *সহিহ বুখারি* : ২৬৯৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৭১৮।

৩৩৬. *সহিহ বুখারি* : ২০৫১, *সহিহ মুসলিম* : ১৫৯৯।

৩৩৭. ইবনে রজব হাম্বলি : *জামিউল উলুম ওয়াল-হিকাম* : ১/৯। (ইমাম আহমাদের কথার সূত্র)

CS CamScanner

উল্লিখিত প্রতিটি হাদিস অতি চমৎকারভাবে ইসলামের একেকটি দিককে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করছে। এমনকি আপনি এর সবগুলো একসঙ্গে পড়ে ফেলা মানে আপনি যেন পুরো ইসলাম সম্পর্কেই পড়ে নিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে 'জাওয়ামিউল কালিম' নির্বাচন করা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। কারণ, তাঁর প্রায় প্রতিটি কথা ও হাদিসই 'জাওয়ামিউল কালিম'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রতিটি কথার মর্ম উদ্ধারে একটি বড় পরিসরের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাপক অর্থ ধারণকারী হাদিসের ক্ষেত্রে। তবুও রাসুলের হাদিসের অলৌকিকতা বোঝার জন্য আমরা এখানে অল্প কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করার ইচ্ছা রাখি। যথা :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»

> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা উত্তম, তিনি উত্তম ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।[৩৩৮]

এই অতি সংক্ষেপ বাক্যগুলোর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, আল্লাহ তাআলা কোন কাজগুলো গ্রহণ করেন, আর কোনগুলো গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ভালো কাজগুলো গ্রহণ করেন। আর ভালো কাজেরও কোনো সীমাপরিসীমা নেই। ভালো কাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন সদকা, আত্মশুদ্ধি, ভালো কাজের আদেশ, সত্য ও সততা, আমানতদারি, সাহায্য-সহযোগিতা, হেদায়েত, বদান্যতা এবং এমন আরও লক্ষ-কোটি ভালো কাজ রয়েছে।

আর অন্যদিকে তিনি খারাপ কাজ গ্রহণ করেন না। সে কারণে তিনি গ্রহণ করেন না চুরি, খিয়ানত, ভীরুতা, ধোঁকা, প্রতারণা, অশ্লীলতা এবং এমন আরও লক্ষ-কোটি খারাপ কাজ। এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত ছোট্ট কথাটি ইসলামের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

---

৩৩৮. *সহিহ মুসলিম* : ১০১৫, *সুনানে তিরমিজি* : ২৭৯৯, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৬১৩।

CS CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণ অনুযায়ী আপনি অন্য হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা ভেবে নিতে পারেন। নিচে এমনই কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করা হলো–

১. «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»–মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা।[৩৩৯]

২. «إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» –তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।[৩৪০]

৩. «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»–সচ্ছলতার সময় আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ রাখো, তাহলে অভাবের সময় তিনিও তোমাকে মনে রাখবেন।[৩৪১]

৪. «اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»–আধখানা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।[৩৪২]

৫. «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»–প্রতিটি ভালো কাজই একটি সদকা।[৩৪৩]

৬. «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»–রোজা হলো ঢালস্বরূপ।[৩৪৪]

৭. «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»–যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৪৫]

৮. «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»–নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিসই খমর (মদ), আর প্রত্যেক মদই হারাম।[৩৪৬]

---

৩৩৯. *সুনানে তিরমিজি : ২৩১৮, মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩৭।*

৩৪০. *সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১০২, মুসতাদরাকে হাকেম : ৭৮৭৩।*

৩৪১. *মুসনাদে আহমাদ : ২৮০৪, মুসতাদরাকে হাকেম : ৬৩০৩।*

৩৪২. *সহিহ বুখারি : ১৪১৩, ৬০২৩, সহিহ মুসলিম : ১০১৬।*

৩৪৩. *সহিহ বুখারি : ৬০২১, সহিহ মুসলিম : ১০০৫।*

৩৪৪. *সুনানে নাসায়ি : ২২২৪।*

৩৪৫. *সহিহ মুসলিম : ৯১, সুনানে ইবমে মাজাহ : ৫৯, মুসনাদে আহমাদ : ৩৯৪৭।*

৩৪৬. *সহিহ মুসলিম : ২০০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৩৯০, মুসনাদে আহমাদ : ৪৮৩০।*

CamScanner

৯. «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»—তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[৩৪৭]

এই হলো সামান্য কিছু উদাহরণ। কারণ, এটা এমন এক অধ্যায়, যার কোনো শেষ নেই। এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কিনারা নেই। এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজাগুলোর মধ্যে উজ্জ্বলতম মুজিজা এবং তাঁর নবুয়তের অন্যতম প্রধান প্রমাণ।

* * *

৩৪৭. *সুনানে তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯০৭৭, সুনানে দারেমি : ২২৬০।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা সমাধানে নববি পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন তাদের হেদায়েতদাতা ও পথনির্দেশক হিসেবে। তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে বের করে আনার জন্য। এ কারণে তিনি ছিলেন একাধারে একজন উত্তম নেতা, দক্ষ, শিক্ষক ও প্রশিক্ষক। তিনি তাঁর সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন বাস্তবসম্মত যুক্তি দিয়ে এবং পর্যায়ক্রমিক বিচক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। এ কারণে প্রথমে তিনি মানুষদের অন্তরে সর্বদ্রষ্টা প্রভুর পর্যবেক্ষণের ধারণা প্রবিষ্ট করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছু দেখেন)। এরপর তিনি সে সকল ফাঁক-ফোকর বন্ধ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ক্রমান্বয় চিকিৎসা হিসেবে সর্বশেষে তিনি প্রদান করেছেন যুগোপযোগী আইন ও বিধানাবলি। সমাজের মধ্যে যাদের অন্তর অন্যায় ও অনৈতিকতার দিকে ধাবিত হতে চায়, তাদেরকে এ সকল বিধান বিরত রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। তখন তারা শাস্তির ভয়ে হলেও নিজেদের অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়, প্রতিফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে থাকে।

আমরা নিচের আলোচনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি কীরূপ রীতিনীতি-পদ্ধতির সহায় নিয়েছেন তা উপস্থাপন করব। অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই বিধানাবলি তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ, সমস্যা সমাধানে তাঁর পদ্ধতিগুলোর উৎস হলো আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতি ও তাঁর শরিয়ত।

CamScanner

আলোচনাগুলো আমরা কয়েকটি শিরোনামে উপস্থাপন করতে পারি।

প্রথম অনুচ্ছেদ

সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে নবীজি ﷺ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে নবীজি ﷺ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মাদক ও নেশাদ্রব্য প্রতিরোধ-প্রতিকারে নবীজি ﷺ

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গোটা মানবসমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি ইসলাম অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছে। একই লক্ষ্যে ইসলাম সকলপ্রকার সহিংসতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। কারণ, ইসলাম তার অনুসারীদের মুসলিম বা অমুসলিম সকল মানুষের সাথে সুউচ্চ মূল্যবোধ এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন আচরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু সব ধরনের অন্যায়, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এ সকল উচ্চ গুণাবলির বিপরীত। সুতরাং আমাদের প্রতিপালক আদেশ দিয়ে বলেছেন–

﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ﴾

তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। [সুরা হা-মিম সাজদা : ৩৪]

বস্তুত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনাচার ছিল শরিয়তনির্দেশিত সেসব সুউচ্চ মূল্যবোধের উত্তম প্রয়োগ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজ নিয়ে বসবাস করেছেন, সেটা আমাদের বর্তমান বিশ্বের সমাজগুলোর চেয়ে খুব যে ভালো ছিল এমন নয়। হিংস্রতা, সহিংসতা এবং সন্ত্রাসী তাণ্ডবের সমস্যা সেখানেও ভয়ংকররূপে অবস্থান করছিল। এর চর্চার রূপ ছিল এমন, যেন তা হিংস্র ও অত্যাচারীদের অধিকার। সেই সমাজের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় জাফর বিন আবু তালেব রা. বাদশা নাজাশির নিকট কুরাইশ অমুসলিম সমাজের ব্যাপারে যে বিবরণ প্রদান করেছেন তার মাঝে। তিনি বলেছিলেন,

হে বাদশা, আমরা ছিলাম শিরকের ওপর অটল এক জাতি। মূর্তিদের ইবাদত করতাম। মৃত জীবজন্তু ভক্ষণ করতাম।

CamScanner

প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। অন্যায় রক্তপাতসহ অন্যের প্রতি যত ধরনের অন্যায় করা যায়, সবই ছিল আমাদের নিকট বৈধ। হালাল-হারাম বলতে আমাদের কাছে কোনো বিষয় ছিল না।[৩৪৮]

এ ছাড়া আমরা যদি সেই সমাজে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রবণতার দিকে লক্ষ করি, তবে এটিকে তৎকালীন আরবসমাজের হিংস্রতা ও রূঢ়তাসংক্রান্ত সমস্যার গুরুতরতার ব্যাপারে জাজ্বল্যমান প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। তাই এ সমস্যা সমাধানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ....»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনটা জিনিস হারাম করেছেন এবং তিনটা জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া...।[৩৪৯]

এভাবে প্রাচীন বিশ্ব কিংবা বর্তমান বিশ্ব সকল সময়ই হিংস্রতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তাণ্ডবে পৃথিবী বারবার রক্তাক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এগুলোর নিরাময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিস্ময়কর নববি সমাধান এনেছেন। সমাজে যে সমাধান প্রয়োগ করা হয়েছে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দয়া-ভালোবাসার মিশেলে পরিপূর্ণ ইসলামি আদর্শের আলোকে। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে তাঁর সাহাবিদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার সার্বক্ষণিক দর্শনের চিন্তা প্রবেশ করিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলা এবং বান্দার অধিকারগুলো আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে ওঠে। ফলে সে আর সহিংসতা প্রদর্শন করে না। সন্ত্রাসে লিপ্ত হয় না। কারণ, সে জানে আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। তার সকল গোপন বিষয়ও তিনি জানেন। হজরত মুআজ রা. থেকে বর্ণনা রয়েছে। তিনি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে

---

৩৪৮. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩৩৫, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ২/১১১, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/২০।

৩৪৯. *সহিহ বুখারি* : ৮৪৪, *সহিহ মুসলিম* : ৫৯৩।

আল্লাহর রাসুল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

«اُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»

তুমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে সরাসরি দেখছ।(৩৫০)

মানুষের অবনত হওয়া এবং হিংস্রতা থেকে বিরত থাকার জন্য এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক পদ্ধতি। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্যার সমাধানে আরেক ধাপ এগিয়ে যান। এই দ্বিতীয় ধাপে তিনি নজর দেন সমাজের কাঠামোর প্রতি। বস্তুত একটি সমাজ সুসংহত হওয়ার জন্য বেশ কিছু মূল্যবোধ নির্ধারণ ও তার চর্চা জরুরি। যথা :

১. সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে কোমলতা, সহানুভূতি ও ন্যায়পরতার উন্মেষ ঘটানো। সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়পূর্ণ আচরণ করবে। কোনো জাতি, ধর্ম বা বংশের কারণে কারও প্রতি কোনো পার্থক্য করা হবে না। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল, দয়ালু। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যা দান করেন কঠোরতা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা দান করেন না।(৩৫১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনচরিত এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এমনকি তাঁর ব্যক্তিজীবনের আচরণও এই নীতির উৎকৃষ্ট নমুনা। তাঁর জীবনে কোমল আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, একবার একদল ইহুদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রবেশ করল। এরপর (প্রবেশের সময়) তারা বলল, 'اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (তোমার মৃত্যু হোক)।' তাদের কথাগুলো আমি বুঝতে পারলাম। তখন আমি

---

৩৫০. মুসনাদে আহমাদ : ৬১৫৬, মুজামুল কাবির : ১৭১৩১, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৮/১২৮।
৩৫১. সহিহ মুসলিম : ২৫৯৩, সুনানে আবু দাউদ : ৪৮০৭, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৬৮৮।

CamScanner

বললাম, 'বরং তোমাদের ওপরই মৃত্যু ও লানত বর্ষিত হোক।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'শান্ত হও আয়েশা, নিশ্চয় আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হে আয়েশা, তুমি কঠোরতা ও মন্দালাপ থেকে বিরত থাকো।'

(আয়েশা রা. বলেন,) তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি শোনেননি তারা কী বলেছে?!'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাদের উত্তরে আমি বলেছি, وَعَلَيْكُمْ (এবং তোমাদেরও)।'[৩৫২]

২. সমাজের অন্যায়কারীদের সাথেও দয়ার্দ্র মনোভাব রাখা। এটি এমন এক মহান মূল্যবোধ, একটি মুসলিম সমাজে অনিবার্যভাবে যার চর্চা হওয়া উচিত। কারণ, অনেক সময় সামান্য একটু দয়া ও সহমর্মিতার আচরণও বহু সহিংসতা ও উগ্রতাকে অপসারিত করে দেয়, পরস্পরের মাঝে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দিকে লক্ষ করলে তাঁর নিকট এই মূল্যবোধের মহত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হব। যেমন হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ এক বেদুইন[৩৫৩] এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তা দেখে রাসুলের সাহাবিগণ 'থামো... থামো...' বলে তাকে ধমকাতে লাগলেন।

আনাস রা. বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'তোমরা এ অবস্থায় তাকে বাধা দিয়ো না; এখন তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও।' সাহাবিরা বিরত রইলেন। বেদুইন লোকটি প্রস্রাব সেরে নিলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'দেখো, এটা হলো মসজিদ।'

---

৩৫২. *সহিহ বুখারি* : ৬০২৪, ৬২৫৬, ৫৬৮৩; *সহিহ মুসলিম* : ২১৬৫।

৩৫৩. কেউ বলেন, তার নাম ছিল যুল খুওয়াইসিরা ইয়ামেনি। কেউ বলেন, যুল খুওয়াইসিরা তামিমি। আবার কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আকরা বিন হাবেস। সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানি : *ফাতহুল বারি* : ১০/৪৩৯।

CamScanner

এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। বরং এটা হলো আল্লাহর জিকির, নামাজ আদায় এবং কুরআন পাঠ করার স্থান।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে পানি আনতে আদেশ করলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে এলো এবং সেই পানি প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দিলো।[৩৫৪]

আমরা হাদিসটিতে দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করেছেন খুবই কোমলতা ও সহানুভূতির সাথে। তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে অন্যায়কারীর সাথে কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন এবং নিজে ভীতি প্রদর্শন ও ধমক ব্যতীতই তাকে শান্তভাবে কোমলতার সাথে ইসলামের শিক্ষা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৩. তৃতীয় বিষয় হলো, মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করা। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ»

নিশ্চয় দ্বীন হচ্ছে সহজ বিষয়। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয় (অর্থাৎ দ্বীন পালনে সে অক্ষম হয়ে যায়)। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থায় আমল করো, (আমল করার ব্যাপারে) সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকালে, দুপুরে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট) সাহায্য চাও।[৩৫৫]

সুতরাং দ্বীন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এমন একটা বিষয়, যা সহিংসতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জোরপূর্বক নিজের মতামত গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

৪. চতুর্থ বিষয় হলো, সমাজের সকল সদস্যের মাঝে শান্তিকামী হওয়ার মানসিকতা তৈরি। এটি এমন এক মূল্যবোধ, যার দ্বারা গুণান্বিত মানুষকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকট এবং

[৩৫৪]. *সহিহ বুখারি* : ২১৯, ৬০২৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৫।
[৩৫৫]. *সহিহ বুখারি* : ৩৯, *সুনানে নাসায়ি* : ৫০৩৪, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৩৫১।

CamScanner

সামাজের মাঝে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এমনকি এই শান্তিকামী মনোভাবের সুদূর বিস্তৃত সীমাও তিনি আমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। যেমন হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, কোন মুসলমান শ্রেষ্ঠ?'

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

> যে মুসলমানের জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, সে মুসলমানই শ্রেষ্ঠ।[৩৫৬]

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের সহিংসতা ও উগ্রতার সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু এই সামাজিক মূল্যবোধের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি এমন কিছু আদেশ-নিষেধও প্রদান করেছেন, যেগুলো সমাজের সহিংসতা বন্ধ করে দয়া, মমতা ও সম্প্রীতির প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নারীদের সাথে কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন। হজরত ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার বাঁদিদের আঘাত করবে না।' এরপর একবার উমর রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'মহিলারা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হচ্ছে।' এই কথার প্রেক্ষিতে নবীজি তাদেরকে আঘাত করার অনুমতি প্রদান করলেন। তবে এরপর অনেক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (আঘাতের) অভিযোগ আরোপ করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। মূলত যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে, তারা উত্তম লোক নয়।'[৩৫৭]

---

৩৫৬. *সহিহ মুসলিম* : ৪২, *সুনানে তিরমিজি* : ২৫০৪, *মুসনাদে আহমাদ* : ৬৭৯২, *মুসনাদে আবু ইয়ালা* : ২২৭৩।

৩৫৭. *সুনানে আবু দাউদ* : ২১৪৬, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২৭৬৫।

CamScanner

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেবক ও খাদেমদের ওপরও কঠোরতা আরোপ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হজরত আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার তিনি তার এক গোলামকে আঘাত করেন। তখন হঠাৎ তার পাশ থেকে শুনতে পান, 'হে আবু মাসউদ, জেনে রেখো, তুমি তার ওপর যেমন ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তারচেয়ে তোমার ওপর বেশি ক্ষমতা রাখেন!'

আবু মাসউদ রা. বলেন, আমি শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখনই আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তাকে স্বাধীন করে দিলাম।'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি এমনটা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে।'[৩৫৮]

আমরা আরও দেখি, তিনি সমাজে মানুষ হত্যা এবং অন্যায় রক্তপাত হারাম করেছেন। বরং এটাকে তিনি অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এই বিধির ভিত্তিমূলে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

> আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে হত্যা করো না, তবে (শরিয়ত অনুযায়ী) তোমরা তার অধিকার লাভ করলে ভিন্ন কথা। [সুরা বনি ইসরাইল : ৩৩]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের সামনে গুরুত্বের সাথে এই অপরাধের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন, যাতে মানুষের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। যেমন তিনি বলেন,

«لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»

> আসমান জমিনে বসবাসকারী সকলে মিলেও যদি মাত্র একজন মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা (এই একজন হত্যার

[৩৫৮]. *সহিহ মুসলিম : ১৬৫৯, সুনানে আবু দাউদ : ৫১৫৯, সুনানে তিরমিজি : ১৯৪৮।*

CS CamScanner

শাস্তি হিসেবে) তাদের সকলকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩৫৯]

লক্ষ করে দেখুন, মাত্র একজন মানুষের হত্যাও আল্লাহর নিকট কত মারাত্মক অপরাধ যে, শুধু এটুকুর জন্যই তিনি আসমান জমিনের সকল অধিবাসীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন!

তদ্রূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বিঘ্ন মানুষদের আতঙ্কিত করতেও নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি যেসব উপায়ে মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন ও আতঙ্কিত করা হয়, তার সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমও বন্ধ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

«مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি লৌহ নির্মিত (অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, তাহলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ফিরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে; যদিও সে তার আপন ভাই হয়।[৩৬০]

হাদিসটিতে মুসলমানের সম্মান রক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে আতঙ্কিত করা বা তাকে কোনোরকম কষ্ট প্রদান করা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর এই নিষেধের বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচরণই উত্তম সাক্ষী। যেমন ইহুদি যায়েদ ইবনে সুনার ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সে তাঁর নিকট এসে তাঁর জামা ধরে রাগান্বিত চোখে তাকালো এবং বলল, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি কি আমার ঋণ পরিশোধ করবে না?! আল্লাহর কসম, হে বনি আবদুল মুত্তালিব, তোমরা এমনই এক জাতি, যারা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করো। তোমাদের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে আমার এই জ্ঞান হয়েছে।'

---

৩৫৯. *সুনানে তিরমিজি* : ১৩৯৮, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৮০৩৬।
৩৬০. *সহিহ মুসলিম* : ২৬১৬, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৫৯৪৪।

CamScanner

যায়েদ ইবনে সুনা রা. বলে, আমি এই সময় উমর ইবনুল খাত্তাবের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ক্রোধে চেহারার মাঝে তার চোখদুটি যেন চড়কির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর শত্রু, আমি যা শুনছি ও দেখছি তুমি কি আল্লাহর রাসুলের সাথে তাই করছ!! সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি যদি তার সন্তুষ্টি হারানোর ভয় না করতাম, তবে এখনই আমার এই তরবারি দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উমরের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে ছিলেন। এরপর বললেন,

> হে উমর, এই মুহূর্তে তোমার থেকে আমাদের প্রত্যাশা ভিন্ন কিছু। যেমন তুমি আমাকে সুন্দরভাবে ঋণ আদায়ের কথা বলতে পারতে আর তাকে বলতে পারতে সুন্দরভাবে তা দাবি করার। শোনো, এখন তুমি তাকে সাথে করে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা আদায় করে দাও। আর তুমি যেহেতু তাকে ভয় দেখিয়েছ, সে কারণে তাকে তার অধিকার থেকে আরও বিশ সা' খেজুর বাড়তি আদায় করে দিয়ো।[৩৬১]

আমরা আরও দেখি, হাসিঠাট্টাচ্ছলেও তিনি কাউকে ভয় দেখাতে বা আতঙ্কিত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো সফরে ছিলেন। তখন তাদের এক ব্যক্তি ঘুমানোর সময় তাদের একজন (ঠাট্টার ছলে) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এতে সেই ঘুমন্ত ব্যক্তি আচমকা ভয় পেয়ে যায়। এই ঘটনা জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»

---

৩৬১. *সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৮৮, মুসতাদরাকে হাকেম : ২২৩৭।*

CamScanner

> কোনো মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।[৩৬২]

উল্লিখিত গুণসংবলিত সমাজের মানুষেরা নিরাপদ, নির্বিঘ্নভাবে জীবনযাপন করবে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবে কিছু কিছু বিচ্যুত মানুষ সমাজে থাকবেই। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে প্রলুব্ধ করে সমাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে এবং নিজেরা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে। তাদের জন্যই প্রয়োজন হয় শরিয়তের এমন সব আইন ও দণ্ডবিধানের, যেগুলো তাদের এসব অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। শরিয়তের এমন কিছু দৃষ্টান্ত হলো, কিসাস, বিদ্রোহ, ডাকাতি ইত্যাদির দণ্ডবিধান। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

> যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। [সুরা মায়িদা : ৩৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল দণ্ড বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কেননা এর মাঝে গোটা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল।

হিংস্রতা, সহিংসতা ও উগ্রতার সমস্যার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমাধান শুধু মুসলিমসমাজের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর দৃষ্টি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য সমানভাবে প্রসারিত ছিল। এ কারণে আমরা তাঁর জীবনের অধিকাংশ আচরণের ক্ষেত্রেই দেখি তিনি বিরোধীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি

---

৩৬২. *সুনানে আবু দাউদ : ৫০০৪, মুসনাদে আহমাদ : ২৩১১৪।*

CamScanner

যুদ্ধাবস্থায়ও তিনি শত্রুদের সাথে এরূপ আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণে তিনি সর্বদা তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ প্রদান করতেন, 'তোমরা কোনো অতি বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না।'[১১১]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদূর সম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন (শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বিজয় অর্জনের চেষ্টা করতেন)। যেমন খায়বারের যুদ্ধে হজরত আলি রা.-এর হাতে ঝান্ডা তুলে দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন,

> তুমি ধীরেসুস্থে এগিয়ে যাবে। এরপর যখন তুমি তাদের নিকট উপস্থিত হবে, প্রথমে তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করো। আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হেদায়েত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য বহু লাল রঙের উটের চেয়েও উত্তম।'[১১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব এই যে, তিনি লড়াই করেছেন অরাজকতা প্রসারের প্রতিটি রূপের বিরুদ্ধে এবং প্রতিটি এমন কাজের বিরুদ্ধে, যেগুলো সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং নির্বিঘ্ন মানুষদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। সেটা হতে পারে সন্ত্রাস, ডাকাতি, বিদ্রোহ কিংবা উগ্রতা ও সহিংসতার নামে। মূলত সবগুলোই সমাজের মাঝে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ায়। সমাজের শান্তিকামী মানুষদের শঙ্কিত করে এবং তাদের স্বাভাবিক সুস্থির জীবনের মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তির সাথে বসবাসের মাধ্যমেই জমিনে তারা এক অপূর্ব খোদায়ি খেলাফত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

---

[১১১]. সুনানে আবু দাউদ : ২৬১৪, সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ১৭৯৩২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৬/৪৮৩।
[১১২]. সহিহ বুখারি : ২৯৪২, ৪২১০; সহিহ মুসলিম : ২৪০৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব—ইসলাম এ দুটি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর উদ্ভব ও উৎপত্তির পূর্বেই বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে এর শিকড় কেটে ফেলার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে। যাতে মুসলিমসমাজকে নৈতিক, চারিত্রিক ও বিশ্বাসগত দিকের সমূহ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান আমাদের জানিয়েছে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মানুষের মানসিক সুস্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে সেইসব ব্যক্তির ওপর যারা ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাস ও শরিয়তের অনুশাসনের বাইরে অবস্থান করে। যেমন তারা বিভিন্ন নেশা, মাদকদ্রব্য গ্রহণে জড়িয়ে পড়ে। তদ্রূপ হত্যা, ছিনতাই, ইত্যাদিতেও এই বেকারদের উপস্থিতি বাড়ছে। এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আল্লাহ তাআলার নিকট দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতেন। এমনকি তিনি যে দোয়ায় কুফর থেকে আশ্রয় চাইতেন, সেই একই দোয়ায় দারিদ্র্যের ব্যাপারেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যেমন তিনি বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ»

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কুফরি এবং দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই।(৩৬৫)

আজকের আধুনিক বিশ্বে যেমন দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে, অতীতেও এই সমস্যা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমাধানে ইসলামের শিক্ষা ও বিধানাবলির আলোকে ক্রমান্বয় পদ্ধতির কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি মানুষদের উৎসাহিত করেছিলেন যেকোনো ধরনের কাজ ও পেশায় নিয়োজিত থাকতে। বস্তুত নবীরাও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তারা

---

৩৬৫. সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯০, মুসনাদে আহমাদ : ২০৩৯৭।

CS CamScanner

মানুষদের সামনে কর্মের এবং হালাল উপার্জনের উচ্চমানের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে বলেন,

«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[৩৬৬]

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য ও অনুসরণীয়, সেটা হলো তিনি নিজেও ছাগল চরিয়েছেন এবং নবুয়তপ্রাপ্তির আগে হজরত খাদিজা রা.-এর সম্পদের মাধ্যমে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যেমন হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ»

আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। তখন তাঁর সাহাবিগণ বললেন, আপনিও কি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।[৩৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল (বৈধ) কর্মকেই সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্বের চোখে দেখতেন, কাজটি যা-ই হোক না কেন। কেননা, মানুষের নিকট হাত পাতা এবং তাদের সামনে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে নিজে কাজ করে খাওয়াই উত্তম। এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদিসে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে,

«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

---

৩৬৬. *সহিহ বুখারি* : ২০৭২, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৬৩৩৩।

৩৬৭. *সহিহ বুখারি* : ২২৬২, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২১৪৯।

তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা থেকে) রক্ষা করেন, তার জন্য এটাই উত্তম মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ানোর চেয়ে, যে হাত পাতার ফলে মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে।[৩৬৮]

এ ছাড়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে কাজকর্ম ও পেশা সওয়াব লাভের মাধ্যম বলেও পরিগণিত ছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্প তৈরির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদেরকে বর্গাচাষের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন দরিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় আগত মুহাজির মুসলমানদের সাথে আনসার সাহাবিগণ করেছিলেন। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, আনসার সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজিরদের) মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না।'

তখন তারা মুহাজিরদের বললেন, 'আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন, আমরা আপনাদের বাগানের ফলের মধ্যে অংশীদার করে নেব।'

তখন মুহাজিরগণ বললেন, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম (অর্থাৎ তারা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন)।'[৩৬৯]

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদকে হারাম করেছেন। কেননা সমাজের দরিদ্রদের জন্য এর মাঝে রয়েছে অনেক রকমের ক্ষতিকর বিষয়। এটা সমাজের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে, তার পিছিয়ে পড়ার কারণ ঘটায় এবং দরিদ্রদের আরও দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত করে তোলে। অবশেষে এটা তাদের পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাকো।'

---

৩৬৮. *সহিহ বুখারি* : ১৪৭০, ১৪৭১; *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১৮৩৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৪২৯।
৩৬৯. *সহিহ বুখারি* : ২২০০।

CamScanner

তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কী কী?' নবীজি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো হলো, আল্লাহর সাথে শিরক করা,... সুদ খাওয়া... ।'[৩৭০]

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনের এ সকল নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রয়োগের বাস্তব নমুনা ছিল আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন। যেমন হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার এক আনসারি ব্যক্তি এসে নবীজির নিকট হাত পাতল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঘরে কি কিছু নেই?'

লোকটি বলল, 'একটি গালিচা আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছিয়ে রাখি। একটি পাত্রও আছে, তাতে আমরা পানি পান করি।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

লোকটি সেগুলো নিয়ে এলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বললেন, 'এ দুটি কে ক্রয় করবে?'

এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এগুলো এক দিরহামে ক্রয় করব।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আরও দুইবার অথবা তিনবার বললেন, 'কেউ কি এর অধিক মূল্য দেবে?'

আরেকজন বলল, 'আমি দুই দিরহামে নেব।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই ব্যক্তিকে জিনিস দুটি দিয়ে তার থেকে দিরহামদুটি গ্রহণ করলেন। এরপর সেই আনসারি ব্যক্তিকে তা প্রদান করে বললেন, 'এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং আরেক দিরহামে একটি কুঠারের ফলা কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

লোকটি তাই করল। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সেই লৌহ কুঠারে একটি হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, তুমি এটা দিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করো এবং পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে আমার সাথে আর দেখা করবে না।'

---

৩৭০. *সহিহ বুখারি* : ২৭৬৭, ৬৮৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ৮৯।

CamScanner

লোকটি কুঠার হাতে চলে গেল। কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে লাগল। (এভাবে পনেরো দিন পার হলে) সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাক্ষাৎ করতে এলো। ইতিমধ্যে সে দশ দিরহাম উপার্জন করেছে। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাবার কিনল। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

«هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ভিক্ষার কারণে কিয়ামতের দিন মুখমণ্ডলে দাগ নিয়ে ওঠার চেয়ে এটাই তোমার জন্য উত্তম।

(এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন) তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারও জন্য অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ানো বৈধ নয়। ১. প্রচণ্ড দরিদ্র ব্যক্তি। যথা : ২. ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি। ৩. যার ওপর রক্তপণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম।[৩৭১]

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে এটা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাস্তবসম্মত প্রায়োগিক পদক্ষেপ। যত সামান্যই হোক, তিনি দরিদ্র লোকটির শক্তি-সক্ষমতাকে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। তাকে দেখিয়েছেন একটি সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে হালাল রিজিক উপার্জন করার পথ ও পদ্ধতি।

কিন্তু অবস্থা যদি বেশি সংকীর্ণ হয়। মানুষটি কোনো কাজ করতে সক্ষম না হয় এবং সে একজন দরিদ্র অভাবী ব্যক্তি হিসেবে করুণ জীবনযাপন করতে থাকে, তখন তার এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামের নীতি হলো, সচ্ছল ধনী আত্মীয়রা তাদের দরিদ্র আত্মীয়দের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাদের মাঝে যেহেতু নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, আত্মীয়দের জন্য এটি এক আবশ্যক অধিকার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾—তুমি নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান করে দাও। [সুরা রুম : ৩৮]

এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতই আমাদের সামনে সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখিয়েছে এবং প্রতিটি

---

৩৭১. *সুনানে আবু দাউদ : ১৬৪১, সুনানে তিরমিজি : ৬৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৯৮, মুসনাদে আহমাদ : ১২১৫৫*

মুসলমানের নিকট পারস্পরিক সংহতিমূলক দায়িত্ব পালনে অগ্রগণ্যতার বিন্যাস বর্ণনা করেছে। যেমন হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, বনু উজরাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তার গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্তিলাভের ঘোষণা দিলেন। এ সংবাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছাল। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'এ ছাড়া তোমার কাছে আর কি কোনো সম্পদ আছে?'

লোকটি বলল, 'না।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এমন কে আছ যে আমার থেকে এ গোলামটি ক্রয় করবে?'

তখন নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ আদাবি তাকে আটশত দিরহামে ক্রয় করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো গ্রহণ করে লোকটিকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন,[৩৭২]

«اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»

এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। তারপর যদি কিছু বাকি থাকে, তাহলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করো। এরপর অবশিষ্ট থাকলে তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করো। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা এদিকে-সেদিকে ব্যয় করো।' এ বলে তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।[৩৭৩]

কিন্তু যখন ধনী আত্মীয়গণ তাদের দরিদ্র আত্মীয়দের প্রয়োজন পূরণে অপারগ হবে, তখন সমাজের অন্যদের ওপর দরিদ্রদের দায়িত্ব বর্তাবে। তাদের তখন সেই জাকাত থেকে অর্থসম্পদ প্রদান করা হবে, যা আল্লাহ তাআলা ধনীদের সম্পদ থেকে দরিদ্রদের জন্য আবশ্যক সাব্যস্ত

---

৩৭২. আবদে মুদাব্বার তথা যেই গোলাম মালিকের মৃত্যুর পর আজাদ হয়ে যাবে তাকে বিক্রি করা যাবে কি যাবে না তা নিয়ে আহলুল ইলমগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। এই হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা শরহুল হাদিস ও ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান রয়েছে।-সম্পাদক।

৩৭৩. *সহিহ মুসলিম* : ৯৯৭, *সুনানে নাসায়ি* : ২৫৪৬।

CamScanner

করেছেন। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা সেই দরিদ্র ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যে কর্ম করতে এবং উপার্জন করতে সক্ষম নয়। এ কারণে নবীজি বলেছেন,

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

> জাকাতের সম্পদ গ্রহণ করা কোনো ধনীর জন্য বৈধ নয় এবং বৈধ নয় কোনো সুস্থ-সবল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্যও।[৩৭৪]

এ হাদিসের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মহীন, অলস ভবঘুরে ব্যক্তিদের জন্য জাকাতের সম্পদে কোনো অধিকার রাখেননি। এর মাধ্যমে তিনি সক্ষম ব্যক্তিদের কর্ম ও উপার্জনের দিকে ধাবিত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু জাকাতের সম্পদেও যদি সকল দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণ না হয়, তখন মুসলিম রাষ্ট্রের পুরো ধনভান্ডার থেকে সম্পদ প্রদান করে তাদের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ঘুচানো হবে এবং স্বধর্মী-বিধর্মী সকলপ্রকার অভাবী ব্যক্তির আশ্রয়স্থল বিবেচিত হবে সেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের মাঝে উত্তম দৃষ্টান্ত হলো 'আহলে সুফফা'[৩৭৫]-এর জন্য তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা।

এরপরও যদি সমাজে এমন দরিদ্র অবশিষ্ট থাকে, যে নিজে কাজ করতে সক্ষম নয়, তাহলে সমাজের সকল সদস্যের জন্য আবশ্যক হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের জন্য সদকা প্রদান করা।

মানবসমস্যা সমাধানে এটি ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন। যেমন হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার

---

৩৭৪. *সুনানে আবু দাউদ* : ১৬৩৪, *সুনানে তিরমিজি* : ৬৫২, *সুনানে নাসায়ি* : ২৫৯৭।
কর্মক্ষম ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, মৌলিকভাবে তো জাকাত তার জন্যও জায়েজ, তবে সেজন্য তার হাত পাতা বৈধ নয়। এটিই হাদিসের উদ্দেশ্য।-সম্পাদক

৩৭৫. أَهْلُ الصُّفَّةِ (ঝুপড়িবাসী)। 'আহলে সুফফা' বলা হতো সে সকল দরিদ্র মুহাজিরকে, যাদের বসবাসের নিজস্ব কোনো গৃহ ছিল না। মসজিদে নববির ছায়াময় এক জায়গায় তারা অবস্থান করতেন। (তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য অর্জন করতেন এবং দ্বীন-ইসলামের জ্ঞান চর্চা করতেন।)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মাঝে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে দান-সদকার ওপর উৎসাহিত করলেন। কিন্তু লোকজন দান করতে বিলম্ব করছিল। এমনকি বিলম্বের কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় রাগের ভাব পরিলক্ষিত হলো। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো এবং তা তাঁকে প্রদান করল। এরপর অনেকেই একের পর এক দান করতে লাগল। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় খুশির ভাব পরিদৃষ্ট হলো। তখন তিনি বললেন, যে লোক কোনো ভালো কাজের সূচনা করল এবং পরবর্তীকালে সে অনুসারে আমল করা হলো, তাহলে সেই কাজের সূচনার জন্য অন্যান্য আমলকারীর প্রতিদানের সমান প্রতিদান তার জন্য লিখিত হবে। তবে এতে পরবর্তী আমলকারীদের প্রতিদানে কোনো ঘাটতি হবে না। আর যে লোক কোনো খারাপ কাজের সূচনা করল এবং তারপর সে অনুযায়ী আমল করা হলো, তাহলে সেই কাজের সূচনার জন্য অন্য আমলকারীদের খারাপ প্রতিদানের সমান গুনাহ তার জন্যও লিখিত হবে। এতেও তাদের পাপ সামান্য পরিমাণ হ্রাস করা হবে না।[৩৭৬]

বস্তুত সমাজের সদস্যদের মাঝে এসব আদর্শ ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সমাজের বুনিয়াদ মজবুত হয়। তার ভিত্তিগুলো ভারসাম্যপূর্ণ হয়। তাকে তখন হিংসা ও বিদ্বেষের ব্যাধি দংশন করতে পারে না। অন্যদের দয়ার দানের দিকে বুভুক্ষুর মতো কাউকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। একদিকে কিছু লোকের উদরপূর্তি হবে, আর অন্যরা জীবনধারণের সামান্য অবলম্বনও পাবে না, তখন আর এমনটা হবে না।

মোটকথা, ইসলাম দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে বাস্তবসম্মত ও প্রায়োগিক সমাধান প্রদানে সক্ষম হয়েছে। আর এ ধরনের সমস্যা সমাধানের এই অনন্যসাধারণ দূরদর্শী পদ্ধতিগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সেইসাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সামনে তিনি যে নীতি-বিধি উপস্থাপন করেছেন, এটা কোনো মানব-উদ্ভাবিত রীতি-পদ্ধতি নয়; অবশ্যই তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত আসমানি ওহির শিক্ষা।

---

[৩৭৬]. *সহিহ মুসলিম* : ১০১৭, *সুনানে নাসায়ি* : ২৫৫৪, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯২২৫।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মাদক ও নেশাদ্রব্য প্রতিরোধ-প্রতিকারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ক্ষতি করে এমন সকল-কিছুকে ইসলাম হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর সকল মানুষের জন্য উত্তম এবং উপকারী এমন সকল বিষয়কে করেছে হালাল ও বৈধ। বস্তুত আল্লাহ তাআলা যা-কিছু হারাম করেছেন, মানুষকে তার উত্তম বিকল্প প্রদানও করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

> সে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে এবং তাদের থেকে তাদের ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। [সুরা আরাফ : ১৫৭]

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর বা নফস সর্বদা তার চাহিদাগুলো চরিতার্থ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণামে তার যে বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় সেদিকে সে খেয়ালই করতে চায় না। এ কারণে ইসলাম তার অনুসারীদের নফসের খামখেয়ালি ও একগুঁয়েমির লাগাম টেনে ধরার নির্দেশ প্রদান করেছে। মানুষ যত ধরনের সমস্যা ও ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে, সেগুলো থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক নানা আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যেগুলোর সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটেছিল।

মানুষের জন্য অনিষ্টকর এমন সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান একটি সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। প্রাচীন আরবদের মাঝে এটি রক্তমাংসের সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা তাদের কবিতাগুলোর মধ্যেও মদের প্রশংসা করত। আরবদের কবিতায় প্রথমাংশে থাকত সাধারণত পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির

CamScanner

স্মৃতিকথা, এরপরই শুরু হয়ে যেত মদের বর্ণনা ও বিবরণ। তাদের ঘরে-বাইরে, সভা-বৈঠকে কোনো স্থানেই মদ ছাড়া চলত না। মদ ব্যতীত তারা যেন তাদের জীবনযাপন কল্পনাও করতে পারত না। এ কারণে এই সমস্যার প্রতিকারে আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানও এসেছে অতি বিচক্ষণ পদ্ধতিতে, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে, সমাধানটি এসেছে সমস্ত জাহানের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনুল কারিমের আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে অপূর্ব ধারাবাহিকতার সাথে। ধীরে ধীরে মানুষকে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথমে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিচের আয়াতটি প্রথম নাজিল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

> এবং খেজুরের ফল ও আঙুর থেকেও (আমি তোমাদের পানীয় দান করি), যা দ্বারা তোমরা মদ বানাও এবং উত্তম খাদ্যও (বানাও)। নিশ্চয় এর ভেতরও সেই সব লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। [সুরা নাহল : ৬৭]

এখানে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য খাদ্যকে 'উত্তম' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে 'উত্তম' শব্দ ব্যবহার করেননি। এর দ্বারা মূলত মদ পরে কোনো সময় হারাম হওয়ায় প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর তিনি মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন মদের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর দিকে বলেছেন। যদিও তাতে কিছু উপকার রয়েছে, কিন্তু উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

> তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দুটোর মধ্যে মহাপাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। আর এ দুটোর পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর। [সুরা বাকারা : ২১৯]

এর পরের ধাপে আল্লাহ তাআলা নামাজের পূর্বে মদ্যপান করা নিষেধ করেন। অর্থাৎ নামাজে আসার মুহূর্তে অবশ্যই তাদেরকে পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত থাকতে হবে, মাতাল থাকা যাবে না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন নামাজের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো। [সুরা নিসা : ৪৩]

এভাবে একের পর এক সচেতনতার কারণে মানুষের অন্তর মদ হারাম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকটা প্রস্তুত হয়ে গেল এবং একদিন তা পরিপূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে বলে মনে মনে দিন গুনতে লাগল। যেমন হজরত উমর রা. বলেন,

«اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا»

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করুন।[৩৭৭]

এরূপ প্রস্তুত হয়ে ওঠার পরই একদিন আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণভাবে মদ হারাম করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তির অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং এসব পরিহার করো, যেন তোমরা সফলতা অর্জন করো। [সুরা মায়িদা : ৯০]

---

৩৭৭. *সুনানে নাসায়ি : ৫৫৪০, মুসনাদে আহমাদ : ৩৭৮, মুসতাদরাকে হাকেম : ৩১০১।*

CS CamScanner

হজরত আয়েশা রা. জাহেলি যুগের মানুষের অন্তরে মাদকাসক্তির গভীরতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। এ কারণে তিনি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ওহির ক্রমধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলেন,

...প্রথমবারেই যদি মদ সম্পর্কে নাজিল করা হতো তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা অবশ্যই বলে বসত, আমরা কখনোই মদ ছাড়ব না।[৩৭৮]

কিন্তু অন্তরে আল্লাহ তাআলার ধ্যান-খেয়ালের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সমাজকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন, তাতে কুরআনের আয়াতে মদ হারামের কথা নাজিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবিগণ তাঁর আদেশকে মান্য করে নিয়ে ছিলেন। যেমন হজরত আনাস রা. বলেন, একদিন আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। সেদিন তারা 'ফাজিখ' নামক মদ পান করছিল। এদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এই মর্মে ঘোষণা দেয়, 'সাবধান! মদ এখন থেকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।'

এই ঘোষণা শুনে আবু তালহা আমাকে বললেন, 'বাইরে যাও এবং ঘরের সমস্ত মদ ফেলে দাও।' আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত মদ রাস্তায় ঢেলে দিলাম।

আনাস রা. বলেন, সেদিন মদিনার রাস্তাঘাটে মদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।[৩৭৯]

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাজিলের মাধ্যমে অকাট্যভাবে মদ হারাম হওয়ার পরেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন তিনি হজরত আবু দারদা রা.-কে বলেন, মদ পান করো না। কেননা, তা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি।[৩৮০]

---

[৩৭৮]. *সহিহ বুখারি* : ৪৯৯৩, বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ২২২৬, *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ৩/৩৫২।

[৩৭৯]. *সহিহ বুখারি* : ২৪৬৪, *সহিহ মুসলিম* : ১৯৮০।

[৩৮০]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৩৩৭১, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৭২৩১।

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন তাদের ওপর, যারা মদ তৈরি করে, বিক্রি করে এবং পান করে। এ বিষয়ে তিনি বলেন,

«لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

মদ, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়, এদের সকলকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন।[৩৮১]

কিন্তু তাই বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেননি, বরং খোলাই রেখেছেন। এমনকি কেউ যদি বারবার ভুল করে তবুও। আবার তাদের একেবারে নির্ভয়েও ছেড়ে দেননি। বরং মদ্যপায়ীদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ, আখিরাতের শাস্তি এবং তাঁর নিকট তাওবার তাওফিক না হওয়ার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সমাজে শিকড় গেড়ে বসা এমন সমস্যাগুলোর সমাধানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই মহানুভব পন্থায় তার সমাধান করতেন। তাই তিনি সকলকে সতর্ক করার জন্য বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। এ অবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন। পুনরায় মদ পান করলে ও মাতাল হলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাজ কবুল হবে না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। আর যদি এ অবস্থায়ও তাওবা করে তাহলেও আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন। (আবার) এরপরও সে যদি মদ্যপানে লিপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবেন।'

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, রাদাগাতুল খাবাল কী?' নবীজি বললেন, 'জাহান্নামিদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।'[৩৮২]

---

৩৮১. সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৭৪, সুনানে তিরমিজি : ১২৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৩৮০।
৩৮২. সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৮০, সুনানে তিরমিজি : ১৮৬২, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৩৭৭। সুনানে দারেমি : ২০৯১, মুসনাদে আহমাদ : ৬৬৪৪, মুসতাদরাকে হাকেম : ৭২৩২।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে বিশেষ কিছু উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশের মধ্যে মদের বিষয়টিও ছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি উম্মতের মাঝে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তাদের সকল ধরনের মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যে আপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। যেমন হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার এক লোক নবীজির কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কিছু নসিহত করুন।' নবীজি তাকে বললেন,

«لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ.... وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ...»

আল্লাহর সাথে কিছু শরিক করো না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করা হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়।...আর মদ পান করো না। কেননা এটা সকল অন্যায়ের চাবিস্বরূপ।[৩৮৩]

এ ছাড়া মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর মদের ক্ষতিকারক প্রভাবের কথাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। একবার এক সাহাবি তার নিকট এসে মদকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» –নিশ্চয় এটা (মদ) ব্যাধি, ব্যাধিনিরোধক (ওষুধ) নয়।[৩৮৪]

আজকের আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রও প্রমাণ করেছে, যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, তারা খুব সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন লিভার ব্লক হয়ে যাওয়া। এর কারণ হলো মদ লিভারের দেহকোষকে ধ্বংস করে ফেলে। সেখানে চর্বি জমায়। এ ছাড়া মদের কারণে পরিপাকতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন মানুষ তার স্বাভাবিক খাদ্যচাহিদা হারিয়ে ফেলে। পুষ্টিহীনতা ও ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেয়। স্নায়ুর ওপর ভীষণ চাপ পড়ে। ফলে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। হার্টের

---

৩৮৩. *সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০৩৪, মুসনাদে আহমাদ : ২২১২, মুসতাদরাকে হাকেম : ৬৮৩০।*
৩৮৪. *মুসনাদে আহমাদ : ১৮৮৭৯, সহিহ ইবনে হিব্বান : ২০৬৫।*

CamScanner

মাংসপেশিতেও খারাপ প্রভাব ফেলে এবং রক্তগঠনের বিভিন্ন উপাদানেও সমস্যা দেখা দেয়।[৩৮৮]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মদের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা অব্যাহত রেখেছিলেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি অতীতের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করো, কেননা তা নানারকম অপকর্মের উৎস। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক দুশ্চরিত্রা নারী তার প্রেমে পড়ে যায় ও তাকে কাছে পেতে সে তার এক দাসীকে সেই আবেদ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকতে পাঠাল। তখন সেই আবেদ ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাসীর সাথে আগমন করল। সে যখনই কোনো দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেই দরজা বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে এসে উপস্থিত হলো। নারীর সামনে ছিল একটি বাচ্চা ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি। বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই মদ পান করবেন, অথবা এই বাচ্চাকে হত্যা করবেন। (এই তিনটার যেকোনো একটি আপনাকে করতেই হবে।)

আবেদ বলল, 'আমাকে এক পেয়ালা মদ দাও।' সেই নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করালো। তখন সে আবেদ বলল, 'আরও দাও...।' এভাবে সেই আবেদ আর থামল না। শেষপর্যন্ত সেই আবেদ নারীটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং উক্ত বাচ্চাকেও হত্যা করল। অতএব, তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা, আল্লাহর শপথ! মদ ও ঈমান কখনো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এর একটি অপরটিকে বের করে দেয়।[৩৮৯]

---

[৩৮৮]. জারিদাতুর রিয়াদ। ওয়েবসাইট : www.alriyadh.com। আরও দেখুন, মুস্তফা সুওয়াইফ : আল-মুখাদ্দিরাত ওয়াল-মুজতামা : ৮৬-৯১।

[৩৮৯]. সুনানে নাসায়ি : ৫৬৬৬, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫৩৪৮।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে সমস্যার সমাধান করেছেন, নামের তুলনায় তার বিষয় বা বস্তুর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি যখন মদ হারাম করেছেন, তখন একইসাথে এমন সকল বিষয়কেও হারাম করেছেন, যেগুলো মদের মতো, মস্তিষ্ক বিকৃতিকারী। তার উৎস যেটাই হোক, আঙুর, খেজুর অথবা অন্যকিছু। সবই হারাম। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

যে পানীয়ই মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।[৩৮৭]

হজরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে নেশাজাতীয় সকলপ্রকার দ্রব্য শরিয়তে হারাম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। কেননা এটা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে। সমাজকে দুর্বল করে। হাদিসটিতে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নেশাদায়ক ও অবসাদ সৃষ্টিকারী[৩৮৮] দ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন।[৩৮৯]

আমরা আরও দেখতে পাই, যা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এমন সবকিছুই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

'না সাধারণ অবস্থায় অন্যের ক্ষতি করা যাবে আর না প্রতিশোধের ভিত্তিতে একে অপরের ক্ষতি করার সুযোগ আছে।'[৩৯০] (অর্থাৎ ইসলাম কোনোভাবেই মানবসমাজের ক্ষতি সমর্থন করে না।)

অতএব, মদের ক্ষেত্রে যেরকম নিষিদ্ধতা ও শাস্তির বিধান রয়েছে, তদ্রূপ অন্য সকল সমাজবিধ্বংসী নেশাজাতীয় দ্রব্য ও বিষাক্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও একইভাবে নিষিদ্ধতা ও শাস্তি প্রয়োগ হবে।

---

৩৮৭. *সহিহ বুখারি* : ২৪২, ৫৫৮৫; *সহিহ মুসলিম* : ২০০১।

৩৮৮. অর্থাৎ এমনকিছু গ্রহণ করা যার পর শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং ছাড়া ছাড়া ভাব চলে আসে, যদিও পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হয় না।-সম্পাদক

৩৮৯. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩৬৮৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬৬৭৬।

৩৯০. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৩৪০, *মুয়াত্তা মালেক* : ১৪২৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৮৬৭।

CamScanner

মদ ও মাদক হারাম হওয়ার পর যে ব্যক্তি এগুলো পান করবে, তার ক্ষেত্রে শরিয়তে স্পষ্ট শাস্তির বিধান এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিয়তের এ বিধানের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানের ক্ষেত্রে খেজুর গাছের ডাল এবং জুতা দিয়ে আঘাত করেছেন।[৩৯১]

আর হজরত কাবিসা ইবনে জুআইব রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ»

যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করো।[৩৯২]

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে এসব শাস্তির উদ্দেশ্য হলো, সেইসব ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্ত করা, যাদের নফস তাদেরকে মাদক ও নেশাদ্রব্যের প্রতি প্ররোচিত করে। অর্থাৎ এ শাস্তির দ্বারা অপরাধীদের থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের এই শাস্তি প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতি একধরনের সহানুভূতির প্রকাশ। কারণ, তারা অসুস্থ। তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন। সহমর্মিতার সাথে তাদেরকে এটা থেকে ফিরিয়ে আনাই এ শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের অন্তর থেকে ভুল ধারণা রহিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপও নিয়েছেন। যেমন হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। তখন নবীজি বললেন, 'তাকে প্রহার করো।'

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তখন তাকে হাত দিয়ে মারল। কেউ মারল জুতা দিয়ে। কেউ মারল কাপড় দিয়ে। এরপর লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন লোকদের মধ্যে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, أَخْزَاكَ اللهُ –আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক।

---

[৩৯১]. *সহিহ বুখারি* : ৬৭৭৩, *সহিহ মুসলিম* : ১৭০৬।

[৩৯২]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৪৮৫, *সুনানে নাসায়ি* : ৫৬৬১, *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৭৪৮।

CS CamScanner

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন,

«لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ»

তোমরা কিছুতেই এমন কথা বলো না। তার ওপর শয়তানকে সাহায্য করো না।[৩৯৩]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যকরভাবে পর্যায়ক্রমে মাদক ও নেশার সমস্যা সমাধান করেছেন। প্রথমত আল্লাহ তাআলার ভয় বা তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করে। কারণ, সকল মাদককে হারাম করেছেন আল্লাহ তাআলা। অর্থাৎ মাদকসমস্যার সমাধানে প্রথম পদ্ধতি হলো আল্লাহ তাআলার ভয় বা তাকওয়া। দ্বিতীয়ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাধ্য ও বিচ্যুতদের জন্য শাস্তির সকল দণ্ডবিধানই প্রয়োগ করেছেন। আর এ পদ্ধতিও বক্র লোকদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া থেকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করে। আর এর মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের সমূহ কল্যাণ ও সংশোধন।

সামসময়িক সমস্যাগুলোর সংশোধন ও সমাধানের ক্ষেত্রে এই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ও পদ্ধতি। এই পরিচ্ছেদে আমরা এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো সহিংসতা ও সন্ত্রাস, যার দ্বারা গোটা বিশ্ব আক্রান্ত। আমরা দেখেছি, এই সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্য নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার সমাধান করেছেন!

আরেকটি বিষয় ছিল সমাজের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। এখানেও আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি চমৎকারভাবে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করেছেন। সমাজের সকল ব্যক্তি ও শ্রেণির সামনে তিনি কাজকর্ম ও পরিশ্রমের দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। হতাশ না হয়ে কর্মে উদ্যোগী হওয়ার প্রতি তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

সর্বশেষ আমরা দেখেছি, সমাজে শিকড় গেড়ে বসা অন্য আরেকটি ভয়াবহ সমস্যার সুন্দর একটি সমাধান তিনি দিয়েছেন। অর্থাৎ মাদকাসক্তি

---

৩৯৩. *সহিহ বুখারি* : ৬৭৭৭, *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৪৭৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৯৭৩।

ও নেশাদ্রব্যের সমস্যা। এটাও তিনি সমাধান করেছেন অতি বিচক্ষণতার সাথে, পর্যায়ক্রমে।

মোটকথা, সকল সমস্যার সমাধানেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ও পদ্ধতি ছিল অনন্য ও অসাধারণ। জাগতিক সকল পদ্ধতি থেকে যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তা হলো, সমাজের প্রতিটি সদস্যের অন্তরে আল্লাহ তাআলার সদা পর্যবেক্ষণের ভীতি রোপণ করে দেওয়া অর্থাৎ তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করা। এই চেতনা ও মূল্যবোধের কারণে তারা নিজেরাই সব ধরনের খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত থেকেছে। প্রতিফলে সকলেই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতে সক্ষম।

আমাদের সামসময়িক বিশ্বের আধুনিক সমাজেও এই সমস্যাগুলো ভীষণ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো বিশ্ব এখন এসব ভয়াবহ সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত ও জর্জরিত। বলাবাহুল্য, কত তীব্রভাবেই-না বিশ্ব আজ এগুলোর সমাধানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই নিয়ম ও পদ্ধতির দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। যেই সমাধানগুলোকে তিনি নিজের দিকে সম্বন্ধ করেননি। বরং এগুলোর সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহ তাআলার দিকে। অর্থাৎ এই বিধানগুলো এসেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আর এর মাঝেই রয়েছে নবীজির সত্যতার ওপর এবং তাঁর নবুয়তের দাবির পেছনে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য না থাকার অকাট্য প্রমাণ।

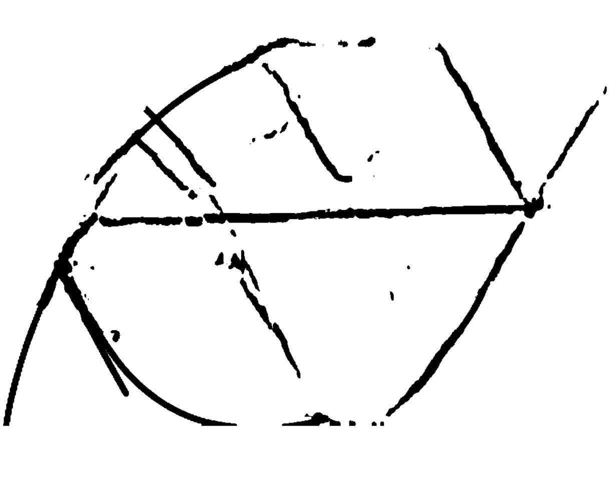

CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার তাঁর নবুয়তের প্রমাণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনকেই তাঁর নবুয়তের সত্যতার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, তাঁর এই জীবন ছিল সব দিক দিয়ে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন শুধু তাঁরই হতে পারে, যিনি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ও নির্বাচিত। আর তিনি নিজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন একটি মহান আদর্শ ও চেতনার। যেমনটি তাঁর ক্ষেত্রে বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ○ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾

> সে তাঁর নিজ খেয়ালখুশি থেকে কিছু বলে না। এটা তো খালেস ওহি, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তিমান (ফেরেশতা)। [সুরা নাজম : ৩-৫]

সুতরাং তোমরা এই আবেদ রাসুলের দিকে লক্ষ করো, যিনি রাতদিন তাঁর প্রতিপালকের নাম নিতে অবহেলা করেন না। এই উম্মির দিকে লক্ষ করো, যাকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রচণ্ড শক্তিমান এক ফিরেশতা। লক্ষ করো এই নবীর দিকে, যিনি তাঁর উম্মতকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে অধিক আগ্রহী। যিনি দুনিয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরাসক্ত, অথচ দুনিয়া তাঁর নিকট এসেছিল প্রচণ্ড আসক্তি নিয়ে। আরও লক্ষ করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কীভাবে তাঁকে নিষ্কলুষ রেখেছেন। কীভাবে তাঁর জীবনের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন! এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তোমরা অনুধাবন করতে পারবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সমস্ত জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসুল। এমন স্বচ্ছ সুন্দর ও নির্মল জীবন যার, তিনি কিছুতেই মিথ্যার দাবিদার হতে পারেন না। কিছুতেই তিনি হতে

CamScanner

পারেন না প্রতারক ও প্রবঞ্চক। তিনি হতে পারেন না কোনো রাজ্য ও রাজত্বের উচ্চাভিলাষী। হতে পারেন না এই তুচ্ছতর দুনিয়ার প্রত্যাশী। নিচের আলোচনাগুলোয় আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের এমন কিছু দিক উপস্থাপন করতে চাই, যেগুলো তাঁর নবুয়তের সত্যতার স্পষ্ট দলিল ও প্রমাণ বহন করে।

প্রথম অনুচ্ছেদ
নবীজি ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
নবীজি ﷺ-এর ইবাদত-বন্দেগি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
উম্মতের প্রতি নবীজি ﷺ-এর দরদ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
নবীজি ﷺ-এর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
নবীজি ﷺ-এর নিরক্ষরতা

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবিমুখতা

জীবন সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনকে একটি ভারসাম্য দান করে। তখন সে অনুধাবন করে, পার্থিব এ জীবন দেখতে যত বড়ই মনে হোক, বাস্তবে তা খুবই ছোট ও সংক্ষিপ্ত। বরং আখিরাতই হলো উত্তম ও স্থায়ী। এ কারণে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া সম্পর্কে বলেন,

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

আর (জান্নাতের বিপরীতে) পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। [সুরা আলে ইমরান : ১৮৫]

আল কুরআনুল কারিম মানুষের সামনে তার দুনিয়াপ্রত্যাশা প্রসঙ্গে একটি বাস্তবসম্মত মানদণ্ড স্থাপন করেছে এভাবে,

﴿وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত! [সুরা আনকাবুত : ৬৪]

অতএব, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পার্থিব জীবন আখিরাতের শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের মূল ও কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছানোর জন্য এটা নিছক একটা পথ বা রাস্তা। আর দুনিয়া সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক এই কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেন,

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

তুমি দুনিয়ার মধ্যে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি একজন আগন্তুক অথবা নিছক একজন রাস্তা অতিক্রমকারী।[৩৯৪]

---

৩৯৪. *সহিহ বুখারি : ৬৪১৬, সুনানে তিরমিজি : ২৩৩৩, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১১৪।*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তবতা এবং আল্লাহর কাছে আখিরাতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিখিয়েছেন। এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ»

আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে দেখুক তার আঙুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।[৩৯৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব হলো, তাঁর পুরো জীবন ছিল দুনিয়ার বিষয়ে এই ঐশী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব ও আদর্শ নমুনা। যেমন হজরত উমর রা. একবার নবীজির কামরা ও তাঁর জীবনযাপনের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি তাঁর (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কামরায় প্রবেশ করে দেখি, তিনি খেজুরের আঁশভরতি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খেজুরপাতার খালি চাটাইয়ের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝখানে কোনো বিছানা ছিল না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে।... তারপর আমি নবীজির ঘরের ভেতর এদিক-সেদিক দৃষ্টি দিলাম। কিন্তু তাঁর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দেখার মতো আর কিছুই পেলাম না, তখন আমি আবেদন করলাম, 'আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদের অনেক সচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদের পার্থিব প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কি কোনো সন্দেহের মধ্যে রয়েছ?

CamScanner

তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[৩৯৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সাহাবিরাও অনেকবার নবীজির শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরপাতার খালি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। এ কারণে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর আমার পিতামাতা কোরবান হোক। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা আপনার চাটাইয়ের ওপর একটি বিছানা বিছিয়ে দিই, যেন সেটা আপনাকে এই কষ্ট থেকে রক্ষা করে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«مَا أَنَا وَالدُّنْيَا، إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া তো আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল।[৩৯৭]

আমরা আরও দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে অনেকগুলো বিজয় দান করেছেন। ইচ্ছা করলেই তিনি আরাম-আয়েশের সাথে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু এসব ত্যাগ করে তিনি দুনিয়াবিমুখ জীবনই গ্রহণ করেছেন। লোক দেখানো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে বহুদূরে অবস্থান করেছেন। পানাহারেও থেকেছেন মিতব্যয়ী এবং অতি সাধারণ। সেই অতি সাধারণ খাদ্যও অনেক সময় তাঁর দস্তরখানে থাকত না। হজরত নুমান ইবনে বশির রা. একবার নিজের খুতবা প্রদানকালে বলেন, হজরত উমর রা. বলেছেন, মানুষ আজ কী বিপুল পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করেছে! অথচ,

---

[৩৯৬]. *সহিহ বুখারি* : ৪৯১৩, *সহিহ মুসলিম* : ১৪৭৯।
[৩৯৭]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৪১০৯, *সুনানে তিরমিজি* : ২৩৭৭।

CamScanner

«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ»

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থেকেছেন। (কখনো কখনো) ক্ষুধা নিবারণের জন্য এমন কিছু নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না, যার মাধ্যমে নিজের পেটপূর্ণ করবেন।[৩৯৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহুবার এমন ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন! তেমনই একবারের কথা হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করে বলেন, একদিন দিবসে অথবা রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর রা.-কেও বাইরে দেখতে পেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'এই অসময়ে কোন কারণে তোমারা ঘর থেকে বের হয়েছ?'

তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, ক্ষুধার যন্ত্রণার কারণে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে মহান আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! তোমরা যে কারণে বের হয়েছ, আমিও সে কারণে বের হয়েছি, চলো আমার সাথে।'

নির্দেশমতো তারা (হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা.) উভয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা এক আনসারি সাহাবির বাড়িতে এলেন। তখন সেই সাহাবি বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু তার স্ত্রী নবীজিকে দেখে বলল, 'মারহাবান ওয়া আহলান—আপনাদের স্বাগতম।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক কোথায়?' সাহাবির স্ত্রী বলল, 'তিনি আমাদের জন্য মিষ্টিপানি আনতে গেছেন।'

ইতিমধ্যে সেই আনসারি সাহাবি সেখানে উপস্থিত হলেন। নিজের বাড়ির সামনে নবীজি ও তার দুই সাথিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা, আজ মেহমানের দিক দিয়ে আমার মতো সৌভাগ্যবান আর কেউই নেই।' তারপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে এলেন।

---

৩৯৮. *সহিহ মুসলিম : ২৯৭৮, সুনানে তিরমিজি : ২৩৭২, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪৬।*

CS CamScanner

তাতে কাঁচাপাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, 'আপনারা এ ছড়া থেকে খান।' এরপর তিনি একটি ছুরি নিলেন (ছাগল জবাই করার জন্য)।' নবীজি তাকে বললেন, 'সাবধান! দুধওয়ালা বকরি জবাই করবে না।'

অতঃপর সেই সাহাবি মেহমানদের জন্য বকরি জবাই করলেন। মেহমানরা বকরির গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন। মিষ্টিপানি পান করলেন। এভাবে যখন তাঁরা সকলে ক্ষুধা নিবারণ করলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হজরত আবু বকর ও উমর রা.-কে লক্ষ করে বললেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ»

যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে এরপর তোমরা এ নিয়ামত লাভ করেই বাড়িতে ফিরছ।[৩৯৯]

প্রকৃত অর্থেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবিমুখতা ছিল তাঁর নবুয়তের সত্যতার অন্যতম একটি প্রমাণ। তাঁর রাসুল হওয়ার ওপর একটি শক্তিশালী দলিল। আমাদের তো দুনিয়া প্রভাবিত করে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে ফেলে। অবশেষে আমরা সকলেই দুনিয়ার ভোগবিলাসের নিকট অনুগত হয়ে পড়ি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাঁর জীবন শুরু করেছেন দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে, তেমনই দুনিয়াবিমুখতা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আমাদের এই কথাকে সত্যায়ন করে হজরত আয়েশা রা.-এর নিচের এই বক্তব্যটি। তিনি বলেন,

«مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ»

---

৩৯৯. সহিহ মুসলিম : ২০৩৮।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে তিনদিন গমের রুটি পেট ভরে খাননি, এ অবস্থার মধ্য দিয়েই তিনি পরপারে চলে যান।[৪০০]

যখন দুনিয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবৃত্তির সকল কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তখনও তিনি সর্বোচ্চ দুনিয়াবিমুখতা প্রদর্শন করেছেন। এই তো হুনাইনের দিনের ঘটনা। সেদিন দুনিয়ার যাবতীয় প্রাচুর্য তাঁর হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু কত উদার অকুণ্ঠ চিত্তেই-না তিনি সকল-কিছু তাঁর সাহাবি এবং নবমুসলিমদের মনস্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিকট একটি মাছির ডানার পরিমাণ মূল্যও ছিল না এ বিশাল সম্পদের। এ কারণে নিজের জন্য তিনি সেখান থেকে এমন কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি, যাতে তাঁর এত বছরের দারিদ্র্যের একটু উপশম হবে কিংবা এই ষাট বছর-উত্তীর্ণ জীবনের বাকি সময়গুলো বিলাসে অতিবাহিত করার অবলম্বন হবে। বরং সম্পদ চাওয়ার জন্য যখন বেদুইনদের একজন তাঁর চাদর আঁকড়ে ধরেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,

«رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا»

আমার চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা কি আশঙ্কা করো, যে জিনিস আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেবো না? যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, তিহামা[৪০১] অঞ্চলের বাবলা গাছের মতো এত অধিক পশুও যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের দান করতেন, তাও আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু ও মিথ্যাবাদী হিসেবে দেখতে পাবে না।[৪০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবিমুখ ছিলেন, এটা ঠিক। তবে এই দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে তাঁর একটি অতি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

---

৪০০. *সহিহ বুখারি* : ৬৪৫৪, *সহিহ মুসলিম* : ২৯৮০।
৪০১. তিহামা : আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত সমতল ভূমি।-সম্পাদক
৪০২. *সহিহ বুখারি* : ৩১৪৮, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮২০, *মুআত্তা মালেক* : ৯৭৭।

এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছে, দুনিয়াবিমুখ হওয়ার অর্থ দুনিয়ায় বসবাস বর্জন করা নয়। দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা মানে দুনিয়া ধ্বংস করা নয়। বরং মুসলমান দুনিয়া নির্মাণ করবে, আবাদ করবে এবং প্রতিনিধিত্ব করবে, তবে ভোগবিলাসে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে না। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ»

যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া শুরু হয় আর তোমাদের কারও হাতে একটি গাছের চারা থাকে, তাহলে সে যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই সেই চারাটি রোপণ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তাই করে।[৪০৩]

দুনিয়া সম্পর্কে এই হলো ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এটা এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা আখিরাতের হিসাবনিকাশের কারণে দুনিয়া সম্পর্কে গাফেল করে দেয় না। আবার দুনিয়ার হিসাবনিকাশের কারণে আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন করে না। এই হলো ইসলামের মহত্ত্ব ও অনন্যতা। এই হলো ইসলামের নবীর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত করে এবং প্রমাণিত করে আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর আহ্বানকে।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-বন্দেগি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অধিক শুকরিয়া আদায়কারী। সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার মহান নিয়ামতগুলোর শোকর আদায় করতেন, যেগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রদান করেছেন এবং যে-সকল নিয়ামতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম ছিল খুবই সংগতিপূর্ণ। এ কারণে তাঁর শোকর আদায় শুধু মৌখিক শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর শোকর ছিল বাস্তব, জীবন্ত এবং জীবনযাপনের সাথে জড়িত। এ কারণে আমরা তাঁর জীবনে দেখি, তিনি একাধারে সেজদাকারী, রুকুকারী, আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী। কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাআলার প্রশংসাজ্ঞাপনকারী। কুরআনুল কারিমে যে-সকল আয়াতে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল আয়াতের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

> হে মুমিনগণ, রুকু করো, সেজদা করো, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। [সুরা হজ্জ : ৭৭]

এমন অনেক হাদিস ও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলো আমাদের সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়ে তোলে। যেমন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত অধিক নামাজ আদায় করতেন যে, তাঁর দুটি পা ফুলে যেত। একদিন আয়েশা রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন এমনটা করেন! অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

CamScanner

«أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»

আমি কি একজন শোকর আদায়কারী বান্দা হতে চাইব না![৪০৪]

তাঁর এই সুন্দর অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি কখনোই ইবাদতকে রবের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিছক কর্তব্য বলে মনে করতেন না। বরং তিনি নামাজে দাঁড়াতেন ভালোবাসা নিয়ে। নিজের উৎফুল্লতা ও আগ্রহ নিয়ে। এটাই ছিল তাঁর মহান রবের জন্য একপ্রকার গভীর ও মমতাপূর্ণ কৃতার্থের স্বীকৃতি, যিনি তাঁকে সক্ষমতা দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা এটাও বুঝতে পারি, তিনি কেন এভাবে দীর্ঘ ইবাদত করতেন এবং ইবাদতের জন্য নিজেকে সীমাহীন কষ্টকর অবস্থায় ফেলতেন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. আরেকটি হাদিসে নবীজির রাতের নামাজের চিত্র ও ধরন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এ ছিল তার রাত্রিকালীন নামাজ। এতে তিনি এত দীর্ঘ সেজদা করতেন যে, তাঁর মাথা ওঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের নামাজের পূর্বে তিনি আরও দু-রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, নামাজের জন্য মুআজ্জিন মসজিদে আসা পর্যন্ত।[৪০৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক নামাজ ও অধিক কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে প্রশান্তি পেতেন। যেমন হজরত হুজাইফা রা. বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি নবীজির সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলাম। তিনি সুরা 'বাকারা' পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু এর পরেও তিনি পড়তে থাকলেন। তখন আমি ভাবলাম তিনি এর (সুরা বাকারা) দ্বারা পুরো দু-রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরও পড়তে থাকলেন। এবার আমি ভাবলাম সুরাটি শেষ করে তিনি হয়তো রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সুরা 'নিসা'-ও পড়তে শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। অতঃপর তিনি 'সুরা আলে ইমরান' শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন।

---

৪০৪. *সহিহ বুখারি* : ৪৮৩৭, *সহিহ মুসলিম* : ২৮২০।
৪০৫. *সহিহ বুখারি* : ৯৯৪, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৩৩৬।

তিনি থেমে থেমে ধীরে ধীরে পড়ছিলেন এবং কোনো তাসবিহের আয়াত এলে তাসবিহ পড়ছিলেন, কিছু চাওয়ার আয়াত এলে কিছু চাইছিলেন। যখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার কোনো আয়াত পড়ছিলেন, তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু করলেন। রুকুতে তিনি পড়তে থাকলেন 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ'। তাঁর রুকু কিয়ামের মতোই দীর্ঘ হলো। এরপর 'سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বললেন। এরপর যতক্ষণ সময় রুকু করেছিলেন, প্রায় ততক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সেজদা করলেন। সেজদায় তিনি পড়লেন, 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى'। তাঁর এই সেজদাও প্রায় কিয়ামের সময়ের মতো দীর্ঘায়িত হলো।(৪০৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামাজ আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহূর্ত, এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন,

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ»

ফরজ নামাজগুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের নামাজ।(৪০৭)

রাতের নামাজের সীমাহীন পছন্দের কারণে তাঁর যদি কোনো কারণে কোনো নামাজ কাজা হয়ে যেত, তাহলে তিনি সেটা প্রভাতে আদায় করে নিতেন। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

«وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নফল নামাজ আদায় করলে, তা নিয়মিত আদায় করা পছন্দ করতেন। তবে যদি কোনোদিন ঘুম বেশি হয়ে যেত অথবা তীব্র ব্যথা দেখা দিত, যাতে তাঁর জন্যে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতো না, তাহলে তিনি দিনে বারো রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন।(৪০৮)

---

৪০৬. *সহিহ মুসলিম* : ৭৭২, *সুনানে নাসায়ি* : ১১৩৩, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৩৪১৫।
৪০৭. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৪২৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ৮৪৮৮।
৪০৮. *সহিহ মুসলিম* : ৭৪৬, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৩১৪, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৫৫২।

CamScanner

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি নবীজির এই যে গভীর ভালোবাসা; বিশেষ করে নামাজের প্রতি, এটা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় বিলাল রা.-কে তাঁর এ কথা বলার মাধ্যমে, তিনি বিলাল রা.-কে বলতেন, قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ –হে বেলাল, তুমি দাঁড়াও, (আজান ও ইকামত দাও) এবং নামাজের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে শান্ত করো।[৪০৯]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ –আমার চোখের শীতলতা বা প্রশান্তি রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।[৪১০]

এতএব, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আল্লাহ তাআলার অব্যাহত নিয়ামত, অনুগ্রহ ও বিভিন্ন দান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকর ও প্রশংসার আমলকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিত। এ কারণে সর্বদা তাঁর জিহ্বা আল্লাহ তাআলার জিকিরে এবং (তাঁর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের) প্রশংসায় সিক্ত থাকত। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন।[৪১১]

এ ছাড়া আমরা নবীজিকে দেখি, তিনি রমজানের সময় বেশি বেশি দান-সদকা করতেন এবং বেশি বেশি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। বিশেষ করে রমজান মাসের শেষ দশকে আগের চেয়েও বহুগুণ বেশি ইবাদতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন। হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»

> যখন রমজানের শেষ দশক আসত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হতেন এবং নিজেও

---

[৪০৯]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৯৮৫, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৩১৩৭, *আল মুজামুল কাবির* : ৬২১৫।
[৪১০]. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৩৫২৬, *সুনানে নাসায়ি* : ৩৯৩৯, *আল মুজামুল কাবির* : ১৭৩৮৮।
[৪১১]. *সহিহ মুসলিম* : ৩৭৩, *সুনানে তিরমিজি* : ৩৩৮৪, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৮।

রাত্রিজাগরণ করতেন ও পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন।[৪১২]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা রাখতেন। তিনি এর কারণ হিসেবে বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ (আল্লাহ তাআলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়, সুতরাং আমি পছন্দ করি আমার আমলসমূহ রোজা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক।[৪১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড রোদ্র-তাপের দিনে রোজা রাখতে ভালোবাসতেন। যেমন হজরত আবু দারদা রা. বলেন, রমজান মাসে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। গরম এত তীব্র ছিল যে, আমাদের সকলেই গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য মাথার ওপর হাত রেখে নিজেকে আড়াল করছিল। এ সময় নবীজি ও ইবনে রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের কেউই রোজা অবস্থায় ছিলেন না।[৪১৪]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ের বোধ ও চেতনা নিয়ে ইবাদত করেছেন, নিছক দায়িত্ব আদায়ের জন্য নয়। তিনি ইবাদত করেছেন নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা, আত্মত্যাগ এবং প্রতিদান বৃদ্ধির মানসিকতা নিয়ে, আবশ্যক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নয়। এ কারণে তাঁর ইবাদতের রং, রূপ ও চিত্র ছিল খুবই মনকাড়া ও অনন্য।

---

৪১২. *সহিহ বুখারি* : ১৯২০, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৪২২, *সহিহ ইবনে খুজাইমা* : ২০২৯।

৪১৩. *সুনানে তিরিমিজি* : ৭৪৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৮০১, *সুনানে নাসায়ি* : ২৩৫৮।

৪১৪. *সহিহ বুখারি* : ১৯৪৫, *সহিহ মুসলিম* : ১১২২।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

উম্মতের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদ

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন মানবজাতির জন্য ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষার মাধ্যমরূপে, এ কারণেই তিনি মানবজাতির মুক্তির দূত হওয়ার অধিকার ও সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাঁর হৃদয়জুড়ে ছিল উম্মতের জন্য সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসা। যে ব্যক্তি মানবজাতিকে প্রীতি ও ভালোবাসার মূল্যবোধে দীক্ষিত করতে চায়, হেদায়েতের পথ দেখাতে চায়, তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার হলো এক বিরাট উৎস। উম্মতের প্রতি এই দরদ তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহের কারণেই ছিল, এটা তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর একটি স্পষ্ট প্রমাণ। এ কারণে উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া, দরদ ও সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

> (হে মানুষ,) তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসুল এসেছে। তোমাদের যেকোনো কষ্ট তাঁর জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু। [সুরা তাওবা : ১২৮]

উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদ ও সহানুভূতি এতটা উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, কোনো মানুষের দ্বারা তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেমন ইসলামের দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কার দুর্বল স্বল্প মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচার চরমে উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য নিজেদের দ্বীন পালন করাও কষ্টকর হয়ে উঠছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের প্রতি সহমর্মী

CamScanner

হয়ে তাদের হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, ‘তোমরা হাবশায় হিজরত করলে, ভালো হয়। সেখানে এমন এক বাদশা আছেন, যার নিকট কারও ওপর অত্যাচার করা হয় না। তা হলো ন্যায়ের ভূমি। তাহলে হয়তো আজ তোমরা যে কষ্টের মধ্যে আছ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের তা থেকে মুক্তি প্রদান করবেন।’[৪১৫]

এ ছাড়া আমরা আরও দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অনেক আমল থেকে বিরত থেকেছেন, যেটা ছিল তাঁর নিকট অতি প্রিয় ও পছন্দনীয়। সেই আমল থেকে বিরত থাকার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, এটা যেন তাঁর উম্মতের ওপর ফরজ না হয়ে যায়, তখন এটা তাদেরকে কষ্ট দেবে, তাদের ওপর কঠিন হয়ে যাবে। এ বিষয়ে হজরত আয়েশা রা. বলেছেন,

«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল করা পছন্দ করতেন, সে আমল কোনো কোনো সময় এ আশঙ্কায় ছেড়েও দিতেন যে, সে আমল লোকেরা করতে থাকবে, ফলে তাদের ওপর তা ফরজ হয়ে যাবে।[৪১৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বিভিন্ন গুনাহ থেকে সতর্ক করতেন এবং গুনাহগুলো সাধারণ মনে হলেও সেগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছোট গুনাহগুলো থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা এগুলো একজন মানুষের ওপর জমা হতে হতে এত বেশি হয়ে যায় যে, সেগুলো লোকটিকে ধ্বংস করে ফেলে।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব গুনাহের একটি দৃষ্টান্তও প্রদান করেছেন। নবীজি বলেন, যেমন কোনো সম্প্রদায় একটি নির্জন ভূমিতে অবতরণ করল। এরপর যখন তাদের খাবার তৈরির সময়

---

৪১৫. *বাইহাকি* : ১৮১৯০, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩২২, ৩২৩।
৪১৬. *সহিহ বুখারি* : ১১২৮, ১১৭; *সহিহ মুসলিম* : ৭১৮।

হলো তখন একজন গিয়ে একটি কাঠ নিয়ে এলো। অন্যজন আরেকটি নিয়ে এলো। এভাবে তারা একে একে অনেক কাঠ জমা করল। এরপর তারা আগুন প্রজ্বলিত করল। সেই আগুনে নিজেদের খাবার রান্না করে নিলো। ছোট ছোট গুনাহের অবস্থাও এমন। অল্প অল্প অনেক হয়ে একসময় সবকিছু জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে ওঠে।[৪১৭]

উম্মত যেন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়, এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের এমন পথভ্রষ্ট নেতা ও ইমামদের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যারা উম্মতকে ধ্বংস করবে ও অনিষ্টের দিকে নিয়ে যাবে। এ কারণে তিনি উম্মতকে সম্বোধন ও সতর্ক করে বলেছেন,

«أَنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّوْنَ»

> আমি তোমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভয় করি পথভ্রষ্ট নেতা ও ইমামদের নিয়ে।[৪১৮]

মুমিনদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদ ও সহানুভূতি দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে ইবাদতের ক্ষেত্রে। যদিও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়া সব সময়ই একটি প্রশংসা ও উৎসাহের বিষয়, বরং এ ব্যাপারে মানুষকে আদেশও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের ওপর দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির ভয় করেছেন, যার ফলে তারা তাদের জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। এ কারণে তিনি বলেছেন,

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ»

---

৪১৭. *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৮১৮, তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ৫/৪৪৯, *শুআবুল ঈমান* : ৭০১৭।

৪১৮. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪২৫২, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭৫২৫, *সুনানে দারেমি* : ২১১, *সুনানে তিরমিজি* : ২২২৯।

আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টের ভয় না করতাম, তবে এশার নামাজকে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পর্যন্ত বিলম্বের আদেশ দিতাম।[৪১৯]

এ হাদিসসহ আরও অনেক হাদিস উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার পরিধি ও পরিব্যাপ্তি প্রকাশ করে। প্রকাশ করে উম্মতের প্রতি তাঁর সীমাহীন সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। এটাও বোঝা যায়, উম্মতের দ্বীনি বিষয়ে তিনি তাদের কল্যাণের ক্ষেত্রে কতটা দয়ার্দ্র ও আগ্রহী ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। যেকোনো বৈধ বিষয়েই অনুগ্রহ প্রদর্শনের কোনো সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। যেমন তিনি একবার শুনলেন তাঁর তিনজন সাহাবি নিজেদের ওপর অস্বাভাবিক কষ্ট চাপিয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা বা ইচ্ছা করেছে, তাদের ধারণায় এটা ছিল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় মাধ্যম। হজরত আনাস রা. ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, তিনজনের একটি দল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর স্ত্রীদের ঘরে এলো। অতঃপর তাদের যখন নবীজির ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা নিজেদের ইবাদতের পরিমাণকে অতি সামান্য মনে করল এবং বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। (তবুও তিনি এত ইবাদত করেন! তাহলে আমাদের কত ইবাদত করা উচিত! এই ভাবনা থেকে) তাদের একজন বলল, আমি সারাজীবন রাতভর নামাজ আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি অব্যাহতভাবে আজীবন রোজা রেখে যাব কখনো বাদ দেবো না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কখনো বিয়ে করব না।

(এই কথা রাসুলের কানে গেলে। তখন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে বললেন, 'তোমরা কি এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। অথচ আমি রোজা পালন করি, আবার তা থেকে বিরত থাকি। নামাজ

---

৪১৯. *সুনানে তিরমিজি* : ২৩, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৬৯১।

আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'(৪২০)

সুন্দর হয়, যদি আমরা এই আলোচনা এমন একটি বিষয়ের মাধ্যমে শেষ করি, যা প্রতিফলিত করবে উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন দয়া, দরদ, সহানুভূতি এবং তাদের জন্য তাঁর ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতা। সেই সাথে প্রকাশ করবে তাঁর এই দরদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুরুত্ব প্রদানের বিষয়কে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার এই বাণী তিলাওয়াত করলেন,

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

হে আমার প্রতিপালক! ওইসব প্রতিমা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে-কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমাকে অমান্য করলে (তার বিষয়টা আমি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি), আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা ইবরাহিম : ৩৬]

এরপর হজরত ইসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনিই মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [সুরা মায়িদা : ১১৮]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে নিজের দুহাত তুলে বলতে থাকলেন, اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ –হে আল্লাহ, আমার

৪২০. *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩, *সহিহ মুসলিম* : ১৪০১।

উম্মত... আমার উম্মত (আমার উম্মতকে রক্ষা করো)। এটা বলে কাঁদতে লাগলেন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা বললেন, হে জিবরাইল! তুমি নবী মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তবু তাঁকে জিজ্ঞেস করো, আপনি কাঁদছেন কেন?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে যা বলেছিলেন, তা জিবরাইলকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ।

(জিবরাইল আল্লাহ তাআলাকে জানানো শেষে) আল্লাহ তাআলা বললেন, হে জিবরাইল, তুমি আবার মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।[৪২১]

---

৪২১. *সহিহ মুসলিম* : ২০২, *সুনানে নাসায়ি* : ১১২৬৯, *মুজামুল কাবির* : ১৫১৫ *শুআবুল ঈমান* : ৩০৮, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৭৩৫৭

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন

নবুয়তপ্রাপ্তির আগে ও পরে সব সময়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ, নৈতিকতাপূর্ণ এবং মহান চারিত্রিক গুণাবলিতে ভরপুর। সেই জাহেলি পরিবেশে এতগুলো মহৎ গুণ কারও মধ্যে থাকা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু নবীজির মধ্যে সব ধরনের মহৎ গুণ একত্রিত হয়েছিল। তিনি সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বিষয়টা এতই বিস্ময়কর ছিল যে, যারা ছিল তাঁর প্রাণের শত্রু, যারা কিছুতেই তাঁর আহ্বানের প্রতি ঈমান আনেনি, সেই ঘোর বিরোধী শত্রুরাও তার নিকট নিজেদের সম্পদ আমানত রাখত। এদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি এতটাই উচ্চ ও মহান ছিল যে, সম্প্রদায়ের ভীষণ শত্রুতাও তাঁর আমানতদারিকে ভুলিয়ে দেয়নি। এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হিজরতের রাতে কাফেরদের এসব আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হজরত আলি রা.-কে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন, অথচ এসব আমানতদাতারা সে রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরভিত জীবনের দিকে লক্ষ করলে, আমরা তাঁর জীবনের স্বচ্ছতা অনুধাবন করতে পারব এবং দেখতে পাব, কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল মলিনতা থেকে পবিত্র রেখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে গড়ে তোলা হয়েছে আল্লাহ তাআলার বিশেষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যোগ্য করে তোলা হয়েছে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হওয়ার জন্য। এ কারণে নবুয়তের পূর্ব থেকেই জাহেলি যুগের সকল চারিত্রিক কলুষতা থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর যৌবনের স্বভাবকে পবিত্র রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে গুনাহের সকল পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। যেমন ইবনে ইসহাক ও

CamScanner

অন্যরা বলেছেন, জাহেলিয়াতের সকল খারাবি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছিলেন।[৪২২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র রাখা এবং তাঁকে জাহেলি যুগের সকল খারাবি থেকে মুক্ত রাখার একটি প্রমাণ হলো নাবালেগ অবস্থায়ও তাঁর বস্ত্রহীন না হওয়া। এ ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করে বলেন, আমার স্মরণ হয়, আমি তখন কুরাইশ বাচ্চাদের মাঝে অবস্থান করছিলাম। বাচ্চাদের কিছু খেলার জন্য আমরা পাথর বয়ে আনছিলাম। বাচ্চাদের সকলেই ছিল বিবস্ত্র। কারণ, সকলেই তার লুঙ্গি খুলে কাঁধে নিয়েছিল। আর তার ওপর পাথর নিয়ে বয়ে আনছিল। আমি যখন তাদের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং পেছনে তাকালাম, হঠাৎ একজন মুষ্টিপাকানো ব্যক্তি আমাকে ভীষণ জোরে একটি ঘুষি দিলো এবং বলল, 'তুমি তোমার লুঙ্গি ভালো করে পরিধান করে নাও।' ফলে আমি আমার লুঙ্গি নিয়ে ভালো করে সতর ঢেকে বেঁধে নিলাম। এরপর আমি আমার সাথিদের মাঝে একাই লুঙ্গি পরিধান করে শূন্য কাঁধে পাথর টানতে লাগলাম।[৪২৩]

জাহেলি যুগে কুরাইশদের কাবাঘর পুনর্নির্মাণের সময়ও এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, আমার পিতা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করে বলেন, কুরাইশরা কাবাঘর নির্মাণের সময় দুইজন দুইজন করে দল বানিয়ে পাথর বহন করছিল। তখন আমি এবং আমার ভাতিজা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের লুঙ্গি কাঁধে দিয়ে তার ওপর পাথর রেখে বহন করছিলাম। তবে যখন মানুষের ভিড় হয়ে যেত, তখন আমরা লুঙ্গি পরে নিতাম। একবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার আগে ছিলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে খোঁজ করতে এসে দেখি তিনি আকাশের দিকে অনিমিষ নেত্রে তাকিয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে ভাতিজা, 'তোমার কী হলো?' তিনি বললেন, 'আমাকে বিবস্ত্র চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে।'

---

[৪২২]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/১৮৩, ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ২/২৮৬।

[৪২৩]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/১৮৩, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ১/৩১২, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ২/১৪৭

আব্বাস রা. বলেন, আমি এই ঘটনা গোপন করে রেখেছিলাম। এভাবেই একদিন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুয়ত প্রদান করলেন।[৪২৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবরকম ক্রটি ও খারাবি থেকে মুক্ত রাখার আরেকটি উদাহরণ হলো, তিনি কখনো অনর্থক খেলা ও গান শোনার দিকে ধাবিত হননি। এ বিষয়ে হজরত আলি রা. বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মূর্খতার যুগে মানুষেরা যে গানের দিকে ধাবিত হতো, দুটি রাত ছাড়া আমি কখনো তার ইচ্ছাও করিনি। তবে সেই দুটি রাতেও আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াতের এই কর্ম থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একরাতের ঘটনা এই যে, মক্কার কিছু বালকসহ আমরা পরিবারের ছাগল চরাচ্ছিলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, 'তুমি আমার ছাগলগুলো দেখে রেখো। আমি মক্কা যাব এবং যুবকরা যেমন কিচ্ছা-কাহিনি শোনে, আমিও শুনব।'

সঙ্গী বলল, 'ঠিক আছে, যাও।'

আমি মক্কা এলাম এবং সেখানকার গৃহসমূহের মধ্যে প্রথম গৃহের নিকট উপস্থিত হলাম। আমি সেখানে ক্রীড়া, কৌতুক ও ঢোলবাজনার শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কী হচ্ছে?' আমাকে বলা হলো, 'অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলাকে বিয়ে করছে।' আমি সেখানে দৃশ্যাবলি দেখার উদ্দেশ্যে বসে পড়লাম। তখনই আল্লাহ তাআলা আমার চোখে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কসম, আমি পরদিন রোদ্রের খরতাপে জাগ্রত হলাম। এরপর আমি আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে গেলাম। সে জিজ্ঞাসা করল, 'গতরাতে কী করেছ?' আমি বললাম, 'কিছুই না।' এরপর যে পরিস্থিতি দেখেছিলাম, তা তার নিকট বর্ণনা করলাম।

অতঃপর অপর এক রাতেও আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, 'আমার ছাগলগুলো দেখে রেখো। আমি কিচ্ছা-কাহিনি শোনার জন্য মক্কা যাচ্ছি।' আমি মক্কা এলাম এবং প্রথম রাতের মতো কথাবার্তা শুনলাম। আমিও সেগুলো দেখার জন্য বসে গেলাম। তখনই আল্লাহ তাআলা আবার আমাকে ঘুমে অচেতন করে দিলেন। আল্লাহর শপথ! পরদিন রোদের

---

৪২৪. *মুসনাদুল বাজজার* : ১২৯৫, ইবনে আসেম শাইবানি : *আল-আহাদ ওয়াল-মাছানি* : ১/২৭১, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ* : ২/১৪৭, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/২৫১।

CamScanner

খরতাপে আমার ঘুম ভাঙল। আমি আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে এলাম। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করলে?' আমি বললাম, 'কিছুই না।' এরপর তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলাম।

আল্লাহর কসম! এই দুইরাতের পরে আমি আর কখনো কোনো খেলতামাশায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও করিনি এবং শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুয়ত প্রদান করলেন।[৪২৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কখনো মদ পান করেননি। কোনোদিন কোনো মূর্তিকে সেজদা করেননি। যেমন আলি রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কি কখনো মূর্তিদের ইবাদত করেছেন?'

নবীজি বললেন, 'না।'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আপনি কি কখনো মদ পান করেছেন?'

নবীজি বললেন, 'না। এসব কাজ যে খারাপ ও গর্হিত, তা আমি জানতাম। অথচ আমি তখন পর্যন্ত কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না।'[৪২৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো মূর্তিকে সেজদা করেননি। শিশুকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালনকারী উম্মে আইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বুয়ালা নামক এক মূর্তির কাছে কুরাইশরা বছরে একবার একত্র হতো। আবু তালিবও নিজের গোত্রসহ এই মূর্তির কাছে একত্র হতেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেখানে সকলের সাথে একত্র হতে নির্দেশ প্রদান করতেন। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন। এ কারণে একবার আবু তালিব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি খুব রাগ হলেন। তাঁর ফুফুরাও সেদিন তাঁর প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তারা বললেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি তোমার জাতির উৎসবে উপস্থিত হয়ে তাদের সমাবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাও না? এভাবে তারা নবীজিকে

---

৪২৫. *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৬২৭২, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৭৬১৯।

৪২৬. সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ২/১৪৯, আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি : *কানজুল উম্মাল* : ৩৫৪৩৯, আশ-শাওকানি : *ফাতহুল কাদির* : ৪/৫৪৬।

CamScanner

পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং বেশ কিছুদিন একেবারে নিখোঁজ হয়ে রইলেন, মাশাআল্লাহ।

অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি একসময় ফিরে এলেন। ফুফুরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় কে কষ্ট দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে উন্মাদনার ভয় করি। তাঁর ফুফুরা বললেন, 'আল্লাহ শয়তান দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করবেন না। কারণ, তোমার মধ্যে এমন ভালো গুণাবলি রয়েছে, যার যোগ্য শুধু তুমিই। তুমি কী দেখে ভয় পেয়েছ?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যখনই মূর্তির নিকটবর্তী হলাম, তখন সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি আমার সামনে আবির্ভূত হলো। সে আমাকে সজোরে আওয়াজ দিলো, মুহাম্মাদ! এর কাছ থেকে দূরে থাকো এবং একে স্পর্শ করো না।' উম্মে আয়মান বলেন, এরপর তিনি আর কখনো কুরাইশদের ধর্মীয় উৎসবগুলোর ধারেকাছেও যাননি।[৪২৭]

এমনইভাবে নবুয়তপ্রাপ্তির পরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে যাননি। কখনো তিনি ভোগবিলাস ও আনন্দ-ফুর্তি অন্বেষণ করেননি। যেমন ধরুন, কুরাইশদের নেতাবর্গ যখন তাঁর নিকট ইসলামের আহ্বান থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে দুনিয়ার সকল ভোগ্য জিনিস প্রদানের প্রস্তাব করল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট যে বার্তা নিয়ে এসেছি, তার দ্বারা আমি তোমাদের কোনো সম্পদ অন্বেষণ করি না। তার দ্বারা তোমাদের মাঝে সম্মানও চাই না। তোমাদের ওপর কর্তৃত্বও দেখাতে চাই না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের নিকট একজন রাসুল (বা বার্তাবাহক) হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন। তিনি আমাকে তোমাদের জন্য একজন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং আমার প্রতিপালকের দেওয়া দায়িত্ব আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। এখন আমি তোমাদের নিকট যে বার্তা নিয়ে এসেছি, তোমরা যদি তা আমার থেকে গ্রহণ করো, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য

৪২৭. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/১৫৮, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ২/১৪৯, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৬৬।

দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর হবে। আর যদি তা আমার সামনে প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমি আল্লাহ তাআলার ফয়সালার জন্য ধৈর্যধারণ করব, এ সময় তিনিই আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।'[৪২৮]

কাফেররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতই মিথ্যারোপ এবং তাঁর অবাধ্যতা করুক, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের লক্ষ্যটি ছিল একেবারে স্পষ্ট এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের পূর্ণতা ও স্বচ্ছতার আরেকটি দিক হলো, তিনি কখনো তাঁর সম্প্রদায় ও অনুসারীদের ওপর নিজের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের কোনো সুযোগ খোঁজেননি, এ ব্যাপারে অনেক সাক্ষ্য ও প্রমাণ রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহিম মারা যাওয়ার সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়। ঘটনাটি হজরত মুগিরা ইবনে শুবা রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়। লোকজন বলতে লাগল—ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

»إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللهَ«

নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোতে গ্রহণ লাগে না। বরং তোমরা যখন এটা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে।[৪২৯]

---

৪২৮. *খলকু আফআলিল ইবাদ*, পৃষ্ঠা : ১৮৬ (৪০৮), ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪৭৯।

৪২৯. *সহিহ বুখারি* : কিতাবুল কুসুফ; বাবুস সালাত ফি কুসুফিস শামস : ১০৪৪, *সহিহ মুসলিম* : কিতাবুল কুসুফ : বাবু সালাতিল কুসুফ : ৯০১।

এমতাবস্থায় কোনো মিথ্যাবাদী অথবা প্রতারক থেকে কখনো এ ধরনের সত্যকথন প্রকাশ পেত না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নবী না হয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার হতেন, তাহলে তিনি কিছুতেই এ ধরনের মহা সুযোগ হাতছাড়া করতেন না বরং বলতেন, দেখো... দেখো, সূর্যও আমার দুঃখে দুঃখিত হয়েছে। তাতে গ্রহণ লেগেছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু করেননি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার আরেকটি দিক হলো, সর্বক্ষেত্রে নিজের মানবীয় পরিচয় প্রকাশের আগ্রহ। তিনি বলতেন যে, মুহাম্মাদ বনি আদমের মধ্য থেকে একজন মানুষ, তিনি পিতামাতার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছেন। পানাহার করেন। বিবাহ করেন। ক্ষুধার্ত হন এবং অসুস্থ হন। আনন্দিত হন এবং দুঃখিতও হন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই কথাটির ওপর তিনি অত্যধিক জোর দিতেন এবং মানুষের সামনে এগুলো বারবার বলতেন। এখানে আমরা উদাহরণ হিসেবে জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর অবস্থানটি উপস্থাপন করতে পারি। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একজন লোককে আনা হলো। ভয়ে লোকটির বুক ও ঘাড়ের শিরা কাঁপছিল। এটা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি স্বাভাবিক হও, সহজ হও। আমি কুরাইশের এমন এক সাধারণ নারীর পুত্র, যিনি এই উপত্যকায় শুষ্ক লবণাক্ত গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন।' এরপর জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালি রহ. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾

> তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও। আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকো। [সুরা কাফ : ৪৫][৪৩০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার আরেকটি মহান দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করেছেন এবং সেই তিরস্কারের কথা কুরআনুল

---

৪৩০. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৩৭৩৩।

কারিমে অন্তর্গত হওয়া। যাতে এটা চিরদিন মানুষদের মাঝে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই তিরস্কারই আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বচ্ছ-সুস্পষ্ট, সকলেই তাঁর গোপন বা প্রকাশ্য বিষয় জানে। এটা কি কোনো ভণ্ড, প্রতারক ও মিথ্যাবাদীর জীবনের ক্ষেত্রে সম্ভব হতো? কিছুতেই না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের তিরস্কারের একটি উদাহরণ হলো এই, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى﴾

(রাসুল) মুখ বিকৃত করলেন ও চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল। [সুরা আবাসা : ১-২]

এই ঘটনাটি ঘটে, যখন অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। তখন নবীজি কুরাইশদের বড় বড় নেতাকে দাওয়াত প্রদানে ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর দিকে তেমন দৃষ্টি প্রদান করেননি। তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করে এই আয়াত নাজিল করেন। এর মাধ্যমে এটি এমন এক কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল যা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও পঠিত হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনে এমন আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিরস্কার এসেছে।

এমন ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, সবচেয়ে স্বচ্ছ, সবচেয়ে সুন্দর, স্পষ্ট ও নির্মল, যাতে কোনো কলুষতা রাখা হয়নি। অতএব, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীজির বার্তাটিই সর্বশেষ বার্তা।

CamScanner

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরক্ষরতা

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর নিকট পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। তাঁকে এমন সব মুজিজা দ্বারা দৃঢ় ও শক্তিশালী করেছেন, যেগুলো তাঁর সত্যতার ওপর প্রমাণ বহন করে। এসব মুজিজার মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল মুজিজা হলো তাঁর 'উম্মি' বা নিরক্ষর হওয়া। ঐতিহাসিকভাবেই এটা প্রমাণিত, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যখন সকল জাহানের নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখনও তিনি উম্মিই ছিলেন। এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বড় পূর্ণতা। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ মুজিজাগুলোর মধ্যে এটিও একটি বড় মুজিজা। ইবনে তাইমিয়া রহ. এ সম্পর্কে বলেন,

> আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ এবং বিশেষ সকলেই তাঁর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাঁর সম্প্রদায় যারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছে তিনি তাদের সকলের নিকট জ্ঞাত ও পরিচিত। আর যারা তাঁকে দেখেনি, তাদের নিকটও বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর পরিচয় পৌঁছে গেছে যে, তিনি ছিলেন একজন উম্মি বা নিরক্ষর ব্যক্তি। লিখিত কোনো জিনিস তিনি পড়তে পারতেন না। কোনো কিতাবের কোনো বিষয়ও তিনি মুখস্থ করেননি, সেটা কোনো ঐশী কিতাব হোক কিংবা অন্যকিছু। তিনি নিজ হাতে কোনোদিন কিছু লেখেননি। মানুষদের কোনো কিতাব থেকে কোনোদিন কিছু প্রতিলিপি করেননি, সেটা ঐশী হোক কিংবা ভিন্ন কিছু।[৪৩১]

কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'উম্মি' বা নিরক্ষতা সাব্যস্ত করেছে। যারা দাবি করে,

---

৪৩১. ইবনে তাইমিয়া : *আল-জাওয়াবুস সহিহ : ৫/৩৩৮।*

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তীদের কিতাব পাঠ করে এই কুরআন শিখেছেন, তাদের কথাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। সেসব আয়াতের মধ্যে নিচে কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ﴾

তিনিই হলেন সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত ছিল। [সুরা জুমআ : ২]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

আপনি বলেন, হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ তাআলার রাসুল, যে আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনো, যিনি নিজেও আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর কালিমার প্রতি ঈমান রাখেন। এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। [সুরা আরাফ : ১৫৮]

হজরত ইবনে আব্বাস রা.বলেন,

«كان نبيُّكُم صلى الله عليه وسلم أُمِّيًّا لا يَكْتُبُ ولَا يقرَأُ ولَا يَحسبُ»

তোমাদের নবী ছিলেন উম্মি বা নিরক্ষর, তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন না। হিসাব করতে পারতেন না।...[৪৩২]

যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾

> আর আপনি ইতিপূর্বে না কোনো কিতাব পাঠ করেছেন আর না নিজ হাতে কোনোকিছু লিখেছেন। যার কারণে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। [সুরা আনকাবুত : ৪৮]

আল্লামা যামাখশারি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আপনি একজন নিরক্ষর। আপনাকে কেউ কখনো কোনো কিতাব পাঠ এবং লেখা শেখায়নি। (কারণ) এটা যদি আগে থেকে আপনার অর্জিত থাকত অর্থাৎ আপনি যদি আগে থেকে পড়া ও লেখার গুণ অর্জন করতেন, তাহলে আহলে কিতাবদের মধ্যে ভ্রান্তরা সন্দেহ প্রকাশ করে বলত, আমরা আমাদের কিতাবের মধ্যে যে নবীর কথা পেয়েছি তিনি হবেন উম্মি, তিনি লিখতে ও পড়তে জানেন না। আর এদিকে মক্কার মুশরিকরাও সন্দেহ পোষণ করে বলত, সম্ভবত এটা সে কারও থেকে শিখেছে কিংবা সে নিজ হাতেই রচনা করেছে।[৪৩৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর তাঁর উম্মি হওয়াকে একটি বাস্তব ও যৌক্তিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা 'উম্মি' এমন একটি গুণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলদের মধ্যে শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এ গুণে গুণান্বিত করেছেন। যাতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক যেসব মুজিজা দ্বারা সুদৃঢ়তা দান করবেন, সেই মুজিজা যেন পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা উম্মি হওয়াকে তাঁর একান্ত একটি গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যাতে এটা প্রকাশ পায় যে, তাঁর সকল পূর্ণতা ও পারঙ্গমতা মূলত স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। নতুবা জগতে যোগ্যতা অর্জনের যত

---

৪৩২. ইমাম কুরতুবি : *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন* : ৭/২৯৮।

৪৩৩. আল্লামা যামাখশারি : *আল-কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল ফি উজুহিত তাবিল* : ৩/৪৬২।

পরিচিত মাধ্যম ও উপকরণ, তাঁর জন্য সেগুলোর কোনোটিই ব্যবহৃত ও চর্চিত হয়নি। এ কারণে অন্যদের জন্য 'নিরক্ষর' হওয়া তাঁর কমতি বা অপূর্ণতা হলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উম্মি বা নিরক্ষর হওয়া তাঁর নবুয়তি পূর্ণতার জন্য একটি বড় গুণ। কারণ, এভাবে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর অর্জিত হয়েছে, সেসব জ্ঞানের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো ভুলের সম্ভাবনা নেই। তিনি ছিলেন তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত। তিনি ছিলেন তাঁর জ্ঞাত বিষয়ে সঠিক প্রমাণের ওপর। জগতের অন্য শিক্ষার্থীরা যেগুলো শিখে অর্জন করে, তাদের চেয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল অতি মহান, নিশ্চিত ও অকাট্য। এ কারণে তাঁর উম্মি হওয়াটাই একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি যা অর্জন করেছেন তার সকল-কিছুই ঐশী দানের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩৪]

নববি এই মুজিজার আরেকটি বড় মহত্ত্ব এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে। যে কিতাব আরবের সকল মুশরিক এবং তাদের পরবর্তীদের জন্যও কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষমকারী চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য হয়েছে। অথচ আরবের মুশরিকরা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু তাদেরকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চ্যালেঞ্জ করেছেন এমন একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে, কমপক্ষে এর মতো একটি সুরা কিংবা একটি আয়াত রচনা করতে। এই অতি উজ্জ্বল বিস্ময় ও মুজিজা সম্পর্কে বুদ্ধিমান যে কেউ চিন্তা করে দেখুক, কত বিস্ময়কর আর অলৌকিক এই কুরআন! যেমন *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির* গ্রন্থের লেখক বলেন, আপনারা কি কখনো এই অবস্থাটা চিন্তা করে দেখেছেন, নিতান্তই একজন উম্মি, অথচ তিনিই আনয়ন করছেন এমন সুউচ্চ সাহিত্য ও মর্মসমৃদ্ধ এমন অনন্য, অসাধারণ চমৎকার এক গ্রন্থ! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রিসালাতের সৌভাগ্য ব্যতীত এটি তাঁর জন্য কিছুতেই সম্ভব হতো না। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মে কোনো নিরক্ষর মানুষ নিজের থেকে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নয়।[৪৩৫]

প্রাচীন যুগের কুরাইশ সম্প্রদায়ের মুশরিকরাও স্বীকার করেছে, এই বিস্ময়কর কুরআন এমন কোনো উম্মি ব্যক্তির জন্য নিয়ে আসা সম্ভব নয়,

---

[৪৩৪]. ইবনে আশুর : *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির* : ৯/১৩৩।
[৪৩৫]. ইবনে আশুর : প্রাগুক্ত ১১/১২৩।

যে পড়তে ও লিখতে জানে না। এ কারণে তারা কখনো দাবি করত এটা হয়তো কোনো জাদু যা মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। এই যেমন উতবা ইবনে রবিআর বক্তব্য। (তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলে ফিরে এসে নিজের মুশরিক সঙ্গীদের বললেন,) 'আল্লাহর কসম! আমি আজ এমন কথা শুনেছি, যা আগে কখনো শুনিনি। এটা কোনো কবিতা নয়, নয় কোনো জ্যোতিষবাণী। হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা শোনো এবং বিষয়টা আমার দায়িত্বে অর্পণ করো। তোমরা এই ব্যক্তিকে তাঁর কাজ করতে দাও। তাঁকে তাঁর মতো চলতে দাও। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর থেকে যে কথা শুনেছি, তা এক নতুন বার্তা। আরবরা যদি তাঁকে আক্রমণ করে, তবে তো তাঁর ক্ষেত্রে তোমাদের মোকাবিলায় অনারবরা যথেষ্ট হয়ে গেল। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তো তাঁর রাজত্বই তোমাদের রাজত্ব। তাঁর সম্মানই তোমাদের সম্মান। তাঁর মাধ্যমে তোমরাই মর্যাদাপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য হবে।'

উতবার এই কথা শুনে তার সঙ্গীরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! হে আবুল ওয়ালিদ, তোমাকে সে তাঁর কথার মাধ্যমে জাদু করেছে!'[৪৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মি হওয়ার মুজিজা বুঝেছিল 'আদ্দাস'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ থেকে দুঃখিত, ক্লান্ত, আহত ও বিপদ্গ্রস্ত হয়ে ফিরে এলেন। কারণ, তায়েফবাসী ঈমান গ্রহণ করেনি। তখন তিনি আহত ও ক্লান্ত হয়ে রবিআর দুই ছেলের বাগানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এটা দেখে তারা দুইজন তাদের গোলাম আদ্দাসকে একটি আঙুরের থোকা দিয়ে নবীজির নিকট পাঠালেন। এই আদ্দাস ছিল একজন খ্রিষ্টান যুবক। সে আঙুরের থোকা নিয়ে এগিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখল। তখন নবীজি সে আঙুর হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে মুখে দিলেন। এটা দেখে আদ্দাস কিছুক্ষণ বিস্ময়ের সাথে নবীজির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এই অঞ্চলের লোকেরা খাওয়ার সময় এই কথা বলে না।' তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার দেশ কোথায় আর তোমার ধর্ম কী?'

---

৪৩৬. বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়া* : ২/২০৪-২০৫, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫০৪-৫০৫।

আদ্দাস বলল, 'আমি একজন খ্রিষ্টান। আমি নিনাওয়া[৪৩৭] এলাকার অধিবাসী।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি তো সৎ ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার জনপদের মানুষ।'

আদ্দাস বলল, 'আপনি কীভাবে ইউনুস ইবনে মাত্তার কথা জানলেন? আল্লাহর শপথ! আমি নিনায়ার এমন অবস্থা দেখে এসেছি যে সেখানে দশজন ব্যক্তিও মাত্তাকে চেনে না। তাহলে আপনি কীভাবে জানলেন মাত্তার কথা, অথচ আপনি নিজে একজন উম্মি (নিরক্ষর) এবং আপনার সম্প্রদায়ও উম্মি!'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইউনুস ইবনে মাত্তা হলেন আমার ভাই, তিনি একজন নবী ছিলেন, আমিও একজন নবী।'

এ কথা শুনে আদ্দাস ঝুঁকে পড়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা, দুই হাত ও পায়ে চুমু খেল। এরপর আদ্দাস যখন ফিরে গেল, তখন তার মালিক রবিআর দুই পুত্র তাকে বলল, 'হে আদ্দাস, তোমার ধ্বংস হোক! কীজন্য তুমি এই ব্যক্তির মাথা, দুই হাত ও পায়ে চুমু খেতে গেলে?'

আদ্দাস বলল, 'হে আমার সর্দার, এই পৃথিবীতে তারচেয়ে উত্তম কোনো মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন, যা শুধু একজন নবীর পক্ষেই জানা সম্ভব।'[৪৩৮]

অন্যদিকে, সংশয়ী কিছু মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মি বা নিরক্ষরতার গুণ অস্বীকার করতে চেয়েছে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত ও ইনজিলের অনেক গোপন বিষয় উন্মোচন করে দিয়েছেন, ভবিষ্যতের বহু ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যেমন পারস্যের পরাজয়। যার কথা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়, যা শিক্ষাগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়।

---

৪৩৭. নিনাওয়া : বর্তমান ইরাকের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি জেলা, যা বাগদাদ থেকে ৪০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।-সম্পাদক

৪৩৮. ইবনে তাইমিয়া : *আল-জাওয়াবুস সহিহ* : ১/৩৯১-৩৯২।

কিন্তু বাস্তবে তাঁর 'নিরক্ষতা' এমন এক যৌক্তিক, স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মুজিজা, জেদি ও একগুঁয়ে ব্যক্তিরা ছাড়া এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদিও এই একগুঁয়ে ব্যক্তিরা খুব ভালোভাবেই জানে, এই নবীর উম্মি হওয়ার বিষয়টি তাওরাত ও ইনজিলে উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

যারা অনুসরণ করে সেই উম্মি রাসুল ও নবীকে যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজিলের মধ্যে লিখিত পেয়েছে। [সুরা আরাফ : ১৫৭]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾

হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন জেনেবুঝে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ অস্বীকার করো? [সুরা আলে ইমরান : ৭০]

তোমরা সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি ও পরিচয় তোমাদের কিতাবের মধ্যে রয়েছে, এরপরও তোমরা তাঁকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করো। তাঁর প্রতি ঈমান আনো না। অথচ তোমরা তোমাদের নিকট অবস্থিত তাওরাত ও ইনজিলের মধ্যে তাঁর কথা লিখিত পেয়েছ, 'তিনি হবেন এমন উম্মি নবী, যিনি নিজে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন।'[৪৩৯]

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরক্ষরতা তাঁর সত্যতা ও নবুয়তের অন্যতম প্রমাণ।

* * *

---

৪৩৯. ইমাম তাবারি : *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন* : ৬/৫০৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা

আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন। তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট, মানুষ ও জিন, আরব ও অনারব সকলের জন্যই। আর তিনি প্রেরিত হয়েছেন বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অকাট্য দলিলসহকারে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এইসব দলিল ও প্রমাণ প্রদান করেছেন, যাতে মানবজাতি তাঁর নবুয়তের সত্যতা এবং রিসালাতের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে পারে। বুঝতে পারে যে, তিনিও সম্মানিত নবীদের ধারারই একজন। যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যাদের পাঠিয়েছেন এক ও অভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে, অর্থাৎ বিশ্ববাসীকে মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি আহবানের দায়িত্ব।

নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাধারণ নীতি হলো, প্রতিটি নবী তাঁর দাওয়াতের মশাল পরবর্তী নবীর জন্য অর্পণ করে যাবেন। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সংবাদ প্রদান করেছে। সকল নবী তথা সকল নবী ও মানবের পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকলেই নিজেদের উম্মতকে শেষ নবীর সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গিয়েছেন। যুগে যুগে যখনই যে-নবীর আগমন ঘটেছে, তখনই তাঁর থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের সুসংবাদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বস্তুত এই সুসংবাদগুলো ও ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো ছিল আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নবীগণের পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগাম বার্তা। এর উদ্দেশ্য হলো, ঐশী হেদায়েতের ধারায় যেন কোনো বিচ্ছিন্নতা বা বিরূপতা না আসে। সুতরাং একজন নবীর পরে যখন কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে,

CamScanner

তখন যেন পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীরা তাঁর বিরোধী হয়ে না দাঁড়ায় এবং পূর্ব নবীর অন্ধ পক্ষপাতিত্বে পরবর্তী নবীর শত্রুতায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে। বরং তারা যেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, তিনি পূর্বজনেরই পথ ও মতের একজন পতাকাবাহী। তারই সমর্থক ও সাহায্যকারী। এর মাধ্যমে হেদায়েতের বার্তা পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন থাকে, একে অপরের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করে। আর যুগে যুগে এভাবেই আসমানি রিসালাত পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু বিষয় এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপনের ইচ্ছা রাখি।

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি ﷺ-এর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তাওরাতে নবীজি ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইনজিলে নবীজি ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী

কুরআনুল কারিম জানিয়েছে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জাতির জন্য একজন নবী বা বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। যিনি নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন। সৎকাজের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, অসৎ কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করেছেন, যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত দাঁড় করানো না যায়। সেইসাথে এসব জাতি ও সম্প্রদায় তাদের নবীদের মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে যেন অবগত ও নিশ্চিত হতে পারে। এ বিষয়টি কুরআনুল কারিম আমাদের জানিয়েছে এইভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾

পূর্ববর্তী (আসমানি) কিতাবসমূহেও এর (অর্থাৎ এই কুরআনের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) উল্লেখ রয়েছে।

[সুরা শুআরা : ১৯৬]

ইমাম কুরতুবি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।[৪৪০]

এটা ঠিক যে, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থাবলির খুব কম বিবরণই অবিকৃতভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তবুও যতটুকু এসেছে, তাতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর রিসালাতের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন ব্রাহ্মণদের নিকট পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্যতম গ্রন্থ 'সামবেদ'-এ আমরা পাই,

---

৪৪০. ইমাম কুরতুবি : *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন* : ১৩/১৩৮।

CamScanner

> আহমাদ তাঁর রবের পক্ষ থেকে জীবনবিধান প্রাপ্ত হবেন। তা থাকবে প্রজ্ঞায় ভরপুর। সেই জীবনবিধান তেমনই আলো থেকে গৃহীত হবে, যেমন আলো গৃহীত হয় সূর্য থেকে।[৪৪১]

হিন্দুদের আরেকটি ধর্মীয় গ্রন্থ হলো 'অথর্ববেদ'। সেখানে মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

> হে মানবজাতি, মনোযোগ দিয়ে শোনো ও মনে রাখো! মুহাম্মাদকে পাঠানো হবে মানবজাতির কাছে। তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্তুতি গাওয়া হবে সবখানে, এমনকি স্বর্গেও। স্বর্গও তাঁর অনুগত হবে। আর তাঁর নাম হবে মাহামেদ। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।)[৪৪২]

হিন্দুধর্মের তৃতীয় আরেকটি গ্রন্থ হলো 'ভবিষ্য পুরাণ'। সেখানে লিখিত আছে,

> ওই সময় এক ভিনদেশিকে নিজের সাথি-সঙ্গীসহ প্রেরণ করা হবে। তাঁর নাম হবে 'মাহামেদ', আর উপাধি হবে 'বিশ্বগুরু বা জগতের শিক্ষক'।[৪৪৩] সৃষ্টিকর্তা তাঁকে পাঁচটি পবিত্রকারী বিষয় (আমল) দিয়ে পবিত্র করবেন।[৪৪৪]

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেই পবিত্রকারী পাঁচটি আমল হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ মোচন করে তাকে পবিত্র করেন।

'ভবিষ্য পুরাণ'-এ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের গুণাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

---

৪৪১. 'সামবেদ' দ্বিতীয় খণ্ড অনুচ্ছেদ : ৬-৮। তথ্যসূত্র : সফিউর রহমান মুবারকপুরি وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৫১

৪৪২. *'অথর্ববেদ'* বিশতম খণ্ড। অধ্যায় : ১২৭, অনুচ্ছেদ : ৭০। তথ্যসূত্র : সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৫২।

৪৪৩. এভাবে ইউহান্নার ইনজিলের মধ্যেও আছে, ইসা মাসিহ এই গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রদান করে গেছেন। তিনি বলেছেন, إن أركون العالم سيأتي –এখানে 'أركون' বলতে নেতা ও মহান ব্যক্তি। অর্থাৎ সারা বিশ্বের নেতা অচিরেই আসবেন। দেখুন, ইবনে তাইমিয়া : *আল-জাওয়াবুস সহিহ* : ৫/৩০৪-৩০৫।

৪৪৪. খণ্ড : ২, অধ্যায় : ৩। তৃতীয় শ্লোক এবং তার পরের শ্লোকসমূহ। তথ্যসূত্র : সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৫২।

CS CamScanner

> তারা খাতনা করবে। তারা মাথার পেছনে টিকি রেখে লম্বা করবে না বরং তারা লম্বা করবে মুখের দাড়ি। উঁচু আওয়াজে মানুষদের প্রার্থনার (নামাজের) দিকে আহ্বান করবে। তারা শূকর ছাড়া অধিকাংশ প্রাণী আহার করবে। পবিত্রতার জন্য 'দারবা'[৪৪৫] ব্যবহার করবে না। তাদের শহিদগণ হবেন পবিত্র। তাদের বলা হবে 'মুসলি' (অর্থাৎ মুসলমান)। কারণ, তারা সেইসব লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে দিতে চায়। তাদের এই ধর্ম আসবে আমার থেকে। আর আমিই সৃষ্টিকর্তা।[৪৪৬]

একদল হিন্দু গবেষক এসব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন বেদ ও ধর্মীয় গ্রন্থের এইসব শ্লোক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশেষে তারা দেখেছেন, এগুলোতে মূলত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এমনকি তাঁর দাওয়াত ও রিসালাতের বহু বিবরণও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে অনেক হিন্দু পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন নিজেদের ধর্মগ্রন্থে উক্ত এই অসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোতে নবীজির যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর আলোকে তারা তাঁকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

যেমন হিন্দুধর্মীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে তাঁকে বলা হয়েছে 'নরাশংস'। 'নরাশংস' একটি সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি মূলত দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি হলো। 'নর' অর্থ মানুষ। যে বেদগুলোতে সাধারণত কখনো 'মানুষ' শব্দকে প্রশংসার স্থানে ব্যবহার করা হয় না, সেখানে এই ব্যবহারটি খুবই বিস্ময়কর।

আর শব্দটির দ্বিতীয় অংশ হলো 'আশংস'। এর অর্থ হলো, অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। অতএব 'নরাশংস' শব্দটি আরবি 'মুহাম্মাদ' শব্দের হুবহু প্রতিশব্দ। কারণ, 'মুহাম্মাদ' অর্থ অধিক প্রশংসিত।

---

৪৪৫. দারবা (الدرباء) : এক প্রকার উদ্ভিদ। হিন্দুধর্ম মতে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এর দ্বারা মানবদেহের (দূষিত) রক্ত বের করা হয়।-সম্পাদক

৪৪৬. তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়। শ্লোক : ২৭-২৮। তথ্যসূত্র : সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৫২।

তা ছাড়া বেদগুলোতে শুধু যে নবীজির নাম এসেছে এমন নয়, বরং তাঁর সাথে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির এমন বিস্তারিত বিবরণও এসেছে, যা সব ধরনের মতপার্থক্যের অবসান ঘটাতে সক্ষম। এমন সুস্পষ্ট সুসংবাদও এসেছে, যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন অন্য কেউ উদ্দেশিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই ।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ও বিস্তারিত বিবরণ এসেছে 'অথর্ববেদ'-এ। অথর্ববেদের বিশতম অধ্যায়ের একশ সাতাশতম পরিচ্ছেদে। এ ছাড়াও হিন্দুদের ধর্মীয়গ্রন্থের বহু বেদ ও পুরাণে এই বিবরণগুলোর বহু মন্ত্র ও শ্লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।[৪৪৭] নিচে সেইসব শ্লোক ও মন্ত্রের কিছু অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো :

১. হে মানবজাতি, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনো! 'নরাশংসের' প্রশংসা করা হবে। তার স্তুতি গাওয়া হবে। আর আমরা ওই দেশত্যাগকারীকে (অথবা শান্তির মশালবাহীকে) রক্ষা করব ষাট হাজার নব্বইজন শত্রুর কবল থেকে।

এই শ্লোকের কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যথা :

এক. এখানে বলা হয়েছে, উক্ত মহামানব মানুষের প্রশংসার পাত্র হবেন। মানুষেরা তাঁর গুণগ্রাহী হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তিনি বিশেষভাবে এগিয়ে থাকবেন। আর আমরা জানি, জগতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত প্রশংসা করা হয়েছে এবং হয়, মানব-ইতিহাসের অন্য কারও ক্ষেত্রে তার এক-দশমাংশও করা হয়নি বা হয় না। এ কারণে নবীজির নামই হয়েছে 'মুহাম্মাদ' (অধিক প্রশংসিত)। এতএব, নবীগণসহ অন্য সকলের চেয়ে তিনিই প্রশংসাপ্রাপ্তির এই বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে রয়েছেন।

দুই. শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, তিনি হবেন স্বদেশত্যাগী বা হিজরতকারী। সকলেরই জানা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হিজরতকারী। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হিজরত ছিল সকল নবীর জীবনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য একটি বড় ঘটনা।

---

৪৪৭. সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৬৬।

CamScanner

তিন. (যা এই শ্লোকের একটি ব্যতিক্রমধর্মী কথা) এখানে উল্লেখিত মহান ব্যক্তির শত্রুসংখ্যার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা হবে ষাট হাজার নব্বই জন। অনেকেই এ বিষয়টি জরিপ করে দেখেছেন যে, কারা কারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। তাদের সেই জরিপে এর (শ্লোকে উল্লেখিত ষাট হাজার নব্বই) কাছাকাছি সংখ্যাই উঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[৪৪৮]

২. তিনি উটে আরোহণ করবেন। তাঁর স্ত্রী হবে বারোজন। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন এবং বাহনের দ্রুততায় আসমান স্পর্শ করবেন। অতঃপর আবার মর্ত্যে নেমে আসবেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদের ক্ষেত্রে এই শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট অর্থ বহন করে। কারণ, শ্লোকে উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্যই নবীজির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন, 'নরাশংস' বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সফর বা যুদ্ধযাত্রায় সর্বদা উটে আরোহণ করতেন। সিরাতগ্রন্থগুলোতে এর বহু বিবরণ রয়েছে।

তা ছাড়া এই শ্লোকের দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এই অবতার বা নবীর জন্মস্থল হবে মরু অঞ্চলে। কারণ, উট মরু অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও সাধারণত পাওয়া যায় না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থল মক্কা মরুভূমির দেশ। যা দিগন্তবিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তরবেষ্টিত।

এরপর শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, 'এই অবতার অবিবাহিত হবেন না। তিনি বিবাহ করবেন। তাঁর বারোজন স্ত্রী হবে।' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও স্ত্রীর সংখ্যা ছিল বারো। (যারা রায়হানা বিনতে যায়েদ রা.-কে তাঁর স্ত্রী বলে গণ্য করেছেন, তাদের মতানুসারে।) এই বৈশিষ্ট্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবী বা অবতারের মধ্যে পাওয়া যায় না।[৪৪৯]

---

৪৪৮. সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৭১।

৪৪৯. সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৭১, ৩৭২; ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/৬০৫, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ২/৩৮৮।

ভারত উপমহাদেশের সংস্কৃত ভাষার একজন বড় পণ্ডিত হলেন বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়। তিনি তার রচিত *নরাশংস ও অন্তিম ঋষি* নামক গ্রন্থের ১৪ নং পৃষ্ঠায় উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় অংশের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এর অর্থ করেছেন, 'তাঁর স্ত্রী হবে বারোজন'। এই অর্থ ছাড়া ভিন্ন কোনো অর্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা তিনি বলেননি।[৪৫০]

উক্ত শ্লোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মেরাজের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি সেই সফর করেছিলেন 'বোরাক' নামক একটি দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করে। উক্ত বাহন এত দ্রুতগামী ছিল যে, সে তার একেক কদম ফেলত তার দৃষ্টির শেষ সীমায়। উক্ত বাহনে চড়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানসমূহ ভ্রমণ করেছেন। তারপর আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।[৪৫১]

এই শ্লোক দুটিসহ 'নরাশংস' সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শ্লোকের বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ! অতএব, হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোর এসব বর্ণনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণবাক্য। অনেক হিন্দু পণ্ডিতই স্পষ্ট ভাষায় এগুলো বলে গেছেন। এতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হওয়া এবং সেগুলোতে তাঁর আগমনের সুসংবাদ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস, মানুষের হাতে রচিত এ গ্রন্থগুলোর উৎসমূল ছিল বিশুদ্ধ, যদিও মানুষের হাতে এসে তা বহু বিকৃতির শিকার হয়েছে। কারণ, এটা বোধগম্য নয় যে, শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নবুয়ত ও রিসালাত অবতীর্ণ হবে আর অন্য সকল জনপদ ও তার অধিবাসীদের ওহি ও রিসালাত থেকে দূরে রাখা হবে! এ ধরনের কাজ থেকে আল্লাহ তাআলা বহু উর্ধ্বে। এটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও ন্যায়পরতার সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনুল কারিম আমাদের জানিয়েছে যে মানবজাতির প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই একজন পথপ্রদর্শক এসেছেন।

---

৪৫০. তথ্যসূত্র : সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৭৪।

৪৫১. সফিউর রহমান মুবারকপুরি : وانك لعلى خلق عظيم : ১/৩৭৫।

তিনি তাদেরকে সুসংবাদ ও সতর্ক বাণী শোনাতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন সতর্ককারী গত হয়েছেন।

[সুরা ফাতির : ২৪]

অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ ও তাঁর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের এসব শ্লোকগুলো—হিন্দু পণ্ডিতদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে—উপস্থাপন করা যেতে পারে।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তাওরাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ

বর্তমান পৃথিবীতে তাওরাতের অনুসারীদের (ইহুদিদের) কাছে 'তাওরাত' নামে যে গ্রন্থগুলো রয়েছে, তাতে এমন বহু দলিল-প্রমাণ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো সুস্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের দাবিকে সত্য প্রমাণ করে। তিনিই হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং তাঁকে জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সেইসাথে এইসব বর্ণনা এই কিতাবের ধারক তথা ইহুদিদের কুফরির ওপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে, আর মুমিনদের ঈমানকে করে প্রমাণিত।

ইহুদিজাতি তাদের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদের কাছে বিদ্যমান আলোকে নির্বাপিত করতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যে তারা আল্লাহর কিতাব 'তাওরাত'-এর মধ্যে নানাধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতিসাধন করেছে। 'তাওরাত' থেকে তারা যে প্রকৃত সত্য মুছে দিয়েছে এবং মূল রূপ বিকৃত করে ফেলেছে, তা হলো, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবসংক্রান্ত খোদাপ্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কারণ, তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করত তারা ব্যতীত আর কোনো জাতি আল্লাহর সঠিক পথে জগদ্ব্যাপী কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম নয়। কিন্তু যখন দেখা গেল শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটেছে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে, ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ বনি ইসরাইলে নয়, পূর্ব থেকে যেমনটি হয়ে আসছিল, তখন বনি ইসরাইল তথা ইহুদিদের বুকে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত পরিচয় এবং সত্যধর্ম ইসলামকে বিকৃত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়।

CamScanner

তাওরাতের প্রথম পুস্তকের নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে,

> হাজেরা যখন সারাকে ছেড়ে দূরে চলে এলো, ফিরেশতা তাকে সম্বোধন করে বলল, হে হাজেরা! তুমি কোথা থেকে এসেছ আর কোথায় যাচ্ছ? হাজেরা তখন ফিরেশতাকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলো। ফিরেশতা তাকে বলল, তুমি ফিরে যাও, আমি তোমাকে অগণন সন্তান ও শস্যাদি প্রদান করব। আর হ্যাঁ... তুমি গর্ভবতী হবে এবং একজন সন্তান জন্ম দেবে, যার নাম হবে ইসমাইল। আল্লাহ তাআলা তোমার কষ্ট-অপমান এবং বিনয়-নম্রতা দেখেছেন। তোমার সন্তান নির্ভীক ও সাহসী হবে। সবার ওপর তার কর্তৃত্ব থাকবে; আর তার প্রতি থাকবে সবার সমর্থন। তার আবাসস্থল হবে অন্য ভাইদের মাঝেই।[৪৫২]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, '...সকলেরই জানা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে বনু ইসহাকের ওপর বনু ইসমাইলের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। বরং বনু ইসহাকের হাতেই নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থের গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামানায় তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাথে মিশরে এসেছিল। সে সময়ও তাদের ওপর বনু ইসমাইলের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। মুসা আলাইহিস সালামকে যখন নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়, তখন তারা তার সঙ্গে মিশর থেকে চলে আসে। তার সাথে থাকাকালীন তারা ছিল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের ওপর কারোই কোনো ধরনের কর্তৃত্ব ছিল না। এরপর তারা হজরত ইউশা আলাইহিস সালামের সাথে ছিল, হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ ও সুলাইমান আ.-এর রাজত্ব পর্যন্ত। সুলায়মান আলাইহিস সালামকে তো এমন রাজত্ব প্রদান করা হয়েছিল, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই সময় পর্যন্তও তাদের ওপর বনু ইসমাইলের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এরপর আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করলেন হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে। কিন্তু বনি ইসহাক বা বনি ইসরাইল তার নবুয়তকে অস্বীকার করে বসল। তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তাদের এই কুফরি ও মিথ্যাচার তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনল। তাদের রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে গেল। এরপর তারা

---

৪৫২. আদিপুস্তক : পদ : ১৬। সূত্র : ইবনুল কাইয়িম : *হিদায়াতুল হায়ারা* : ১৪৭।

CamScanner

আর কখনো রাজত্ব ও কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে দিলেন। তারা রোম, পারস্য ও অন্যান্য জাতির অধীন হয়ে পড়ল। তবুও এই সময় পর্যন্ত তাদের ওপর বনু ইসমাইলের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এমনকি অন্য কোনো জাতির ওপরও তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। নবুয়তের মহান দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমেই সকল জাতির ওপর বনু ইসমাইলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো! সারা দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশার চেয়ে তারাই প্রতাপশালী হয়ে উঠল। তারা পরাভূত করল রোম, পারস্য, তুর্কি, দায়লামসহ[৪৫৩] বহু রাজ্য ও সম্প্রদায়কে। ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের পরাভূত করল। আর এভাবেই তাওরাতের বক্তব্য, 'সবার ওপর তার কর্তৃত্ব থাকবে'-এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটল। আর এটা এমন এক কর্তৃত্ব, যা চিরকাল স্থায়ী থাকবে।

ইহুদিরা বলে, এটা আমরা অস্বীকার করি না। তবে এটা ছিল তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের সুসংবাদ, তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের সংবাদ নয়।

মুসলমানগণ এর উত্তরে বলেছেন, রাজত্ব দুই ধরনের। ১. এমন রাজত্ব, যার সাথে নবুয়তের কোনো সম্পর্ক থাকে না, বরং অনেক সময় সেটা হয়ে থাকে কর্তৃত্ববাদী ও জালেমের রাজত্ব। ২. এমন রাজত্ব, যা নবুয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত। প্রথম প্রকার রাজত্বের ব্যাপারে কখনোই 'সুসংবাদ' আসতে পারে না। বিশেষ করে রাজ্যের অধিকারী যদি নবুয়ত ও রিসালাতের দাবি করে আর এ দাবিতে সে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে তো সে হবে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট, মহা পাপাচারী ও কট্টর কাফের। এ ধরনের লোকের রাজ্যপ্রাপ্তির সুসংবাদ আসমানি গ্রন্থে আসতে পারে না। বরং তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সতর্কবার্তা আসবে, যেমনটি এসেছে দাজ্জালের ব্যাপারে। এ ধরনের লোক সানহারেব,[৪৫৪] বুখতেনসর[৪৫৫] এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে

---

৪৫৩. দায়লাম, তুর্কি কুর্দিদের একটি জনগোষ্ঠী।

৪৫৪. সানহারেব (سنحاريب أو سنحريب) : খ্রিষ্টপূর্ব ৭০৫-৬৮১ সময়কালের আসিরিয়ান সাম্রাজ্যের অত্যাচারী বাদশা। তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পুরো ইরাক, বর্তমান ইসরাইল। বাবেল শহরও তার শাসনাধীন ছিল। তার পিতা সারগোন দ্বিতীয়।-অনুবাদক

CamScanner

মিথ্যারোপকারী অন্যান্য জালেম ও পাপাচারী রাজা-বাদশাদের থেকেও নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর। এমন মানুষের খবর কখনো সুসংবাদ হতে পারে না! আর এ ধরনের কারও আগমনে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং হাজেরা আলাইহাস সালাম আনন্দিতও হতে পারেন না এবং কেউ কখনো এমন লোকের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করে না। আর হাজেরা আলাইহাস সালামের বিনয়-নম্রতা ও কষ্ট-অপমানের জন্য এটা কোনো পুরস্কার হতে পারে না! এ ছাড়া, উপরোল্লেখিত বাণীতে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা নিজে বিষয়টা দেখেছেন। এই নবজাতক শিশুকে সম্মানিত ও এক বিশাল জাতির জন্য নির্বাচন করেছেন। কিন্তু অবিশ্বাসীদের কথানুসারে (ইহুদিদের কথা যদি সত্য হয়) পুরস্কারস্বরূপ হাজেরা আলাইহাস সালামকে যেন কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে, তোমার পেট থেকে জন্ম নেবে এক জালেম খোদাদ্রোহী বাদশা, যে মানুষের ওপর অন্যায় কর্তৃত্ব খাটাবে। আল্লাহর প্রেমিকদের হত্যা করবে। তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিকে দাস-দাসীতে পরিণত করবে। তাদের সমুদয় সম্পদ আত্মসাৎ করে নেবে। নবীদের ধর্মকে পরিবর্তন করে অধর্মের রাজত্ব কায়েম করবে এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করবে ইত্যাদি।

সুতরাং যারা এই সুসংবাদকে এ ধরনের মন্দ অর্থে প্রয়োগ করবে, তাদের সে কাজকে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে! তবে যারা আল্লাহর ক্রোধে দগ্ধ, নবীদের খুনে যাদের হাত রঞ্জিত, মিথ্যাচারিতা যাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, তাদের থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ আশ্চর্যের কিছু নয়।[৪৫৬]

সময়ের বিবর্তনে তাওরাতের মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতিমূলক হস্তক্ষেপ চলা সত্ত্বেও এখনো তাতে এমন কিছু বর্ণনা রয়ে গেছে, যা সুস্পষ্টভাবে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে প্রমাণ করে, যার সম্পর্কে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এমনকি তিনি নিজেও তাঁর উম্মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন!

---

৪৫৫. বুখতেনসর : সে বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেছিল। বুখতেনসর নামের অর্থ প্রতিমার পুত্র। শৈশবে তাকে মূর্তির নিকট কুড়িয়ে পাওয়া যায় এবং তার বাবার পরিচয় জানা যায়নি। এ কারণে তাকে 'বুখতেনসর' বা 'প্রতিমার পুত্র' বলা হতো। সূত্র : *লিসানুল আরব* : ৫/ ২১০। (আরবি উচ্চারণটি মূলত বুখতেনসসর, তবে প্রচলিত উচ্চারণ বুখতেনসর। তাই সেভাবে রাখা হলো।-সম্পাদক)

৪৫৬. ইবনুল কাইয়িম : *হিদায়াতুল হায়ারা* : ১৪৮-১৪৯।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আমি জাবুরের একটি নুসখায় দেখেছি, যাতে স্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসহ তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু আরেকটি নুসখায় দেখেছি, যেখানে ওই কথাগুলো নেই। অতএব, (তারা যেহেতু বিকৃত করেছে) তাই এটা এখন অসম্ভব নয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির কথা হয়তো এক নুসখায় পাওয়া যাবে, অন্য নুসখায় তা পাওয়া যাবে না।[৪৫৭]

আমরা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের এসব সুস্পষ্ট বিবরণ ও সুসংবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখতে পাব, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সনে পারস্যের বাদশাহ (সাইরাস)-এর হাতে ব্যাবিলনের পতন হলে বুখতেনসর (নেবুচাদনেজার দ্বিতীয়) খ্যাত ক্যালডিয়ান নেতা কর্তৃক নির্যাতিত ও বন্দী হওয়ার পর ইহুদিরা ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। তারা পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাস ও মন্দির নির্মাণ করে। নতুন ইবাদতখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় আনন্দের আতিশয্যে তারা চিৎকার করতে থাকে। এই সময়টাতে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন হজরত হাজ্জাই (বা হগয়) আলাইহিস সালামকে।[৪৫৮] তিনি তাদের সামনে তখন পাঠ করে শোনান,

> আমি অতি সত্বর জাতিসমূহের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করব। অচিরেই সকল জাতির পথপ্রদর্শকরূপে আগমন করবে 'হিমদাহ'। এই ঘরকে আমি সম্মান ও মর্যাদায় ভরে তুলব। এমনটাই ঘোষণা করেছেন ধর্মসেনাদের প্রতিপালক। আমার হাতে রয়েছে সোনা ও রুপার ভান্ডার। এভাবেই বলেছেন ধর্মসেনাদের প্রতিপালক। এ ঘরের শেষ অবস্থার মর্যাদা হবে প্রথম অবস্থার মর্যাদা থেকেও বেশি গৌরবময়। এমনটাই বলেছেন ধর্মসেনাদের প্রতিপালক। এখানে প্রদান করা হবে 'শালম'। এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন ধর্মসেনাদের প্রতিপালক।[৪৫৯]

---

৪৫৭. ইবনে তাইমিয়া : *আল-জাওয়াবুস সহিহ* : ৩/৫০, ৫১।

৪৫৮. হজরত হাজ্জাই আলাইহিস সালাম ছিলেন হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সামসময়িক।

৪৫৯. বাইবেল : নবী হগয়ের পুস্তক : ৯/৭-৯।

CamScanner

ইহুদি ও খ্রিষ্টান ভাষ্যকারগণ উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যকার 'হিমদাহ' ও 'শালম'-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি দুটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা মনে করেন 'হিমদাহ' শব্দটি ইহুদিবাদ কিংবা খ্রিষ্টবাদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী। সে হিসাবে এখন যদি উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীর 'হিমদাহ' ও 'শালম' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থ আশা ও শান্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্‌বাণীটা নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাৎপর্যহীন নিছক অস্পষ্ট কিছু আশার বাণী বলে গণ্য হয়। কিন্তু আমরা যদি 'হিমদাহ' দ্বারা একজন মহান মনীষীকে উদ্দেশ্য করি আর 'শালম'-কে ধরি আসমানি ধর্ম ও কার্যকরী শক্তি অর্থে, তাহলে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অর্থপূর্ণ ও কার্যকর হয়ে ওঠে এবং তখন তা সাব্যস্ত হবে ব্যক্তি 'আহমাদ' ও শান্তির ধর্ম 'ইসলাম'-এর ক্ষেত্রে। কারণ, 'হিমদাহ' ও 'শালম' শব্দদুটি সূক্ষ্মভাবে আহমাদ ও ইসলামকেই বোঝায়।[৪৬০]

পাদরি আবদুল আহাদ দাউদ[৪৬১] দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'হিমদাহ' ও 'শালম' শব্দদুটির উৎসমূল প্রমাণ করে, তাওরাতের সুসংবাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামধর্মের ব্যাপারেই এসেছে। কারণ, তাওরাতে হিমদাহ-এর যে মূলপাঠ রয়েছে তার শাব্দিক অর্থ হলো, 'অতি সত্বর সকল জাতির জন্য (পথপ্রদর্শক হিসেবে) 'হিমদাহ'-এর আগমন ঘটবে। 'হিমদাহ' শব্দটি প্রাচীন হিব্রু অথবা আর্মেনীয় ভাষা থেকে গৃহীত। এর মূল উচ্চারণ হলো, 'হিম্‌দ্' (حِمْدْ)। হিমিদও (حِمِد) পড়া যায়। হিব্রুভাষায় এর অর্থ হলো 'বড় আশা' বা 'কাঙ্ক্ষিত' অথবা এমন ব্যক্তি বা বস্তু যার প্রতি মানুষ আগ্রহবোধ করে। আর আমরা দেখি, আরবি ভাষার حَمِدَ ফেয়েল বা ক্রিয়াবাচক শব্দটিও ওই 'হা-মিম-দাল' (ح م د) মূলধাতু থেকেই গৃহীত। যার অর্থ হলো, অধিক প্রশংসা করা। এভাবেই শব্দটি 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে সত্যায়িত হয়।

---

৪৬০. আবদুল আহাদ দাউদ : *মুহাম্মাদুন কামা ওয়ারাদা ফি কিতাবিল ইয়াহুদি ওয়ান-নাসারা* : ৩৬-৩৭

৪৬১. আবদুল আহাদ দাউদ। তিনি খ্রিষ্টান পাদরি ছিলেন। নাম ছিল ডেভিড বেঞ্জামিন ক্যালদানি (David Benjamin Keldani)। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালদিয়ার (ইরাকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন অঞ্চল) পক্ষ থেকে রোমের একজন পাদরি ছিলেন। ইসলামগ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আবদুল আহাদ দাউদ। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। যেমন, الكتاب المقدس، محمد في الكتاب المقدس، الانجيل والصليب । তার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য তারই লেখা محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى -গ্রন্থের ভূমিকা পড়া যেতে পারে।

তাওরাতে বর্ণিত আরেকটি সুসংবাদ হলো, যা 'যিশাইয়' পুস্তকের বিয়াল্লিশতম পদে এসেছে। বর্ণনাটি হলো,

> মরু অঞ্চল ও এর জনপদগুলো আনন্দে উচ্চকিত হয়ে উঠবে, যে অঞ্চলসমূহে বাস করেছে কায়দার।[৪৬২] আর 'সালে' (سَالِع)-এর অধিবাসীরা পাহাড়ের চূড়া থেকে গীত গাইবে। যাতে জোরে আওয়াজ হয়। প্রতিপালক তাদের সম্মান প্রদান করবেন। এবং উপদ্বীপে তাদেরকে তার (প্রতিপালকের) পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত করা হবে।[৪৬৩]

এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা। কারণ, এখানে আরবদেশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবই হলো কায়দার ইবনে ইসমাইলের আবাসভূমি। আর কায়দার ইবনে ইসমাইল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ।[৪৬৪] এ ছাড়াও এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দেশ মদিনারও উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, 'সালে-এর অধিবাসীরা গীত গাইবে।' 'সালে' হলো মদিনার প্রবেশদ্বারে অবস্থিত 'সাল' (سَلْع) নামক একটি পাহাড়, যা এখন পর্যন্ত এ নামেই পরিচিত। হিব্রু ভাষায় এটাকে 'সালে' বলে।[৪৬৫]

উল্লেখিত বক্তব্যটি আমাদের সামনে অনুসন্ধান ও ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়, কেন ইহুদিরা মদিনা মুনাওয়ারা ও এর আশপাশে এসে বসতি গড়েছিল! কারণ, তাদের এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সর্বশেষ নবী মদিনাতেই বসবাস করবেন। তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে 'সালে' পাহাড় ছিল এর নিদর্শন। তাদের আশা ছিল, শেষ নবী তাদের মধ্য থেকেই কেউ হবেন। আর তাঁকে তাদের মধ্যেই প্রেরণ করা হবে। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, তারা অনেক সময় আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়কে শেষ নবীর বিষয়ে ভয় দেখাত, যিনি অচিরেই তাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মাধ্যমে তারা আউস, খাজরাজসহ অন্যদের থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

---

৪৬২. কায়দার ছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের পুত্র।

৪৬৩. *যিশাইয়* : ৪২/১১।

৪৬৪. ইবনুল কাইয়িম : *হিদায়াতুল হায়ারা* : ১৫৮।

৪৬৫. ফাজেল সালেহ সামাররায়ি : *নুবুওয়াতু মুহাম্মাদ মিনাশ শাক্কি ইলাল ইয়াকিন* : ২৫৩।

মদিনা ও মদিনার আশপাশে অবস্থানরত ইহুদিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি সম্পর্কে জানত। তারা এটাও জানত যে, তাঁর আবির্ভাবের সময় অত্যাসন্ন। ইবনে সাদ রহ. এ বিষয়টি ধারাবাহিক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তার বক্তব্য হলো, বনু কুরাইজা, বনু নাজির, ফাদাক ও খায়বারের ইহুদিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে অবহিত ছিল। তারা জানত তাঁর হিজরতের স্থান হবে মদিনা।[৪৬৬]

তাওরাত ও বাস্তব ইতিহাসের এইসব বর্ণনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী ও রাসুল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

এই হলো কয়েকটি সুসংবাদের বিবরণ, যেগুলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাওরাতে এসেছে। এখানে এর চেয়ে বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। এসব বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ছিলেন সত্যবাদী ।

৪৬৬. মুহাম্মদ ইবনে সাদ : আত-তাবাকাতুল কুবরা : ১/১০৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইনজিলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ

ইনজিলে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে। সেখানে কখনো নবীজির পরিচয়ে বলা হয়েছে 'জগতের শিক্ষক'। কখনো বলা হয়েছে 'ফারাকলিত'। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম তার রিসালাতের বড় একটা সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন। কিন্তু ইহুদিদের সাধারণ থেকে শুরু করে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, এমনকি গির্জার ধর্মগুরু ও পাদরিরা পর্যন্ত সকলেই এই বিষয়ে নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতেরও বিরোধিতা করেছে। হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামসহ তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত অন্য অনেক নবীকে তারা হত্যা করেছে।

এতকিছু সত্ত্বেও ইনজিলের বহু স্থানে সেই মহাসত্যের সাক্ষ্য রয়ে গেছে, যে সত্যের আগমন ঘটবে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরে। সেই মহাসত্যের বাস্তবায়ন হয়েছে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ও তাঁর চিরন্তন রিসালাতের মাধ্যমে।

একটি সীমিত সময়ের রিসালাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে। মূলত তার রিসালাত ছিল শুধু ইহুদি বা বনি ইসরাইলের জন্য। তাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দাউদ আলাইহিস সালামের বংশে আগত 'মাসিহ'-এর ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য। তাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার জন্য যে, জমিনের ওপর রাজত্ব আল্লাহর, তারা যার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে, সেটা দাউদ আলাইহিস সালামের বংশের কোনো ত্রাণকর্তার দ্বারা হবে না, বরং হবে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ থেকে, নাম হবে 'আহমাদ'। প্রাচীন গ্রিক ভাষার ইনজিলসমূহে বর্ণিত নাম PERIQLYTOS (পেরিক্লিটোস) অনুসারে এটাই সঠিক নাম;

CamScanner

PARACLETE[৪৬৭] (প্যারাক্লিট) অনুসারে নয়। পাদরিরা যেমনটা বিকৃতিসাধন করেছে।[৪৬৮]

এই বাস্তবতাকেই কুরআনুল কারিম নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

ওই সময়ের ঘটনাকে স্মরণ করুন যখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে ইসরাইলের বংশধর, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত একজন রাসুল। আমার আগমনের পূর্বে অবতীর্ণ 'তাওরাত'-কে আমি সত্যায়ন করছি এবং আমার পরে আগমনকারী একজন রাসুলের সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি, যার নাম হবে আহমাদ। [সুরা সফ, ৬]

ইনজিলের বহু স্থানে শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ এসেছে। যেমন ইউহান্নার ইনজিলে (জোহনের বাইবেলে) বর্ণিত হয়েছে,

আমার বিদায়ের আগে 'ফারাকলিত' আসবেন না। তিনি এসে পাপাচারের কারণে জগদ্‌বাসীকে তিরস্কার করবেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলবেন না। (রবের পক্ষ থেকে) যা শুনবেন, তা-ই বলবেন। তিনি তোমাদের সাথে কথা বলবেন। ন্যায়পরতার সাথে তোমাদের পরিচালনা করবেন এবং অদৃষ্টের ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ দেবেন।[৪৬৯]

গ্রিক শব্দ PERIQLYTOS-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ সান্ত্বনাদানকারী। কেউ বলেছেন, সাহায্যকারী ও অধিক

---

৪৬৭. PARACLETE : 'الفارقليط'। অর্থাৎ যিনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করেন। তিনি হবেন স্রষ্টার পক্ষ হতে প্রেরিত আত্মা। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল-কিছু শেখাবেন। তাদের নিকট এই শব্দের অর্থ (حَمَّاد) অধিক প্রশংসাকারী। কেউ বলেন, (حَامِد) প্রশংসাকারী। তবে তাদের অধিকাংশ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য (مُخَلِّص) ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা। দেখুন, জুবাইদি : *তাজুল আরূস* : ২৬/৩০০; ইবনে তাইমিয়া: *আল-জাওয়াবুস সহিহ* : ৫/২৮৭-২৮৮

৪৬৮. আবদুল আহাদ দাউদ : *মুহাম্মাদুন কামা ওয়ারাদা ফি কিতাবিল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা* : ১৪২।

৪৬৯. বাইবেল : জোহন: ১৬-২৫।

CamScanner

প্রশংসাকারী। আবার কেউ বলেছেন, শব্দটি আরামাইক (আর্মেনীয়) ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো, অভিশাপ থেকে মুক্তিদাতা। শব্দটি সেই সময় বিশ্বাসীর মাঝে প্রচলিত ছিল। (তারা জানত) শব্দটি শেষ নবী সম্পর্কিত। আবার কারও অভিমত হলো, এটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ। আরবিতে যার অর্থ হয়, আহমাদ বা মুহাম্মাদ। প্রাচীন আরামাইক ভাষার ইনজিলসমূহের মূলপাঠের শব্দ হলো (مُحَمَّدَةٌ) 'মাহমাদাহ' এবং (حَمِدَةٌ) 'হামিদাহ'। এ দুটি শব্দ আরবি ভাষার 'আহমাদ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দদুটির সাথে হুবহু মিল রাখে। এ কারণে গ্রিক ভাষার 'ফারাকলিত' শব্দের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে শেষ ব্যাখ্যাকেই শুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী গণ্য করা যেতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষায় বলেন,

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

আমার পরে এমন একজন রাসুল আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে আহমাদ। [সুরা সফ : ৬]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের ব্যাপারে এটি একটি স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ। এর মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারিম একটি ঐশী কিতাব। কারণ, PERIQLYTOS-এর অর্থ যে 'আহমাদ', আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহিপ্রাপ্তি ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কিছুতেই সেটা জানা সম্ভব ছিল না। এটা একটি অকাট্য ও চূড়ান্ত দলিল। কারণ, এ গ্রিক শব্দের শাব্দিক অর্থ আরবি 'আহমাদ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দদ্বয়ের সমার্থক। আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো, কুরআনুল কারিম (اسم تفضيل) 'ইসমে তাফজিল'-এর শব্দ احمد-কে محمد থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছে। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই অভিনব 'আহমাদ' নামটি ইতিপূর্বে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। কোনো গ্রিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনো PERIQLYTOS নাম ব্যবহৃত হয়নি। আবার আরবেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে কারও নাম 'আহমাদ' ছিল না। এমনই বিস্ময়করভাবে নামটাকে সর্বশেষ নবী ও রাসুলের (যিনি ছিলেন প্রশংসার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত) জন্যই সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

CamScanner

অবশ্য এ কথা সত্য যে, গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের একজন প্রসিদ্ধ গ্রিক ব্যক্তি ছিলেন PERIQLYS (পেরিক্লিস) নামে। তবে এর অর্থ 'প্রসিদ্ধ'। 'অধিক প্রসিদ্ধ' নয়।[৪৭০]

ড. আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার[৪৭১] বলেন, আমি একবার ইতালীয় প্রাচ্যবিদ ড. কার্লো নালিনো (Carlo Nallino)-কে[৪৭২] PERIQLYTOS-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, পাদরিরা বলে এর অর্থ সান্ত্বনাদানকারী।

তখন আমি তাকে বললাম, আমি প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ড. কার্লো নালিনোকে প্রশ্ন করেছি, কোনো পাদরিকে জিজ্ঞাসা করিনি!

তখন তিনি বললেন, এর অর্থ হলো, অনেক প্রশংসার অধিকারী।

আমি বললাম, শব্দটা কি আরবি حمد মূলধাতু থেকে 'ইসমে তাফজিল' (أحمد-আহমাদ)-এর সমার্থক?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন আমি বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম হলো 'আহমাদ'।

তিনি তখন বললেন, ভাই! আপনি তো অনেক জানেন!

---

৪৭০. আবদুল আহাদ দাউদ : *মুহাম্মাদুন কামা ওয়ারাদা ফি কিতাবিল ইয়াহুদি ওয়ান-নাসারা* : ১৯২-১৯৮।

৪৭১. আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার (১২৭৮-১৩৬০ হি./ ১৮৬২-১৯৪১ খ্রি.)। তিনি একজন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং ফিকহবিদ। এ ছাড়াও তিনি পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতার পাশপাশি বেশ কয়েকটি সেমিটিক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য এবং দ্বীনিয়াতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তার রচনাবলি– *তারিখুল ইসলাম*, *তারিখুল খুলাফায়ির রাশিদিন*। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মাদ রজব বাইয়োমি (محمد رجب البيومي) : *আন নাহজাতুল ইসলামিয়া ফি সিয়ারি আলামিহাল মুআসিরিন* : ১/৩১৭-৩৩৮।

৪৭২. Carlo Alfonso Nallino (১৮৭২-১৯৩৮ খ্রি.) তিনি একজন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। ইহুদি সংস্কৃতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। রোম ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস ও ইসলামি শিক্ষার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ইতালীয় বিজ্ঞান একাডেমি ও মিশরের ভাষা একাডেমির সদস্য ছিলেন। তার অন্যতম রচনা হলো, *ইলমুল ফালাক : তারিখুহু ইনদাল আরাবি ফিল কুরুনিল উসতা*। দেখুন, আবদুর রহমান বাদাবি : *মাওসুআতুল মুসতাশরিকিন* : ৫৮৩ এবং নাজিব আকিকি : *আল-মুসতাশরিকুন* : ১/৪৩২-৪৩৪।

CamScanner

ড. আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার বলেন, এরপর আমরা দুজন পৃথক হয়ে যাই এবং আমি আমার মনের মাঝে আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

এর অর্থের ব্যাপারে আরও বেশি দৃঢ়তা অর্জন করি।[৪৭৩]

ইনজিলের উল্লেখিত বাণীর মধ্যে আরেকটি কথা ছিল, 'তিনি তোমাদের ন্যায়পরতার সাথে পরিচালনা করবেন।'

এ কথার মাঝেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বও দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী সেই শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। আর কুরআনুল কারিম হলো মহা সত্যবাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

> আপনি তাদের মধ্যে বিচার করবেন আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী। আপনার কাছে আগত সত্যকে উপেক্ষা করে তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। [সুরা মায়িদা : ৪৮]

মৃত সাগর অঞ্চলে ইনজিলের কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে গণ্য হয়। 'ফারাকলিত'-এর ব্যাপারে বহু তথ্য-প্রমাণ সেখানে রয়েছে। যা ইনজিলের বহু গতানুগতিক ধারণাকে আমূল পালটে দেয়। একজন শীর্ষস্থানীয় পাদরি এমনটি বলেছেন। তিনি হলেন পল ডিভাইন (Paul Devine)। তিনি ওয়াশিংটনের বড় গির্জাসমূহের অন্যতম প্রধান। তিনি বলেন, মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপিগুলো কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এটি ইনজিলের গতানুগতিক অনেক ধারণাকে পালটে দিয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে একটি বর্ণনা এমন এসেছে, নিঃসন্দেহে ঈসা ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের জন্য একজন মেসিয়া। তারপর আরেকজন মেসিয়া আছেন।

---

৪৭৩. ফাজেল সালেহ সামাররায়ি : *নুবুওয়াতু মুহাম্মাদ মিনাশ শাক্কি ইলাল ইয়াকিন* : ২৮২-২৮৩।

CS CamScanner

আরামাইক ভাষায় মেসিয়া অর্থ 'রাসুল বা বার্তাবাহক'। এ কারণে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার অনুসারীদের বলেছিলেন, মানবপুত্র প্রস্থান করবেন। তারপর আসবেন 'ফারাকলিত'। তিনি তোমাদের নিকট অনেক গোপন রহস্য নিয়ে আসবেন। তিনি তোমাদের নিকট সবকিছুর ব্যাখ্যা দেবেন। তিনি আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন, যেমন আমি তাঁর ব্যাপারে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে উপমাসমূহ নিয়ে এসেছি। আর তিনি ব্যাখ্যা নিয়ে আসবেন।[৪৭৪]

অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তিনি মানবজাতিকে দেখিয়েছেন সত্যের সকল পথ। ইনজিলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত আত্মা যখন তোমাদের কাছে আসবেন, তখন তিনি তোমাদের সত্যের সকল পথ দেখাবেন। কারণ, তিনি নিজের কথা শোনাবেন না। বরং তিনি যে কথাগুলো (স্রষ্টা থেকে) শুনবেন, শুধু সেগুলোই বলবেন এবং তিনি ভবিষ্যতের অনেক বিষয় তোমাদের জানাবেন।[৪৭৫]

সাহাবিদের একটি বর্ণনা ইনজিলের এ কথাকে সত্য প্রমাণিত করে। তারা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এরপর মেম্বারে উঠে ভাষণ দিলেন। একপর্যায়ে জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। মেম্বার থেকে নেমে জোহর নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর আবার মেম্বারে উঠে ভাষণ দিলেন। একপর্যায়ে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। মেম্বার থেকে নেমে আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। অতঃপর আবার মেম্বারে উঠে ভাষণ দিলেন। একপর্যায়ে সূর্য ডুবে গেল। উক্ত ভাষণে তিনি আমাদেরকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেককিছু অবহিত করেন। আমাদের মধ্যকার অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সেই ভাষণ সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে পেরেছে।[৪৭৬]

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেছেন, তিনি

---

৪৭৪. বাইবেল : জোহন : ১৪:১৬। সফিউর রহমান মুবারকপুরি : *নাবাউন আজিম ইলা জামিয়িল বাশার* : ১/৩২৭-৩২৯।

৪৭৫. বাইবেল : জোহন : ১৬:১৩।

৪৭৬. *সহিহ মুসলিম* : ২৮৯২।

CamScanner

জগদ্‌বাসীকে ভ্রষ্টতা ও পাপাচার থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের বিশ্বাসের বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করবেন।

একইভাবে হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম অথবা (খ্রিষ্টানদের ভাষ্যমতে) যাজক জোহন পরিবর্তনের আভাস দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ইহুদিদেরকে পরিবর্তন করে এমন এক জাতিকে আনা হবে, যারা আল্লাহর পতাকা সমুন্নত করবে এবং তাঁর কালেমাকে উঁচু করবে। আরও আভাস দিয়েছেন যে, শেষ নবী হিসেবে এমন একজন রাসুলের আগমন ঘটবে, যিনি হবেন রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুসংবাদের মূল পাঠটি এমন, সেই সময় যাজক জোহন (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) আসবেন। তিনি ইহুদি সমাজে প্রচার করবেন যে, তোমরা তাওবা করো। কারণ, আসমানি রাজত্বের (KINGDOM OF HEAVEN) দিন ঘনিয়ে এসেছে। তিনি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে যিশাইয় নবী দ্বারা কথিত আছে, প্রান্তরে একজন উঁচু আওয়াজের অধিকারী ঘোষণা করবেন, তোমরা প্রতিপালকের পথে ফিরে এসো। তোমরা তাঁর পথগুলোকে সরল বানাও...। এরপর যখন তিনি দেখবেন দলে দলে ফারিসি ও সাদুকিরা খ্রিষ্টবাদের দীক্ষার জন্য আসছে, তখন তিনি তাদের বলবেন, হে সাপের বংশধর! তোমাদের কে বলল যে এর মাধ্যমে তোমরা আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে পারবে! তোমরা বরং তাওবার উপযোগী কিছু ফল তৈরি করো। আর নিজেদের অন্তরের মধ্যে এ কথা বলতে সামান্যতম চিন্তা বা দ্বিধা করো না যে, আমাদের পিতা হলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। কারণ, আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ তাআলা এই পাথর থেকেও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য সন্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখন গাছের গোড়ায় কুড়াল স্থাপন করা হয়েছে। অতএব, যে গাছ ভালো ফল দেবে না, তা কেটে ফেলা হবে ও আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আমি তোমাদের তাওবার জন্য পবিত্র পানি দ্বারা শুদ্ধি করছি। তবে আমার পরে যিনি আসবেন, তিনি আমার থেকেও শক্তিমান। আমি তার জুতা বহনেরও উপযুক্ত নই। তিনি তোমাদের শুদ্ধি করবেন পবিত্র আত্মা ও আলো দিয়ে।[৪৭৭]

হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম (খ্রিষ্টানদের মতে যাজক জোহন) চেষ্টা করেছিলেন ইহুদিদেরকে তাওবাকারী বানাতে। তাই তিনি স্পষ্ট

---

৪৭৭. *মথি* : ৩ : ১-৩, ৭-১১।

CamScanner

ভাষায় তাওবা করার এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু তাদের অবাধ্যতার কথা জানতেন এবং তাদের থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং ফল দিতে অস্বীকারকারী গাছের গোড়ায় কুড়াল স্থাপন সম্পন হয়েছে। এখন তা কেটে ফেলার অপেক্ষামাত্র। তিনি তাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অতি সত্বর তাদের ওপর আল্লাহর অবধারিত গজব ও ক্রোধ অবতীর্ণ হবে। এরপর তিনি তার ইনতেকালের পর বিকল্প গাছে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশে আসন্ন নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, তিনি হবেন তার থেকেও শক্তিমান। নিছক পানি দিয়ে শুদ্ধিকরণকে তিনি পরিহার করবেন। তিনি শুদ্ধির কাজ করবেন আত্মা এবং আলো দিয়ে। আমরা জানি, 'রুহ' (আত্মা) এবং 'নুর' (আলো) দুটোই পবিত্র কুরআনের দুটি গুণ। অর্থাৎ এর মাধ্যমে কুরআনুল কারিমকেই বোঝানো হয়েছে।

বিকল্প জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্ভবত নবুয়ত এখানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। কারণ, নবুয়ত ও রাজত্ব ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে বহাল থাকার ভাবনাকে হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম অস্বীকার করেননি। তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তারা (ইহুদিরা) ছাড়াও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আরও বংশধর রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নবুয়ত তাঁর বংশধরদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে, এর দ্বারা তারা যেন ধোঁকায় পতিত না হয়। এর মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, বিকল্প জাতি হবে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশের ভিন্ন শাখা। কারণ, হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের কথা প্রমাণ করে, অচিরেই আল্লাহ তাআলা ইহুদিরা ছাড়া ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অন্য সন্তানদের (নবুয়তের জন্য) বের করবেন। এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরদের দ্বারা। অতঃপর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বংশে আগমন করেন।[৪৭৮]

---

৪৭৮. নাসরুল্লাহ আবদুর রহমান আবু তালিব : *তাবাশিরুল ইনজিলি ওয়াত-তাওরাতি বিল ইসলামি ওয়া-রাসূলিহি মুহাম্মাদ* : ৩২৭।

CamScanner

এমন আরও বহু ভবিষ্যদ্‌বাণীতে ভরে আছে ইনজিল, যেগুলো অকাট্যভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রমাণ বহন করে। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইনজিলে বর্ণিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও তাঁর সত্যতা সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের যে বক্তব্যগুলো এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।

এই অনুচ্ছেদে আমরা পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ তথা তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদিতে বর্ণিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে কিছু প্রমাণ ও ভবিষ্যদ্‌বাণী উল্লেখ করেছি। অনুচ্ছেদের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা এমন একটা বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, যা এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর শুদ্ধতাকে আরও জোরদার করবে ইনশাআল্লাহ।

ফ্রা মেরিনো (Fra Marino) নামে জনৈক লাতিন যাজক ইতালীয় ভাষায় লিখিত ইনজিলের একটি কপি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, তিনি ইরেনিয়াসের কিছু পুস্তিকা অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখলেন, একটি পুস্তিকায় সাধু 'বার্নবা'-র ইনজিলের ওপর ভিত্তি করে সাধু পলের নিন্দা করা হয়েছে। এ থেকে যাজক ফ্রা মেরিনো সাধু বার্নবার এই ইনজিল সম্পর্কে অনুসন্ধানে মনোযোগী হন। এ ব্যাপারে পোপদের সদর দফতরে তার কাজের অবস্থান তাকে সহায়তা করে। ফলে এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পোপ সিক্সটাস পঞ্চম (১৫৮৫-১৫৯০ খ্রি.)-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এই সুযোগে তিনি পোপদের গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সেখানে অনুসন্ধানের পর তার সেই কাঙ্ক্ষিত বার্নবার ইনজিল[৪৭৯] বা 'গস্পেল অব বারনাবাস'-এর কপি খুঁজে পান। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর তার সুদৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়। অবশেষে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪৮০]

* * *

---

৪৭৯. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও সুসংবাদ সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন, *ইনজিলু বারনাবা দিরাসাতুন হাওলা ওয়াহদাতিদ-দ্বীন ইনদা মুসা ওয়া-ঈসা ওয়-মুহাম্মাদ*। নিরীক্ষণ : সাইফুল্লাহ আহমদ ফাযেল।

৪৮০. মুহাম্মাদ আবু যাহরা : *মুহাজারাতুন ফিন-নাসরানিয়া* : ৫৬।

CS CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্যসমূহ

আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনিই হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

(হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। [সুরা আহজাব : ৪০]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবুও যারা যৌক্তিক প্রমাণে বিশ্বাসী, তাদের জন্য অন্য কিছু সাক্ষ্য এখানে উপস্থাপন করেছি। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসবাসকারী সম্মানিত সাহাবিগণ, পুণ্যবতী স্ত্রীগণ; এমনকি তাঁর ঘোরতর শত্রুদের সাক্ষ্যও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিমাবিশ্বের বিবেকবান পণ্ডিতদের মধ্যে যারা সত্যান্বেষী হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পাঠ করেছেন, অথবা অন্যের থেকে শুনেছেন এবং যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মনোবল, নির্মল স্বভাব, পবিত্র হৃদয়, মহৎ চরিত্র ও অনন্য বুদ্ধিমত্তার কথা স্বীকার করেছেন, পরিশেষে তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এইসব সাক্ষ্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের সত্যতা ও তাঁর রিসালাতের মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে।

CamScanner

আমরা নিচের শিরোনামগুলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন সাক্ষ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অনুচ্ছেদ
আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
সাহাবিগণের সাক্ষ্য

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাক্ষ্য

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
সামসময়িক অমুসলিমদের সাক্ষ্য

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
সুবিবেচক পশ্চিমাদের সাক্ষ্য

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ
বাস্তবতার সাক্ষ্য

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর বহু দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তবে তাঁর সত্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার যে সাক্ষ্য বিদ্যমান, সেটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে মানবজাতির নিকট যা বলেছেন, তা সত্যই বলেছেন।

এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কখনোই সাহায্য করতে পারেন না। অথচ আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু সাহায্যই করেননি, বরং বহু সুস্পষ্ট অলৌকিক মুজিজা দিয়ে তাঁকে সুদৃঢ় করেছেন।

আরেকটি মৌলিক কারণ হলো, কুরআনুল কারিমের বাস্তব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া এটিই জগতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে এখনো টিকে আছে। যেখানে ইসলামের আগমন ঘটেছে সেখানেই যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটাকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় মুখস্থ করে কিংবা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই বিষয়টি কুরআনুল কারিমকে দিয়েছে এমন এক অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, যা জগতের আর কোনো ঐতিহাসিক দলিলপত্রের ক্ষেত্রে কখনো ঘটেনি।

এখন, আমরা সেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দিকে লক্ষ করে দেখি। সেখানে আল্লাহ তাআলা বহু আয়াতে বিভিন্নভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾

মুহাম্মাদ একজন রাসুল। (আর তিনিই প্রথম এমন নয়) তাঁর পূর্বে গত হয়েছেন আরও বহু রাসুল। [সুরা আলে ইমরান : ১৪৪]

CamScanner

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সকল মানুষের জন্যে রাসুল বানিয়ে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। [সুরা নিসা ৭৯]

ইমাম তাবারি রহ. এই আয়াতের টীকায় বলেন,

﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আপনাকে আমি এবং আমার সৃষ্টিকুলের মাঝে একজন বার্তাবাহক নির্ধারণ করলাম। আমি আপনাকে যে রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করেছি, তা তাদের কাছে পৌছে দেবেন। যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে, তাদের নিকট তা পৌছে দেওয়াই আপনার দায়িত্ব। তারা যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেটা তাদেরই ক্ষতি। আর আপনার ও তাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আপনি যে রিসালাত ও ওহি পৌছাতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা আপনি পৌছালেন কি না এবং আপনি যাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, তারা তা গ্রহণ করল কি না এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। কারণ, তাঁর নিকট আপনার ও তাদের সকলের অবস্থা সুস্পষ্ট। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আপনাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করবেন। আর তাদের ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদানও তিনি তাদের দেবেন। ভালোর জন্য রয়েছে ভালো আর মন্দের জন্যে মন্দ প্রতিদান।[৪৮১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

---

[৪৮১]. ইমাম তাবারি : *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন* : ৮/৫৬১।

আর (আমি পাঠিয়েছি) এমন অনেক রাসুল, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে ইতিপূর্বে শুনিয়েছি এবং এমন অনেক রাসুল, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ তাআলা মুসার সঙ্গে কথা বলেছেন। (আমি পাঠিয়েছি) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসুলদের, যাতে রাসুলদের আগমনের পর আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

কিন্তু আল্লাহ ওই কিতাব সম্বন্ধে, যা তিনি আপনার প্রতি নাজিল করেছেন, সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা নাজিল করেছেন স্বীয় জ্ঞানের সাথে এবং ফিরেশতাগণও এ সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তবে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। [সুরা নিসা : ১৬৪-১৬৬]

সাইয়েদ কুতুব শহিদ রহ. এই আয়াতগুলোর টীকায় বলেন, আহলে কিতাবরা এই সর্বশেষ রিসালাতকে (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত) অস্বীকার করল। আর আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতি হলো, বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তিনি নবী ও রাসুলদের প্রেরণ করেন। 'তারা ভালো কাজের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করেন, যাতে রাসুলদের আগমনের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোনো অভিযোগ না থাকে।' [সুরা নিসা: ১৬৫]

অথচ আহলে কিতাবরা পূর্ববর্তী নবীদেরকে স্বীকার করে। যেমন ইহুদিরা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী সকল নবীকে নবী হিসেবে স্বীকার করে। আর খ্রিষ্টানরাও সে সকল নবী এবং হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বীকার করে। সুতরাং হে মুহাম্মাদ, আহলে কিতাবরা যখন আপনার রিসালাতকে অস্বীকার করছে, তখন তাদের অস্বীকৃতির কারণে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। তারা অস্বীকার করুক! 'আল্লাহ তাআলা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি আপনার নিকট যে বার্তা প্রেরণ করেছেন, তা তিনি জেনেবুঝেই আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আর এ ব্যাপারে ফিরেশতাগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তবে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।' [সুরা নিসা : ১৬৬] আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সাক্ষ্য, এরপর ফিরেশতাদের সাক্ষ্য, যাদের মধ্যে ওহিবাহক ফিরেশতাও (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) রয়েছেন, আহলে কিতাবদের সকল কথাকে নাকচ করে দেয়। আর তাদের কথায় কী-ই বা আসে যায়,

CamScanner

এখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আপনার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন! সাক্ষ্য দিচ্ছেন ফেরেশতাগণও! এ ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট!

বস্তুত, আল্লাহ তাআলার এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও তাদের দেওয়া কষ্টের জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে।[৪৮২]

যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি এক আশ্চর্যজনক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾

কাফেররা বলে আপনি রাসুল নন। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। [সুরা রাদ : ৪৩]

মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নবীর সত্যতার ওপর এই সাক্ষ্যের প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আশুর রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আল্লাহ তাআলা তার দাবিকে কখনোই সত্যায়ন করেন না এবং তার লক্ষ্য ও কার্যক্রম কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে না। এটা আকায়েদ শাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্যের সমার্থক।

তারা বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আপন রীতি পরিবর্তন করার অর্থ হলো, আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যা কিছু বলেছে, সত্য বলেছে।[৪৮৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদানকারী আয়াতের সংখ্যা অনেক। বললে অত্যুক্তি হবে না, আসলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআনুল কারিমের প্রতিটি আয়াতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

---

৪৮২. সাইয়েদ কুতুব : *ফি জিলালিল কুরআন* : ২/২৯১।

৪৮৩. ইবনে আশুর : *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির* : ২৫/২১।

সুন্দর হয়, আমরা যদি এ অধ্যায়টি আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে শেষ করি! আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾

বলুন, (কোনো বিষয়ে) সাক্ষ্য দানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? বলুন, আল্লাহ! (এবং তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।

[সুরা আনআম : ১৯]

অর্থাৎ এই জগতে সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতায় কোন সাক্ষ্যদাতা সবচেয়ে বড়? কোন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য সকল সাক্ষ্যের উর্ধ্বে? কার সাক্ষ্যটি বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে যার সাক্ষ্যের পর আর কোনো সাক্ষ্য নেই?

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন প্রশ্ন করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, একইভাবে তাঁকে উত্তর প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কারণ, সম্বোধিত ব্যক্তিগণ জানেন, তাঁর উত্তর প্রদান ছাড়া অন্য কারও উত্তর প্রদানের ক্ষমতা নেই এবং বাস্তবেও তাঁর উত্তর ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারও উত্তর চলে না।

অবশেষে তাই আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন, ﴿قُلِ اللَّهُ﴾–আপনি বলে দিন, তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই হলেন সবচেয়ে বড় সাক্ষ্যদাতা। তিনিই সত্য বর্ণনা করেন। তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী। তাঁর সাক্ষ্যের পর আর কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর কথার পরে আর কারও কথা চলে না। তিনি যখন কিছু বলেন, তখন সকল কথার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।[৬৮৪]

---

৬৮৪. সাইয়েদ কুতুব : *ফি জিলালিল কুরআন* : ২/৪৯৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সাহাবিগণের সাক্ষ্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হলেন সে সকল ব্যক্তি, যারা তাঁর দাওয়াতকে সত্যায়ন করেছেন, তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাঁকে দেখেছেন এবং দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করেছেন, শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই। সুতরাং অনিবার্যভাবেই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি খারাপ স্বভাবের হতেন, অভ্যন্তরীণভাবে মন্দ হতেন, তাহলে তারাই প্রথম তাঁর থেকে দূরে সরে যেতেন, তাঁকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু ব্যাপারটি হয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি বিদায় হজের দিন উপস্থিত সাহাবার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক লক্ষ কিংবা তারও বেশি।

কাছের কিংবা দূরের সকল সাহাবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন হজরত আনাস বিন মালেক রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ সান্নিধ্য অর্জনের সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। যেমন ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, বাজারে, মসজিদে এবং লড়াইয়ের ময়দানে, সবখানে। হজরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন,

«خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ؟»

আমি দশ বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। এর মাঝে তিনি কখনো আমার কোনো কথা-কাজে 'উফ' বলেননি। কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে অথবা এ কাজটি কেন করলে না![৪৮৫]

---

৪৮৫. *সহিহ বুখারি* : ৫৬৯১, *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৯।

চারিত্রিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এটা এক অনন্যসাধারণ উপমা। সীমাহীন সৌন্দর্যমণ্ডিত এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। 'দশটি বছর' সামান্য বা সংক্ষিপ্ত কোনো সময় নয়। অথচ কী আশ্চর্যের বিষয়, এত দীর্ঘ সময়েও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে আনাস রা.-এর ব্যাপারে কখনো সামান্যতম ভর্ৎসনা বা তিরস্কার বের হয়নি। যদি এমন কিছু হতোই, তাহলে অবশ্যই আনাস রা. তা বলতেন। জীবদ্দশায় না বললেও অন্তত তাঁর ইনতেকালের পর বলতেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু বলেননি।

সকল সাহাবিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের সীমাহীন ভালোবাসার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এই ভালোবাসা ও প্রীতির উৎস ছিল তাঁর রিসালাতের প্রতি তাদের সত্যায়ন ও তাঁর সঙ্গে বাস্তব জীবনে দীর্ঘদিনের ওঠাবসা। নবীজির প্রতি সাহাবিদের গভীরতম ভালোবাসার একটি নমুনা পাওয়া যায় জায়েদ ইবনে দাসিনা রা.-এর ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ছিল এমন :

একবার বনু হুজাইলের কয়েকজন লোক যায়েদ ইবনে দাসিনা রা.-কে বন্দি করে দাস হিসেবে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কুরাইশির নিকট বিক্রি করে দেয়। সফওয়ানের পিতা উমাইয়াকে মুসলমানগণ বদরযুদ্ধে হত্যা করেছিলেন, এ কারণে সে যায়েদ বিন দাসিনাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। সুতরাং মক্কার কাফেররা তাকে হত্যা করার জন্য হারামে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু সাহাবি যায়েদ ইবনে দাসিনা রা. এই অবস্থাতেও ছিলেন শান্ত ও নির্ভয়, শাহাদাতের প্রতি তুলনাহীন আগ্রহী। আবু সুফিয়ান রা. (তখনও তিনি মুসলমান হননি) তাকে বললেন, তুমি কি এটা চাও যে, তোমার স্থানে এখন মুহাম্মাদ থাকুক, আমরা তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিই আর এর বদলে তুমি তোমার পরিবারে নিরাপদে অবস্থান করবে?

উত্তরে যায়েদ রা. বললেন, আল্লাহর কসম! (তোমরা যা বললে, সেটা তো বহু দূরের কথা) আমি তো এটাও পছন্দ করি না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন যেখানে আছেন, সেখানে থাকাবস্থায়

CS CamScanner

তাঁর গায়ে কোনো কষ্টদায়ক কাঁটা ফুটবে আর আমি আমার পরিবারে অবস্থান করব![৪৮৬]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যায়েদ রা. তখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। জীবনের এই অন্তিম মুহূর্ত সত্যকথনের আসল মুহূর্ত। এ মুহূর্তে মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না। এ সময় মানুষ সেই চূড়ান্ত সত্যটাই বলে, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই।

এই ঘটনা পূর্ণ আস্থার সাথে এ কথাই প্রমাণ করে যে, সাহাবিদের মনমস্তিষ্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্য নবী হিসেবেই বিদ্যমান ছিলেন। বিষয়টি যদি এমন না হতো, তিনি যদি নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার হতেন, তাহলে কিছুতেই যায়েদ রা.-সহ সকল সাহাবি একজন ভণ্ড মিথ্যুক ব্যক্তির জন্য এভাবে জানমাল উৎসর্গ করতেন না।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য যারা দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম হলেন, হজরত সালমান ফারসি রা.। তিনি দীর্ঘকাল একজন সত্যনবীর অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন, যার বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন সম্পর্কে জেনেছিলেন আমুরিয়ার এক খ্রিষ্টান পাদরি থেকে। আমুরিয়ার পাদরির নিকট সালমান ফারসি রা. আরেকজন পাদরির সন্ধান চান, যিনি নির্জনে গির্জায় বসে প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল থাকেন। হজরত সালমান ফারসি রা. তার হেদায়েতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন :

আমুরিয়ার পাদরি আমাকে বললেন, হে বৎস, তুমি এমন একজন নবীর সময় পাবে, যিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাব হবে আরবে। তিনি হিজরত করে এমন এক ভূমিতে যাবেন, যা হবে দুই পাথুরে ভূমির মাঝখানে, খেজুরবৃক্ষ-বেষ্টিত। তাকে চেনার স্পষ্ট কিছু নিদর্শন রয়েছে। যেমন তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন; তবে সাদকাহ (দান) গ্রহণ করবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে 'মোহরে নবুয়ত' থাকবে। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পারো, তাহলে চলে যাও।'

---

৪৮৬. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/১৭২, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১২৮।

CamScanner

সালমান রা. বলেন, এরপর সেই পাদরি মারা গেলেন এবং তাকে দাফন করা হলো। তার মৃত্যুবরণের পর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আরও কিছুদিন আমি আমুরিয়াতে অবস্থান করলাম। একদিন কালব গোত্রের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। আমি তাদের বললাম, তোমরা কি আমাকে আরবদেশে নিয়ে যাবে, বিনিময়ে তোমাদের আমি আমার এই গরুর পাল ও আমার এই সকল সম্পদ প্রদান করব। তারা রাজি হয়ে গেল। আর আমিও (চুক্তি অনুযায়ী আমার) গরুর পাল ও সম্পদ তাদের দিয়ে দিলাম। তারা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে নিলো। আমাকে নিয়ে তারা যখন ওয়াদিউল কুরাতে পৌঁছাল, তখন আমার সাথে তারা জুলুম করল। তারা আমাকে এক ইহুদির কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিলো।

এরপর থেকে আমি সেই ইহুদির কাছে থাকতে শুরু করি এবং তার খেজুরবাগান দেখাশুনা করতে থাকি। আমার মনে হতে লাগল যে, এটাই হয়তো সেই দেশ, যার কথা পাদরি আমাকে বলেছেন। তবে অন্তরে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা আসছিল না। আমি তার অধীনে থাকা অবস্থায় একদিন বনু কুরায়জা গোত্র থেকে তার এক চাচাতো ভাই এলো। ইহুদি লোকটি তার কাছে আমাকে বিক্রয় করে দিলো। তখন সে আমাকে মদিনায় নিয়ে চলে এলো। খোদার কসম! মদিনার পরিবেশ দেখামাত্র আমুরিয়ার পাদরির দেওয়া বিবরণের আলোকে আমি তা চিনে ফেললাম!

আমি সেখানে সেই ইহুদির নিকট অবস্থান করতে লাগলাম। এদিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে নবুয়ত দান করলেন। তিনি দীর্ঘ একটা সময় মক্কায় অবস্থান করলেন। কিন্তু আমি আমার গোলামি বা দাসত্বের বন্ধনের কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো খবরই শুনতে পেলাম না। ইতিমধ্যে তিনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় চলে এলেন। আল্লাহর কসম! আমি একদিন আমার মুনিবের এক খেজুরগাছের মাথায় চড়ে কাজ করছিলাম। আর আমার মুনিব নিচে বসে ছিল। এ সময় তার এক চাচাতো ভাই এদিকে এসে তার কাছে দাঁড়াল। অতঃপর তাকে লক্ষ করে বলল, আল্লাহ বনু কায়লাকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর কসম! তারা এখন কুবাতে এক লোকের কাছে সমবেত হয়েছে। যে আজ মক্কা থেকে এসেছে। তারা দাবি করছে সে নাকি একজন নবী!

সালমান রা. বলেন, তার এই কথা শোনার সাথে সাথে উত্তেজনায় আমার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল, উত্তেজনার আতিশয্যে খেজুরগাছ থেকে আমি হয়তো আমার মুনিবের গায়ের ওপর পড়ে যাব!

সালমান রা. বলেন, এরপর আমি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এলাম। এবং তার সেই চাচাতো ভাইকে বলতে লাগলাম, আপনি কী বলছেন? আপনি কী বলছেন?

আমার মুনিব আমার কাণ্ড দেখে রেগে গিয়ে আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারল। এরপর আমাকে বলল, এর সাথে তোর কী সম্পর্ক! তুই তোর কাজ কর গিয়ে!

আমি বললাম, না, কিছু না। আমি শুধু তাঁর কথা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম।

আমার কাছে কিছু খাদ্য ছিল যা আমি জমিয়েছিলাম। এরপর সন্ধ্যার সময় আমি এগুলো নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে চলে গেলাম। তিনি তখন কুবাতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমি শুনেছি আপনি একজন সৎ মানুষ। আপনার সঙ্গে আপনার অনেক সঙ্গীসাথি রয়েছে, যাদের অনেকেই দরিদ্র, নিশ্চয় তাদের খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। সদকার জন্য আমার কাছে এই সামান্য কিছু খাদ্য রাখা ছিল। এই খাদ্যের ব্যাপারে আমি আপনাদের অধিক হকদার মনে করছি।

সালমান রা. বলেন, এ কথা বলে আমি খাদ্যগুলো নবীজির সামনে উপস্থিত করলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা এগুলো খেয়ে নাও। কিন্তু তিনি নিজের হাত গুটিয়ে রাখলেন, কিছু মুখে দিলেন না। সালমান রা. বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, হ্যাঁ... একটি আলামত পাওয়া গেল।

সালমান ফারসি রা. বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। আরও কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা থেকে মদিনায় চলে গেলেন। খাদ্যগুলো নিয়ে আমি আবার নবীজির দরবারে হাজির হলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম, আমি দেখেছি, আপনি সদকা গ্রহণ করেন না। তাই আপনার জন্যে এই

CS CamScanner

সামান্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি। সম্মানের সাথে আপনার সামনে তা পেশ করছি।

সালমান রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়াটি গ্রহণ করে তা থেকে খেলেন। এরপর সাহাবিদেরকেও খেতে বললেন। তারাও তাঁর সঙ্গে সেগুলো খেলেন।

আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ.. এই তো দুটি আলামত পাওয়া গেল।

এরপর আমি আরেকদিন নবীজির নিকট গেলাম। তিনি তখন বাকিউল গরকাদে (বর্তমানে যেটা জান্নাতুল বাকি নামে পরিচিত) অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর এক সাহাবির জানাজায় এসেছিলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল চাদরজাতীয় ঢিলেঢালা দুটি বস্ত্র। তিনি তাঁর সাহাবিদের মাঝে বসে ছিলেন। আমি গিয়ে প্রথমে তাঁকে সালাম দিলাম। এরপর আমি পাদরির বর্ণিত 'মোহরে নবুয়ত' দেখার জন্য তাঁর পিছন দিকে গেলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পেছনে যেতে দেখে বুঝে ফেললেন, আমি হয়তো এমন কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি, যার বিবরণ আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে তিনি নিজেই তাঁর পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। তখন আমি তাঁর পিঠে মোহরে নবুয়ত দেখে তা চিনে ফেললাম। তৎক্ষণাৎ আমি যেন মোহরে নবুয়তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সেটাকে চুম্বন করলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমার কান্না এসে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, সামনের দিকে এসো। আমি ঘুরে তাঁর সামনে বসলাম এবং আমার ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম...।[৬৮৭]

হজরত সালমান ফারসি রা.-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, হজরত সালমান রা.-এর ইসলামগ্রহণের পর থেকে হিজরি পঁয়ত্রিশতম বছরে ইনতেকালের আগ পর্যন্ত ইসলামের ওপর তার অটল থাকা, ইসলামের জন্য জিহাদ করা, ইসলামের প্রচারে জীবন বাজি রাখা এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কোনো মিথ্যা নবুয়তের

---

৬৮৭. মুসনাদে আহমাদ : ২৩৭৮৮, ইবনে হিশাম : আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ১/২২০, ২২১।

দাবিদার ছিলেন না কিংবা আনীত ধর্মের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী ছিলেন না। কারণ, সালমান ফারসি রা. যদি এর বিপরীত কিছু দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আবার সেই সর্বশেষ নবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন যার খোঁজে তিনি বহু বছর আগেই ঘর ছেড়েছেন। এটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাজ। কিন্তু আমরা জানি, এমনটি হয়নি। কারণ তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবেই পেয়েছিলেন। এমনকি তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী।

এ বিষয়টি আরও সুদৃঢ় হয়ে যায় ইহুদি পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.[৪৮৮]-এর ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে। তিনি নিজের ইসলামগ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন :

আমি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনলাম, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি, তাঁর নাম, দেহাবয়ব এবং তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সময়, আমরা যার আশা ও অপেক্ষায় ছিলাম, কারণ আমি তাঁর সম্পর্কে জানতাম, যা গোপন রেখেছিলাম এবং নীরব ছিলাম। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় এলেন। যখন তিনি কুবায় বনু আমর বিন আউফে অবস্থান গ্রহণ করলেন, এক ব্যক্তি এসে আমাকে তাঁর আগমনের সংবাদ দিলো। আমি তখন এক খেজুর গাছে কিছু কাজ করছিলাম। নিচে আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস বসে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ শুনে আমি তাকবির দিয়ে উঠলাম। তাকবিরের আওয়াজ শুনে আমার ফুফু বললেন, তুমি যদি মুসা ইবনে ইমরান আ.-এর আগমনের সংবাদ শুনতে, তাহলেও হয়তো এর থেকে বেশি জোরে আওয়াজ করতে না।

আমি আমার খালাকে বললাম, খালা! তিনি মুসা ইবনে ইমরানেরই ভাই। মুসা ইবনে ইমরানকে যে ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁকেও সেই একই ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

---

৪৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। তিনি হলেন আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইবনুল হারেস ইসরাইলি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের সময় তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। আগে তার নাম ছিল 'الحصين'। ইসলামগ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ'। তিনি ৪৩ হি./ ৬৬৩ খ্রি. মদিনায় ইনতেকাল করেন। দেখুন, ইবনে আবদুল বার : *আল-ইসতিআব* : ৩/৯২১।

CamScanner

খালা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিই কি সেই নবী, যার সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হতো কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে তাঁকে পাঠানো হবে?

আমি বললাম, জি, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে তা সংঘটিত হয়েই গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি তখনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলাম। স্পষ্টভাবে তাঁর চেহারা মোবারক দেখার সাথে সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল, এটা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমি আপনাকে এমন কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব, যেগুলোর উত্তর কেবল একজন নবীই দিতে পারেন, (বিষয়গুলো হলো) কিয়ামতের প্রথম আলামত কোনটি? জান্নাতিদের প্রথম খাবার কী হবে? সন্তান কখনো পিতার আকৃতিতে হয়, কখনো হয় মায়ের আকৃতিতে, এর কারণ কী? আর চন্দ্রের মধ্যে যে কালো অংশ দেখা যায়, সেটা মূলত কী জিনিস?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বেই জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে এগুলো সম্পর্কে জানিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, জিবরাইল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, সে তো ফেরেশতাদের মধ্য থেকে ইহুদিদের শত্রু! তখন তিনি কুরআনুল কারিম থেকে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

(হে নবী) বলে দিন, কোনো ব্যক্তি যদি জিবরাইলের শত্রু হয়, তবে (হোক না!) সে তো আল্লাহর অনুমতিক্রমে এ কালাম আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং যা ঈমানদারদের জন্য সাক্ষাৎ হেদায়েত ও সুসংবাদ। [সুরা বাকারা : ৯৭]

CamScanner

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত হবে একটি আগুন, যা মানুষের সামনে পূর্ব দিক থেকে বের হবে এবং তাদেরকে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে।

আর জান্নাতিরা প্রথম যে খাবার খাবে সেটা হলো, মাছের কলিজা ।

আর সন্তানের ব্যাপারটা হলো, যখন পুরুষের পানি নারীর পানি থেকে অগ্রবর্তী হয়, তখন সন্তান পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। আর যখন নারীর পানি পুরুষের পানি থেকে অগ্রবর্তী হয়, তখন সন্তান নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

আর চন্দ্রের কালো অংশের মূল রহস্য হলো, প্রথমে আলোকময় সূর্য ছিল দুটি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾

> আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। এরপর রাতের নিদর্শনকে মুছে (নিষ্প্রভ করে) দিয়েছি। [সুরা ইসরা : ১২]

অতএব, যে কালিমা বা কৃষ্ণতা তুমি দেখতে পাও, তা হলো সেই নিষ্প্রভ অংশ।

উত্তরগুলো শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই আর আপনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম পরিবারের নিকট ফিরে গেলেন। তাদেরকেও ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ফলে তারাও ইসলামগ্রহণ করল। তবে তিনি গোত্রের অন্যদের থেকে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখলেন। এরপর আবার তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ইহুদিরা জানে, আমি তাদের সর্দার এবং তাদের সর্দারের ছেলে। আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং তাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। ইহুদিরা বড় অপবাদ দানকারী জাতি। আপনি তাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই যদি তারা আমার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তারা আমার ওপর বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। আমার ব্যাপারে তারা এমন কিছু বলবে, যা আমার মধ্যে নেই। তাই

আমি চাচ্ছি, আপনি আমাকে একটি কামরায় লুকিয়ে রেখে তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-কে একটি কামরায় লুকিয়ে রেখে ইহুদিদের খবর পাঠালেন। ইহুদিরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কসম সেই আল্লাহর, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই! অবশ্যই তোমরা জানো, আমি আল্লাহ তাআলার একজন সত্য নবী। আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি সত্য ধর্ম নিয়ে। অতএব, তোমরা ইসলামগ্রহণ করে নাও।

ইহুদিরা তখন বলল, না। আমরা এমনটি জানি না।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন ব্যক্তি?

তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান। সে আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারপুত্র। সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যদি ইসলামগ্রহণ করে, তাহলে তোমরা তাঁর ব্যাপারে কী বলবে?

ইহুদিরা বলল, আল্লাহ তাআলা তাকে এ ধরনের কাজ থেকে হেফাজত করুন!

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, বাইরে এসো!

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বের হয়ে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর আনীত ধর্মকে কবুল করে নাও। আল্লাহ তাআলার কসম! তোমরা জানো যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সত্য নবী। তোমরা তাওরাতে তাঁর কথা লিখিত পেয়েছ। পেয়েছ তাঁর নাম ও গুণাবলির কথাও। আমি আবারও সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর ওপর ঈমান আনছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করছি। আমি তাঁকে চিনতে পারছি।

CS CamScanner

এ সময় ইহুদিরা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান। এভাবেই তখন ইহুদিরা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর বিভিন্ন দুর্নাম করতে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এমনটাই আশঙ্কা করছিলাম। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, এরা হলো ভীষণ অপবাদ আরোপকারী জাতি। মিথ্যা, প্রতারণা ও সকল ধরনের অপকর্মই এদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, এরপর আমি ও আমার পরিবার আমাদের ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ করে দিলাম। আমাদের সাথে আমার ফুফুও ইসলামগ্রহণ করেন। খুবই সুন্দর ছিল তার ইসলামগ্রহণ।[৪৮৯]

এইসব সাক্ষ্য শুধু যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হয়েছিল এমন নয়, বরং তাঁর ইনতেকালের পরও বহু সাক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই যেমন আমর ইবনুল আস রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তাঁর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমার কাছে কোনো ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় ছিল না। আমার দৃষ্টিতে তাঁর থেকে অধিক সম্মানিতও কেউ ছিল না। অধিক সম্মান ও প্রভাবের কারণে আমি তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস করতাম না। আমার কাছে যদি তাঁর আকৃতির বিবরণ চাওয়া হয়, তাহলে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, আমি কখনোই তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাতে সক্ষম হইনি।[৪৯০]

এই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর সাহাবিদের গভীর ভালোবাসা, তাঁর দাওয়াতের ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর রিসালাতের সত্যায়ন সম্পর্কে কিছু সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত। এগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্য নবী। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বমানবতাকে সত্য পথের দিশা দিতে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে।

---

৪৮৯. বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* : ২/৫২৯-৫৩১, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ*: ২/৩৭৯, ৩৮০।

৪৯০. আবুল ফজল সাইয়েদ আবুল মাআতি নুরি : *আল মুসনাদুল জামে* : ৩২/৪৯৮।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাক্ষ্য

জানা কথা, একজন স্ত্রীই তার স্বামীর সবচেয়ে নিকটতম। স্বামীর গোপন বিষয় প্রকাশ হওয়ার আগেই স্ত্রী তা জেনে থাকে। প্রকৃত স্বভাবচরিত্র থাকে তার নখদর্পণে। তার সামনে কৃত্রিমতার আবরণ থাকে না। এগুলো অবগতির জন্য যেখানে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট, সেখানে যদি স্ত্রীর সংখ্যা একাধারে নয়জন হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে আমাদের ধারণা কেমন হতে পারে? এটা কি ভাবা যায় যে, নয় নয়জন সতিন থাকবে আর তারা সৌন্দর্য নিয়ে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও আত্মমর্যাদাবোধে আক্রান্ত হবে না! স্বামীর জীবদ্দশায় কিংবা তার মৃত্যুর পরে?

সাধারণ বিবেচনা থেকেই বলা যায়, এটা হতেই পারে না। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই এতজনের মধ্যে কেউ তাদের স্বামীকে ভালোবাসবে, আর কেউ অপছন্দ করবে, তাদের সাথে তার আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়ার কারণে। অথবা তাঁদের কাউকে কাছে টানা আর অন্যদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও কি এমন ঘটেছিল?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাঝে এ ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং স্ত্রীদের সকলেই নবীজির নৈকট্য অর্জনে প্রতিযোগিতা করতেন। সকল স্ত্রীই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতেকালের পরেও। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেউ ছিলেন বৃদ্ধা, বয়স্কা। কেউ ছিলেন বয়সে ছোট, কিছুটা জেদি। কেউ ছিলেন অতি আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারিণী। আবার কেউ কেউ অতি দ্রুত রেগে যেতেন। কিন্তু তারা সকলেই একটি ব্যাপারে ছিলেন এক এবং অভিন্ন। আর সেটা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী ছিলেন সাইয়েদা খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.। নবীজির সাথে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর সংসার করেছেন। এই সময়ে তাঁর মাঝে ভালো ছাড়া মন্দ কোনো বিষয়

CS CamScanner

দেখতে পাননি। নবীজির ওপর প্রথমবার ওহি নাজিল হলে তিনি যখন ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন, তখন হজরত খাদিজা রা. নবীজির অস্থিরতা কাটানোর জন্যে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তা রক্ষা করেন। অন্যের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বকে উপার্জন করে দেন। মেহমানকে যথাযথ আপ্যায়ন করেন। সত্যপথের বিপর্যস্ত মানুষকে সাহায্য করেন...।'(৪৯১)

সাইয়েদা খাদিজা রা.-এর এই সান্ত্বনা নিছক মুখের কথা ছিল না। বরং এটা ছিল প্রকৃত বাস্তবতা। এ গুণাবলি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবজাত। হজরত খাদিজা রা. দীর্ঘদিন যেগুলো তার মধ্যে দেখে এসেছেন। এর মাধ্যমেই প্রকাশ পায়, বাড়িতে খাদিজা রা.-এর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ যেমন সুন্দর ও অমায়িক ছিল, বাইরেও ঠিক তেমনই ছিল। এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। তাঁর এই সুন্দর আচরণই সাইয়েদা খাদিজা রা.-কে নবীজির সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের সাক্ষ্য দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী ছিলেন হজরত আয়েশা রা.। তিনিও নবীজির উত্তম আখলাক-চরিত্র এবং সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। অন্যদের চেয়ে তিনিই ছিলেন তাঁর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ও অবগত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার অনেক মূল্যায়নও করতেন। এমনকি নবীজি ইনতেকাল করেছেন তার ঘরে, তার কোলে মাথা রেখে। সেই আয়েশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্রের ক্ষেত্রে বলেছেন,

«فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»

কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র।(৪৯২)

---

৪৯১. *সহিহ বুখারি : ৪, ৪৯৫৪, সহিহ মুসলিম : ১৬০।*

৪৯২. *সহিহ মুসলিম : ৭৪৬, সুনানে আবু দাউদ : ১৩৪২, সুনানে নাসায়ি : ১৬০১, মুসনাদে আহমাদ : ২৪৩১৪।*

এ বিষয়ে সিরাত গ্রন্থাবলিতে অনেক ঘটনা রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে উম্মাহাতুল মুমিনিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী পরিমাণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন তার নমুনা পাওয়া যায়। তেমনই একটি ঘটনা হলো উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান রা.-এর। ঘটনাটি ঘটেছিল তার পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের সাথে। আবু সুফিয়ান ছিলেন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তাদের বড় নেতা। তখনও তিনি কাফের ছিলেন, ইসলামগ্রহণ করেননি।

কুরাইশরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ায় কৃত চুক্তি ভেঙে ফেলল এবং বনু খুজাআর ওপর আক্রমণ করে তাদের অনেককে হত্যা করল, কাউকে বন্দি করে দাস বানালো, তখন তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এর প্রতিশোধের আশঙ্কা করল। তাই তারা দ্রুত আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠালো, যাতে তিনি উভয় দলের মাঝে চুক্তি নবায়ন করেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি নবায়নের আবেদন নাকচ করে দিলেন এবং মক্কা বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প করলেন। অবশ্য এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ওই আলাপচারিতা, যা পিতা ও কন্যার মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। আবু সুফিয়ান যখন চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে মদিনায় এলেন, তখন তিনি দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আপন কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। বিচ্ছেদের পর কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর। নিজের দ্বীন সংরক্ষণের জন্য উম্মে হাবিবা রা.-এর হাবশায় হিজরত করা থেকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত ছিল এ দীর্ঘ সময়। আবু সুফিয়ান আপন কন্যা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবিবা রা.-এর কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসতে গেলেন, সাথে সাথে উম্মে হাবিবা রা. সেটা গুটিয়ে নিলেন। এটা দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, হে আমার প্রিয় মেয়ে! আমি বুঝতে পারছি না, (তুমি যে চাদরটি গুটিয়ে নিলে,) তুমি কি চাদরকে আমার অযোগ্য মনে করো, নাকি আমাকে চাদরের অনুপযুক্ত?

উম্মে হাবিবা রা. বললেন, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর। আর আপনি এখনো একজন মুশরিক...(এ কারণে আমি চাদর গুটিয়ে নিয়েছি)।

CamScanner

আবু সুফিয়ান তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কাছ থেকে চলে আসার পর তোমার আচার-ব্যবহার মন্দ হয়ে গেছে![৪৯৩]

পুণ্যবতী স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা. ইসলামের স্বাভাবিক আচরণরীতির বাইরে ভিন্ন একটি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সত্যনবী। আর তার পিতা একজন মুশরিক। তিনি এমন কিছুর উপাসনা করেন, যা তার কোনো উপকার করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। তাই তিনি তার এই আচরণের মাধ্যমে তার পিতাকে সে ভ্রান্তির ঘুম থেকে জাগাতে চেয়েছিলেন, যে ভ্রান্তির মধ্যে তিনি অনেকগুলো বছর অতিবাহিত করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি চাদর উঠিয়ে নিয়েছেন। সেইসাথে এটি মূলত তার হৃদয়ে তার সৎ ও সত্যবাদী স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ছিল। অন্যদিকে তার পিতা ছিলেন মুশরিক। দীর্ঘদিন যিনি তার স্বামী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করে আসছেন। এ কারণে নবীর স্পর্শধন্য বিছানায় বসার ক্ষেত্রে নিজের পিতার জন্যও তার অন্তরে কোনো কোমল অনুভূতি জাগ্রত হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার সাক্ষ্যসমূহের মাঝে আরেকটি উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য হলো উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাবের সাক্ষ্য। হুয়াই বিন আখতাব ছিল ইহুদি গোত্র বনু কুরায়জার প্রসিদ্ধ নেতা। তার খেয়ানত, প্রতারণা ও মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই কন্যা হজরত সাফিয়া রা.-ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি আমার জীবনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে উত্তম চরিত্রবান কাউকে দেখিনি। খায়বারের দিন তিনি আমাকে তাঁর বাহনে করে নিয়ে আসেন। আমি ছিলাম তাঁর উটের পেছনে। তখন রাতের বেলা। আমি ঘুমের আধিক্যে ঢুলে ঢুলে পড়ছিলাম। বারবার আমার মাথা হাওদার লাঠির সাথে গিয়ে লাগছিল। এ সময় তিনি আমার গায়ে মৃদু স্পর্শ করে বলছিলেন, 'এই মেয়ে! একটু ধৈর্য ধরো।'[৪৯৪]

---

৪৯৩. ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৩৫০।

৪৯৪. *মুসনাদে আবু ইয়ালা* : ১৩/২৯-৩১। ইমাম তবারানি : *মুজামুল আওসাত* : ৬/৩৪৪, ৩৪৫।

CamScanner

এরপর একদিন এই নারীই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বদলে নিজের জীবন উৎসর্গ করা এবং তাঁর সকল কষ্টকে নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। হজরত যায়েদ বিন আসলাম রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম রোগের সময়, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট সমবেত হলেন। তখন সাফিয়া রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলেন, 'হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কসম! আমার মন চায়, আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন, তা আপনার না হয়ে আমার হোক।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই সে সত্য বলেছে।'[৪৯৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই এমন আবেগঘন কথা বলেছিলেন। কথাটি তিনি এমন একসময় বলেছেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কোনো তোষামোদ করার প্রয়োজন ছিল না কিংবা তার কোনো রাগ বা ক্রোধ থেকে বাঁচারও বিষয় ছিল না। বরং এটা ছিল, একজন স্ত্রীর হৃদয়ের আকুতি, যিনি বিশ্বাস করতেন তার স্বামী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী। এ কারণেই তিনি তখনো তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ বা হে আল্লাহর নবী' বলে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব হলো, তিনি হৃদয়ের এ অনুভূতিকে সত্যায়ন করেছেন। যদিও তখন কোনো কোনো স্ত্রী চোখের ইশারায় তাকে কটাক্ষ করেছিলেন।

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী তার সংসারে অবস্থান করেছেন। তারা ছিলেন মুমিনা নারী। অল্পে তুষ্টির অধিকারিনী। সকল জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিবেদিতা। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার পূর্বে তারা তার থেকে যেভাবে ঈমান ও ইসলাম শিখেছিলেন, তার ঘরে এসেও তারা ঠিক তেমনই জীবনযাপন করেছেন।

৪৯৫. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১১/৪৩১।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সামসময়িক অমুসলিমদের সাক্ষ্য

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে শুধু তার প্রিয়জন বা মুমিনরা সাক্ষ্য দিয়েছেন এমন নয়; বরং যারা তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেছে, যারা ছিল তার ঘোর বিরোধী, তারাও তার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে।

মক্কার এইসব কাফের নেতা এবং আশপাশের আরবদের অন্তর তো বিশ্বাস করত, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী—কিছুতেই মিথ্যাবাদী নয়। নবুয়তপ্রাপ্তির আগে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা নবীজির সঙ্গে বসবাস করেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তারা তাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখেনি। কখনো আমানতের খেয়ানত করতে দেখেনি। আচার-আচারণ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অসাধুতা বা অসচ্ছতা পায়নি। তবুও তারা তাদের জাগতিক বিশেষ কিছু স্বার্থের কারণে তার প্রতি ঈমান আনেনি।

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রাসুলের ওপর অনুগ্রহ করলেন এবং মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন, আর তিনি সেই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষদের ডাকতে শুরু করলেন– গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তখন তাঁর প্রতি মানুষদের আচরণ একেবারে উল্টে গেল। তাঁরা তার রিসালাতের দাবিকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। তাঁর সাথি-সঙ্গীদের নির্যাতন করতে লাগল। এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল।

তবে এইসব হঠকারিতা, জুলুম-নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের পরও তার শত্রুরাও বিভিন্ন সময়ে তাঁর দাওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো রোমের সম্রাটের সাথে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রা.-এর কথোপকথন। ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন আবু সুফিয়ান রা. ছিলেন নবীজির শত্রু। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান রা. তাকে জানিয়েছেন, তিনি কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী দলের সাথে তখন শামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠাল। এটা সে সময়ের ঘটনা, যখন রাসুলুল্লাহ

CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ও কুরাইশের লোকদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে (হুদায়বিয়ার সন্ধি) আবদ্ধ হয়েছেন। আবু সুফিয়ান রা. তার সঙ্গীদের নিয়ে ইলইয়াতে (জেরুজালেম) সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলেন। হিরাক্লিয়াসের পাশে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট ছিল। একজন দোভাষীকে ডাকা হলো। সম্রাট জিজ্ঞাসা করল, যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করছে, এখানে রক্তসম্পর্কে তোমাদের মধ্যে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ কে?

আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন বললাম, এখানে বংশগতভাবে আমি তার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

তখন হিরাক্লিয়াস বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর তার সাথি-সঙ্গীদেরকে তার পেছনে এনে বসাও। এরপর সম্রাট দোভাষীকে বলল, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তাকে এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব, যদি সে মিথ্যা বলে, তাহলে তারা যেন তার মিথ্যা ধরিয়ে দেয়।

আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! যদি লজ্জার আশঙ্কা না থাকত যে, মক্কায় গিয়ে তারা আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলার দোষ ছড়াবে, তাহলে আমি তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে কিছু মিথ্যা বলতাম।

এরপর হিরাক্লিয়াস আমাকে প্রশ্ন করল– তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কেমন?

আমি বললাম, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত বংশের মানুষ।

সম্রাট বলল, তোমাদের মধ্যে তাঁর পূর্বে কেউ কি এধরনের দাবি করেছিল?

আমি বললাম, না।

সম্রাট বলল, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল?

আমি বললাম, না।

সম্রাট বলল, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ করে নাকি দুর্বল ব্যক্তিরা?

অমি বললাম, বরং দুর্বল ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ করে।

সম্রাট বলল, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে?

CamScanner

আমি বললাম, বরং দিনদিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

সম্রাট বলল, কেউ কি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে ধর্ম ত্যাগ করেছে?

আমি বললাম, না।

সম্রাট বলল, সে এই দাবি করার আগে তোমরা কি কখনো তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছ?

আমি বললাম, না।

সম্রাট বলল, সে কি কখনো প্রতারণা করেছে?

আমি বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা তার সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। এই চুক্তিতে সে কী করবে বলা যায় না। (পরে আবু সুফিয়ান রা. বলেন, আমাদের কথোপকথনের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে এই কথাটা ছাড়া আমি অন্য কোনো কথা ঢোকানোর সুযোগ পাইনি।)

সম্রাট বলল, তোমরা কি তাঁর সাথে কোনো লড়াই করেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সম্রাট বলল, তোমাদের লড়াইয়ের কী অবস্থা ছিল?

আমি বললাম, যুদ্ধের ব্যাপারটা আমাদের মাঝে কূপের বালতির মতো অদলবদল হয়ে থাকে। কখনো আমরা বিজয়ী হই আর কখনো তারা বিজয়ী হয়।

সম্রাট বলল, সে তোমাদেরকে কীসের নির্দেশ দিয়ে থাকে?

আমি বললাম, সে বলে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা বলত, সেগুলো বর্জন করো। সে আমাদেরকে নামাজ, সদকা, চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দেয়।

এরপর বাদশা দোভাষীকে বলল, 'তুমি তাকে বলে দাও, আমি তাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি বলেছ, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত বংশের লোক। নবীগণ এমনই হন। তাদের নিজ সম্প্রদায়ের অভিজাত বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এরপর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে এমন কথা কেউ দাবি করেছে কি না। তুমি বলেছ, না। এ ক্ষেত্রে আমি বলি, যদি তাঁর পূর্বে কেউ এমন কথা বলে থাকত,

CS CamScanner

তাহলে বলতাম, সে এমন ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বের লোকের অনুসরণে এমন দাবি করে বসেছে। এরপর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কি না। তুমি বলেছ, না। আমি বলি, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকত, তাহলে বলতাম, সে এমন ব্যক্তি, যে হারানো বাদশাহি পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা তাঁর এই দাবির পূর্বে তাঁকে কোনো মিথ্যা বলতে দেখেছ কি না। তুমি বলেছ, না। আমি জানি, যে মানুষদের ব্যাপারে মিথ্যা বলে না, সে কখনো আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে নাকি দুর্বল ব্যক্তিরা। তুমি বলেছ, দুর্বল ব্যক্তিরা। নবীদের অনুসারীরা এমনই হয়। আমি আরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে। তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটা এমনই হয়, তা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে তা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পর কেউ সেই ধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে ধর্ম ত্যাগ করে কি না। তুমি বলেছ, না। হ্যাঁ, ঈমানের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। যখন ঈমানের স্বাদ অন্তরে পৌঁছে যায় (কেউ সেটা ছেড়ে আসতে পারে না)। আমি আরও জিজ্ঞাসা করেছি, সে কখনো গাদ্দারি বা প্রতারণা করে কি না। তুমি বলেছ, না। রাসুলগণ এমনই হয়, তারা গাদ্দারি বা প্রতারণা করে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে তোমাদের কীসের নির্দেশ দেয়। তুমি বলেছ, সে তোমাদের নির্দেশ দেয় এক আল্লাহর ইবাদত করার। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার। সে তোমাদের নিষেধ করে মূর্তির ইবাদত করতে। তোমাদের নির্দেশ দেয় নামাজ, সদকাহ, চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার...। তুমি যা বলেছ, তা যদি আসলেই সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সে অচিরেই আমার এই দু-পায়ের স্থানটুকুও অধিকার করে নেবে। আমি আগে থেকেই জানতাম তাঁর আগমন ঘটবে, তবে ধারণা করিনি যে সে তোমাদের মধ্য থেকে হবে। যদি আমার বিশ্বাস থাকত, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব, তাহলে আমি সকল কষ্ট উপেক্ষা করে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতাম! আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম, তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম!...।[৪৯৬]

---

৪৯৬. *সহিহ বুখারি* : ৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৩।

CamScanner

এই দীর্ঘ বর্ণনাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, আবু সুফিয়ান এখানে যা-কিছু বলেছেন, তা সবই বাস্তব ও সত্য ছিল। আবু সুফিয়ান দীর্ঘদিন ধরে এগুলো নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সাথে ওঠাবসা করেছেন। কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজের বিবেকবুদ্ধি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সবকিছু অনুভব করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক শত্রুদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারব অথবা বিশাল রাজত্বের অধিকারী হিরাক্লিয়াস, যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছে, শুধু এরা দুজনই যে তাঁর নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছে এমন নয়; বরং অন্য আরও অনেক শত্রুই সাক্ষ্য প্রদান করেছে, শত্রুতা পোষণে যারা এই দুজন থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপছন্দ করা, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁকে হত্যা করতে চাওয়া, এমনকি মানুষের মাঝ থেকে তাঁর নামনিশানা মুছে দিতে চাওয়া ইত্যাদি শত্রুতামূলক কাজে যাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রবর্তী মনে করা হতো, সে হলো আবু জাহেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা ছিল সর্বোচ্চ। বদর যুদ্ধের সময় সেই মূলত মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার অহংকার-অহমিকাই তাকে টেনে এনেছিল ধ্বংস ও মরণের মুখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কঠিনতম শত্রুও তাঁর সত্যতা ও নবুয়তের সাক্ষ্য দিয়েছে। আবু জাহেল ছিল হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরমা রা.-এর মামা। তিনি একদিন তার মামা আবু জাহেলকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, মামা! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দাবি করছেন, এই দাবির আগে তোমরা কি তাঁকে মিথ্যুক বলতে?'

উত্তরে আবু জাহেল বলল, 'ভাগনে! আল্লাহর কসম! যৌবনে আমাদের মাঝে মুহাম্মাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর সততার কারণে তাঁকে 'আল-আমিন' বলে ডাকা হতো। আমরা কখনোই তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।'

তখন মিসওয়ার ইবনে মাখরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আপনারা কেন তাঁকে অনুসরণ করেন না?'

আবু জাহেল তখন তাকে বলল, 'ভাগনে! আমরা আর বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পর বিভিন্ন সম্মানজনক কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম। তারা অভাবীদের খাবার খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। তারা হাজিদের পানি পান করিয়েছে, আমরাও করিয়েছি। তারা অসহায়-দুস্থকে আশ্রয় দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি...। এমনকি আমরা কোনো জনসমাগমে উপস্থিত হলে আমাদের উভয় পক্ষকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো। এরপর তারা যখন বলল, আমাদের মাঝে একজন নবী আছে! এখন আমরা কীভাবে এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব?'

এ ছাড়া আবু জাহেলের আরও একটি ঘটনা রয়েছে। বদরযুদ্ধের দিন আখনাস ইবনে শুরাইক আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করে বলেছিল, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ সম্পর্কে আমাকে বলো, সে সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী? (ভয় নেই) এখানে আমি আর তুমি ছাড়া অন্য কোনো কুরাইশি নেই যে আমাদের কথা শুনে ফেলবে!'

তখন আবু জাহেল বলল, 'ধ্বংস তোমার। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ অবশ্যই সত্যবাদী, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা কথা বলেনি। কিন্তু বনু কুসাই একাই যদি হজের পতাকা, কাবার রক্ষণাবেক্ষণ, হাজিদের পানি পান করানো, আবার শেষমেশ নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্বও নিয়ে যায়, তাহলে কুরাইশের অন্য গোত্রগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আর থাকে কী?'[৪৯৭]

ইসলামি দাওয়াতের সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম শত্রু আবু জাহেলের উপর্যুক্ত সাক্ষ্য দুটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ কারণে শত্রুতা করেনি যে, তার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন মিথ্যাবাদী কিংবা ভণ্ড; বরং তার শত্রুতার কারণ ছিল তার তুচ্ছ গোত্রপ্রীতি। এটাই নবীজির নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদানকে আবু জাহেলের নিকট খুব কঠিন ও জটিল করে তুলেছিল। কারণ, তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করাটা বনু হাশেমের মর্যাদার পাল্লাকে কুরাইশের অন্য সকলের জন্য ভারী করে দিচ্ছিল। আর এ ব্যাপারটাই আবু জাহেল মেনে নিতে পারেনি। তাই সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানকে সত্য জেনেও সেটাকে অস্বীকার করেছে।

---

৪৯৭. ইবনুল কাইয়িম : *হিদায়াতুল হায়ারা* : ৫০, ৫১।

এভাবে শুধু আবু জাহেল নয়; বরং কুরাইশের সকল গোত্রই স্বীকার করেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। এটা এমন এক বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত অন্য কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বড় একটি সম্প্রদায়, যার অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলি নিয়ে বহু মতবিরোধ, মতানৈক্য ও বিভেদ রয়েছে, তারা সকলেই সমাজের একজন ব্যক্তির আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার ওপর একমত হয়ে যাবে, এটা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এমন কল্পনাই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে।

নবুয়তের প্রথম দিকে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকালয় থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের কাছে এলেন। পাহাড়ে উঠলেন এবং يا صباحاه –বা 'সকালবেলার বিপদ থেকে সাবধান' বলে চারদিকে আওয়াজ দিলেন। আহ্বান শুনে সকল মানুষ যখন তাঁর কাছে একত্রিত হলো, তিনি তাদের বললেন, 'আমি যদি বলি, একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা সত্য মনে করবে?'

তারা সকলেই তখন উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ...। আমরা তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তোমাদের সতর্ক করছি ভবিষ্যতের কঠিনতম শাস্তির (পরকালের শাস্তির)।'

তখন আবু লাহাব বলে উঠল, 'তোমার জন্য ধ্বংস, তুমি কি আমাদের এজন্যই এখানে একত্রিত করেছ?'[৪৯৮]

অর্থাৎ কুরাইশের সকলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার স্বীকৃতি প্রদান করল। কিন্তু যখনই তিনি তাদের সামনে আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর প্রকৃত দাওয়াত ও আহ্বান পেশ করলেন, তখনই তারা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেল, নবীজির কথা অমান্য করল, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণে এবং নিজেদের গোত্রমর্যাদা, ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্পদ খোয়ানোর আশঙ্কা করে।

---

৪৯৮. সহিহ বুখারি : ৪৭৭০, ৪৮০১; সহিহ মুসলিম : ২০৮।

CamScanner

এই ঘটনা ছাড়াও, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরাইশের আরও বহু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো নবীজির সত্যবাদিতার পক্ষে কুরাইশদের স্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে। সেইসাথে এগুলো তাঁর দাওয়াত ও নবুয়তের স্বীকৃতিরও প্রমাণ বহন করে।

এভাবে, অনেক ইহুদি নেতাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতাকে স্বীকার করত। যেমন বর্ণনা করেছেন উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রা.। তিনি ছিলেন বনু কুরাইজার ইহুদিদের নেতা হুওয়াই বিন আখতাবের কন্যা। তিনি বলেন, আমি ছিলাম আমার পিতা ও চাচা আবু ইয়াসিরের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি যদি কখনো তাদের কোনো সন্তানের সাথে একত্রে থাকতাম আর তারা আমাদের কাছে আসতেন, তাহলে তারা সবার আগে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন এবং 'কুবা'-তে বনু আমর বিন আউফের নিকট অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন আমার পিতা হুওয়াই বিন আখতাব ও আমার চাচা আবু ইয়াসির খুব সকালে রাতের অন্ধকার বাকি থাকতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেলেন। সারাদিন তারা তাঁর কাছে অবস্থান করে, একদম সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে, সন্ধ্যায় ফিরে এলেন। সাফিয়া রা. বলেন, তারা ফিরে এলেন খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে। চিন্তার ভারে যেন নুইয়ে পড়ছেন। তাদের হাঁটার গতি ছিল খুবই মন্থর।

সাফিয়া রা. বলেন, আমি বরাবরের মতো খুব উৎফুল্লতার সাথে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তারা দুজনের একজনও আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তারা ছিলেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এ সময় চাচা আমার পিতাকে বললেন, আচ্ছা, 'ইনিই কি তিনি?' (অর্থাৎ সেই নবী।)

পিতা বললেন, 'আল্লাহর কসম! ইনিই তিনি।'

চাচা আবার বললেন, 'তুমি কি তাঁকে চিনতে পারছ? তাঁর ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারছ?'

আমার পিতা বললেন, 'হ্যাঁ।'

চাচা বললেন, 'তাহলে এখন তাঁর ব্যাপারে তোমার কী সিদ্ধান্ত?'

CS CamScanner

পিতা বললেন, 'আল্লাহর কসম! তবুও আজীবন আমি তাঁর শত্রুতা করে যাব!'(৪৯৯)

চমৎকার হয়, আমরা যদি আমাদের এই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানি নাজরানের খ্রিষ্টান কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদানের মুবাহালা(৫০০) সংক্রান্ত ঘটনার মাধ্যমে। সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾

তোমার কাছে (ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (তাদেরকে) বলে দাও, এসো, ডাকি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, আর আমাদের নিজ লোকদেরকে, এবং তোমাদের নিজ লোকদেরকে তারপর আমরা সকলে মিলে (আল্লাহর সামনে) কাকুতিমিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই। [সুরা আলে ইমরান : ৬১]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (নাজরানের খ্রিষ্টানদের) মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানান। এজন্য তিনি হজরত আলি, হাসান, হুসাইন এবং

---

৪৯৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫১৭।

৫০০. মুবাহালা (المباهلة) : শব্দটির অর্থ একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া। পরিভাষায় মুবাহালা হলো, দুটি পক্ষ যদি পরস্পরবিরোধী দাবি করে এবং নিজেদের বক্তব্যকেই সঠিক বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তখন তারা প্রকাশ্যে সবার সামনে এসে এই বলে গজব কামনা করবে যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মাঝে মিথ্যাবাদীর ওপর অভিশাপ আরোপ করুন। তখন দু-পক্ষই আমিন আমিন বলবে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, মিথ্যাবাদীদের সাথে মুবাহালা করা একটি সুন্নত পদ্ধতি।-অনুবাদক

CamScanner

ফাতেমা রা.-কে সঙ্গে নিয়ে নাজরানের খ্রিষ্টানদের নিকট গমন করেন এবং তাদের মুবাহালার প্রতি আহ্বান করেন। তখন প্রতি-উত্তরে তারা বলল, 'হে আবুল কাসেম, আমাদের একটু সময় দাও। আমরা আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে একটু শলা-পরামর্শ করি। এরপর তুমি আমাদের যে বিষয়ে আহ্বান করছ, সে বিষয়ে কী করব সেটা ঠিক করে তোমার সামনে উপস্থিত হবো।'

এ বলে তারা চলে গেল। এরপর তারা 'আকেব' নামের এক ব্যক্তির সাথে একান্তে মিলিত হলো। সে ছিল তাদের মূল সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। তারা বলল, 'হে মাসিহের গোলাম, এ বিষয়ে তুমি কী মনে করো?'

আকেব তাদেরকে বলল, 'হে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা, তোমরা জানো যে, মুহাম্মাদ একজন সত্যনবী। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের নবীর বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তই এনেছেন। আর তোমরা এ কথাও জানো, কোনো সম্প্রদায় যদি নবীর সাথে মুবাহালায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের বড়দের কেউ জীবিত থাকে না। আর ছোটদেরও কেউ বড় হয়ে ওঠে না। অতএব, তোমরা যদি এই মুবাহালা করতে যাও, তাহলে তা হবে তোমাদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার কারণ। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের ধর্মের ওপরই অটল থাকতে চাও এবং তোমাদের নবীর ব্যাপারে তোমাদের যে চিন্তা-চেতনা, সেটাই লালন করতে চাও, তাহলে মুহাম্মাদকে বিদায় জানিয়ে তোমরা তোমাদের এলাকায় ফিরে যাও।[৫০১]

---

৫০১. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫৮৪।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

সুবিবেচক পশ্চিমাদের সাক্ষ্য

পশ্চিমাবিশ্বের অনেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করেছেন। তাদের এই সঠিকতার মূল উৎস হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে তাদের গবেষণাধর্মী ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিস্তৃত অধ্যয়ন। আর এই অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান পূর্ণতা পেয়েছে আধুনিক কিছু বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি, সূত্র ও পদ্ধতির মাধ্যমে, যেগুলোতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের এই গবেষণাগুলোতে ইতিবাচক ফলই প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা তাঁর সততা, সঠিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর তাদের এই স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যসমূহ জ্ঞানজগতে স্বতন্ত্র প্রদীপ হয়ে আলো বিকিরণ করছে, যার মাধ্যমে পশ্চিমের অনেক সত্যানুসন্ধানী মানুষ সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে।

যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ন্যায়পূর্ণ সঠিক মন্তব্য করেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন ফ্রান্সের কবি ল্যামার্টিন (Alphonse de Lamartine)।[৫০২] তিনি বলেছেন, তোমরা কি মনে করো মুহাম্মাদ ধোঁকাবাজ, প্রতারক, ভণ্ড বা মিথ্যুক? কিছুতেই না। আমরা তাঁর ইতিহাস পড়েছি। তাঁর জীবনচরিত নিয়ে দীর্ঘ অধ্যয়ন করেছি, সেগুলো কখনো তাঁর এমন পরিচয় প্রদান করে না। বরং ধোঁকা, প্রতারণা, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারিতার দোষে সে ব্যক্তিই দোষী হবে, যে এগুলো মুহাম্মাদের ওপর চাপাতে চায়।[৫০৩]

---

৫০২. আলফনস ডি ল্যামার্টিন : Alphonse de Lamartine (১৭৯০-১৮৬৯ খ্রি.)। একজন ফরাসি লেখক, কবি এবং রাজনীতিবিদ। অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন তুরস্কের ইজমির শহরে। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো, *তাআম্মুলাতুন শিরিয়্যাহ*, *রিহলাতুন ইলাশ শারক*।

৫০৩. আলফনস ডি ল্যামার্টিন : ইবনে হিশাম : *আস-সাফারু ইলাশ শারক* : ৮৪।

থমাস কার্লাইল[৫০৪] বলেছেন, আমরা কখনোই মুহাম্মাদকে মিথ্যুক বা প্রতারক মনে করি না। কারণ, তিনি কখনো তাঁর নানাবিধ কলাকৌশল ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে বিশেষ কোনো স্বার্থ হাসিল করতে চাননি। অথবা এগুলোর মাধ্যমে তিনি কোনো রাজত্ব বা বাদশাহি করার আকাঙ্ক্ষা করেননি কিংবা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট দুনিয়ার কোনো বিষয়-আশয় অর্জন করতে ইচ্ছা করেননি। তিনি বরং যে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা ছিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও সঠিক। তাঁর আহ্বান ছিল একজন সত্যবাদীর আহ্বান, যা এসেছিল অজানা এক জগৎ থেকে। মুহাম্মাদ কখনোই মিথ্যুক ও প্রতারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক টুকরো প্রাণসদৃশ, তা থেকে বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এসেছে প্রকৃতির প্রাণ। এরপর হঠাৎ তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে সমগ্র বিশ্বকে করে তুলেছে আলোকিত, উদ্ভাসিত।[৫০৫]

সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লি বোন[৫০৬] বলেছেন, আমি তোমাদের নতুন কোনো মন্দ বিষয়ের দিকে আহ্বান করছি না, কিংবা আহ্বান করছি না নিন্দনীয় কোনো ভ্রষ্টতার দিকে। আমি বরং আহ্বান করছি এক আরবীয় ধর্মের প্রতি, যা আল্লাহ তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর তিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সেই ঐশী ধর্মের আহ্বান ছড়িয়ে দিলেন এমন সম্প্রদায়ের মাঝে, যারা মূর্তি ও পাথরের উপাসনায় লিপ্ত ছিল। মূর্খতার যুগের বিভিন্ন তুচ্ছ ও মন্দ কাজের মধ্যেই যারা তৃপ্তি অনুভব করত। তারা ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত, তিনি এসে তাদের এক ও ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ ছিল বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত, তিনি এসে সেগুলোকে সংশোধন ও সুসংহত করেছেন। সৃষ্টির পূজা থেকে তিনি তাদের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের দিকে। এ কারণে গভীরতম ভালোবাসা,

---

৫০৪. থমাস কার্লাইল—Thomas Carlyle (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রি.) : স্কটিশ লেখক। তীক্ষ্ণ সমালোচক। ঐতিহাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো, *আবতাল* (এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম সম্পর্কে একটি অসাধারণ অধ্যায় রয়েছে। এটার আরবি অনুবাদ করেছেন উসতাজ আলি আদহাম), *আস-সাওরাতুল ফারানসিয়্যা*। দেখুন, নাজিব আকিকি : *আল-মুসতাশরিকুন* : ২/৫৩।

৫০৫. থমাস কার্লাইল—Thomas Carlyle : *আবতাল* : ৫৮-৬০।

৫০৬. গুস্তাভ লি বোন—Gustave Le Bon (১৮৪১-১৯৩১ খ্রি.) : একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ। তিনি সমাজ ও মনোবিদ্যা সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তার বিখ্যাত রচনা হলো, *হাজারাতুল আরাব* সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে ইসলামি আরব সভ্যতার ন্যায়-নীতি বিষয়ক আলোচনাধর্মী মৌলিক গ্রন্থগুলোর একটি। দেখুন, আহমাদ হামেদ : *আল-ইসলাম ওয়ার-রাসুল ফি ফিকরি হা-উলা* : ৫৯-৬১।

CamScanner

বংশের আভিজাত্য, নেতৃত্বের সফলতা এবং খোদাপ্রদত্ত নবুয়তের দিক থেকে তিনিই ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। দেখো, এই হলেন মুহাম্মাদ, যার ধর্মকে আজ ৪০০ মিলিয়ন (চল্লিশ কোটি...)[৫০৭] মুসলমান সাদরে বরণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তারা বসবাস করছে। অথচ তারা সকলেই (যে ভাষারই হোক) আরবি ভাষার আসমানি গ্রন্থ 'কুরআন' পাঠ করছে।[৫০৮]

গুস্তাভ লি বোন অন্যত্র বলেছেন, অতএব, যে রাসুল এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সকলের জন্য উচিত হবে তাঁর রিসালাতের অনুসরণ করা এবং অতি দ্রুত তাঁর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া প্রদান করা। কারণ, এটা এক মহান আহ্বান। এর মূলকথা হলো স্রষ্টার পরিচয় অর্জন করা। ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বরং এ ধর্মের সকল কিছুই কল্যাণ ও পরিশুদ্ধির দিকে ধাবিত করে। সকল বিশ্বাসীর কাঙ্ক্ষিত পথই হলো কল্যাণকামিতা। আর আমি সমগ্র খ্রিষ্টজগৎকে এ দিকেই আহ্বান করছি।[৫০৯]

ব্রিটিশ চিন্তাবিদ, লেনপুলও[৫১০] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজের মুগ্ধতা গোপন রাখতে পারেননি। তাই তিনি কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু চারিত্রিক মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন, কোমলতা, সাহসিকতা, উদার চরিত্র...। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যকারী ও এ সকল চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হবে এবং তাঁর ব্যাপারে সব ধরনের বিরূপ মন্তব্য প্রবৃত্তি ও পক্ষপাতদুষ্ট হবে। আর এটা হবেই-না বা কেন! তিনি অনেকগুলো বছর নিজ গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের শত্রুতা সহ্য করেছেন। হাজার নির্যাতনেও অঢেলধৈর্য ও বিরাট সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর মহানুভবতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহা করলে সে ব্যক্তি নিজে হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি নিজের হাত টেনে নিতেন

---

৫০৭. এখন ২০20 খ্রিষ্টাব্দ। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৭৫৫ কোটি, যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৯০ কোটি।-অনুবাদক

৫০৮. প্রাগুক্ত।

৫০৯. গুস্তাভ লি বোন : *হাজারাতুল আরব* : ৬৭।

৫১০. লেনপুল–Lane Poole (১৮৫৩-১৯১৭ খ্রি.) : একজন ইংরেজ দার্শনিক। তিনি ১৮৯৭ সালে প্রাচীন মুদ্রাগুলোর তালিকা প্রস্তুত করেন। সেটা মিশরের দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে এখনো সংরক্ষিত আছে। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, *রিসালাতুন ফি তারিখিল আরাব*।

CamScanner

না, মুসাফাহাকারী কোনো শিশু হলেও। একদিনের জন্যও কখনো এমন হয়নি যে, তিনি কোনো দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন আর তাদের সালাম প্রদান করেননি, চাই সেটা বড়দের দল হোক অথবা ছোটদের। তাঁর দুটি ঠোঁটে সর্বদা মিষ্টি-মুচকি হাসি লেগে থাকত। শুধু তাঁর মুখের মধুর আওয়াজই যথেষ্ট ছিল শ্রোতাদের বিমোহিত করতে এবং তাদের অন্তরাত্মাকে আকৃষ্ট করতে।[৫১১]

ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ[৫১২] বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধ্যয়ন করেছি এক অতি আশ্চর্য মানুষ হিসেবে। আমার মতে তিনি অ্যান্টি-ক্রাইস্ট বা ঈসা আলাইহিস সালামের বিরোধী তো ননই; বরং তাকে মানবতার ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য।[৫১৩] বর্তমান ইউরোপের লোকেরা একত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ছে। কখনো এর থেকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে তাদের এমন বিশ্বাসও জন্মাচ্ছে যে, এই বিশ্বাসই পারে ইউরোপীয় সকল সমস্যার সমাধান করতে। তোমাদের কর্তব্য হবে, এই মানসিকতা নিয়েই আমার ভাবনা-উপলব্ধিগুলো বুঝতে চেষ্টা করা।[৫১৪]

বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর[৫১৫] বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কিছু মহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট। তাঁর প্রচারিত ধর্মও ছিল সহজ ও সাবলীল।

---

৫১১. লেনপুল : *রিসালাতুন ফি তারিখিল আরাব*। তথ্যসূত্র : আফিফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা : *রুহুদ্দিনিলি ইসলামি* : ৪৩৮।

৫১২. জর্জ বার্নার্ড শ–George Bernard Show (১৮৫৬-১৯৫০ খ্রি.) : একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও ঔপন্যাসিক। ১৯২৫ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী নিয়ে তাকে একটি নাটক লেখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু রাসুলের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। (যারা মানুষের সামনে ইসলামকে বিকৃত ও খারাপভাবে উপস্থাপন করতে চায়, তাদের জন্য এর মাঝে রয়েছে উত্তম এক দৃষ্টান্ত।) অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, আহমাদ হামেদ : *আল-ইসলাম ওয়ার-রাসুল ফি ফিকরি হা-উলা*: ১৩-১৫।

৫১৩. ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর লিখিত *'কিতাবে ও পরধর্ম গ্রন্থে নবী করীম (সঃ)'* তে আছে, আমি বিশ্বাস করি যদি তাঁর মতো কোনো ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব আচরণ করতেন তবে তিনি এর সমস্যাগুলো এরূপভাবে সমাধান করতে পারতেন যাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ আনতে সমর্থ হতেন। আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করছি মুহাম্মাদের ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে যেমন আজকের ইউরোপ তাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে...।)

৫১৪. আল-হুসাইনি মাআদি : *আর-রাসূল ফি উয়ুনি গারবিয়্যাতিন মুনসিফাহ* : ৭০।

৫১৫. ইউলিয়াম ম্যুর–William Muir (১৮১৯-১৯০৫ খ্রি.) : একজন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদ (পূর্বে তার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে)।

CS CamScanner

তিনি এমন কিছু কাজ সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন, যা জ্ঞানীদেরকেও বিস্মিত করে। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর মতো এমন কোনো সমাজসংস্কারক দেখেনি, এত অল্প সময়ের মধ্যে যিনি মানুষের অন্তরকে এভাবে জাগিয়ে তুলেছেন, উত্তম গুণাবলির মাধ্যমে তাদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করেছেন এবং চারিত্রিক উৎকর্ষে সমুন্নত করেছেন।[৫১৬]

এভাবে তাঁর প্রশংসাযোগ্য যে গুণের কথাই বলি না কেন এবং প্রশংসাকারী সে ব্যাপারে যতটুকু তাঁর প্রশংসা করতে সক্ষম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তারও অনেক ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তিই গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মহান জীবনাচার অধ্যয়ন করেছেন, তিনি এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত হয়েছেন। তাঁর এ মহান জীবনাচার তাঁর স্থানকে বিশ্বের অন্যান্য রাসুল, চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাগ্রে এনে দিয়েছে।[৫১৭]

বিখ্যাত আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ওয়াশিংটন আরভিং[৫১৮] বলেন, রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরবর্তী দিনগুলোতেও মানুষের প্রতি যে সদাচার দেখিয়েছেন, তা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রেরিত একজন নবী ও রাসুল, নিছক কোনো নেতা ও বিজয়ী নন। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেও মক্কাবাসীর প্রতি তিনি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতিই প্রদর্শন করেছেন। নিজের সফলতা ও বিজয়কে তিনি ক্ষমা ও দয়ার স্বর্ণমুকুট পরিয়েছেন।[৫১৯]

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু[৫২০] বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকের মতো বহু কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেছিলেন, যেগুলো তাঁর যুগে প্রচলিত ছিল।

---

৫১৬. ইউলিয়াম ম্যুর : *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ৩১।

৫১৭. ইউলিয়াম ম্যুর : *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ২০।

৫১৮. ওয়াশিংটন আরভিং–Washington Irving (১৭৮৩-১৮৫৯ খ্রি.) : একজন আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক। অনেক গুরুত্বের সাথে ইসলাম বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত রচনা হলো, *ফাতহু গারনাতাহ*, *হায়াতু মুহাম্মাদ*। সূত্র : নাজিব আকিকি : *আল-মুসতাশরিকুন* : ৩/১৩১।

৫১৯. ওয়াশিংটন আরভিং : *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ৭২।

৫২০. জওহরলাল নেহেরু–Jawaharlal Nchru (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) : ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। বিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যতার পক্ষে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্য অনেক নেতার মতো হিন্দুত্ববাদের প্রতি কঠোর অনুরাগী বা উগ্রবাদী ছিলেন না।

CamScanner

তিনি যে ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন, তা পালন করা ছিল অতি সহজ। নীতিমালা ছিল সুস্পষ্ট। এটি আদেশ করত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও উঁচু-নিচুর ভেদাভেদহীনতার। এ কারণে এই ধর্ম আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। কারণ হলো, দীর্ঘদিন ধরে তারা বিভিন্ন স্বৈরাচারী নিষ্ঠুর শাসকদের হাতে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। পুরাতন প্রথার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাই নতুন ও জুলুমহীন বিধানের প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে ওঠেছিল। ঠিক এই সময়ে ইসলামের আগমন ছিল তাদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, ইসলামই তাদের বহু দুরবস্থা দূর করে এবং জুলুম অত্যাচারের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে।[৫২১]

বেলজিয়ামের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন[৫২২] বলেন, মোটকথা... তাঁর আগের কিংবা পরের কোনো নবীকে এ পরিমাণ বিজয় ও সফলতা প্রদান করা হয়নি, যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।[৫২৩]

উল্লিখিত এই সাক্ষ্যগুলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু দিক প্রকাশিত হয়েছে, যে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছেন তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করা সকলেই। এমনকি যারা (সত্যান্বেষী হয়ে) তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন করেছেন, তারাও। আর এই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে, তিনি ছিলেন আসমানি রিসালাতের বার্তাবাহী সর্বশেষ নবী ও রাসুল, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পুরো মানবজাতির যাপিতজীবনের সংস্কার ও সংশোধন।

---

[৫২১]. জওহরলাল নেহেরু : *লামাহাত মিন তারিখিল আলাম* : ২৭। (জওহরলাল নেহেরু এটা ইংরেজিতে লিখেছিলেন, যার নাম, Glimpses of world history। এটার বাংলাও করা হয়েছে, যার নাম : বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ।-অনুবাদক

[৫২২]. জর্জ সার্টন–George Sarton (১৮৮৪-১৯৫৬ খ্রি.) : মূল নিবাস বেলজিয়াম। প্রকৃতিবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৯৩১-১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আরবিভাষা শিক্ষাগ্রহণ করেন। মনুষ্যচেতনায় আরবের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক অনেক ভাষণ ও বক্তৃতা দিয়েছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-মাদখাল ইলা তারিখিল ইলমি*। সূত্র : নাজিব আকিকি : *আল-মুসতাশরিকুন* : ৩/১৪৭, ১৪৮।

[৫২৩]. জর্জ সার্টন : আস-সাকাফাতুল গারবিয়্যা ফি রিআয়াতিশ শারকিল আওসাত : ২৮-৩০।

CamScanner

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

বাস্তবতার সাক্ষ্য

অতীত বা বর্তমান সকল যুগের বাস্তবতা এটাই যে, অন্য ধর্মগুলোর চেয়ে ইসলামধর্মই পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছিলেন। সে সময় খুব অল্পসংখ্যক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বহু দিন, বহু বছর কেটে গেছে, আজ সেই স্বল্প সংখ্যক মানুষের ইসলাম এখন পৌঁছে গেছে পৃথিবীর সকল প্রান্তে।

ইতিহাস তার অকাট্য সততা নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে, ক্রমান্বয়ে এই ধর্ম অতি দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে এবং পৃথিবীর বহু জাতি-গোষ্ঠী এর প্রতি ঈমান আনছে, চাই সে জাতি বাহ্যিক কোনো যুদ্ধে বিজয়ী হোক অথবা পরাজিত। এটা এমন এক বিস্ময়কর বিষয়, যা পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের বিচলিত করে ছাড়ে। অর্থাৎ মুসলিমরা কোথাও বাহ্যিকভাবে পরাজিত হলেও ইসলাম সকল স্থানেই বিজয়ী হচ্ছে। এই যে তাতারদের ইসলামগ্রহণ, এটা তো খুব দূরের কোনো ঘটনা নয়। তারা মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিল মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ৬৮৫ হিজরিতে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে) 'আইনে জালুত'-এর ময়দানে যখন তাদের পরাজয় ঘটল, তখন তারা বাধ্য হলো এ ধর্মের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে ভাবতে। খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে এ কারণে তাদের অধিকাংশই ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়েছে। ফলে, একসময় যারা ছিল ইসলাম ধ্বংসের মূল কারিগর, তারাই আবার ইসলামের সৈনিকে পরিণত হলো। তারাই তখন ইসলামের বাগানকে অত্যাচারীদের কবল থেকে রক্ষা করতে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করল।

অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বড় আহ্বানকারী ইসলাম নিজেই। কারণ, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস এবং তার বিধিবিধান এতটাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার যে, সুচিন্তক প্রতিটি মানুষকেই তা আকর্ষণ করে এবং তার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

CamScanner

তা ছাড়া ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই ইসলাম তার অধিকার প্রদান করে। তার কোনো অধিকার হরণ করে না। কারণ, একজন ব্যক্তি ইসলামের মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তাকে পাওয়ার পথ পেয়ে যায়। দিনে অন্তত পাঁচবার তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হতে পারে। কোনোরকম অন্তরায় ছাড়া সরাসরি নির্বিঘ্নে তাকে হৃদয়খুলে ডাকতে পারে। এমনইভাবে, ইসলামি বিধান মেনে এই পার্থিব জীবনেও সে সবচেয়ে সুখী, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন একটি জীবনযাপনের আশা করতে পারে। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে স্থায়ী শান্তির জায়গা জান্নাত কামনা করতে পারে। আর এ মহান প্রাপ্তির জন্য ইসলাম শুধু তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদান এবং শরিয়তের বিধান অনুসরণের কথা বলে। এ ছাড়া তার সক্ষমতার বাইরে তার ওপর অন্য কিছু চাপিয়ে দেয় না।

আপনি যদি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু দৃষ্টি দেন এবং ইসলামের সম্প্রসারণ নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করেন, নিঃসন্দেহে আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন। (মানচিত্র নং-৩)

আপনার এই বিস্ময়-বিমুগ্ধতা বাড়তেই থাকবে, যখন আপনার সামনে স্পষ্ট হবে যে, ইসলাম তার প্রতিটি অনুসারীর অন্তরে পরিপূর্ণভাবে স্থান করে নিয়েছে। অথচ এগুলোর জন্য নেই নিয়মতান্ত্রিক কোনো সৈন্যবাহিনী অথবা প্রচলিত নিয়মের কোনো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এসব ব্যবস্থাপনা ছাড়াই ক্রমে তার অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আল্লাহ তাআলা ইসলামকে মেনে নেওয়া মানবমনের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামের সত্যবাণী কারও কর্ণপাত হলে ঈমান ও ইসলাম তার হৃদয়কে আন্দোলিত করে। আর এভাবে সত্যের প্রতি যখন একবার বিশ্বাস জন্মে যায়, তখন তা হৃদয় থেকে বের করার সকল পথই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।[৫২৪]

---

৫২৪. হুসাইন মুনিস : আল-ইসলামুল ফাহিহ : ২০-২৪।

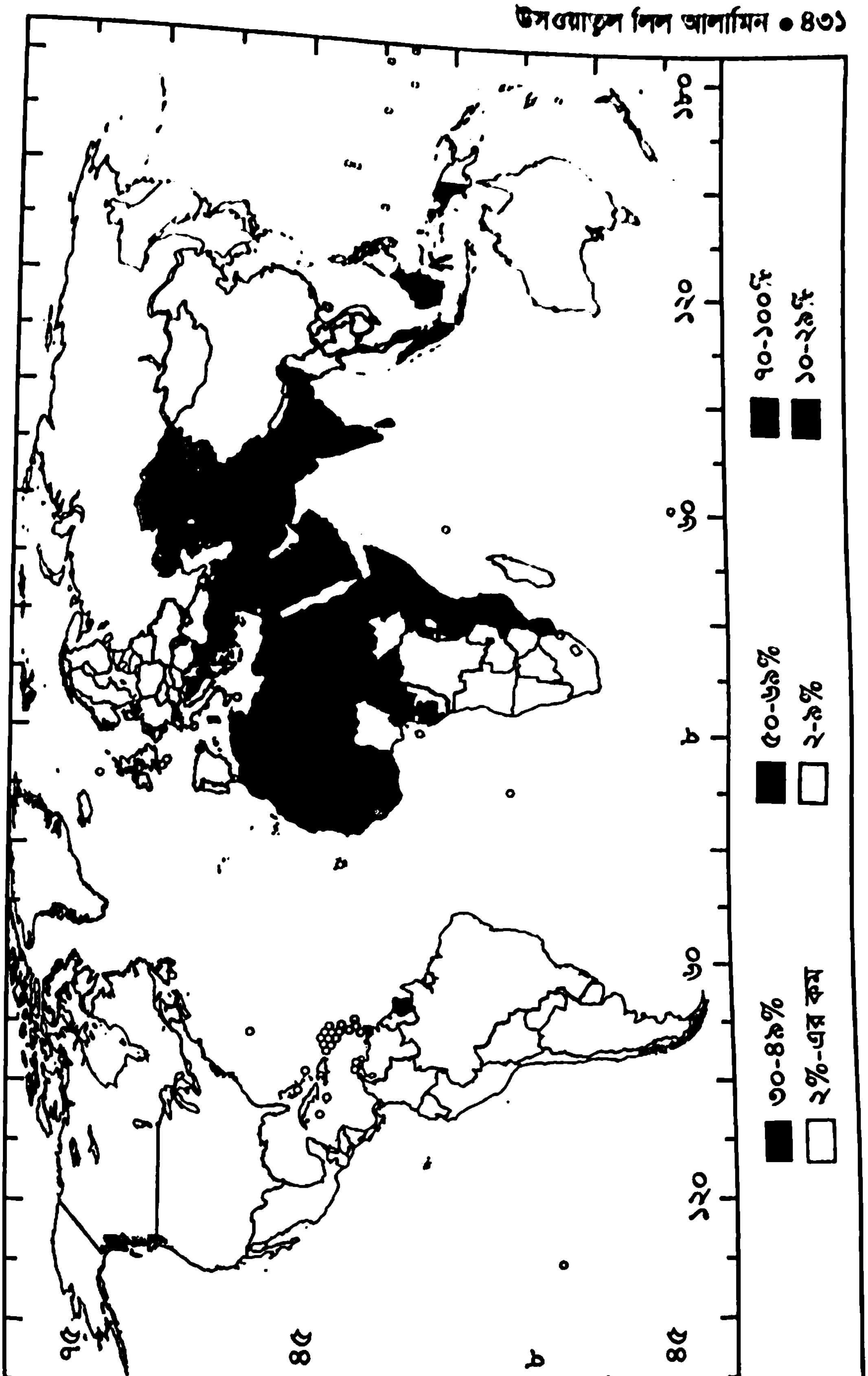

মানচিত্র নং-৩

বিশ্বে মুসলমানদের হার

ইসলামকে মেনে নেওয়া মানবমনের জন্য সহজতর হওয়ার কারণ হয়তো তার স্পষ্টতা ও সততা। এ কারণে পশ্চিমা বিশ্বের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের স্বভাবজাত এইসব বৈশিষ্ট্যে প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়েছেন। এমনকি ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লি বোন ইসলামের সহজতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

> ইসলামের নীতিমালার মতো এত সুস্পষ্ট ও জটিলতাহীন কোনো মতবাদ বা মতাদর্শ পৃথিবীতে নেই। এই নীতিমালাতে একজন উপাস্যের কথা বলা হয়েছে। সেই উপাস্যের সামনে সকল মানুষ সমান। সাথে এমন কিছু অত্যাবশ্যক কাজের কথা বলা হয়েছে, যারা তা পালন করে চলবে, তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আপনার যদি একজন অতি সাধারণ মুসলমানের সাথেও দেখা হয়, তবুও দেখবেন, নিজের আবশ্যক বিশ্বাসের বিষয়াবলি সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত। সে আপনার নিকট ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলো অল্প কথায় খুব সহজে ব্যক্ত করতে সক্ষম। অথচ এ ব্যাপারটাতে খ্রিষ্টানরা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। কারণ, সাধারণ একজন খ্রিষ্টান ত্রিত্ববাদ, রূপান্তর, দেহান্তর ও অন্যান্য দুর্বোধ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে কিছুই বলতে সক্ষম হবে না, যদি না সে খ্রিষ্টধর্মের এমন বড় কোনো ধর্মীয় জ্ঞানী হয়, যার তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি রয়েছে।
>
> এ ছাড়া, মানুষের প্রতি ইসলামের ন্যায়পরতা ও কল্যাণের সুস্পষ্ট নির্দেশনাও বিশ্বব্যাপী তার প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[৫২৫]

আজকের এই জনবহুল বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রদান করলে আমরা দেখতে পাব, পুরো পৃথিবীতে (৪২০০) চার হাজার দুইশরও অধিক ধর্ম প্রচলিত রয়েছে।[৫২৬] কিন্তু বিভিন্ন জরিপ এ তথ্য দিচ্ছে যে, এসব ধর্মের মধ্যে ইসলামধর্মই সবচেয়ে বেশি প্রসারতা লাভ করছে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীতে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১২.৪%

---

৫২৫. গুস্তাভ লি বোন : *হাজারাতুল আরব* : ১২৫।

৫২৬. ওয়েবসাইট : www.adherents.com

CamScanner

আর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল ২৬.৯%। এরপর ১৯৮০ সালে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৬.৫% আর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৩০%। ২০০০ সালে এসে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে হয়ে গেল ১৯.২% আর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা নেমে এলো ২৯.৯%-এ।[৫২৭]

স্বয়ং খ্রিষ্টীয় বিশ্বকোষের (World Christian Encyclopedia) সর্বশেষ নতুন সংস্করণেও সংখ্যানুপাতের এই তারতম্য স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীতে বসবাসকারীদের সামষ্টিক হিসেবে গত শতাব্দীতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার ৭%, যেখানে খ্রিষ্টানদের জনসংখ্যার হার ধীরে ধীরে স্বল্পতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীতে বসবাসকারীদের সামষ্টিক সংখ্যা হিসেবে মুসলমানগণের সংখ্যা বেড়ে ১৯.৬%-এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে (১.৩ বিলিয়ন) ১.৩ শ কোটির কাছাকাছি।[৫২৮]

তা ছাড়া পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষকগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২৫ সালে বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৩০%-এ উন্নীত হবে। আর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা নেমে ২৫%-এ চলে আসবে। এ সকল পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, প্রতি বছর গড়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ২.৯% হারে আর পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে উঁচু হার।[৫২৯]

আমরা যদি পশ্চিমাবিশ্বের কিছু দেশ, যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন আমেরিকাসহ অনন্য দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে সব জায়গাতে একই চিত্র দেখতে পাব। সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতি মানুষের এই অগ্রসরতা ও মুসলমানদের ক্রমবৃদ্ধির হার প্রমাণ করে, ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক ধর্ম। মন ও মানসিকতার সাথে ইসলাম এতটাই সামঞ্জস্যশীল যে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যে-কেউ ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা সম্পর্কে অবগত হবে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে সে কেবল ইসলামধর্মকেই গ্রহণ করে নেবে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি

---

৫২৭. Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004.

৫২৮. ভিজিট করুন ইসলামিক সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইট : www.islmicnews.net এবং আরবি সংবাদপত্র 'আশ-শারকুল আওসাত'-এর ওয়েবসাইট : www.asharqalawsat.com

৫২৯. Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004.

জরিপে উঠে এসেছে, ফ্রান্সে প্রতি বছর গড়ে ৩৬০০ জন ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করে থাকে।[৫৩০]

এদিকে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাকুলিন স্মিথ বলেন, যুক্তরাজ্যে বর্তমানে (২০০৭ সাল) মুসলমানদের সংখ্যা পৌঁছেছে ২ মিলিয়নে (বিশ লক্ষ)। অথচ ২০০১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ১.৬ মিলিয়ন (ষোলো লক্ষ)। সাত বছরেরও কম সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ লক্ষ।

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা বলছে, মুসলমানদের এই নতুন পরিসংখ্যান ইসলামের মর্যাদা ও মহত্ত্বকেই প্রমাণ করে। পৃথিবীতে (জনসংখ্যার হিসাবে) খ্রিষ্টধর্মের পরে এটাকেই সবচেয়ে বৃহৎ ধর্ম হিসেবে দেখা হয়। কারণ, বর্তমান ব্রিটেনের সামষ্টিক জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমান হলো ৩.৩%। তবে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানে ব্রিটেনে যে ধর্মটি সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, সেটা হলো ইসলাম।[৫৩১]

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির সমাজ গবেষণাকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত নতুন জরিপ বলছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামধর্মই সবচেয়ে দ্রুত মানুষের মাঝে প্রসার লাভ করছে। আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা ১২০৯ ছাড়িয়ে গেছে, যার অর্ধেকেরও বেশি স্থাপিত হয়েছে গত দশ বছরের মধ্যে। এভাবে গত দশ বছরের মধ্যে যারা নিজ ধর্ম ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তাদের হারও ১৭% থেকে ৩০%-এর মাঝে ওঠানামা করছে।[৫৩২]

আর জার্মানিতে ৩.৩ মিলিয়ন (তেত্রিশ লক্ষ)-এরও অধিক মুসলমান বসবাস করে। জার্মানির অধিবাসীদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪% হলো মুসলমান। সেখানে মসজিদ বা নামাজের স্থানের সংখ্যা ৩০০০-এর কাছাকাছি।[৫৩৩]

এভাবে বেলজিয়ামের *লিবার বেলজিক* পত্রিকা একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছে, আগামী বিশ বছর পর ব্রাসেলস (যাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অফিসিয়াল রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হয়)-এর অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই অনুমান

---

৫৩০. *ইসলাম টাইম*-এর ওয়েবসাইট : www.islamtime.net
৫৩১. *ইসলাম টাইম*-এর ওয়েবসাইট : www.islamtime.net
৫৩২. *লিওয়াউশ শরিয়া*-এর ওয়েবসাইট : www.shareah.com
৫৩৩. জার্মান সাময়িকীর ওয়েবসাইট : www.magazine-deutschland.de

নাইক হওয়ার একটি স্পষ্ট দলিলও আছে, তা হলো ২০০১ সালের পর থেকে ব্রিটেনে নতুন প্রজন্মের মধ্যে 'মুহাম্মাদ' নামের প্রচলনটা তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি।

একইভাবে রাশিয়ান সংবাদপত্র *Rossiyskaya Gazeta* উল্লেখ করেছে, ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দশ বছরে বেলজিয়ামে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে ২০০৫ সালে এসে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। উক্ত সালে এই দেশের মোট জনসংখ্যাই যেখানে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি।(৫৩৪)

এই হলো মহান ইসলাম। এভাবেই ইসলাম তার গতিময়তা ও নিজের শক্তিতে যুগে যুগে মানুষের মাঝে প্রসার লাভ করেছে। এর কারণ একটাই, ইসলাম স্বভাবজাত নিরঙ্কুশ ধর্ম। অতএব, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণে এই স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম চমৎকার একটি প্রমাণ! ইতিপূর্বে আমরা তাঁর নবুয়তের সত্যতা ও রিসালাতের পূর্ণতার ওপর যেসব স্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করেছি, এ সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এখন পরিতৃপ্তির সাথেই বলতে পারি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর জন্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ দীন-ধর্ম এনেছেন, যা পূর্ণ হয়ে আছে পারস্পরিক ভালোবাসা, সাহায্য, সহমর্মিতা এবং সমূহ কল্যাণে।

সুন্দর হয়, আমরা যদি আমাদের এই আলোচনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসের মাধ্যমে সমাপ্ত করি, যাতে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ইসলাম প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ»

এই ধর্ম একসময় সেইসব স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে রাত হয় এবং দিনের আগমন ঘটে। কাঁচা ইট বা পশমের কোনো ঘর (শহর ও গ্রাম), কোনোটিই বাকি থাকবে না, যেখানে আল্লাহ

৫৩৪. রাশিয়ান সংবাদ সংস্থা নভোস্তি-এর ওয়েবসাইট : http://ar.rian.ru/analytics

তাআলা এই ধর্মকে পৌছে দেবেন না। আর তাতে সম্মানিতরা সম্মানিত হবে ও অসম্মানিতরা অসম্মানিত হবে। সম্মানিতকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন আর অসম্মানিতকে আল্লাহ তাআলা কুফরির মাধ্যমে লাঞ্ছিত করবেন।[৫৩৫]

* * *

৫৩৫. মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯৯৮, মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৩২৬।

তৃতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতের সমাপ্তি টেনেছেন। তাঁর রিসালাত বা বার্তা জগদ্বাসীর জন্য রহমত ও পথনির্দেশনা। সুতরাং নবী হিসেবে তিনি এজন্য আগমন করেননি যে, তিনি এসে অন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। তিনি এসেছেন সঠিক পথের দিশা দিতে, মানুষকে তাদের ভালো কাজের সুসংবাদ এবং মন্দ কাজের জন্য সতর্কবাণী শোনাতে। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, অন্য নবীগণ (তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) হুবহু ওই শিক্ষাই এনেছিলেন, যা তিনি এনেছেন, এটা ভিন্নকিছু নয়। এজন্য তিনি সর্বদাই মানুষের মাঝে এই অভিন্ন মর্মবাণী প্রকাশের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে তাঁকে এ বিষয়টি ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾

আপনি বলে দিন, আমি নতুন কোনো নবী নই (অর্থাৎ আমার আগে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি, আমিই প্রথম, বিষয়টি এমন নয়)। [সুরা আহকাফ : ৯]

অন্য ধর্মানুসারীদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার ছিল খুবই মার্জিত ও উন্নত। তিনি এর প্রেরণা লাভ করেছিলেন আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

CamScanner

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

বাস্তবিকপক্ষে আমি আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদের উত্তম রিজিক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [সুরা ইসরা : ৭০]

এ কারণে একদিনের জন্যেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও ওপর জুলুম করা বা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চিন্তাও করেননি। কাউকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾

আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই ঈমান আনত। তবে কি আপনি মানুষের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়? (অর্থাৎ আপনি ইসলামগ্রহণের ওপর কাউকে চাপ প্রয়োগ করবেন না)।

[সুরা ইউনুস : ৯৯]

এরপরও কিছু বিদ্বেষী মানুষ ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানা ধরনের অভিযোগ ও আপত্তি ওঠায় এবং বিভিন্নপ্রকার সন্দেহ-সংশয় আরোপ করে, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ কারণে আমরা এখানে অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছি। যাতে অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণ এবং শিষ্টাচার উঠে আসে। আর এই অধ্যায়টির আলোচনা নিচের কয়েকটি শিরোনামে উপস্থাপিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

CamScanner

নিচের পরিচ্ছেদগুলোয় আমরা অমুসলিমদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীজি ﷺ ও পূর্ববর্তী নবীগণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি ﷺ-এর চুক্তি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি ﷺ-এর যুদ্ধ-জিহাদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিছু সংশয় ও তার নিরসন

CS CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবীগণ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগদ্বাসীর নিকট সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। প্রেরিত হওয়ার পর থেকেই তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেটা হলো, সকল নবী ও রাসুলের ধর্ম যার নাম ইসলাম। অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে রিসালাতের সমাপ্তি পর্যন্ত সকলের ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন। এই ধর্ম এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। অবশ্য এটা ঠিক যে, শাখাগত কিছু বিধানে শরিয়তগুলোর মাঝে কিছু ভিন্নতা ছিল। কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে এ বিষয়টির আলোচনা এসেছে। যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে এবং আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি এবং কেবল আপনিই ক্ষমাশীল (এবং) অতিশয় দয়ার মালিক। [সুরা বাকারা : ১২৭]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষায় ইরশাদ হয়েছে,

CamScanner

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশ দিয়েছেন এবং দান করেছেন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান। হে আকশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি আমার অভিভাবক। আপনি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিন, যখন আমি থাকি আপনার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

[সুরা ইউসুফ : ১০১]

অতএব বোঝা যায়, ইসলাম সকল নবীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে থাকে। এ কারণে ইসলামই মানবজাতির সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে অধিক উপযুক্ত।

নিচের দুটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আমরা অন্য রাসুলগণের সাথে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কের বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবী-রাসুলদের বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের ব্যাপারে নবীজি ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

নবী-রাসুলদের বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি দাওয়াতের শুরুলগ্ন থেকেই কুরআনুল কারিমে এমন অনেক আয়াত নাজিল হতে থাকে, যেগুলোর মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো, মানবজাতির নিকট অবতীর্ণ সকল রিসালাত বা বার্তা ছিল এক ও অভিন্ন, যদিও তাতে স্থান ও কালের ভিন্নতা এসেছে। এই রিসালাতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেও এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করা এবং আল্লাহ তাআলার সৎ পথের দিশা দেওয়া। তাই কুরআনুল কারিম খুব স্পষ্টভাবে নবী-রাসুলদের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ۝ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

(হে নবী,) আমি আপনার প্রতি ওহি নাজিল করেছি, যেভাবে নাজিল করেছি নুহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং আমি ওহি নাজিল করেছি ইবরাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব, (তাদের) বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে দান করেছি জাবুর।

আর বহু রাসুল তো এমন, পূর্বে যাদের ঘটনাবলি আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসুল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলি আপনাকে শুনাইনি। আর মুসার সঙ্গে তো আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।

[সুরা নিসা : ১৬৩-১৬৪]

CamScanner

অতঃপর এই, মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনুল কারিম মুসা আলাইহিস সালামের সম্মানের বিষয়ে কথা বলেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

যখন মুসা বলবত্তায় উপনীত হলো ও হয়ে গেল পূর্ণ যুবা, তখন আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও ইলম। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। [সুরা কাসাস : ১৪]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾

হে মুসা, আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি আপনাকে যা-কিছু দিলাম তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

[সুরা আরাফ : ১৪৪]

কুরআনুল কারিমের মধ্যে এ ধরনের আয়াত আরও অনেক রয়েছে।

এভাবে, ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে। আপনি লক্ষ করবেন, মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনুল কারিম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে অনেক জায়গায় তার ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় করেছেন যতদিন জীবিত থাকি আমাকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।

আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে উদ্ধত ও রূঢ় বানাননি।

(আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে। [সুরা মারয়াম : ৩০-৩৩]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

এবং (হেদায়েত দান করেছিলাম) জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও। এদের প্রত্যেকেই ছিলেন নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা আনআম : ৮৫]

কুরআনুল কারিম পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধারা বজায় রেখেছিল মদিনার মাটিতেও। অথচ আমরা জানি, মদিনাতে যাওয়ার পরে মুসলিমদের সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের পক্ষ থেকে বারবার মিথ্যাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। এতকিছুর পরও নবী ও রাসুলদের জন্য কুরআনুল কারিমে ঐশী প্রশংসার ধারা অব্যাহত থেকেছে। বরং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা মুসা এবং ঈসা আলাইহিমাস সালামকে উল্লেখ করেছেন দৃঢ় হিম্মতের অধিকারী সম্মানিত নবী-রাসুলদের কাতারে। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾

এবং (হে রাসুল!) সেই সময়কে স্মরণ রাখুন, যখন আমি সমস্ত নবী থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং আপনার থেকেও এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারয়াম থেকেও আর আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম অতি কঠিন প্রতিশ্রুতি। [সুরা আহজাব : ৭]

আমরা যদি এই সুরা তথা সুরা আহজাব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করি, যা নাজিল হয়েছে বনু কুরায়জার ইহুদিদের মুসলমানদের সাথে গাদ্দারি, প্রতারণা, এমনকি মদিনা থেকে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হওয়ার পর, এখানেও আমরা দেখতে পাই, মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। অথচ তারা দুজনই (মুসা ও ঈসা) ছিলেন বনি ইসরাইল বংশের নবী। তা ছাড়া এখানে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারির উচ্চতা ও অনন্যতার কথাও অনুধাবন করতে পারি। সেই মুহূর্তেও তিনি তাদের এই নবী ও রাসুলদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রশংসা ও মর্যাদা প্রচারে সোচ্চার ছিলেন, যখন তাদের সম্প্রদায় ও অনুসারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাধরনের শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণায় লিপ্ত।

আর এই মহান নবীদ্বয়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল না। আলোচনার মাঝে হঠাৎ এসে গেছে এমনও নয়। বরং চোখে পড়ার মতো কুরআনুল কারিমে বহুবার তাদের কথা ও আলোচনা এসেছে। আরও আশ্চর্যের কথা হলো, পুরো কুরআনুল কারিমে 'মুহাম্মাদ' নাম এসেছে মাত্র চারবার আর 'আহমাদ' নাম এসেছে মাত্র একবার। অথচ কুরআনুল কারিমে 'ঈসা' শব্দটি এসেছে পঁচিশবার। 'মাসিহ' নামটি এসেছে এগারোবার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের কথা এসেছে ছত্রিশবার!

আর মুসা আলাইহিস সালাম তো ছিলেন সে সকল নবী-রাসুলের মধ্যে সর্বাগ্রে, যাদের আলোচনায় ভরপুর হয়ে আছে কুরআনুল কারিম। কারণ, কুরআনুল কারিমে মুসা আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে একশ ছত্রিশবার![৫৩৬]

কুরআনুল কারিমে একেক নবীর আলোচনা যতবার এসেছে, আমরা যদি সেই সংখ্যার দিকে একটু দৃষ্টি প্রদান করি, তাহলে সহজেই অনুধাবন করতে পারব মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা বিদ্যমান! (চিত্র নং-২) কুরআনুল কারিমে যে নবীদের আলোচনা সবচেয়ে বেশি এসেছে, তারা হলেন মুসা, ইবরাহিম, নুহ, ঈসা আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম। তারা প্রত্যেকেই সম্মানিত ও সুদৃঢ় হিম্মতের অধিকারী নবী ছিলেন। নিঃসন্দেহে, কুরআনুল কারিমে তাদের জীবনাচার আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে।

---

৫৩৬. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি : *মুজামুল মুফাহরাস লি-আলফাজিল কুরআন* : ২১৮, ৪৯৪, ৬৬৬, ৬৮০।

CamScanner

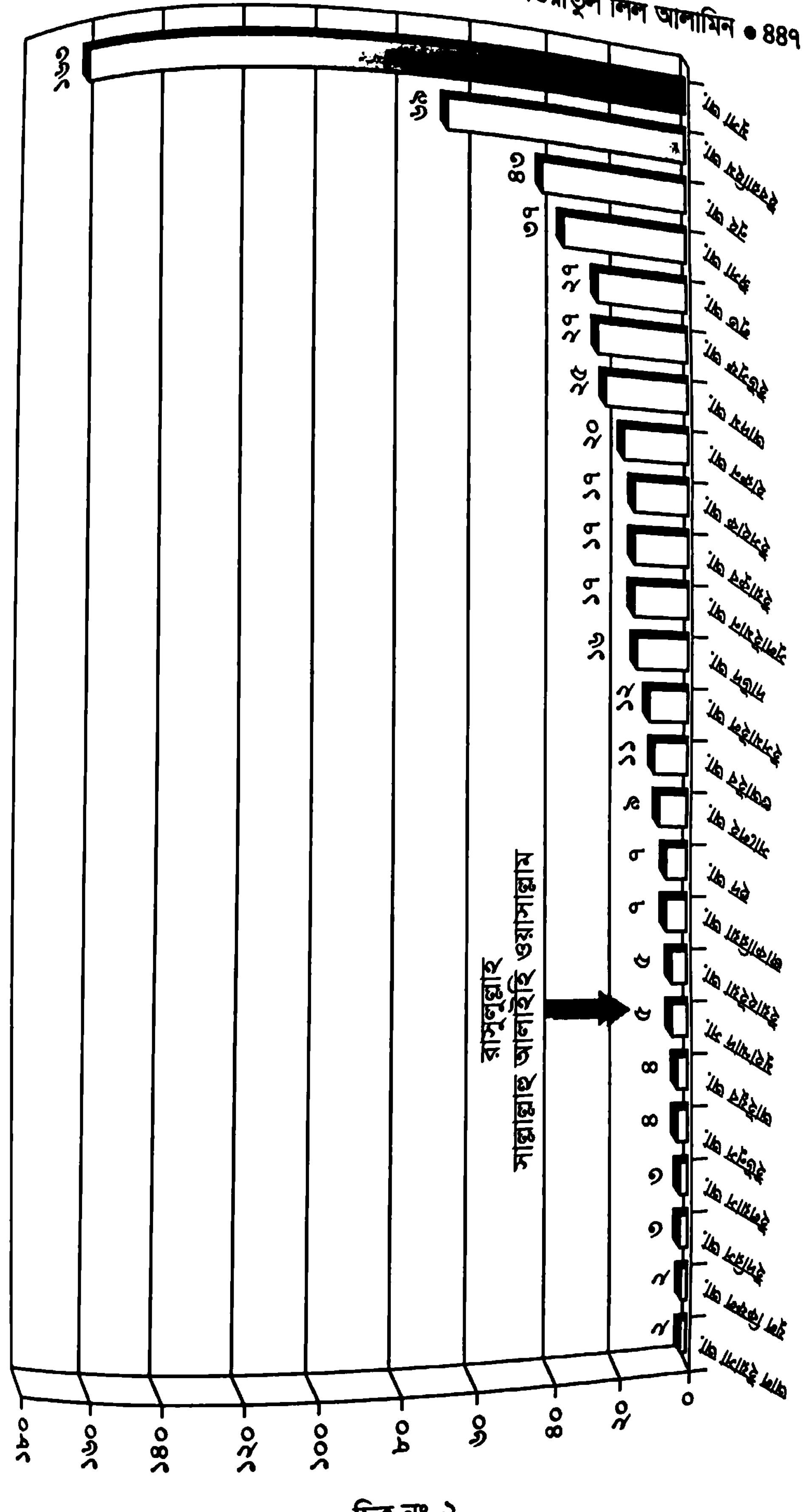

চিত্র নং-২

আল-কুরআনে বর্ণিত নবীগণের নাম

তবে যেমনটি আগেও বলেছি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এসেছে মাত্র পাঁচবার। আমরা এই পরিসংখ্যানে দেখতে পাই অন্তত সতেরোজন নবীর আলোচনা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি এসেছে। অতএব, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ইসলাম এ সকল নবী ও রাসুলকে অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখেই দেখে থাকে। সেইসাথে এখান থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কোনো রচনা নয় যেমনটা অপবাদ দিয়ে থাকে পশ্চিমাবিশ্বের অনেকে। যদি তেমনই হতো, তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র গ্রন্থে অন্যের নয় বরং নিজেরই প্রশংসা ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করতেন সবচেয়ে বেশি।

আসুন, এবার আমরা নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করি! সকল নবী ও রাসুলের প্রতি এ ধরনের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশের পরও কি বলা যায় মুসলমানরা অন্যদের স্বীকৃতি দেয় না?! কিন্তু পৃথিবীর কোথায় আর কারা আছে, যারা আমাদের স্বীকৃতি দেয়, যেমনটি আমরা দিয়ে থাকি অন্যদের?!

যদিও আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সৃষ্টিকুলের মহান নেতা। এটা আমাদের জন্য তৃপ্তির বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সকল নবীর প্রতি ঈমান আনি, ছোট-বড়র কোনো পার্থক্য না করি। মুসলিমজাতির যে ধরনের ঈমান আনার প্রয়োজন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ
وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ
مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾

(হে মুসলিমগণ!) বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও, যা আমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং তার

CamScanner

প্রতিও, যা মুসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং তার প্রতিও, যা অন্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই নবীগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) অনুগত। [সুরা বাকারা : ১৩৬]

এই হলো ইসলাম, যার উদারতা ও ব্যাপ্তির মাঝে সকল রিসালাত স্বীকৃতি পেয়েছে। যা সকল নবী ও রাসুলের প্রতি সুসম্পর্ক ঘোষণা করেছে। একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করেছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত সকল ধর্ম এক ও অভিন্ন এবং সকল রিসালাতের উদ্দেশ্যও এক। আসমানি প্রত্যেক রিসালাতের প্রতিই ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার কাছ থেকে কামনা করেন।(৫৩৭)

শুধু তাই নয়, আল-কুরআন তো বলেছে যেকোনো একজন রাসুলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা মানে সকল নবী-রাসুলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾

আদ জাতি রাসুলদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। [সুরা শুআরা : ১২৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾

নুহের সম্প্রদায় রাসুলদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। [সুরা শুআরা : ১০৫]

সাইয়েদ কুতুব শহিদ রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'হজরত নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু হজরত নুহ আলাইহিস সালামকেই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা রাসুলদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর কারণ হলো, সকল নবী-রাসুলের রিসালাত মূলত একই। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। অতএব, যে এই আহ্বানকে অস্বীকার করল, সে

---

৫৩৭. সাইয়েদ কুতুব : *ফি জিলালিল কুরআন* : ১/৪২৩।

যেন সকল নবী-রাসুলকেই অস্বীকার করল। কারণ, এটাই ছিল তাদের সকলের আহ্বান।[৫৩৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বদা এই প্রেক্ষাপট মনে রাখতেন।

---

৫৩৮. সাইয়েদ কুতুব : *ফি জিলালিল কুরআন* : ৫/৩৫৬।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসুল একটি অট্টালিকার মতো, যার অস্তিত্ব ও টিকে থাকা নির্ভর করে একটি অংশ অন্য অংশের সহযোগিতা ও পরিপূর্ণতা প্রদানের ওপর। তাদের সকলের প্রেরিত হওয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ»

আমার আর আমার পূর্বের নবী-রাসুলদের উপমা হলো, মনে করো, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি নির্মাণ করল। সেটাকে সে নিপুণতা ও সৌন্দর্যে ভরে তুলল। তবে কোনার দিকের একটি ইটের জায়গা ফাঁকা রেখে দিলো। মানুষেরা বাড়িটি পরিদর্শন করতে লাগল আর মুগ্ধ হতে থাকল। আর বলতে লাগল, ইশ... যদি এই ইটটিও লাগিয়ে দেওয়া হতো! নবীজি বলেন, শোনো! আমিই সেই ইট। আমি খাতামুন নাবিইয়িন। (আমার মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে)।[৫৩৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নবীদের মাঝে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। এ কারণে তিনি বলেছেন,

«لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ»

---

৫৩৯. *সহিহ বুখারি : ৩৫৩৫, সহিহ মুসলিম : ২২৮৬।*

তোমরা আমাকে অন্য নবীগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না।(৫৮০)

একবার এক ইহুদি ও এক মুসলিমের মধ্যে নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি নয় বরং মুসলিম ব্যক্তিটির ওপর ভীষণ রাগান্বিত হন। আবু হুরাইরা রা. ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, একবার এক ইহুদি তার একটা পণ্য বিক্রয়ের জন্যে বাজারে নিয়ে এলো। তখন ক্রেতা তাকে যে পরিমাণ মূল্য দিতে চাইল তা তার অপছন্দ হলো। তখন সে বলে উঠল, 'কিছুতেই না। সেই সত্তার কসম, যিনি মুসা আলাইহিস সালামকে সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন...।' ইহুদির এই কথাটি পাশের একজন আনসারি সাহাবি শুনে ফেললেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে সেই ইহুদির গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন এবং তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমাদের মাঝে এখনো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান আর তুমি কিনা বলো, সেই সত্তার কসম, যিনি মুসা আলাইহিস সালামকে সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন!'

ইহুদি লোকটি চলে গেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। নালিশ দিয়ে বলল, 'হে আবুল কাসেম, আমার ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন। তাহলে অমুক কীজন্য আমার চেহারায় আঘাত করল?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারি সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন তার চেহারায় চড় মেরেছ?'

উত্তরে আনসারি সাহাবি ঘটনার পুরো বিবরণ দিলেন। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রাগান্বিত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাগের চিহ্ন নবীজির চেহারায় ফুটে উঠল। এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহর নবীদের মাঝে তুলনা করতে যেয়ো না। কারণ, কিয়ামতদিবসে শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে। আসমান জমিনের সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন, তার কথা ভিন্ন। এরপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন আমারই প্রথম হুঁশ ফিরে আসবে। তবে আমি উঠে দেখব, মুসা আলাইহিস সালাম আরশের পায়া ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই, তার ব্যাপারে কি তুরপর্বতের

---

৫৮০. সহিহ বুখারি : ৬৯১৬।

বেহুঁশিটা এখানে গণ্য হবে নাকি আমার পূর্বেই তাকে ওঠানো হবে! আর আমি এটাও বলি না, কেউ ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে অধিক উত্তম।[৫৪১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বিশেষ করে সে সকল স্থানে, যেখানে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি ইহুদিদের বিরোধিতার কথা বেমালুম ভুলে যেতেন। তিনি বরং স্মরণ রাখতেন নবুয়তের ধারায় ভাই মুসা আলাইহিস সালামের কথা। তিনি তার অবমূল্যায়ন প্রতিহত করেছেন। তার মর্যাদাকে বড় করে তুলে ধরেছেন। কারণ, তিনি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন, ইসলাম নবীগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। এ কারণে অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয়, পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীরা তাদের যতটুকু ভালোবেসেছিল, ইসলাম আমাদের আদেশ করে, আমরা যেন পূর্ববর্তী নবীদের তাঁদের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। কারণ, উদার ইসলামি বিশ্বাসে, নবীদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম রুকন।

এ কারণে আমরা দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে অন্য নবীদের সম্মান প্রদর্শন করতে শিখিয়েছেন। বরং তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বড় বড় আলেমদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন জানতে পারলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে—কারণ মুসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা এ দিনে তাদের শত্রুর কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেটা স্মরণ করে তারা এই রোজা রাখে—তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ»

মুসার ব্যাপারে তোমাদের থেকে আমার অধিকার বেশি।

এরপর তিনি নিজে আশুরার দিন রোজা রাখা শুরু করলেন এবং অন্যদেরও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।[৫৪২]

---

৫৪১. *সহিহ বুখারি* : ১৩৯, ১৩৩৯, ৩৪০৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৭৩।
৫৪২. *সহিহ বুখারি* : ২০০৪, *সহিহ মুসলিম* : ১১৩০।

CS CamScanner

এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও বলেছেন,

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُوْلَى وَ الْآخِرَةِ»

দুনিয়া এবং আখিরাতে, মারয়াম তনয় ঈসা ব্যাপারে অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমিই বেশি অধিকার রাখি।

তিনি আরও বলেছেন,

«الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَ دِيْنُهُمْ وَاحِدٌ»

সকল নবীগণ যেন একই পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, যাদের মা ভিন্ন। তবে তাদের ধর্ম এক।[৫৪৩]

এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার সকল নবীর প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি। তাহলে দেখুন, প্রকৃত ইসলামি মূল্যবোধ থেকে সৃষ্ট সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকৃত, সংকীর্ণ ও খণ্ডিত অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কত পার্থক্য আর কত ব্যবধান!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে এ সকল নবীগণের অবস্থান ও মর্যাদা ছিল এতটাই উচ্চ ও সমুন্নত। এমনকি যদি কখনো পূর্ববর্তী কোনো নবী থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশিত হতো, তিনি যার ভিন্নটা কামনা করছিলেন, তখনও নবীজি তাঁর আশা ব্যক্ত করার আগে সেই নবীর জন্য দোয়া করতেন, তারপর নিজের আশা ব্যক্ত করতেন। যেমন (খিজির আলাইহিস সালামের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের ঐতিহাসিক সেই সফরের ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করছিলেন) যদি মুসা আলাইহিস সালাম কৌতূহলের আতিশয্যে খিজির আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন না করে আরও ধৈর্য ধরতেন, ভালো হতো। এ বিষয়টি ব্যক্ত করার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন,

«يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا»

---

৫৪৩. *সহিহ বুখারি* : ৩৪৪২, ৩৪৪৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৬৫।

CamScanner

আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর রহম করুন। আমাদের কামনা পূর্ণ হতো, যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরও রহস্য বর্ণনা করা হতো।[৫৪৪]

(আরেকটি উদাহরণ। লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের অবাধ্য লোকেরা অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের মানুষ ছিল। তিনি তাদের অত্যাচার ও রূঢ় আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে একটি কথা বলেছিলেন।) কুরআনুল কারিম সেটা এভাবে বর্ণনা করেছে,

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾

তিনি বলতে লাগলেন হায়! তোমাদের মোকাবিলায় আমার যদি শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম! [সুরা হুদ : ৮০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করেন, লুত আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছেন, এখানে তার থেকে আরও উত্তম কথা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথাটি বলতে গিয়ে আগে দোয়া করেছেন এরপর সেই কথাটি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

«يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»

আল্লাহ তাআলা লুত আলাইহিস সালামের ওপর রহম করেন, তিনি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন![৫৪৫]

আর শুধু প্রশংসাই নয়, তাঁর সাহাবিদের থেকে কামনা করেছেন, তারা যেন পূর্ববর্তী ধর্মের অটল বিশ্বাসী অনুসারীদের নিজ নিজ জীবনের জন্য আদর্শ ও হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

এজন্য আমরা সেই ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি, যেখানে অন্য ধর্মের খাঁটি অনুসারীদের আমাদের জন্য উপমা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্ণনাটি এমন, খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার সাথে হেলান দিয়ে কাবার ছায়ায় বসে ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের ব্যাপারে অভিযোগ করে বললাম, 'আপনি কি আমাদের

---

৫৪৪. *সহিহ বুখারি* : ১২২, *সহিহ মুসলিম* : ২৩৮০।
৫৪৫. *সহিহ বুখারি* : ৩৩৭২, *সহিহ মুসলিম* : ১৫১।

CamScanner

জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যার জন্য মাটিতে গর্ত খনন করে তাকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো। এরপর করাত দিয়ে মাথাকে দিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। এমন অমানবিক নির্যাতনও তাকে তার দ্বীন থেকে টলাতে পারত না। আবার কাউকে লোহার চিরুনি এনে তার হাড্ডি থেকে গোশত খুলে ফেলা হতো। এটাও সে সহ্য করত। তারপরও কিছুতেই সে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করত না। আল্লাহর কসম! তিনি এই ধর্মকে এমন পূর্ণতায় পৌঁছে দেবেন যে, পথচারী নিজের বাহনে আরোহণ করে সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অথবা তার বকরিপালের ওপর বাঘের আক্রমণের ভয় ছাড়া আর কারও ভয় তার মনে থাকবে না। তবে তোমরা মূলত বেশি তাড়াহুড়া করছ।'[৫৪৬]

এই ছিল পূর্ববর্তী নবী-রাসুল ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি। নবুয়তপ্রাপ্তির সূচনা থেকেই নবীজির যাপিতজীবনের নীতিমালায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। সকল নবী হলেন বড় একটি অট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন ইটের মতো। একটি অট্টালিকার ইটসমূহ পরস্পরের বিরোধী নয়। এ কারণে সকল নবীর মাঝেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। আর সেই দায়িত্ব হলো, বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।

এ কারণে, আমরা মুসলিমজাতি আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণকে শুধু স্বীকৃতি প্রদান অথবা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ওপরই সীমিত থাকি না; বরং তাঁদেরকে আমরা গভীরভাবে ভালোবাসি ও সম্মান করি। অন্য সকল মানুষের ওপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করি। আর এমনটা হবেই-না কেন! আমাদের প্রতিপালক তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্য হতে তাদের নির্বাচন করেছেন এবং গোটা জগদ্বাসীর জন্য তাদের করেছেন অনুসৃত আদর্শ।

---

[৫৪৬]. *সহিহ বুখারি* : ৬৯৪৩, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬৪৯, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১১০৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ এবং রাসুলের জীবনচরিতের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। ইসলাম সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো, কুরআনুল কারিমে 'সালাম' (শান্তি) ও সালামের সমার্থক শব্দ এসেছে মোট একশ চল্লিশবার। অন্যদিকে হারব (যুদ্ধ) শব্দ এসেছে মাত্র ছয়বার। 'শান্তি' ও 'যুদ্ধ'-এর মাঝে এখানে সংখ্যাগত যে ব্যবধান, এটা 'শান্তি' ও 'যুদ্ধ'-এর ক্ষেত্রে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানকেই প্রকাশ করে। (চিত্র নং-৩)

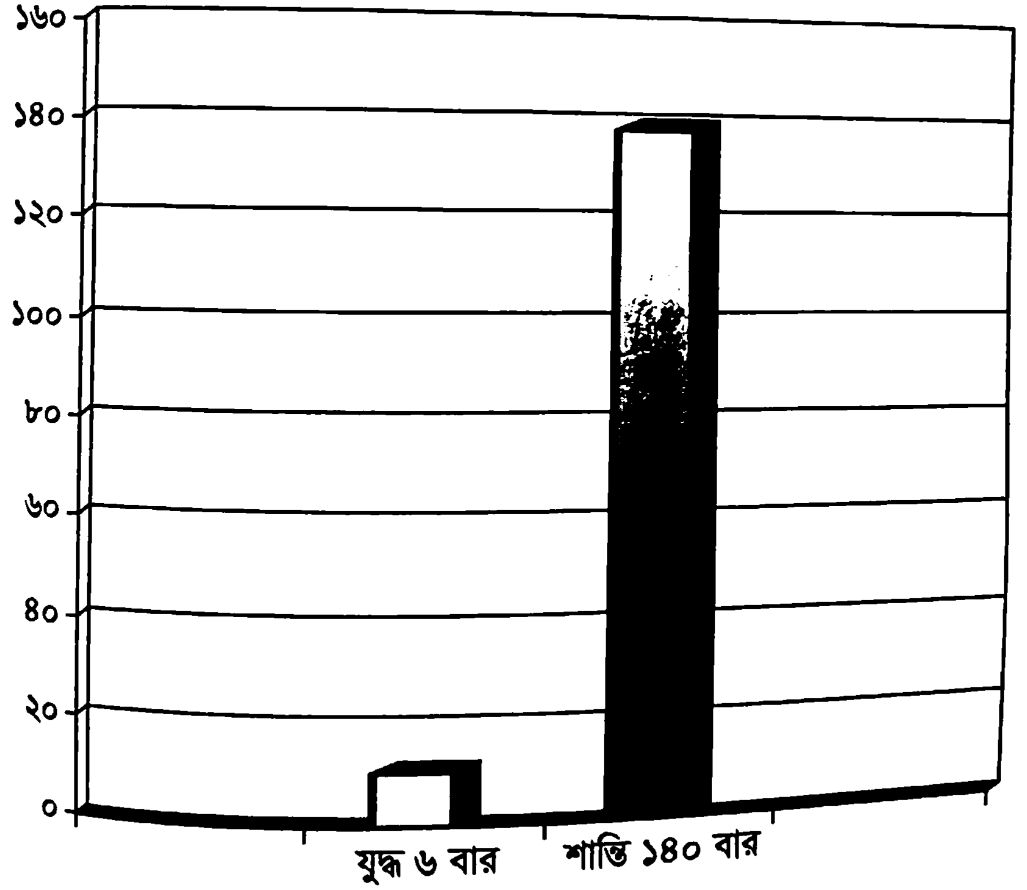

চিত্র নং-৩

আল-কুরআনে 'শান্তি' ও 'যুদ্ধ' শব্দদ্বয়

CamScanner

উভয়টির (শান্তি ও যুদ্ধ) বিষয়ে এই ব্যবধানগত প্রতিফলন ঘটেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারেও। এ কারণে আমরা দেখি, জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিপক্ষের সাথে সমস্যার সমাধানে শান্তি ও সন্ধির পথ খুঁজেছেন এবং যথাসম্ভব যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

তার এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবকে দৃঢ়তা দিয়েছে কুরআনুল কারিমের বহু আয়াত। এসব আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অমুসলিমরা যদি সন্ধি করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে মুসলমানরাও যেন তাদের সাথে সন্ধি করে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে। [সুরা আনফাল : ৬১]

কুরআনুল কারিমের এই আয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, মুসলমানগণ শান্তিপ্রিয়। শত্রুরা যদি তাদের সাথে সন্ধি করতে চায়, তাহলে তাদের সাথে তারা সন্ধি করতে সর্বদা প্রস্তুত, যদি না এই সন্ধির কারণে মুসলমানদের সামষ্টিক কোনো অধিকার বিনষ্ট হয় কিংবা তাদের প্রধান কোনো লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটে। এ কারণে শাইখ মাহমুদ শালতুত[৫৪৭] বলেন, শান্ত পরিবেশই প্রকৃত পরিবেশ। এটাই মূলত মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক তৈরি করে এবং মানুষের মাঝে কল্যাণকর বিষয়াবলি ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। অমুসলিমরা যদি শান্তির পরিবেশ ধরে রাখে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে তারা ও মুসলমানগণ সকলেই ভাই ভাই।[৫৪৮]

---

৫৪৭. মাহমুদ শালতুত (১৩১০-১৩৮৩ হি./১৮৯৩-১৯৬৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন মিশরীয় একজন ফকিহ ও মুফাসসির। বুহাইরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মিশরের আল-আজহার থেকে পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। আল-আজহারে শরিয়া ফ্যাকাল্টির ওয়াকিল হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর ১৯৫৮ সাল থেকে আমৃত্যু আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাইখুল আজহার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার অনেক কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার বিশেষ কয়েকটি রচনা হলো, *ফিকহুল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ*, *মুকারনাতুল মাজাহিব*, *ওয়া-ইয়াসআলুনাকা*। ১৯৬৩ সালে ইনতেকাল করেন। সূত্র : যিরিকলি : *আল-আলাম* : ৭/১৭৩।

৫৪৮. মাহমুদ শালতুত : *আল-ইসলাম আকিদাতান ও শারইয়্যাতান* : ৪৫৩।

CamScanner

এসব কারণে শান্তিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের জন্য প্রত্যাশিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন এবং আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করেছেন। তিনি দুআ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি প্রার্থনা করি। [*আবু দাউদ* : ৫০৭৪, *ইবনে মাজাহ* : ৩৮৭১]

এমনইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারব বা যুদ্ধ শব্দটি অপছন্দ করতেন, এমনকি তা শুনতেও চাইতেন না। হাদিসে এসেছে,

«أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ»

আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। অধিক খাঁটি নাম হারেস ও হাম্মাম এবং নিকৃষ্টতম নাম হারব (যুদ্ধ) ও মুররা। [*আবু দাউদ* : ৪৯৫০, *নাসায়ি* : ৩৫৬৮]

শান্ত সময়ে অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ আচরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুশরিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অমুসলিম এলাকা ও রাষ্ট্রের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুশরিকদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

মক্কার মুশরিকদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার ছিল এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। একদিকে তিনি তাঁর সকল শক্তিসামর্থ্য, ধনসম্পদ ব্যয় করেছেন মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করার জন্যে, অপরদিকে মুশরিকরা শুধু তাঁর বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাঁর সাথে এবং তাঁর সাহাবিদের সাথে সকল ধরনের কঠোর ও রূঢ় আচরণ এবং অত্যাচারের সর্বোচ্চটা দেখিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করা পরিত্যাগ করেননি, যা ছিল তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার একমাত্র পথ।

মক্কার মুশরিকদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচারব্যবহারে মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যথা :

১. কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে দোয়া করা। এভাবে তিনি সকল মুশরিকের হেদায়েতের জন্যই দোয়া করতেন। এমনকি যারা তাঁর সাথে বিশেষ শত্রুতা পোষণ করত, যেমন আবু জাহেল ও উমর ইবনুল খাত্তাব (ইসলাম গ্রহণের আগে)-এর জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন। নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দুজন তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতায় ছিল বেশি প্রসিদ্ধ, তীব্র ঝগড়াটে ও প্রচণ্ড শক্তিশালী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ার মধ্যে বলতেন,

«اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ»

হে আল্লাহ, আবু জাহেল ও উমর ইবনুল খাত্তাব, এ দুজনের মধ্যে যে আপনার নিকট বেশি পছন্দনীয়, তাঁর মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, তবে এ

CS CamScanner

দুজনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট উমর ইবনুল খাত্তাবই বেশি পছন্দনীয় ছিলেন।[৫৪৯]

২. নবীজি বেশি বেশি সুসংবাদ দিতেন। তাঁর জীবনের সকল কথা ও কাজের মধ্যে এই সুসংবাদ প্রদানের প্রতিচ্ছবিই সবচেয়ে বেশি ভেসে ওঠে। মুশরিকদের শত বিরোধিতা ও কঠোরতার পরও তিনি তাঁর এ স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য থেকে বিন্দুপরিমাণও সরে আসেননি। রবিআ ইবনে ইবাদ দাইলি রা. থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। ঘটনাটি ঘটার সময় তিনি অমুসলিম ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম স্বচক্ষে দেখি 'জুল মাজাজ' বাজারে। তিনি বলছিলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»

'হে মানব সকল, তোমরা ঘোষণা করো এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে...।' তিনি একটি প্রশস্ত পথ দিয়ে হাঁটছিলেন আর মানুষেরা তাঁর চতুর্দিকে ভিড় করছিল। তিনি অব্যাহতভাবে এই একই কথা বলে যাচ্ছিলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»

কিন্তু আমি কাউকে কোনো কথা বলতে শুনলাম না। তবে তার পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি, যার চেহারা উজ্জ্বল তবে চোখ দুটো টেরা আর চুলে দুটি বেণি করা। এই লোকটি নবীজিকে লক্ষ করে একাধারে বলে যাচ্ছে, এ ধর্মত্যাগী! এ মিথ্যুক! তোমরা এর কথা শোনো না।'

আমি মানুষদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি কে?' লোকেরা বলল, 'তিনি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি নবুয়তের কথা বলছেন।'

পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর এই লোকটা কে, যে তাঁকে মিথ্যুক বলছে?'

লোকেরা জানাল, 'সে তাঁরই চাচা আবু লাহাব।'[৫৫০]

---

৫৪৯. সুনানে তিরমিজি : ৩৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ : ৫৬৯৬, মুসতাদরাকে হাকেম : ৪৪৮৫, মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬০৩৬।

৫৫০. মুসনাদে আহমাদ : ১৯০২৬, মুসতাদরাকে হাকেম : ৩৯।

আবু লাহাবের এমন প্রকাশ্য বিরোধিতা, হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আচারব্যবহারের স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। তিনি মানুষদের সুসংবাদ শোনানোর পদ্ধতিতে অটল থেকে তাদের মুক্তি ও সফলতার দিকে আহ্বান করে গেছেন। বরং তিনি সুসংবাদ প্রদানের কর্মপন্থায় আখিরাতের অজস্র নেয়ামতপ্রাপ্তির আগে দুনিয়ার রাজত্বেরও সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তবে শর্ত হলো, আল্লাহর ওপর ঈমান রাখা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলের চাচা আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কুরাইশের লোকেরা তাকে দেখতে এলো। নবীজিও তাকে দেখতে এলেন। আবু তালিবের শিয়রে মাত্র একজনের বসার মতো জায়গা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আবু জাহেল সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল, যাতে তাকে আবু তালিবের সাথে একাকী আলাপে বাধা দিতে পারে। সে সময় কুরাইশদের আগত লোকেরা রাসুলের ব্যাপারে আবু তালিবের কাছে অনেকরকম অভিযোগ করল। ফলে আবু তালিব বললেন, 'হে ভাতিজা, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে আসলে কী চাও?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'আমি তাদের থেকে একটিমাত্র কালেমার ঘোষণা চাই, যে কালেমার মাধ্যমে আরবজাতির সকলেই তাদের অনুগামী হয়ে যাবে এবং অনারবগণও তাদের কর দিয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।'

আবু তালিব বললেন, 'মাত্র একটি কালেমা?!'

নবীজি বললেন, 'জি, মাত্র একটি কালেমা। হে চাচা! আপনারা শুধু ঘোষণা করুন, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।'

কথাটি শোনামাত্র কুরাইশের লোকেরা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'একজনমাত্র উপাস্য? এমন কথা তো পূর্বের কোনো ধর্মে আমরা শুনিনি। নিঃসন্দেহে এটা একটা বানোয়াট কথা।'

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এই কথার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে নাজিল করেন,

CamScanner

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ থেকে নিয়ে ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا
إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ -পর্যন্ত মোট সাতটি আয়াত।[৫৫১]

এখানে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কোনো ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করেননি। তাদের সঙ্গে ওঠাবসাও ত্যাগ করেননি। তাদের দিকে তিনি অহংকার ও উপেক্ষার দৃষ্টিতেও তাকাননি। বরং তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং ঈমানগ্রহণের শর্তে তাদের দুনিয়ার রাজত্ব এবং আখিরাতের অফুরন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

৩. মুশরিকদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা। আলাপ করা। এটা ছিল মূলত কুরআনুল কারিমের বিশেষ বাক্-রীতি বা আলাপচারিতার অনুসরণ। এ বিষয়ে কুরআনুল কারিমে অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

বলো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তোমাদের রিজিক দান করেন? বলো, তিনি আল্লাহ! এবং আমরা অথবা তোমরা হয়তো হেদায়েতের ওপর আছি অথবা স্পষ্ট গোমরাহিতে।

বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কেও আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। বলো, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। [সুরা সাবা : ২৪-২৬][৫৫২]

---

[৫৫১]. *সুনানে তিরমিজি* : ৩২৩২, *মুসনাদে আহমাদ* : ২০০৮, *ইবনে হিব্বান* : ৬৬৮৬।
[৫৫২]. সকলেই বলেন, সুরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। তবে একটি আয়াত নিয়ে কিছুটা ইখতেলাফ রয়েছে। দেখুন, ইমাম কুরতুবি : *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন* : ১৪/২৫৮।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভালো করেই জানতেন যে, তিনি সত্য ও হেদায়েতের ওপর আছেন। তারপরও আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন মুশরিকদের সাথে সংলাপে বসেন এবং আলোচনার সূচনা হবে এ কথা বলে,

﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা (যেকোনো একটা দল) হেদায়েতের ওপর আছি কিংবা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে আছি। [সূরা সাবা : ২৪]

অর্থাৎ আমরা এবং তোমরা এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের মধ্যকার যেকোনো একটা দল সত্যের ওপর আছে আর আরেকটি দল আছে গোমরাহির মধ্যে। এখন আমাদের করণীয় হলো, পরস্পর সংলাপে বসা এবং তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে আলোচনা করা, যাতে আমরা সকলেই সেই অজানা বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। নিঃসন্দেহে এটিই হলো একটি আদর্শিক সংলাপের সর্বোত্তম পন্থা। উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচারের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ।

এরপর আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন, কীভাবে তিনি তাদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ভব্যতা বজায় রাখবেন! আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আপনি এভাবে বলবেন,

﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কেও আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসুলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'জুরম' বা অপরাধকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করতে। আর আরবিতে 'জুরম' শব্দটি সাধারণত ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'আমাল' শব্দকে, যা ভালো-মন্দ উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। এরপর সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন। আমাদের মাঝে সঠিক ফয়সালা করে দেবেন।

সেদিন আমরা জানতে পারব, কারা সঠিক পথের ওপর ছিল আর কারা ছিল গোমরাহির মধ্যে।

সন্দেহ নেই, পারস্পরিক সংলাপের সম্ভাব্য সকল পদ্ধতির মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। এখানে অন্ধ দলপ্রীতি নেই। কঠোরতা নেই। বরং আছে সভ্যতা ও শিষ্টাচারের পূর্ণ প্রকাশ। রয়েছে প্রতিপক্ষের প্রতি পূর্ণ সম্মানপ্রদর্শন এবং তাদের যথাযথ মূল্যায়ন।

কুরআনুল কারিমে এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে। সেগুলোর সব এখানে একত্র করা অনেক কষ্টকর এবং তাতে পরিসরও দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তবে এখানে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করেছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সকল নির্দেশনাকে দাওয়াতের অঙ্গনে পরিপূর্ণ কাজে লাগিয়েছেন। তাই এ সকল আয়াত আমাদের সামনে মক্কার মুশরিকদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহানুভূতিপূর্ণ আচারব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত ও মহান পন্থা-পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ।

৪. মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার ও শত্রুতার ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন ধৈর্যধারণ। উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার জানামতে নবীজির সাথে মুশরিকদের সবচেয়ে কঠোর আচরণ কী ছিল?

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বললেন, একদিন আমি দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছেন। এ সময় উকবা ইবনে আবি মুয়িত তার কাছে এলো। নিজের গায়ের চাদর খুলল। এরপর চাদরটা দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলা পেঁচিয়ে খুব জোরে কষে টানতে লাগল। ঘটনাক্রমে সে সময় হজরত আবু বকর রা. সেখানে চলে এলেন। তিনি এসে উকবাকে রাসুল থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন,

﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার রব? তিনি তাঁর দাবির পক্ষে তোমাদের রবের কাছ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণও এনেছেন। [সুরা গাফির : ২৮][৫৫৩]

এ ছাড়াও মক্কার কাফেররা তাঁর ব্যাপারে পাগল, জাদুকর ইত্যাদি মন্দ উপাধি লাগানোর চেষ্টা করেছে। অথচ তিনি ছিলেন এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এগুলো বলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তাঁর আনীত বাণীসমূহকে পাগলের প্রলাপ বলে চালিয়ে দেওয়া। অথচ তা ছিল সত্য ও সঠিক, সকল জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বার্তা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার যিমাদ আযদি মক্কায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন আযদে শানুআ গোত্রের লোক। তিনি পাগলামির চিকিৎসা করতে পারতেন। তিনি মক্কায় এসে কিছু নির্বোধ লোককে বলে বেড়াতে শুনলেন, 'মুহাম্মাদ পাগল।' এ কথা শুনে তিনি মনে মনে ভাবলেন, আহা! এই লোকটার যদি দেখা পেতাম, তাহলে হয়তো আমার হাতে আল্লাহ তাআলা তার পাগলামির সুস্থতা দান করতেন!

বর্ণনাকারী বলেন, শেষমেশ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার দেখা হয়ে গেল। তিনি তখন রাসুলকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি এই পাগলামির চিকিৎসা করতে পারি। আমার হাতে আল্লাহ অনেক পাগলের সুস্থতা দান করেছেন। আপনি চাইলে আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারি!'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ করে বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দেন, কেউ তাকে গোমরা করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

---

৫৫৩. *সহিহ বুখারি : ৩৪৭৫, মুসনাদে আহমাদ : ৬৯০৮।*

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো বলে কিছুটা থামতেই যিমাদ বললেন, 'অনুগ্রহ করে আপনার কথাগুলো আমাকে আবার একটু শোনান।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো আবার তাকে শোনালেন। এভাবে মোট তিনবার তিনি কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর যিমাদ বললেন, 'আমি জ্যোতিষীদের কথা শুনেছি। জাদুকরদের কথা শুনেছি। শুনেছি বহু কবিদের কবিতামালা। কিন্তু আপনার এই কথার মতো কোনো কথা আমি জীবনে শুনিনি। কথাগুলো পৌঁছেছে সীমাহীন গভীরতায়...। আপনি আপনার হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিন, আমি এখনই ইসলামের ওপর বাইআত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করি।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং যিমাদ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে নিলেন...।[৫৫৪]

চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচার অত্যধিক বেড়ে গেল। বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থকার ইবনে হিশাম বলেন, 'চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মুশরিকরা এমন অত্যাচার শুরু করেছিল, তাঁর জীবদ্দশায় যে অত্যাচারের কথা কল্পনাও করা যায়নি। একবার তো কুরাইশের এক নির্বোধ তাঁর মাথায় মাটি ছুড়ে মারল। নবীজি মাটি মাথায় বাড়িতে ফিরে এলেন। তখন নবীজির এক মেয়ে এগিয়ে এসে তাঁর মাথা থেকে মাটি ধুতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। তিনি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে আমার মেয়ে, কেঁদো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।'[৫৫৫]

আমরা বর্ণনা করেছি, মুশরিকদের এত জুলুম-নির্যাতনের পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে আচার-আচরণ বাদ দেননি। ওঠাবসা পরিত্যাগ করেননি। বরং এরপরও তাদের সাথে সুন্দরভাবে ক্রয়-বিক্রয়সহ সকল লেনদেন চালিয়ে গেছেন। এর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো নবুয়তের সপ্তম বছরের ঘটনাবলি।[৫৫৬] এ সময় মুসলমানদের সাথে কুরাইশরা খুবই অমানবিক আচরণ করে। কুরাইশের সকল গোত্র মিলে

---

৫৫৪. *সহিহ মুসলিম* : ৮৬৮, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৬৫৬৮।
৫৫৫. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪১৬।
৫৫৬. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪৩-৭১, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩৫০।

CamScanner

বনু হাশেমসহ মুসলমানদের সাথে অন্যায়ভাবে অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করে।

এরচেয়েও বড় কথা হলো, কুরাইশরা নবীজির নিকট যে আমানতগুলো রেখেছিল, তিনি সেগুলো যথাযথ পাওনাদারদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ হিজরতের সেই ভয়াবহ রাতে কুরাইশের এইসব লোকই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তবুও তিনি তাদের আমানতগুলো যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের বিছানায় রেখে যান হজরত আলি ইবনে আবি তালিবকে।[৫৫৭]

কাফেরদের সীমাহীন অনাচার-অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি নিজের দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আল্লাহর নিকট তাদের ধ্বংস কামনা করেননি। তাই যখন পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত আল্লাহ তাআলার বিশেষ ফিরেশতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি চাইলে আমি তাদেরকে জাবালে আবি কুবাইস ও জাবালে কুআইকিআনের নিচে পিষ্ট করে মেরে ফেলতে পারি!' উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

> আমি তো আশা করি, আল্লাহ তাআলা তাদের পরবর্তীদের থেকে এমন প্রজন্ম সৃষ্টি করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।[৫৫৮]

কুরাইশের মুশরিকদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার ছিল এমনই দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ। এটাও তাঁর নবুয়তের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ, কুরাইশের সাথে তিনি যে ধরনের আচরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ খোদাপ্রদত্ত ঐশী নীতিমালা, যার মূল উৎস ছিল কুরআনুল কারিম।

---

৫৫৭. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/২৩৪, ২৭০, ২৯০; ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪৮৫।

৫৫৮. *সহিহ বুখারি* : ৩২৩১, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৫।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। সেখানকার সংখ্যালঘু অমুসলিম ইহুদি ও মুশরিকরা তাঁর নেতৃত্বে মদিনার অভ্যন্তরে বসবাস করতে থাকে। ধীরে ধীরে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বাড়তে থাকে। তখন সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানরাও মদিনা-রাষ্ট্রের আওতায় চলে আসে। এভাবে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে মদিনায় বসবাস করত। সকল সংখ্যালঘুরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিলের শুরু থেকেই ইসলাম মানুষের এই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যাতে এ স্বাধীনতার মাধ্যমে মানবতার বিকাশ ঘটে এবং মনুষ্যত্ব সৌভাগ্য অর্জন করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত ছিল অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। অথচ তিনি নিজে এবং প্রথম সারির সাহাবিগণ মক্কার মুশরিকদের থেকে হাজার রকমের জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই কাফের ও মুশরিকদের ক্ষেত্রে তেমন আচরণ করেননি। এমনকি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও সাহায্যে তিনি যখন কাফের-মুশরিকদের ওপর বিজয় অর্জন করেছেন, তখনও তিনি তাদের থেকে আগের সেই আচরণের কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি কখনোই পছন্দ করেননি যে, অন্যের ওপর এমন বিশ্বাস চাপিয়ে দেবেন, যা সে মন থেকে মেনে নিতে পারবে না। এটাই মূলত পবিত্র কুরআনের নির্দেশের বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

CamScanner

[illegible]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [illegible] এই [illegible]

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই, হেদায়েতের পথ গোমরাহি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সূরা বাকারা: ২৫৬

শানে নুযূল: [illegible] এক ব্যক্তি ছিলেন। তার ছিল দুটি পুত্রসন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের আগেই তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং [illegible] ব্যবসার উদ্দেশ্যে একবার [illegible] তারা এক খ্রিস্টান দলের সাথে মদিনায় আগমন করে। তাদের পিতা তাদের ধরে রাখেন এবং বললেন, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের ছাড়ব না। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে আনসারী সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার [illegible] একটি অংশ (সন্তান পিতার অংশবিশেষ) জাহান্নামে যাবে? তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।

তখন তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।[২২১]

একটি ছিল পিতার প্রতি সন্তানের [illegible]। পিতা মুসলমান, সন্তানরা খ্রিস্টান। সন্তানরা [illegible] শুধু তাদের পিতারই বিরোধী নয়,

---

[illegible] : ৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও বিরোধী। এরপরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি সন্তানদের নিজেদের বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দাও। তাদের ধর্মকর্ম পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না। অথচ ইসলামে সন্তানের ওপর পিতার আনুগত্য করা একটি আবশ্যক কর্ম।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার প্রথম সংবিধানেও ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা তিনি ইহুদিদের ব্যাপারে এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, তারা মদিনাতে মুসলমানদের সাথেই এক জনগোষ্ঠী হয়ে বসবাস করবে।[৫৬০]

এভাবে সকল বিষয়েই অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল ন্যায়পূর্ণ। এ সম্পর্কে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। একশ ত্রিশজনের এক বিশাল কাফেলা। দীর্ঘ সফরে একসময় আমাদের খাদ্য ফুরিয়ে যেতে লাগল। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের কারও কাছে কি খাবার আছে?' তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একজনের কাছে এক সা' বা এর কাছাকাছি পরিমাণ খাবার আছে। সেটাকেই খামির বানানো হলো। এ সময় সেখানে এক মুশরিকের আগমন ঘটল। চুল এলোমেলো। দেখতে কিছুটা লম্বাটে। সে তার ছাগলপাল চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন, '(আমাদের গোশতের প্রয়োজন। এখন তোমার ছাগল) বিক্রয় হিসেবে বা হাদিয়া হিসেবে দিতে পারো?'[৫৬১]

লোকটি বলল, 'বিক্রয় হিসেবে দেবো।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে একটি ছাগল কিনে নিলেন। জবাই করে গোশত প্রস্তুত করা হলো। কলিজা ভুনা করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই একটি কলিজাকে কেটে কেটে আমাদের একশ

---

[৫৬০]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫০১, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/২৬০, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৩২১।

[৫৬১]. এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় কাফেরদের সাথে কেনাবেচা করা বৈধ। তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণও বৈধ। সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানি : *ফাতহুল বারি* : ৪/৪১০।

CamScanner

ত্রিশজনকেই এক টুকরা করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল তাকে তৎক্ষণাৎ দিলেন আর যে অনুপস্থিত ছিল তার জন্য রেখে দিলেন। আর গোশত-রুটিকে দুটি পাত্রে ভাগ করা হলো। আমরা সকলেই সেখান থেকে তৃপ্তিভরে খেলাম। এমনকি দুইপাত্র খাবার অতিরিক্ত রয়ে গেল। সেগুলো আমরা আবার উটের পিঠে বহন করে নিলাম।[৫৬২]

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশ ত্রিশজনের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে সফর করছিলেন। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একজন মুশরিক নিজের ছাগলপাল নিয়ে যাচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির থেকে যথাযথ মূল্য দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করলেন। তার ওপর কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি করেননি। বিনামূল্যে ছাগল দিতে বাধ্যও করেননি। অথচ তাদের খাদ্যের ভীষণ প্রয়োজন ছিল, কেড়ে নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতাও ছিল। আর লোকটিও ছিল মন্দ আকিদার, মুশরিক। তাই এতে রয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আশপাশের অমুসলিমদের সাথে তেমন আচরণই করেছেন, যেমনটা কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে করে। এ সম্পর্কে আনাস রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্চর্য এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ইহুদি বালক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করত। একবার সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে দেখতে তার বাড়িতে গেলেন। তার শিয়রে গিয়ে বসলেন। তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি ইসলামগ্রহণ করে নাও।' বালকটি তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বলল, 'তুমি আবুল কাসেম (রাসুলের উপনাম)—এর কথা মেনে নাও।'

বালকটি ইসলামগ্রহণ করে নিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি বালকটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিলেন।[৫৬৩]

---

৫৬২. *সহিহ বুখারি* : ২৬১৮, ৫৩৮২; *সহিহ মুসলিম* : ২০৫২।
৫৬৩. *সহিহ বুখারি* : ১৩৫৬, *সুনানে তিরমিজি* : ২২৪৭, *সুনানে নাসায়ি* : ৭৫০০।

এ ছাড়া তিনি আসমা বিনতে আবু বকর রা.-কে[৫৬৪] তার মায়ের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আসমা রা. নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, মক্কার কুরাইশদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধির সময় আমার আম্মা[৫৬৫] আমার নিকট এলেন। তখন তিনি ছিলেন মুশরিক। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বললাম, 'হে আল্লাহর নবী, আমার আম্মা আমার কাছে এসেছেন। আর তিনি আমার নিকট ভালো আচরণের আশা করেন। আমি কি তার সাথে ভালো আচরণ করব?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করো।'[৫৬৬]

ভাবতে অবাক লাগে, চারিত্রিক উৎকর্ষের কতটা উচ্চতর শিক্ষা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিয়েছেন, যখন তিনি পাশ দিয়ে অতিক্রম করা একজন ইহুদির লাশের প্রতি সম্মানজনক আচরণ দেখিয়েছেন! ইবনে আবি লায়লা বলেন, কায়েস ইবনে সাদ[৫৬৭] এবং সাহল ইবনে হুনাইফ[৫৬৮] কাদেসিয়ার একটি স্থানে বসা ছিলেন। তখন

---

৫৬৪. আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনি ছিলেন যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের স্ত্রী। তিনি মক্কায় থাকাকালে ইসলামগ্রহণ করেন। অতঃপর যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন তার গর্ভে ছিল আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রা.। কোবায় তাকে প্রসব করেন। তিনি ৭৩ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন। সূত্র : ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৬/১২, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ১০৭৯১।

৫৬৫. তিনি কুতাইলা বিনতে সাদ। তিনি ছিলেন বনু আমের বিন লুআই গোত্রের। আবু বকর রা.-এর স্ত্রী। তিনি আবদুল্লাহ এবং আসমার রা.-এর মা। ইবনুল আছির তাকে মহিলা সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন কিছুটা বিলম্বে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি যখন মদিনায় আসেন, তখনও তিনি মুশরিকা ছিলেন। সূত্র : ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ*: ৬/২৪২।

৫৬৬. *সহিহ বুখারি* : ২৬২০, *সহিহ মুসলিম* : ১০০৩।

৫৬৭. কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা রা.। একজন বিচক্ষণ আরব। চৌকস এবং যুদ্ধের বিষয়ে খুবই কৌশলী। তিনি ছিলেন তার গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে পাহারাদারির আমির ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতেই পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কায় ৫৯ বা ৬০ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন। দেখুন, ইবনে আবদুল বার : *আল-ইসতিআব* : ৩/৩৫০, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৪/২৭২, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ৭১৭৬।

৫৬৮. সাহল বিন হুনাইফ ইবনে ওয়াহেব রা.। বদরসহ সকল যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন। উহুদযুদ্ধের সময়ও তিনি যুদ্ধের ময়দানে অটল অনড় ছিলেন। আলি রা. যখন বসরা গমন করেন, তখন তিনি তাকে মদিনায় প্রতিনিধি হিসেবে রেখে

পাশ দিয়ে একটি জানাজা যেতে দেখে তারা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যরা বলতে লাগল, 'এটা এক জিম্মির (অমুসলিমের) জানাজা!'

তখন তারা বললেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাজা অতিক্রম করছিল। তিনি সেটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাহাবিগণ বললেন, এটা তো একজন ইহুদির জানাজা! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাতে কী হয়েছে! أَلَيْسَتْ نَفْسًا–সে কি একজন মানুষ নয়?!'(৫৬৯)

তিনিই হলেন আমাদের আদর্শ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিজের উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন অমুসলিমদের সম্মান করতে, এমনকি তাদের মৃতদেরকেও।

খুব চমৎকার হয়, আমরা যদি খায়বারের ইহুদিদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের ঘটনার মাধ্যমে এভাবে আলোচনার সমাপ্তি টানি :

ইহুদিরা পরাজিত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন ইহুদিদের অবস্থান ছিল দুর্বল। আর মুসলমানরা ছিল শক্তিশালী। মুসলমানগণ যদি সে সময় জোর করে নিজেদের সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইত, তাহলে তাদের বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এই স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সাহল ইবনে আবি হাসমা রা. বলেন, একবার তার গোত্রের কিছু লোক খায়বার এলাকায় গমন করে। এরপর সেখানে তারা কাজের জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা তাদের এক সঙ্গীকে মৃত অবস্থায় পায়। যে স্থানে লাশ পাওয়া যায়, সেখানকার লোকদেরকেই তারা হত্যাকারী মনে করে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলে, 'তোমরাই আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছ!' কিন্তু ইহুদিরা তা অস্বীকার করে এবং বলে,

---

যান এবং সাহল রা. সিফফিনের যুদ্ধের সময় আলি রা.-এর সাথে অবস্থান করেন। আলি রা. পরে তাকে পারস্যের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ৮৮ হিজরি সনে কুফায় ইনতেকাল করেন। দেখুন, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ২/৩৩৫, ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ৫৩২৩, ইবনে আবদুল বার : *আল-ইসতিআব* : ২/২২৩।

৫৬৯. *সহিহ বুখারি* : ১৩১৩, *সহিহ মুসলিম* : ৯৬১।

'আমরা তাকে হত্যা করিনি। আর কে হত্যা করেছে তাও আমরা জানি না।'

তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা খায়বারে গিয়েছিলাম। এরপর আমরা আমাদের এক সাথিকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। (ঘটনাক্রমে কথাগুলো বলছিল দলের মধ্যে ছোট একজন, সে কারণে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বড়কে আগে কথা বলতে দাও।' এভাবে কয়েকবার বললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা কি সাক্ষী পেশ করতে পারবে, কে তাকে হত্যা করেছে?' তারা বললেন, 'আমাদের কাছে তো কোনো সাক্ষী নেই।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে ইহুদিরা কসম করে মামলার নিষ্পত্তি করবে।'

'মুসলমান বাদীগণ' বললেন, 'আমরা ইহুদিদের কসমের প্রতি সন্তুষ্ট নই। (কারণ, মিথ্যা বলা তাদের চির অভ্যাস)।' কিন্তু সিদ্ধান্ত এটাই থাকল। তবে নিহত ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাবে ভেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বাইতুল মাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বাদীদেরকে (নিহত ব্যক্তির পরিবারকে) একশ উট দিয়াত (রক্তমূল্য) হিসাবে দিয়ে দিলেন।[৫৭০]

লক্ষ করুন, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ইহুদিদের এলাকায়। সমূহ সম্ভাবনা আছে, এটা তাদেরই কারও কাজ। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহাবিদের নিকট অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই। ব্যাপারটি রয়ে গেছে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে। আর কিসাসের দাবি আদায়ের জন্য প্রমাণ হিসাবে এতটুকু যথেষ্ট নয়। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদেরকে কোনো ধরনের শাস্তির মুখোমুখি করেননি। বরং তাদেরকে শুধু কসম করতে বলেছেন যে, তারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি (পরে ইহুদিরা কসম করে মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়)। ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বাইতুল মাল থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করে দিয়েছেন। যাতে আনসারি ওই সাহাবিদের অন্তর শান্ত হয়ে যায়।

৫৭০. সহিহ [illegible]

ইহুদিদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো ক্ষোভ না থাকে। আর এভাবেই তিনি একটি ফেতনার নিরসন করেন, ইহুদিদের কোনো ক্ষতি না করে।

এই ছিল মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার, যার ভিত্তি ছিল ন্যায়পরতা, দয়া-অনুগ্রহ এবং উদারতা।

CS CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অমুসলিম এলাকা ও রাষ্ট্রের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁকে বানিয়েছেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল। সেইসাথে তাঁকে সুদৃঢ় করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দ্বারা। এটি এমন এক উৎস, যার থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহরণ করেছেন অমুসলিমদের সাথে আচারব্যবহারের নীতিমালা, সেটা একক ব্যক্তি হিসেবে হোক বা রাষ্ট্র হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

এবং (হে নবী,) আপনাকে সকল মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। [সুরা সাবা : ২৮]

এ কারণে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত শুধু আরবভূখণ্ড বা তার আশপাশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আমরা দেখি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় বিভিন্ন রাজা-বাদশার কাছে অনেক চিঠি প্রেরণ করেছেন। সেইসব চিঠিতে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। **(পত্রাবলির চিত্রসমূহ ও মানচিত্র নং-৪)** লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রতিটি চিঠিতে তিনি সেই রাজা বা বাদশাহকে সম্মানের সাথে 'মালিক' বা 'আজিম' বলে সম্বোধন করেছেন। সেই অমুসলিম বাদশাকে এইসব গুণে সম্বোধন করতে তিনি সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করেননি। যেমন রোমের সম্রাটের নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত চিঠির ভাষ্য ছিল এমন :

CS CamScanner

مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ...

আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের ক্ষমতাসীন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশে প্রেরিত... ।[৫৭১]

পারস্যের সম্রাটের নিকট প্রেরিত চিঠির ভাষ্য ছিল এমন :

مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيْمِ فَارِسٍ...

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের ক্ষমতাসীন সম্রাট কিসরার উদ্দেশে প্রেরিত... ।[৫৭২]

মিশরের সম্রাটের নিকট প্রেরিত চিঠির ভাষ্য ছিল এমন :

مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ...

আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মিশরের ক্ষমতাসীন সম্রাট মুকাওকিসের উদ্দেশে প্রেরিত... ।[৫৭৩]

এভাবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে লিখেছিলেন :

هٰذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَمِ عَظِيْمِ الْحَبْشَةِ

এটা নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার ক্ষমতাসীন বাদশাহ আসহাম নাজাশির উদ্দেশে প্রেরিত চিঠি... ।[৫৭৪]

আমরা আরও দেখি, তিনি পারস্যের সম্রাট কিসরার প্রেরিত দূতদ্বয়কেও সম্মান দেখিয়েছেন, অথচ তারা কিসরার পক্ষ থেকে এনেছিল এক অবাঞ্ছিত বার্তা। তারা এসেছিল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্থান মদিনা থেকে ধরে নিয়ে সম্রাট কিসরার সামনে হাজির করার জন্য। এরপরও তিনি তাদের সাথে আচরণে নিজের শান্ত-সৌম্য শিষ্টাচার ও স্বভাবের কোমলতা থেকে বিচ্যুত হননি। বরং তিনি মদিনায় আগত সকল প্রতিনিধিদলকেই সম্মান দেখাতেন। তারা কোন রাষ্ট্রের বা কোন ধর্মের এগুলো তার কাছে মুখ্য ছিল না। সকল

---

৫৭১. *সহিহ বুখারি* : ৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৩।

৫৭২. খতিব বাগদাদি : *তারিখে বাগদাদ* : ১/১৩২, *কানজুল উম্মাল* : ১১৩০২।

৫৭৩. যাইলায়ি : *নাসবুর রায়া* : ৪/৪২১, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ২/৩৩১, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৬৯১।

৫৭৪. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪১, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ১১/৩৬৬।

CamScanner

প্রতিনিধিদলকেই স্বাগত জানানো, মেহমানদারি করা, সুন্দর আচরণ করা এবং উপঢৌকন প্রেরণে তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাই পারস্যের দূতদ্বয়কেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরভাবে স্বাগত জানান, চমৎকার মেহমানদারি করেন, বারবার মেহমানদের নিকট গিয়ে খোঁজখবর নেন এবং তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিজের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করেন।[৫৭৫]

প্রতিনিধিদলের যথাযথ মেহমানদারির জন্য তিনি আলাদা একটি কামরার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। যেমনটি সালামান গোত্রের প্রতিনিধিদলের অভ্যর্থনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের খাদেম সাওবানকে বললেন, 'তাদেরকে সেই কামরায় নিয়ে যাও, যেখানে প্রতিনিধিদল অবস্থান করে।'[৫৭৬]

এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায়, এইসব প্রতিনিধিদলের জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিলাব, মুহারিব, উজরা, আবদে কায়েস, তাগলিব, গাস্সান প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথেও এমনটি করা হয়েছিল।[৫৭৭]

তা ছাড়া, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি অভ্যাস ছিল, এইসব প্রতিনিধিদলকে বিদায়ের সময় হাদিয়া-তোহফা প্রদান করতেন। হাদিয়াগুলোর অধিকাংশ হতো রুপার তৈরি।[৫৭৮]

অপরদিকে তিনি নিজেও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের উন্নতির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেরিত হাদিয়া গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে, যদি সেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো প্রতারণা বা লড়াইয়ের ঘটনা না ঘটত। যেমন মিশরের কিবতিদের রাষ্ট্রপ্রধান মুকাওকিস হাদিয়া প্রেরণ করলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন।[৫৭৯]

---

৫৭৫. ফারুক হাম্মাদা : *আল-আলাকাতুল ইসলামিয়াতুন নাসরানিয়্যা ফিল-আহদিন নাবাবি* : ৯৫।

৫৭৬. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/৩৩২।

৫৭৭. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/৩০০-৩৪৮।

৫৭৮. প্রাগুক্ত।

৫৭৯. ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ২/৩৯৪।

রাজা-বাদশাদের নিকট
রাসুল সা.-এর প্রেরিত পত্রাবলি

পারস্যের বাদশা কিসরার নিকট পাঠানো পত্র

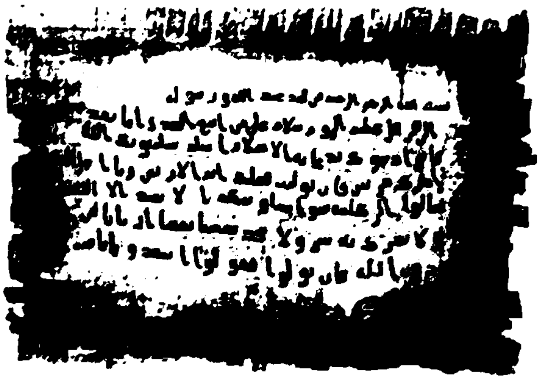

রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠানো পত্র

মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের নিকট পাঠানো পত্র

হাবশার বাদশা নাজাশির নিকট পাঠানো পত্র

কিবতিদের বাদশা মুকাওকিসের নিকট পাঠানো পত্র

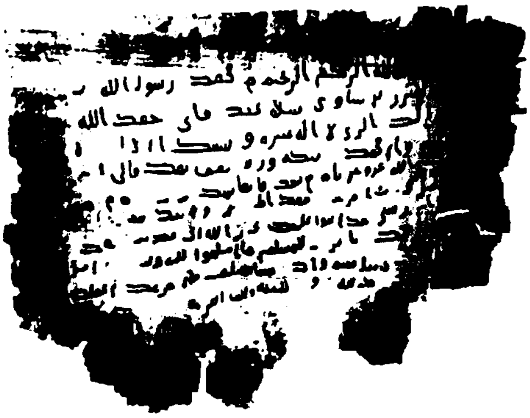

বাহরাইনের রাজা মুনজির বিন সাবির নিকট পাঠানো পত্র

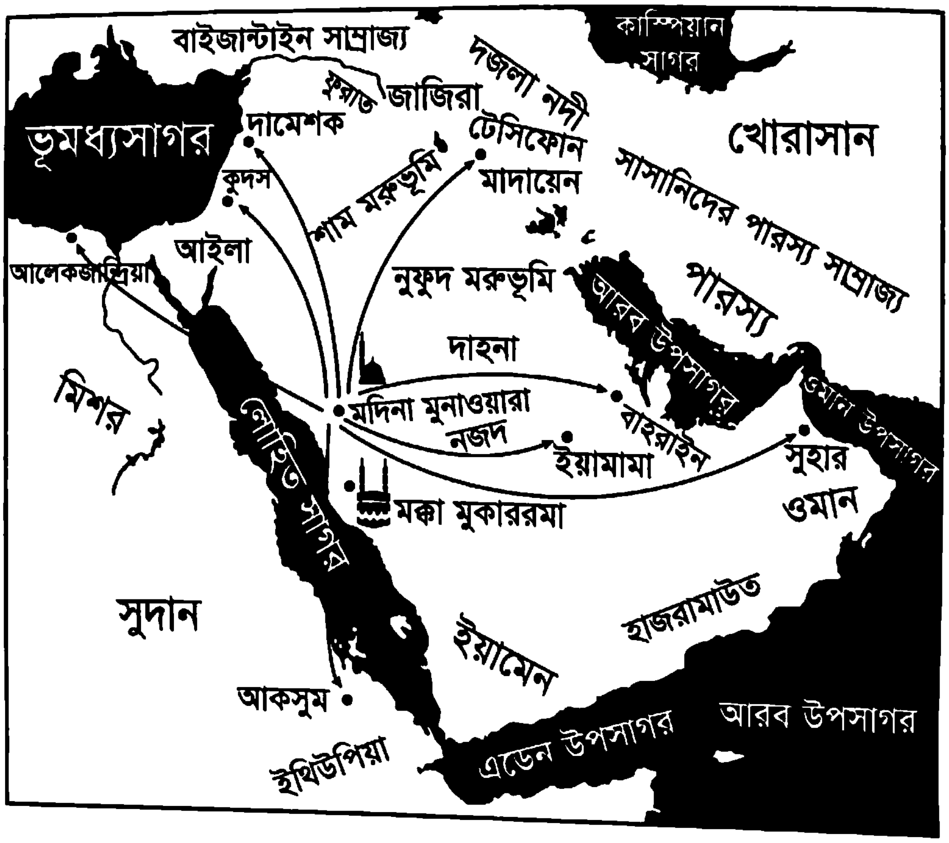

মানচিত্র নং-৪
বিশ্বের রাজা-বাদশাদের প্রতি রাসুল সা.-এর পত্রসমূহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অমুসলিমদের সাথে কূটনৈতিক আচরণের মধ্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে হাবশার (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজাশির সাথে তাঁর ব্যবহার ও সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি। শুরুতেই তিনি সাহাবিদের মজলিসে নাজাশির প্রশংসা করে বলেন, হাবশার মাটিতে এমন একজন বাদশাহ আছেন, যার রাজত্বে কারও ওপর জুলুম করা হয় না।[৫৮০]

এরপর (যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়)[৫৮১] নাজাশির পূর্বধর্মের ওপর থাকা অবস্থাতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা.-এর সাথে নিজের বিবাহের জন্য উকিল মনোনীত করেছিলেন। কারণ, হাবশায় হিজরতের পর উম্মে হাবিবা রা.-এর স্বামী

---

৫৮০. মুসনাদে আহমাদ : ১৮৩০৪, ইবনে হিশাম : আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ২/১৬৪।
৫৮১. ফারুক হাম্মাদা : *আল-আলাকাতুল ইসলামিয়্যাতুন নাসরানিয়্যা ফিল-আহদিন নাবাবি* : ৬৯।

আবদুল্লাহ বিন জাহাশ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে।[৫৮২] তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী বানিয়ে তার কষ্টের উপশম করার ইচ্ছা করেন। ফলে বাদশাহ নাজাশি নিজের ওকালতিতে উম্মে হাবিবাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। মহর নির্ধারণ করা হয় চারহাজার দিরহাম। এরপর উপঢৌকন হিসেবে প্রয়োজনীয় আরও বহু আসবাবসহ শুরাহবিল ইবনে হাসানার সাথে উম্মে হাবিবাকে মদিনায় রাসুলের কাছে পাঠিয়ে দেন। এসব আসবাব নাজাশি নিজের পক্ষ থেকেই প্রদান করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের থেকে কিছুই পাঠানোর প্রয়োজন পড়েনি।[৫৮৩]

এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, মদিনায় অবস্থিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সুদূর ইথিওপিয়ায় অবস্থিত নাজাশির মাঝে অকৃত্রিম সম্পর্কের ভিত্তি ছিল কতটা গভীর, কতটা সুদৃঢ় এবং কতটা নৈকট্যের! বরং উল্লিখিত ঘটনা প্রমাণ করে, উভয়ের সম্পর্ক নিছক কোনো রাজনৈতিক কিংবা লোক দেখানো কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং সম্পর্কটা ছিল এর থেকে আরও অনেক গভীরে। চিঠির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাজাশির পাঠানো উত্তরই এ কথা প্রমাণ করে। বাদশাহ নাজাশি লিখেছিলেন, আমি আমার ওকালতিতে আপনার সাথে আপনার গোত্রের, আপনার ধর্মের এক নারীকে আপনার সাথে বিবাহ প্রদান করেছি। মেয়েটি আবু সুফিয়ানের কন্যা। নাম, উম্মে হাবিবা। আর আপনার জন্য এক সেট পোশাক—জুব্বা, পায়জামা ও কালো রঙের একজোড়া মোজা হাদিয়া পাঠিয়েছি।[৫৮৪]

এরপর হিজরি ষষ্ঠ সালের শেষ দিকে এবং সপ্তম সালের শুরুর দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদশাহ নাজাশির নিকট সর্বশেষ চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে তিনি তাকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দেন

---

[৫৮২]. *সুনানে আবু দাউদ* : ২১০৭, *সুনানে দারাকুতনি* : ৩৬৫২।

[৫৮৩]. বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ৭/২৩২।

[৫৮৪]. হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাবি : *আল-আনওয়ার ফি শামায়িলিন নাবিয়্যিল মুখতার* : ২৮০।

CamScanner

এবং আল্লাহর সাথে শিরক করা ও শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করেন।[৫৮৫]

অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের এটা ছিল সংক্ষিপ্ত কিছু দিক। এগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বভাবপ্রকৃতি অনুধাবনে এবং সকল মানুষকে তাদের অবস্থা অনুপাতে যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্যসাধারণ কূটনৈতিক দূরদর্শিতা প্রকাশ করে।

* * *

---

৫৮৫. এ ক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণনা এসেছে এভাবে : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هٰذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَمِ عَظِيْمِ الْحَبَشَةِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ» *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২/৬৩৩, বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়া* : ২/৩০৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়ের সকল অমুসলিম দল ও গোত্রের সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তাদের সাথে কৃত চুক্তিগুলো তিনি যথাযথভাবে পূরণও করেছেন। কারণ, কুরআনুল কারিমে এমনটাই নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾

> তোমরা যখন কোনো অঙ্গীকার করো, তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। শপথকে দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না।
>
> [সুরা নাহল : ৯১]

ইমাম ইবনে কাছির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা সেই সকল কাজের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো করতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে কৃত শপথসমূহ যথাযথভাবে রক্ষা করা।[৫৮৬]

এই নীতি-আদর্শের ওপরেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন অতিবাহিত হয়েছে। বরং তিনি তাঁর সাহাবিদেরও এই নীতি-আদর্শের ওপর গড়ে তুলেছেন। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পালনের মূল্য শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

> যদি কারও সাথে কোনো সম্প্রদায়ের চুক্তি থাকে, তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনোরূপেই তা ভঙ্গ হওয়ার মতো কোনো আচরণ প্রকাশ করা যাবে না। আর যদি চুক্তি শেষ করতে চায়, তবে ঘোষণা দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করবে।[৫৮৭]

---

৫৮৬. ইবনে কাছির : *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম* : ৪/৫৯৮।

৫৮৭. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৭৫৯, *সুনানে তিরমিজি* : ১৫৮০, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭০৫৬।

'প্রতিশ্রুতি পূরণ' মুসলমানদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। অতএব, এর অন্যথা হলে প্রতিটি মুসলমানকে তার প্রতিপালকের সামনে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। মুসলমানদের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শায়েখ মাহমুদ শালতুত বলেছেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ মুসলমানদের একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। মুসলমানকে এ ব্যাপারে তার প্রতিপালকের নিকট প্রশ্ন করা হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আল্লাহর কাছে প্রতারণা ও খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে।[৫৮৮]

এই পরিচ্ছেদে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করব। তিনটি অনুচ্ছেদে এই আলোচনা সমাপ্ত হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইহুদিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর সন্ধিচুক্তি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

খ্রিষ্টানদের সাথে নবীজি ﷺ-এর চুক্তিসমূহ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মুশরিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর চুক্তিসমূহ

---

৫৮৮. শালতুত : আল-ইসলাম আকিদাতান ওয়া-শারিআতান : ৪৫৭।

CS CamScanner

~~এই পৃষ্ঠাটা শেষে আছে।~~

- এই অঞ্চলের লোকদের ওপর কেউ হামলা করলে তাদের বিরুদ্ধে অঞ্চলের সকলে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।
- তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে, সততা বজায় রাখবে এবং অন্যায় এড়িয়ে যাবে।
- কোনো ব্যক্তির হালিফের (চুক্তিবদ্ধ মিত্র) অপরাধ তার ওপর আরোপিত হবে না।
- সকলে মিলে মজলুমকে সাহায্য করা হবে।
- ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে খরচ বহনে শরিকে হবে যতদিন তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে ।
- ইয়াছরিবের জমিন এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত লোকদের জন্য নিষিদ্ধ স্থান বলে বিবেচিত হবে (অর্থাৎ যুদ্ধ, গাছকাটা, প্রাণী শিকার ইত্যাদি)।
- এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে কিংবা কোনো ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং তার কারণে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে সেটা ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমর্পণ করা হবে।
- কুরাইশদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না। এমনকি যারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরও আশ্রয় দেওয়া যাবে না।
- যারা ইয়াছরিবের ওপর আক্রমণ করতে আসবে, তাদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে একে অপরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব থাকবে ওই অংশ রক্ষা করার, যে অংশে তারা বসবাস করছে।
- কোনো জালেম বা অপরাধীর জন্য এই সন্ধিপত্র তাকে বাঁচানোর কাজে আসবে না।[৫৯০]

এখানে যে বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা প্রয়োজন সেটা হলো, এই চুক্তিনামার মধ্যে বনু কায়নুকা, বনু নাজির এবং বনু কুরায়জার ইহুদিদের কথা নেই। তবে সিরাতের ঘটনাবলিতে এটা প্রমাণিত যে, এই চুক্তিটা ছাড়াও তাদের সাথে আরও অনেক চুক্তি ও সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল।

---

৫৯০. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫০৩, ৫০৪।

CamScanner

এই চুক্তিনামা প্রমাণ করে, ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সূচনালগ্ন থেকেই তার নীতি-আদর্শ হলো, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা[৫৯১] প্রদান করা এবং যথাযথ মূল্যায়নের সাথে অন্যদের একত্রে মিলেমিশে বসবাস করার সুযোগ প্রদান করা। উল্লিখিত চুক্তির ধারাগুলোর প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং মুসলিম সমাজের সদস্যদের মাঝে সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন ও বসবাসের জন্য আইনকানুনও রচনা করে। তাদের যাবতীয় অধিকারও নিশ্চিত করে। কেউ তাদের ওপর জুলুম করতে চাইলে তাদের থেকে সেই জুলুম প্রতিহত করে।

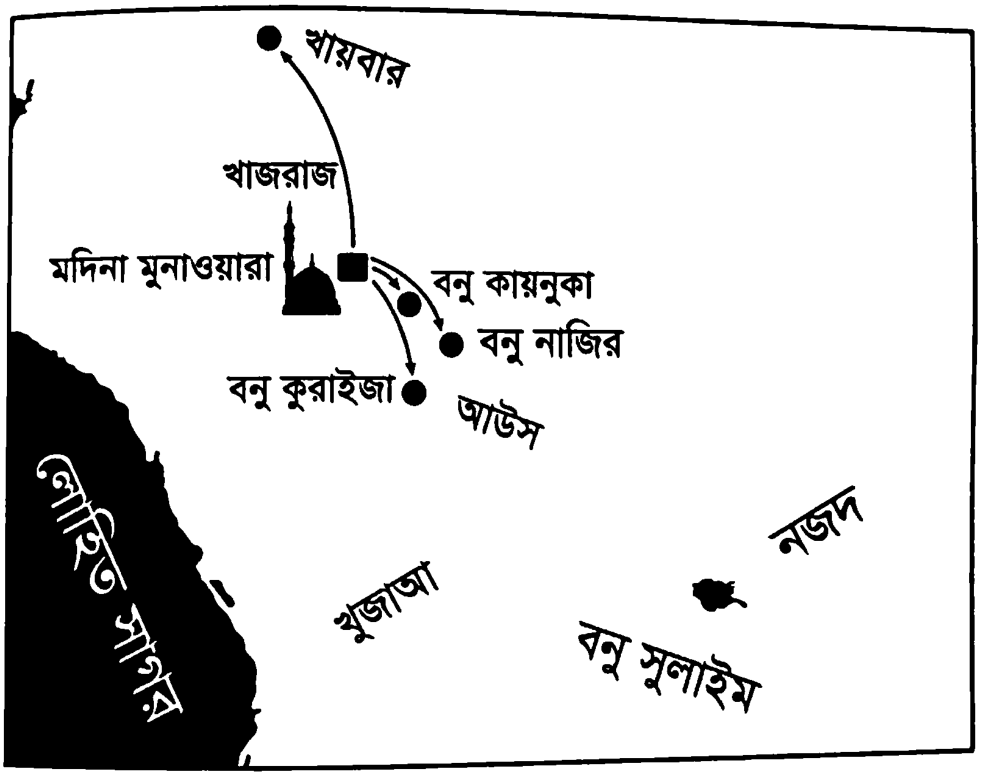

মানচিত্র নং-৫
ইহুদিদের সাথে রাসুল সা.-এর সন্ধিচুক্তি

ইহুদিদের পক্ষ থেকে বহু প্রতারণা, কষ্ট প্রদান ও অব্যাহত ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন এই চুক্তির নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য। যার ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের

৫৯১. 'স্বাধীনতা' শব্দের বদলে এখানে 'ছাড়' শব্দ ব্যবহার যথোপযোগী।-সম্পাদক

সাথে চুক্তিবদ্ধ ইহুদিদের জীবনযাপন ছিল পূর্ণ নিরাপদ। তখন মদিনার অভ্যন্তরে জীবনযাপনের এটা ছিল লক্ষণীয় এক বৈশিষ্ট্য। এর কল্যাণে তাদের মধ্যে ব্যাপকহারে ব্যাবসায়িক লেনদেন চলতে থাকে। মদিনায় অবস্থিত ইহুদিদের বাজারগুলো মুসলমান ক্রেতাদের মাধ্যমে ভরপুর হয়ে যেত। ইহুদিদের বাজারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল বনু কায়নুকার বাজার। সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় এমন জাতির মাঝেই, যারা একে অপরকে বিশ্বাস করে। এ কারণে একজন মুসলিম নারীও নিজে নিজেই পণ্য ক্রয়ের জন্য ইহুদিদের বাজারে চলে যেত। এতে সে কোনো ধরনের জটিলতা অনুভব করত না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তখন মুসলমানগণ ইহুদিদেরকে কী পরিমাণ বিশ্বাস করত।[৫৯২] তদ্রূপ উসমান ইবনে আফফান রা.-ও রুমা নামক কূপটি কিনেছিলেন এক ইহুদির কাছ থেকে।[৫৯৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় বসবাসকারী মুসলমান-অমুসলমান সবার সাথেই মিশতেন। ওঠাবসা করতেন। সবার সাথেই কথাবার্তা বলতেন। তারাও তাঁর সাথে কথাবার্তা বলত। এ বিষয়ে তাঁর জীবনে যে ঘটনাগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো উরওয়া ইবনে যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন, উসামা বিন যায়েদ রা. আমাকে বলেছেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় আরোহণ করলেন। গাধার পিঠে ছিল একটি গদি। গদির নিচে ছিল ফাদাকি[৫৯৪] একটি বস্ত্র। তিনি পেছনে উসামা বিন যায়েদ[৫৯৫] রা.-কে তুলে নিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন

৫৯২. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৩১৪, ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৪৪৩।

৫৯৩. ইয়াকুত হামাবি : *মুজামুল বুলদান* : ৩/১০৪।

৫৯৪. 'ফাদাক' মদিনার উত্তরাঞ্চলীয় একটি গ্রামের নাম। গদিটি সম্ভবত সেখানকার তৈরি ছিল, তাই একে ফাদাকি গদি বলা হয়েছে।

৫৯৫. পুরো নাম : উসামা বিন যায়েদ বিন হারেসা বিন শুরাহবিল কালবি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম যায়েদের পুত্র। তার ক্ষেত্রে বলা হতো, প্রিয়ের পুত্র প্রিয়। অর্থাৎ যায়েদ বিন হারেসা যেমন নবীর প্রিয় ছিলেন, তেমন উসামা বিন যায়েদও ছিলেন তার খুব প্রিয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাসুল তাকে বড় বড় সাহাবির মধ্যে সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ৫৮ বা ৫৯ হিজরি সনে মদিনায় ইনতেকাল করেন। তিনি ফেতনা থেকে নিরাপদে ছিলেন। সূত্র : *আল-ইসতিআব*: ১/১৭০, *উসদুল গাবাহ* : ১/৯১, *আল-ইসাবা* : ৮৯।

CamScanner

খাজরাজ গোত্রের হারেস শাখাগোত্রের সাদ বিন উবাদা রা.-কে[৭৯৮] দেখতে যাচ্ছিলেন। ঘটনাটি ছিল বদরযুদ্ধের আগে। চলতে চলতে তিনি একটি মজলিসের নিকট এসে পৌছলেন। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির লোক বসা ছিল—মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদি। সেই মজলিসে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলও ছিল। ছিলেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা.। রাসুলের বাহনের খুরে উত্থিত কিছু ধুলাবালি মজলিসের দিকে উড়ে গেল। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল নিজের চাদর দিয়ে নাক ঢাকল। এরপর বলল, 'আমাদের ওপর তোমরা ধুলা ছিটিয়ো না।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে সালাম দিলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। কুরআনুল কারিম থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শোনালেন।

তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল, 'তুমি যা বললে, এগুলো যদি সত্য-সঠিকই হয়ে থাকে, তাহলে এর থেকে উত্তম কথা কিছু হতে পারে না। তবে তুমি আমাদের মজলিসে এসে আমাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি তোমার গন্তব্যের দিকে যাও। আমাদের মধ্য থেকে যে তোমার কাছে যায়, তাকে তুমি তোমার এসব কথা শোনাও।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বলে উঠলেন, 'কখনো না, বরং হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা আপনার এ সকল কথা পছন্দ করি।'

ঘটনার এই পর্যায়ে মজলিসে উপস্থিত মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিদের মাঝে হট্টগোল বেধে গেল। এমনকি তারা একে অপরের ওপর চড়াও হওয়ার উপক্রম হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হট্টগোল থামাতে লাগলেন (একপর্যায়ে তারা শান্ত হলো)।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গাধায় আরোহণ করে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিলেন। সাদ বিন উবাদাহ রা.-এর কাছে পৌছে তাকে বললেন, 'হে সাদ, তুমি কি শুনেছ আবু হুবাব কী বলেছে?

---

৭৯৮. পুরো নাম : সাদ ইবনে উবাদা খাজরাজি আনসারি সায়িদি। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ নেতা। আকাবার বাইআত এবং বদরযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আনসারদের অগ্রগামী, বদান্য ও সম্মানিত নেতা। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, যা ছিল তার জাতির মাঝে সর্বস্বীকৃত। তিনি ১৫ হিজরি সনে শামে ইনতেকাল করেন। দেখুন, *আল-ইসতিআব* : ২/১৬১, *উসদুল গাবাহ* : ২/২২১, *আল-ইসাবা* : ৩১৬৯।

CamScanner

(আবু হুবাব দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল) সে তো আমাকে এই এই বলল!'

সাদ রা. বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার কথাবার্তাগুলো এড়িয়ে চলুন! আল্লাহর কসম! আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা যা প্রদান করার প্রদান করেছেন এবং মুসলমানদের নিকট আপনাকে যথাযথ সম্মান দান করেছেন। আর তার (আবদুল্লাহ বিন উবাই) এ প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণ হলো, এই অঞ্চলের লোকেরা একমত হয়েছিল যে, তারা তাকে নেতৃত্বের মুকুট পরাবে। নিজেদের নেতা বানাবে। কিন্তু আল্লাহ যখন সত্যের আগমন ঘটিয়ে সেটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। আর এ কারণেই সে আপনার সাথে এমন আচরণ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন।[৫৯৭]

এটা ঠিক যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন মদিনায় ইহুদিদের সাথে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করবেন। কিন্তু ইহুদিরা বারবার বিভিন্ন উসকানিমূলক কাজ করতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততা দিয়ে এবং অসাধারণ কৌশলে এগুলো মোকাবিলা করতেন। আমরা ইহুদিদের সে সকল উসকানিমূলক কাজের কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরব। যথা :

সকল জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ওপর ইহুদিদের বিভিন্ন অপবাদ আরোপ। এটা এমনই এক গর্হিত ও পীড়াদায়ক অপরাধ, যা সর্বোচ্চ শাস্তির উপযুক্ত করে। আর এটা শুধু তাদের ঈমানের দুর্বলতা কিংবা নিজেদের পরিজ্ঞাত সত্যধর্মকে অস্বীকারের কারণেই বরং এ ধরনের ধৃষ্টতামূলক আচরণের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে চাইত। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করত, তারা যেন তাদের অনুসরণীয় শরিয়তকে ছুড়ে ফেলে। এ ছিল মদিনার জন্য বড় ধরনের ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ।

আল্লাহ তাআলার বিষয়ে তাদের অবাঞ্ছিত কথাবার্তার একটি হলো, আল্লাহ তাআলাকে দরিদ্র বলা। তখন তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন,

৫৯৭. সহিহ বুখারি : ৪৫৬৬, ২৬৯১; সহিহ মুসলিম : ১৭৯৮, মুসনাদে আহমাদ : ২১৮১৫।

CamScanner

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾

আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী। [সুরা আলে ইমরান : ১৮১][৫৯৮]

এ ছাড়া, তারা বিভিন্নভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট প্রদান করত। তারা পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কামনা করত। অথচ বোঝাতে চাইত অন্যকিছু। এ কারণে তাদের কেউ কেউ বলত اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক)। اَلسَّامُ-অর্থ– মৃত্যু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জবাবে শুধু وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের জন্যও অনুরূপ হোক) বলতেন।[৫৯৯] বাড়তি কিছুই বলতেন না। বরং যে-সকল সাহাবি তাদের এই বদদোয়া শুনতেন, তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিতেন, উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যেন কোমলতার পরিচয় দেয়। মুখ থেকে যেন কোনো কটু কথা বের না করে।

এ ছাড়া, তাদের আরও কিছু উসকানিমূলক কাজের নমুনা হলো, বিভিন্ন নবী-রাসুল ও কুরআনুল কারিমের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা। মুহাজির ও আনসারদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদিদের অবস্থা যদি শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলেও হয়তো তা সহ্য করা যেত, কোনোভাবে হয়তো তা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু তারা হঠকারিতার ক্ষেত্রে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিষ্ণুতাকে তারা দুর্বলতা মনে করতে থাকে। যার ফলে তারা এমন সব অপকর্মে লিপ্ত হতে থাকে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো ছিল না। তাদের এসব কর্মকাণ্ড ছিল মদিনা চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এজন্য আর তাদেরকে ক্ষমা করা এবং তাদের এইসব কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না।

যেমন বনু কায়নুকা জঘন্যভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করে। একবার এক মুসলিম মহিলার চেহারা খোলার ব্যাপারে প্ররোচিত করতে থাকে। তারা তার

---

৫৯৮. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫৫৮, ৫৫৯; ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/২৮৫।

৫৯৯. *সহিহ বুখারি* : ৬০২৪, *সহিহ মুসলিম* : ২১৬৪।

সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয়ে ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল অবলম্বন করে। আরেকবার তারা সম্মিলিতভাবে এক মুসলমানকে হত্যা করে।[৬০০]

আর বনু নাজিরের ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্র করে।[৬০১]

অন্যদিকে বনু কুরায়জার ইহুদিরা আরও কঠিন ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মদিনায় বসবাসকারী সকল মুসলমানকে হত্যা ও তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার মতলব আঁটে।[৬০২]

আর খায়বারের ইহুদিদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করার পর। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হন। তিনি ঠিক তখনই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামেন, যখন তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন, আবু রাফে নামে পরিচিত সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক, কিনানা বিন রবি বিন আবিল হুকাইক এবং হুয়াই বিন আখতাব যারা মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংস করার এবং মদিনার ঘরবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে, অর্থাৎ তারা খায়বারে এসে ঘাঁটি গাড়ে। এরা ছিল বনু নাজিরের নেতৃস্থানীয়।[৬০৩] মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু। অপরাধের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। খায়বারে অবস্থানরত বনু নাজিরের ইহুদি, সেই সাথে খায়বারের স্থানীয় ইহুদি ও তাদের নেতারা মিলে বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে। খায়বার ও বনু নাজিরের ইহুদিদের একটি দল মুসলমানদের অবরোধ করার উদ্দেশে মুশরিক দলগুলোকে একত্রিত করতে থাকে। পরিণামে 'আহজাব যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দশ হাজারেরও বেশি মুশরিক লড়াকু সৈন্যদলের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল মদিনা থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করা। তবে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর অনুগ্রহ করেন। তাদেরকে উক্ত যুদ্ধে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়ে 'খায়বার' মুসলমানদের ধ্বংসের ভয়ানক কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিতি পায়। ইসলামি

---

৬০০. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪৭, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৬।
৬০১. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/১৮৯, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১৪৬।
৬০২. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/২২০, সালেহি শামি : সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ : ৪/৩৭৩।
৬০৩. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৫১৩, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৩৪২।

CamScanner

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের কারণে তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা এবং উচিত শিক্ষা দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই লক্ষ্যেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সপ্তম বছরে তাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য বের হন। অনেকগুলো লড়াই ও একের পর এক তাদের দুর্গগুলো অবরোধ করার একপর্যায়ে ইহুদিরা সন্ধির প্রস্তাব করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনায় বসতে চায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন গ্রহণ করেন।

ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, উভয়ের মাঝে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয় যে, তাদের এবং দুর্গে অবস্থানকারী সকল সৈনিক, সন্তানাদি ও মহিলাদের প্রাণ রক্ষা করা হবে। তারা ঘরবাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র, সহায়সম্পত্তি, সোনা-রুপা সবকিছু রেখে খায়বার ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই সন্ধিচুক্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যদি কোনো ইহুদি কোনো কিছু গোপন করে, তাহলে তার এ অপরাধের কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাকে যে নিরাপত্তা দিয়েছেন তা রহিত হয়ে যাবে।'[৬০৪]

অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে কেউ যদি কোনো সম্পদ, স্বর্ণ অথবা রুপা গোপন করে, তবে সেই প্রতারণার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করতে পারবেন।[৬০৫]

ইহুদিরা এই সন্ধি মেনে নেয়। খায়বার থেকে তারা বের হতে শুরু করে। যদিও ইতিমধ্যেই তারা অনেক ধরনের মন্দকাজ করেছে, তারপরও এই সন্ধিচুক্তির কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের প্রাণ রক্ষা করেন। কাউকেই তিনি হত্যা করেননি। তবে যার ব্যাপারে এই প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট খেয়ানত প্রকাশ পেয়েছে, এমন দু-একজন ছাড়া। যেমন হয়েছিল কিনানা বিন আবিল হুকাইকের ক্ষেত্রে।[৬০৬]

---

[৬০৪]. বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়া* : ৪/২০৪, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/২৮৩।

[৬০৫]. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪৭, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/১২৯, ২৮৯-২৯০।

[৬০৬]. এক ইহুদি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামকে অবগত করে যে, কিনানা বিন আবিল হুকাইক সম্পদ গোপন করেছে। তখন তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে

CamScanner

চিন্তা করে দেখুন, এ সময় মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা ছিল। খায়বার থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া ইহুদিদের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথও ছিল না। তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে ইহুদিদের সেই অবাঞ্ছিত প্রস্তাবটিও মেনে নেন। সেটা এই যে, ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবি করল, তিনি যেন তাদেরকে এই অঞ্চলে চাষাবাদ করার সুযোগ প্রদান করেন, বিনিময়ে তারা অর্ধেক ফসল প্রদান করবে।

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদেরকে খায়বারের ভূমি প্রদান করেছিলেন। শর্ত ছিল, তারা সেখানে চাষাবাদ করবে। বিনিময়ে সেখান থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।[৬০৭]

এটা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে খায়বারের ইহুদিদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এবং এটা ছিল তাদের মরুভূমির অজানা অনিশ্চিত পথে বের হওয়া থেকে মুক্তির উপায়। কারণ, প্রথম চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে। চুক্তির পর স্বাভাবিক নিয়মেই খায়বারের ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হচ্ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে খায়বারের ইহুদিরা সেখানে তাদের কাজ ও জীবন চালিয়ে যাচ্ছিল। তখনকার এমন কোনো ঘটনা নেই যা প্রমাণ করতে পারে, মুসলমানগণ তাদের সাথে কোনো হঠকারিতামূলক আচরণ করেছে।

এমনই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির সাথে এবং অপরের প্রতি এমনই সম্প্রীতির পরিচয় দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের সাথে সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়িত করেছিলেন। কিন্তু তারা সে চুক্তি রক্ষা করেনি। এরপরও তারা বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

আনা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি সম্পদ গোপন করেছ?' সে বলল, 'না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বললেন, 'চিন্তা করে বলো, আমরা যদি তোমার নিকট গোপন সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে কি তোমাকে হত্যা করতে পারব?' কিননা বলল, 'হ্যাঁ।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম তল্লাশির আদেশ দিলেন। সেখানে বিশাল ধনভান্ডার পাওয়া গেল। এভাবে মুসলমানদের সাথে প্রতারণার কারণে তাকে হত্যা করা হয়। সূত্র : ইবনে কাছির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৩৭৪, ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৩৩৬-৩৩৭।

৬০৭. *সহিহ বুখারি* : ২৫৭১, *সহিহ মুসলিম* : ১৫৫১।

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

খ্রিষ্টানদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিসমূহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দুই বছরে খ্রিষ্টানদের সাথে কয়েকটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। (মানচিত্র নং-৬) সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে। নাজরানের খ্রিষ্টানরা চৌদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করে।[৬০৮]

উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিল 'আকেব' নামের এক ব্যক্তি। তবে তাদের মধ্যে আরেকজন ছিল দল পরিচালক। তারা তার উপাধি দিয়েছিল সাইয়েদ (নেতা)। এ ছাড়া তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলির দায়িত্বে ছিল তৃতীয় আরেকজন। সে ছিল তাদের ধর্মযাজক বা পাদরি। তার নাম ছিল আবুল হারেস। উল্লিখিত এই তিনজনই ছিল উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। দলের কোনো বিষয়ে প্রধানত তারাই পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।[৬০৯]

প্রতিনিধিদলটি খুবই জাঁকজমক ও সাজসজ্জার সাথে মদিনায় আগমন করে। তাদের গায়ে ছিল রেশমি পোশাক আর হাতে ছিল স্বর্ণের আংটি। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামগ্রহণের কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল না। বরং তারা মূলত এসেছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'মুনাজারা বা বিতর্ক' করার জন্য এবং রাসুলসহ অন্য মুমিনদেরকেও পরাজিত, হতবুদ্ধি ও বিস্মিত করে দিতে।

---

[৬০৮]. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/৩৫৭, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১১২।

[৬০৯]. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/১০৬, ১০৭; সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৫/৫, ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/২৮৯।

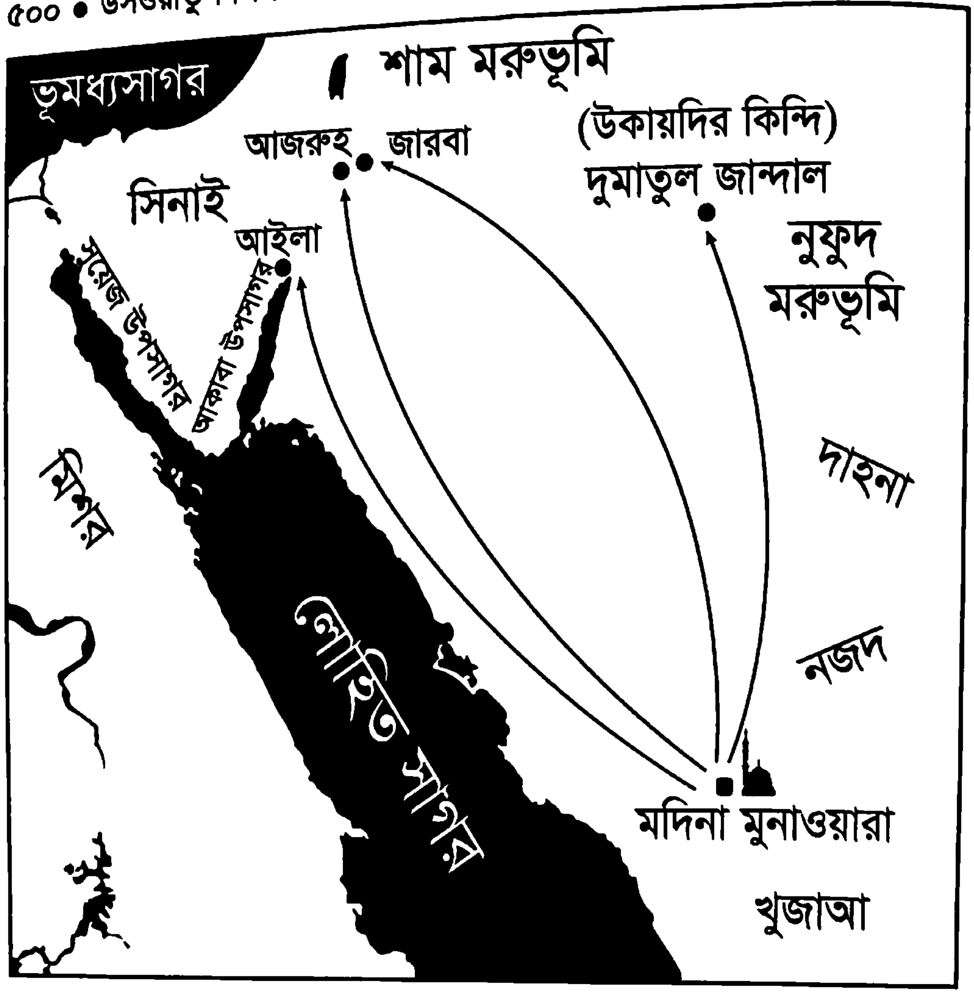

মানচিত্র নং-৬
খ্রিষ্টানদের সাথে রাসুল সা.-এর সন্ধিচুক্তি

আলোচনার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামগ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে বলল, তোমাদের পূর্ব থেকেই আমরা মুসলমান। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তিনটি কারণে তোমরা মুসলমান নও। ১. ক্রুশের ইবাদত করা। ২. শূকরের গোশত খাওয়া। ৩. 'আল্লাহ তাআলার সন্তান আছে' এমন বিশ্বাস পোষণ করা।[৬১০]

এই তিনটি বিষয়ে তোমরা ইনজিলের বাণী পরিবর্তন করেছ। এগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার কথা মেনে নিতে পারোনি। অতএব, এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার না করে তোমরা নিজেদের 'মুসলমান' দাবি করতে পারো না।

---

৬১০. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১১৪, ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৩৪৮।

এভাবে দীর্ঘ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল এমন—

'তোমাদের এ কেমন আচরণ যে তোমরা আমাদের নবীকে গালি দাও? (নবী বলতে তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বুঝিয়েছে) আর বলো যে, সে আল্লাহর বান্দা?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল এবং তাঁর কালিমা, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছিলেন কুমারী মারয়াম আলাইহাস সালামের নিকট।'[৬১১]

অতএব, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের দিকে 'আল্লাহ তাআলার বান্দা' কথাটি সম্বন্ধ করা তার মর্যাদা লাঘব করে না; বরং আরও বৃদ্ধি করে। তিনি ছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসুলদের অন্যতম। তা ছাড়া তিনি আল্লাহর কালিমা, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছিলেন মারয়াম আলাইহাস সালামের নিকট। আমরা মারয়াম আলাইহাস সালামকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। তাকে সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করি। এ কারণে আমরা বলি, তিনি ছিলেন কুমারী সতী নারী মারয়াম।'

কিন্তু এতসব আলোচনার পরও নাজরানের প্রতিনিধিদল তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করল না বরং হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'মানুষ' ও 'আল্লাহর বান্দা' বলাতে তারা ভীষণ রাগান্বিত হয়ে উঠল।

তারপর তারা বলে, 'তুমি কি কখনো পিতা ছাড়া পুত্র দেখেছ? তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্যবাদীই হয়ে থাকো, তাহলে আমাদেরকে তার দৃষ্টান্ত দেখাও।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমার কাছে বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। তাই তোমরা আমাদের এখানে অবস্থান করো। এ বিষয়ে আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানানো হবে তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো।[৬১২]

---

[৬১১]. তাবারি : *জামিউল বায়ান* : ৩/২৯৩, জালালুদ্দিন সুয়ুতি : *আদ-দুররুল মানছুর* : ২/২২৮।

[৬১২]. ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৫৪৯।

CamScanner

পরের দিন সকাল হলো। এর মাঝেই আল্লাহ তাআলা নবীজির ওপর নিচের এই আয়াতগুলো নাজিল করেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾

আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর তাকে বলেন, হয়ে যাও। ফলে সে হয়ে যায়। সত্য সেটাই যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

তোমার কাছে (হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (তাদেরকে) বলে দাও, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, আর আমাদের নিজ লোকদেরকে এবং তোমাদের নিজ লোকদেরকে, এরপর আমরা সকলে মিলে (আল্লাহর সামনে) কাকুতিমিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর লানত পাঠাই। [সুরা আলে ইমরান : ৫৯-৬১]

(সকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলকে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনান) কিন্তু এই ধরনের 'মহাসত্য' বাণীও খ্রিষ্টানদের মনঃপূত হলো না। তাদের সাথে আলোচনার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে মুবাহালার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তাদের যেহেতু পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আল্লাহ তাআলার একজন প্রেরিত রাসুল, তাই তারা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরিশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এইসব হঠকারিতা ও দম্ভপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও কর দেওয়ার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করেন। যদিও

CamScanner

তারাই ছিল সন্ধির প্রথম প্রস্তাবকারী ও অক্ষম দুর্বল এক সম্প্রদায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বড় সেনাদল পাঠাতে পারতেন। কিন্তু না, নবীজি সেদিকে না গিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করেন। কারণ, নবীজি মুসলমানদের মাঝে ও কাছে-দূরের সকল শত্রু-সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত রচনা করতে চেয়েছিলেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি নাজরানের অধিবাসীদের জন্য একটি চুক্তিপত্র প্রেরণ করেন। পত্রটির ভাষ্য ছিল এমন :

> পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি। নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বিশপ আবুল হারেস ও নাজরানের অন্য পাদরিবর্গ, জ্যোতিষবর্গ এবং যাজকদের জন্য ও তাদের মালিকানায় থাকা ছোট-বড় সকল কিছুকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কোনো বিশপকে তার বিশপের পদ থেকে, কোনো যাজককে তার যাজকের পদ থেকে, কোনো জ্যোতিষকে তার জ্যোতিষের পদ থেকে পরিবর্তন করা হবে না। তাদের অধিকার, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি এবং তাদের পূর্ব পদ-পদবির কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটানো হবে না। যতদিন তারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবে, অধীনস্থদের প্রতি কল্যাণকামী থাকবে, জুলুম করবে না, নির্যাতন-নিপীড়নে লিপ্ত হবে না, ততদিন তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকবে।[৬১৩]

বলার অপেক্ষা রাখে না, উক্ত চুক্তিপত্রে বেশ উদারতা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যখন নাজরানের প্রতিনিধিদল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবি করে, তিনি যেন কর আদায়ের জন্য তাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠান, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সঙ্গে একজন পূর্ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠাব।

---

৬১৩. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/১০৬, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* ৫/৫৫, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৫৪৯।

CS CamScanner

বিশ্বস্ততার এই মহান মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার জন্য সকল সাহাবিই চরম উৎসুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওঠো হে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ!'

হজরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ উঠে দাঁড়ালে নবীজি বললেন, 'এ হলো এই উম্মতের আমিন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'[৬১৪]

এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত চুক্তিনামা প্রণয়ন করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ইচ্ছা নিয়ে। আর তিনি কখনোই ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে কোনো চুক্তি করতেন না, যেমনটি করে থাকে অন্য অমুসলিম শক্তিধর জাতিগোষ্ঠীগুলো।

ফলে নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পাদিত এই চুক্তি স্থায়িত্ব লাভ করে, কোনো পক্ষই তা ভঙ্গ করেনি। এই চুক্তির ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল পর্যন্ত নাজরান ও মদিনা মুনাওয়ারার মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো ও স্থিতিশীল থাকে।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেছিলেন 'জারবা' ও 'আজরুহ'-এর খ্রিষ্টানদের সাথেও। তাদের উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে নবীজির ভাষ্য ছিল এমন :

> এটা নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে আজরুহবাসীদের উদ্দেশে প্রেরিত চিঠি। তারা (আজরুহবাসী) আল্লাহ ও মুহাম্মাদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে। চুক্তির শর্তানুসারে তারা প্রতি রজব মাসে পূর্ণ একশ দিনার প্রদান করবে। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানদের সাথে সদাচরণ ও কল্যাণকামনার।[৬১৫]

বিভিন্ন দুর্বল সম্প্রদায়, যাদের লোকসংখ্যা কম, কোনো দিক দিয়েই যারা মুসলমানদের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়, এমন সম্প্রদায়গুলোকে নামমাত্র কর পরিশোধের বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরাট মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান-পরিবেষ্টিত সকল অধিবাসী এই নিরাপত্তা-চুক্তির মাধ্যমে নিরাপদে বসবাসের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে।

---

৬১৪. *সহিহ বুখারি* : ৩৭৪৪, *সহিহ মুসলিম* : ২৪১৯।
৬১৫. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/২৯০, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/৩০।

আয়লা অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় দুমাতুল জান্দালের খ্রিষ্টানদের ক্ষমা ও উত্তম আচরণের পর, তখন আয়লা ও তার আশপাশের এলাকার খ্রিষ্টান বাদশাহ ইউহান্না বিন রুবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করেছিল। এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুকের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন,

> ইউহান্না বিন রুবা যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে, সেদিন আমি তাকে দেখেছি। তার গলায় ছিল স্বর্ণের তৈরি একটি ক্রুশ। মাথার সামনের অংশে ছিল চুলের ঝুঁটি। সে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল, তখন সে মাথা দ্বারা ইশারা করল (সম্মানার্থে মাথা ঝুঁকালো এবং বুকের ওপর হাত রাখল)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ইশারা করে বললেন, 'মাথা উত্তোলন করো।' সেই দিনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাকে একটি ইয়ামেনি চাদর পরিধান করান।[৬১৬]

সম্ভবত ইউহান্নাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন বুঝতে পারে তিনি প্রতিপক্ষের পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে সন্ধি করতে আগ্রহী। কারণ, লোকটি এসেছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রতীক 'ক্রুশ' পরিধান করে। তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করেননি।

সম্ভবত এটাও উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন বুঝতে পারে, রোমের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী, বহু ক্ষমতার অধিকারী মুসলিমজাতির সাথে সন্ধি স্থাপন লাঞ্ছনাকর কোনো বিষয় নয়, বরং এই নির্ভেজাল সন্ধিটা হতে যাচ্ছে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এমন এক জাতির সাথে, যারা প্রতিপক্ষকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে জানে।

---

৬১৬. বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ৯/১৮৫, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ৫/৪৬০।

এই সন্ধিচুক্তির ভাষ্য ছিল এমন :

> পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে ইউহান্না ইবনে রুবা ও আয়লাবাসীর জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তাদের জল ও স্থলের জাহাজ ও যানবাহনের জন্যও আল্লাহ ও নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শাম, ইয়ামেন ও সমুদ্রদ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে থাকবে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অঘটন ঘটালে তার অর্থসম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সম্পদ নিজ দখলে নিয়ে নেবে, সে ব্যক্তির সম্পদ তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারা যেকোনো জলাশয় ব্যবহার করতে চাইবে এবং জল ও স্থলের যেকোনো পথে যাতায়াত করতে চাইবে, তাতে তাদেরকে বাধা দেওয়ার অবকাশ থাকবে না।[৬১৭]

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, উক্ত চুক্তিনামাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জল-স্থলের জাহাজ ও যানবাহনেরও নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। বলাবাহুল্য, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণই সর্বোত্তম এবং প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপকারী। আর সকলের জানা আছে, 'আয়লা' অঞ্চলটি লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই আয়লার সকল অধিবাসী কিংবা কমপক্ষে তাদের বড় একটা অংশ (সাগরে) মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। আর এদিকে মুসলমানগণ হাবশায় হিজরত করা ছাড়া এ যাবৎ কোনো সময়ই সমুদ্র ব্যবহার করেননি। সমুদ্র ছিলো তাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। সুতরাং চুক্তিবদ্ধ আয়লার অধিবাসীদের জলে ও স্থলে নিরাপত্তা প্রদানের অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ওপর ও অন্য মুসলমানগণের ওপর সমুদ্রে আয়লাবাসীদেরকে রক্ষার একটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে নিলেন। কারণ, চুক্তি মোতাবেক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে

---

[৬১৭]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৫২৫, ৫২৬; ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ২/২৫৮, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৪৬৬।

CamScanner

একটি নৌবহর তৈরি করা এবং যখনই আয়লাবাসীর ওপর কোনো আক্রমণ আসবে, তখনই তাদের রক্ষার্থে উক্ত নৌবহর প্রেরণ করা। আর এর জন্য প্রয়োজন কঠোর শ্রম, বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় এবং সেইসাথে নিজেদের ধনসম্পদও ঝুঁকির মধ্যে ফেলা। তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু মেনে নিয়েছেন শুধু এই কারণে যে, মুসলমানগণ যেন চারপাশের সকল জাতি-গোষ্ঠীর সাথে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারেন।

আরও লক্ষণীয় যে, তারা যে-সকল জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহে ও ব্যবহারে অভ্যস্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সে সকল জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহের ও ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। অতএব 'মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না' কথা এখানেই শেষ নয়; উক্ত চুক্তির কারণে আবশ্যক হয়ে পড়ে, অন্য কেউ তাদেরকে সেখান থেকে বাধা দিতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ লড়াই করবেন ও আয়লাবাসীর পানি ব্যবহারের পথ সুগম করবেন।

এটা বেশ কঠিন এবং বড় ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব। তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ তা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই অঞ্চলের এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে, যারা ইসলামকে মান্য করে না এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকেও স্বীকার করে না।

এভাবেই, অন্যের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত, সম্মান ও মূল্যায়নের প্রেরণা সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পাদিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিসমূহে এটাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মুশরিকদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিসমূহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সাথেও কয়েকটি সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। (মানচিত্র নং-৭) এই চুক্তির আওতায় মদিনার আশপাশে বসবাসকারী মুশরিকরা যেমন ছিল, ছিল মক্কার প্রধান মুশরিকরাও।

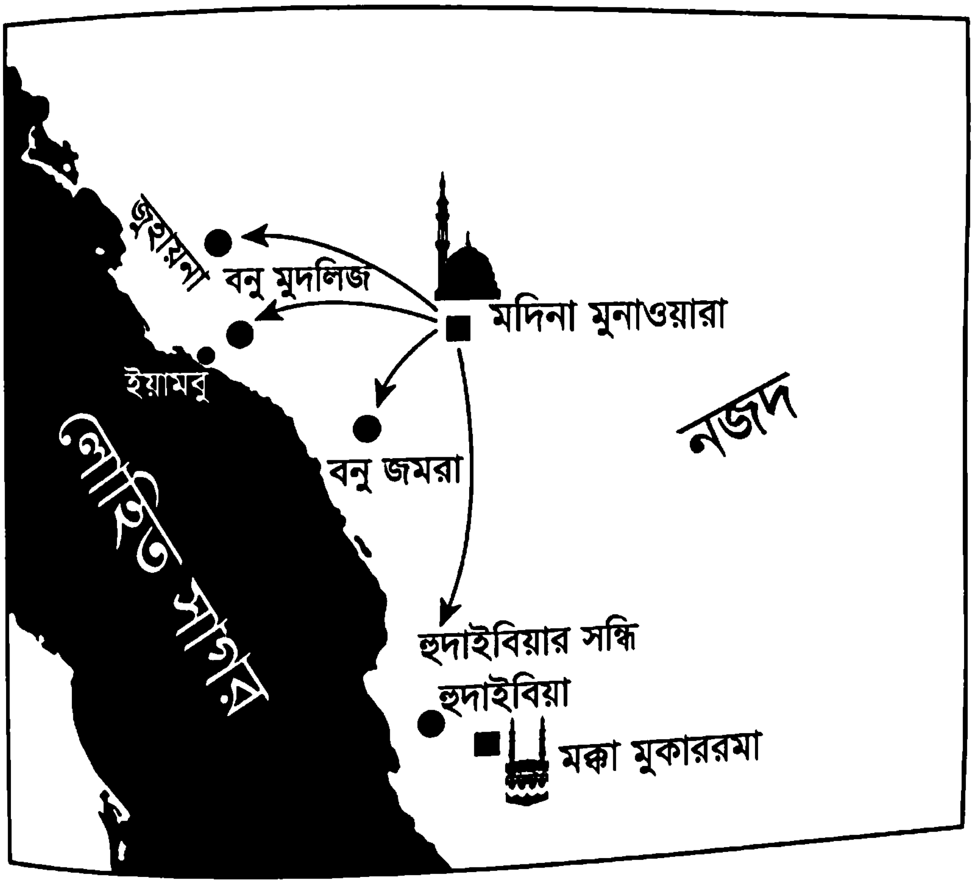

মানচিত্র নং-৭
মুশরিকদের সাথে রাসুল সা.-এর সন্ধিচুক্তি

মদিনার আশপাশের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মধ্যে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে বনু জমরার[৬১৮] সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত সন্ধিচুক্তির কথা। সেই সময় তাদের নেতা ছিল মাখশি ইবনে আমর জমরি। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে,[৬১৯] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এই চুক্তিটি করেছিলেন হিজরি দ্বিতীয় সনের সফর মাসে।[৬২০] অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। এর দ্বারা বোঝা যায়, মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সহাবস্থানের এই নীতি-আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুদলিজের সাথেও সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। তারা বসবাস করত 'ইয়ামবু' নামক অঞ্চলে। এই সন্ধিচুক্তিটাও সম্পাদিত হয় হিজরি দ্বিতীয় সনের জুমাদাল উলা মাসে।[৬২১] এরপর চুক্তি করেন জুহায়না গোত্রের সাথে। তারা ছিল অনেক বড় একটি গোত্র। এ গোত্র বসবাস করত মদিনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে।[৬২২]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চেষ্টা করেছেন মুসলমানগণ যেন আশপাশের গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে সব সময় শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে। তিনি কখনোই কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাননি। তিনি সব সময়ই যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিকে এবং বিরোধের পরিবর্তে ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন।

এর বহু পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরির শেষ দিকে মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়াতে সন্ধি করেন।[৬২৩] অথচ সকলের জানা, এই সন্ধিচুক্তির আগে তিনি কুরাইশদের পক্ষ থেকে দীর্ঘ উনিশটি বছর অনেকপ্রকার অত্যাচার সহ্য করেছেন। তিনি নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ মুশরিকদের বিভিন্নরকম জুলুম, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের

---

৬১৮. **বনু জমরা গোত্র :** আদনান গোত্রের একটি শাখাগোত্র। যারা মদিনার পশ্চিম অঞ্চল ওয়াদ্দানে বসবাস করত।

৬১৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১৩৫।

৬২০. ইবনে হিব্বান : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/১৫১, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১৩৫।

৬২১. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/১৪৩।

৬২২. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/২৭২।

৬২৩. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/২৭৫।

CamScanner

শিকার হয়েছেন। এতকিছুর পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার এই সন্ধিচুক্তিকে পূর্ণতাদানের প্রতি ছিলেন পূর্ণ আগ্রহী। এর দ্বারাই বোঝা যায় তিনি শত্রুদের সাথে আচার-আচরণে ছিলেন কতটা নমনীয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি কতটা আগ্রহী!

আমরা দেখতে পাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের এসব হঠকারিতা ও নির্যাতনের মুখোমুখি সত্ত্বেও স্বপ্নে দেখা 'ওমরা'-র কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মুশরিকদের আবাসভূমি মক্কাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এবারও যখন তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করল, তখনো তিনি কোনো ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত ছাড়াই পুনরায় মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার ইচ্ছা করেন।

এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষেই তিনি শান্তিপূর্ণ পথে হাঁটার অভিপ্রায়ে ছিলেন। তাই এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অবলম্বন করে তিনি সেটা বাস্তবায়িত করেন। সে লক্ষ্যে তিনি চৌদ্দশ সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত নিয়ে মদিনা থেকে বের হন।[৬২৪] সুতরাং তিনি মদিনা মুনাওয়ারার সকল জনশক্তি সঙ্গে নিয়ে বের হননি, আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধের সময় যাদের সংখ্যা তিন হাজারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর অস্ত্র বলতে শুধু মুসাফিরের আত্মরক্ষার তরবারিই সঙ্গে নিয়ে যান। কাফেলার সম্মুখভাগে অনেক হাদি (মিকাতের হারাম অঞ্চলে জবাইয়ের জন্য যে পশু নিয়ে যাওয়া হয়) রাখেন, যাতে করে সকলেই বুঝতে পারে, তিনি কেবল 'ওমরা' পালনের লক্ষ্যেই এসেছেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাঁর নেই। জুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে তিনি ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবিরাও ইহরাম বাঁধেন। পুরো পথ তালবিয়া পড়তে পড়তে তারা অগ্রসর হতে থাকেন।[৬২৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশর ইবনে সুফিয়ান আল-খুজায়ি রা.-কে[৬২৬] আগে পাঠিয়ে দেন রাস্তা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং এই

---

৬২৪. *সহিহ মুসলিম* : ১৮৫৬।

৬২৫. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ২/৯৫।

৬২৬. বিশর ইবনে সুফিয়ান খুজায়ি : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও বুদাইল বিন উম্মে আসরামকে খুজায়া গোত্রের শাখা গোত্র বনু কাবকে মক্কা অভিযানে শরিক হতে আহ্বান জানানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং বনু কাবের জাকাত উসুলের জন্যও তাকে পাঠিয়েছিলেন।

তথ্য জানার জন্য যে, কুরাইশরা মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাদের ওমরার কার্যাবলি ও বাইতুল্লাহ তাওয়াফের প্রতি সম্মত, নাকি তারা অহমিকা প্রদর্শন করবে ও মুসলমানদের ওপর চড়াও হবে! তবে বিশর ইবনে সুফিয়ান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, কুরাইশরা আপনার আগমনের সংবাদ শুনেই স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানসন্ততি নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। তারা বাঘের চামড়া পরিধান করে এসেছে। তারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, তারা বেঁচে থাকতে আপনি কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে 'কুরাউল গামিম'[৬২৭] পর্যন্ত চলে এসেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শোনার পরও সামান্যতম বিচলিত হলেন না। তিনি বরং খুব শান্তভাবে বললেন, আহা কুরাইশ! যুদ্ধবিগ্রহই তাদের শেষ করে দিলো। কী ক্ষতি হতো, যদি তারা আমার ও অন্যান্য মানুষের মাঝে বাধার প্রাচীররূপে না দাঁড়িয়ে পথ উন্মুক্ত করে দিত! এরপর যদি অন্যান্য মানুষই আমার ওপর জয়লাভ করত, তবে তো এমনিতেই কুরাইশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যেত। আর যদি আল্লাহ আমাকে জয়দান করতেন, তখন কুরাইশরাও দলে-দলে ইসলামগ্রহণ করে নিত। এরপরও যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করতে অনীহ হতো, তবে তো তাদের শক্তি ছিলই, তখনই না হয় যুদ্ধে জড়াত!![৬২৮]

যুদ্ধের প্রতি কুরাইশদের এ ধরনের আগ্রহবোধ এবং অব্যাহতভাবে তাদের শত্রুতা প্রদর্শনের পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসেননি। তাই তিনি খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে মুসলমানদেরকে সেই পথ ছেড়ে আরেকটি দুর্গম পথে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। আসলাম গোত্রের একজন তাকে এই পথের সন্ধান দেয়।[৬২৯] এর মাধ্যমে তিনি মুশরিকদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে যান (যদিও তা সাময়িক ছিল)। আর এটা এ কারণে

পাশাপাশি হুদাইবিয়াতে রাসুলের এক গুপ্তচর হিসেবেও তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন। সূত্র : *ইসাবা* : ১/২২৬।

৬২৭. **কুরাউল গামিম** : মক্কা-মদিনায় মধ্যবর্তী হেজাজের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান। গামিম হলো উপত্যকার নাম, কুরা হলো পাহাড়ের নাম। সূত্র : *লিসানুল আরব* : ৮/৩০৮।

৬২৮. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৯৩০।

৬২৯. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/২৭৬।

CamScanner

ছিল না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় পেয়েছিলেন, বরং তা ছিল যথাসম্ভব যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার জন্য।[৬৩০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা-ইচ্ছুক সাহাবিদের নিয়ে হুদাইবিয়াতে পৌঁছে গেলেন। খবর পেয়ে খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ নিজ বাহিনীকে নিয়ে দ্রুত মক্কায় চলে যায় তাদেরকে সতর্ক করার জন্য। এদিকে হুদাইবিয়াতে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী সেখানে এসে থেমে পড়ে। সামনে চলা বন্ধ করে দেয়। মানুষেরা 'ওঠো ওঠো' বলে তাকে ওঠাতে চায়। কিন্তু উটনী তার জায়গাতে অনড় বসে থাকে। মানুষেরা বলা শুরু করে 'কসওয়া' (রাসুলের উটনীর নাম) চলা বন্ধ করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কসওয়া চলা বন্ধ করেনি। এমনটি করার স্বভাব তার নেই। তবে হস্তিবাহিনীকে যিনি আটকে দিয়েছিলেন, সেই সত্তাই তাকে আটকে দিয়েছেন।'

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান দেখানোর জন্য (হারাম অঞ্চলে রক্তপাত এড়ানোর জন্য) আমার কাছে যেকোনো শর্তারোপ করবে, আমি সে শর্ত মেনে নেব।[৬৩১]

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি কসম করে বলেছেন, পবিত্র নগরী মক্কাভূমি, মানুষের প্রাণ ও তাদের ইজ্জত-আবরু হেফাজতের জন্য তিনি যেকোনো ধরনের শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছেন; যদিও সেই শর্ত মানতে গেলে তাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হয়।

আলোচনার জন্য কুরাইশরা একের পর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে থাকল। তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল, নবীজিকে ভয় দেখানো, নবীজিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং কোনো শর্ত ও সুযোগ দেওয়া ছাড়াই মক্কা মুকাররমা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের পক্ষ

---

৬৩০. মাহমুদ শিত খাত্তাব : *আর-রাসুলুল কায়িদ* : ১৮৬, ১৮৭।
৬৩১. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮৭২।

CamScanner

থেকে আগত প্রথম দূত বুদাইল[৬৩২] ইবনে ওয়ারকা আল-খুজায়িকে জানিয়ে দেন যে, তিনি সন্ধি চান। তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপন করতে আগ্রহী। নবীজি তাকে বলেছিলেন,

> আমরা তো কারও সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি, আমরা এসেছি ওমরা করতে। আমাদের জানা আছে, যুদ্ধবিগ্রহ কুরাইশদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে, তাদের বড় ক্ষতিসাধন করেছে। অতএব তারা যদি চায়, আমি তাদের সঙ্গে কিছুদিনের মেয়াদে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করব এবং তারা আমার ও অন্য মানুষদের জন্য ওমরার পথ উন্মুক্ত করে করে দেবে। এরপর আমি যদি আমার দাওয়াতি কাজে সফল হতে পারি, তাহলে তারা অন্য মানুষদের মতো ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে করতে পারবে আর যদি না চায়, তাহলে কমপক্ষে তারা লড়াই করার কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। আর তারা যদি এই প্রস্তাবকে মানতে অস্বীকার করে, তাহলে ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার গর্দান আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই আমি তাদের সঙ্গে আমার এই লক্ষ্য অর্জনে লড়াই করে যাব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৬৩৩]

তবুও, এরপরও একের পর এক কুরাইশদের দূত বা প্রতিনিধি আসতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে ঠিক ওই কথাই বলেন, যা বলেছিলেন বুদাইল ইবনে ওয়ারকাকে।

তারপর নবীজি সিদ্ধান্ত নেন, কুরাইশদের সামনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের জন্য তিনি তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উসমান ইবনে আফফান রা.-কে নির্বাচন করেন। উসমান রা. পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। কুরাইশদের সঙ্গে তার অনেক

৬৩২. বুদাইল বিন ওয়ারকা : মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশের লোকেরা তার ঘরে ও তার আজাদকৃত গোলাম রাফের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি ও তার ছেলে আবদুল্লাহ হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর তিনি ছিলেন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামগ্রহণকারী মহান ব্যক্তিদের একজন। একটি মতে বলা হয় তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। সূত্র : আল-ইসতিআব : ১/২৩৬, উসদুল গাবাহ : ১/২৩৬, ইসাবা : ৬১১।

৬৩৩. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮৭২, *মুজামুল কাবির* : ১৩, *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৮৫৮৭।

আলোচনা ও কথাবার্তা হয়। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন আলোচনা হওয়ার পরেও আলোচনা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এদিকে সাহাবিদের মাঝে কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কায় উসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

সেই সময় দূত হত্যা করাকে যুদ্ধের ঘোষণা বলে বিবেচনা করা হতো। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের জিহাদের ওপর বাইআত করতে বাধ্য হন, যা ইতিহাসে 'বাইআতে রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের ময়দান থেকে কেউ 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না' এই মর্মে সাহাবিগণ বাইআত গ্রহণ করেন।[৬৩৪] যুদ্ধ যেন বেধেই যাচ্ছিল। সেই সময় হজরত উসমান রা. যদি জীবিত ফিরে না আসতেন, তাহলে যুদ্ধ হয়তো বেধেই যেত। অবশেষে যখন প্রমাণিত হলো যে ছড়িয়ে পড়া কথাটি ছিল ভুল, তখন মুসলমানদের অন্তর-আত্মা শান্ত হয় এবং স্বস্তি লাভ করে।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে আরেকজন দূতের আগমন ঘটে। তিনি ছিলেন সুহাইল ইবনে আমর।[৬৩৫]

এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোনো উপায়ে সন্ধি করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছিল। তবে শেষমেশ কুরাইশরাও নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তাদের পরিবর্তন শুরু হয় সুহাইল ইবনে আমরকে দূত হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে। সে ছিল কূটনীতি ও আলাপ-আলোচনায় পারদর্শী, প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তি। এ ছাড়া কুরাইশের অন্য নেতাদের মতো তার স্বভাবচরিত্রে একগুঁয়েমি ছিল না। এমনকি বর্ণিত

---

[৬৩৪]. *সহিহ মুসলিম* : ১৮৫৬-১৮৫৮, *সুনানে তিরমিজি* : ১৫৯১, *সুনানে নাসায়ি* : ৪১৫৮।

[৬৩৫]. সুহাইল ইবনে আমর ইবনে লুআই ইবনে গালেব। সে ছিল জাহেলি যুগে কুরাইশদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কাফের অবস্থায় সে বদরযুদ্ধের দিন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। তখন হজরত উমর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তার সামনের দাঁত ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিন, তাহলে আর সে কোনোদিন আপনার বিপক্ষে বিতর্ক করতে পারবে না।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। আশা করা যায় সে একদিন এমন অবস্থানে পৌছাবে, তুমি নিজেই তার প্রশংসা করবে।' পরে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর রাসুলের ইনতেকালের পর আরবের কিছু লোক যখন মুরতাদ হয়ে যেতে লাগল, তখন তিনি ভাষণ দিয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় এই ধর্ম সম্প্রসারিত হবে সূর্যের উদয় ও অস্তের সম্প্রসারণের মতো। সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ৩৫৬৯, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ২/৩৪৬।

CS CamScanner

আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগমন করতে দেখে বলে উঠলেন, 'হে সাহাবিগণ, এবার তোমাদের জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে গিয়েছে।'[৬৩৬] আর বাস্তবেও দেখা গিয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি আশা করেছিলেন, ঠিক তেমনটিই হয়েছে।

সুহাইল কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করতে আগ্রহী হয়। তবে সে সন্ধিচুক্তির মধ্যে হঠকারিতা ও কঠোরতামূলক কিছু প্রস্তাব ও কাজও করে বসে। এরপরও সন্ধিচুক্তির বিভিন্ন ধারা ও তার বাক্য চয়নের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমনীয়তা ও সন্ধির ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাতেবকে (চুক্তি লেখক) ডেকে বললেন, লেখো, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'। তৎক্ষণাৎ সুহাইল বলে উঠল, আল্লাহর কসম! 'রহমান' কে আমি তা জানি না! বরং তুমি লেখো, 'হে আল্লাহ, তোমার নামে শুরু করছি', যেমনটি তুমি আগে লিখতে। তখন মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' ছাড়া অন্যকিছু লিখতে পারব না। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লেখো, 'হে আল্লাহ, তোমার নামে শুরু করছি।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লেখো, 'এই চুক্তিনামাতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ'। এটা দেখে সুহাইল বলে উঠল, যদি আমরা তোমাকে আল্লাহর রাসুল বলেই বিশ্বাস করতাম, তবে তো আমরা তোমাকে আল্লাহর ঘর থেকে বাধা দিতাম না এবং তোমাদের সাথে লড়াই করতেও উদ্যত হতাম না। তাই এর পরিবর্তে তুমি লেখো, 'আবদুল্লাহর পুত্র'। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসুল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করো। আচ্ছা লেখো, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ'। (বর্ণনাকারী ইমাম যুহরি বলেন, রাসুলের এই নমনীয়তা প্রদর্শনের কারণ ছিল তার পূর্বোক্ত ওই কথা—তারা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের প্রতি সম্মান দেখানো ও হারাম অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড এড়ানোর জন্য যেকোনো শর্তারোপ করবে, আমি সেই শর্ত মেনে নেব।)

---

৬৩৬. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১-২৭৩২, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৮৭২।

CamScanner

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই মর্মে যে, তোমরা আমাদের জন্য বাইতুল্লাহর পথ উন্মুক্ত করে দেবে, আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব।' তখন সুহাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! কোনোভাবেই আরববাসী এ কথা বলার সুযোগ পেতে পারে না যে, আমরা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। (তাই এ বছর তোমাদের তাওয়াফের সুযোগ হবে না) তবে আগামী বছর তা হতে পারে।'

পরে সেভাবেই লেখা হলো। অতঃপর সুহাইল বলল, 'এবং এই শর্তে যে, আমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে চলে গেলে, তুমি তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে, যদিও সে তোমার ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে।'

মুসলমানগণ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কীভাবে সম্ভব যে, তাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে অথচ সে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে?'

তারা সকলে সন্ধির এই ধারা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে সুহাইল ইবনে আমরের ছেলে আবু জান্দাল বেড়ি পরিহিত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে এসেছিল মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে। আবু জান্দাল এসে মুসলমানদের মাঝে অবস্থান নিলো। তখন সুহাইল বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ, যে ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে চুক্তি করেছি, এটাই কিন্তু তা পূরণের প্রথম ক্ষেত্র, তুমি তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেবে।'

নবীজি বললেন, 'এখনো তো আমরা চুক্তি সম্পূর্ণ করিনি!'

সুহাইল বলল, '(যদি তা কার্যকর না করো) তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আর কখনো কোনো বিষয়ে সন্ধি করব না।'

নবীজি বললেন, 'কেবল ওকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও।'

সুহাইল বলল, 'কিছুতেই আমি তাকে তোমার নিকট থাকার অনুমতি দিতে পারি না।'

নবীজি বললেন, 'অবশ্যই তোমাকে এটা করতে হবে।'

সুহাইল বলল, 'আমি পারব না।'

এদিকে তখন আবু জান্দাল (মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, 'হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের কাছে মুসলমান হয়ে এসেছি। এখন

CamScanner

কীভাবে আবার আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে! তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না ইসলামের জন্য আমি কী পরিমাণ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছি!'

বাস্তবেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে তাকে চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল।[৬৩৭]

এভাবে আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ ছাড় দিয়েছেন! চুক্তিপত্রের শুরুতেই পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লেখার ব্যাপারে। এরপর তার নামের সঙ্গে 'আল্লাহর রাসুল' এই বিশেষণটি যুক্ত করার ব্যাপারে। তা ছাড়া এ বছর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে ফিরে যাওয়ার মতো কঠিন প্রস্তাবকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন!

শুধু তাই নয়, এরপর আমরা দেখেছি, মক্কাবাসীর মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট গমন করলে তার পরিবারের লোকেরা যদি তাকে ফেরত চায়, তাহলে তিনি তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। এরকম প্রস্তাবও তিনি মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন। বিষয়টি আরও করুণ হয়ে উঠেছিল, যখন সুহাইল ইবনে আমরের ছেলে আবু জান্দালের আগমন ঘটেছিল। ইসলামগ্রহণ করার কারণে সে তখন মুশরিকদের নিকট ভীষণ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাকে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এ অবস্থাতেই সে এসে মুসলমানদের নিকট সাহায্যের আবেদন করে। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে আমরের কাছে তাকে রেখে দেওয়ার দাবি করেন। কিন্তু সুহাইল সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং সন্ধির সকল আলোচনার অগ্রগতি এই নির্যাতিত মুসলিম যুবককে রেখে দেওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ তাকে ফেরত না দিলে আর সন্ধি হবে না। এভাবে সন্ধি-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশেষে এটাতেও সম্মতি প্রদান করেন। সন্ধিচুক্তি পূর্ণ করার জন্য তিনি দৃশ্যত এসব জটিলতা ও প্রতিকূলতা মেনে নেন। এতে তিনি সাহাবায়ে কেরামের আপত্তিকেও উপেক্ষা করেন, যাদের অগ্রভাগে ছিলেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। পরিশেষে রাসুলের লক্ষ্য বাস্তবতায় পরিণত হয়, চুক্তি

---

৬৩৭. *সহিহ বুখারি* : ২৭৩১, ২৭৩২; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৪।

সম্পাদিত হয়। চুক্তিনামা লিখে দুটি কপি বানানো হয়। মুসলমানগণ ও মক্কাবাসী প্রত্যেকে একটি করে কপি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই লিখিত সন্ধিচুক্তির সবচেয়ে লক্ষণীয়, মুগ্ধকর ব্যাপার ছিল, সন্ধি-পরবর্তী জটিল সময়গুলোতেও সেই শর্তগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো। কারণ, সেই চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি আবু বসির রা.-কেও ফিরিয়ে দেন। সে ছিল কুরাইশদের একজন। ইসলামগ্রহণের পর নিজের ধর্ম রক্ষার্থে সে মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে এসেছিল।

কুরাইশরা তাকে ধরে আনার জন্য দুজন লোক পাঠায়। তারা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'সেই প্রতিশ্রুতি পালন করুন, যা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বসির রা.-কে তাদের হাতে দিয়ে দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিপালন এমনই সততাপূর্ণ ছিল যে, একজন মুসলমান হয়ে (আশ্রয়ের জন্য) মদিনায় এসেছে, কিন্তু রাসুল তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অথচ সেই সময় মদিনায় লড়াকু সৈনিকের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া মক্কায় একজন মুসলমানকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহু বিপদের মুখোমুখি হতে হতো। তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করা হতো। এরপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজেদের কাছে রেখে দেননি। বরং ফেরত পাঠিয়েছেন। কারণ, চুক্তির ধারাগুলোতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিল। এ কারণে সেটা পালন করা ছিল অবশ্য কর্তব্য।

অথচ এদিকে আবু বসির রা. নিজেও রাসুলের ফেরত প্রদান দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যান এবং তাঁকে প্রশ্ন করে বলেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন! তারা তো আমাকে আমার ধর্মের কারণে কষ্ট দেবে!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে আবু বসির, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অচিরেই তোমার এবং তোমার সঙ্গে থাকা দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।'[৬৩৮]

---

৬৩৮. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/২৯১।

পরে, মক্কা যাওয়ার পথে আবু বসির সমুদ্র উপকূলের দিকে পালিয়ে যান। সেখানে একটি শিবির স্থাপন করেন এবং কুরাইশদের বিভিন্ন কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা করতে থাকেন। কিন্তু কুরাইশরা তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি এবং তারা রাসুলকেও এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে পারেনি। কারণ, আবু বসির তো তখন তাঁর অধীনে ছিলেন না।

এদিকে মক্কার অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমান আবু বসিরের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে এবং কুরাইশের কাফেলার ওপর হামলার কাজে সহযোগিতার জন্য তার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যেই সুহাইল ইবনে আমরের ছেলে আবু জান্দাল আবু বসিরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তাকে অনুসরণ করে এভাবে আরও ৭০ জন মুসলমান। এইসব নির্যাতিত নওমুসলিম সন্ধিচুক্তির শর্তের কারণে মদিনায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারছিল না, আবার কাফেরদের নির্যাতনের কারণে মক্কাতেও অবস্থান করতে পারছিল না। মক্কা থেকে এইসব মুসলমান আবু বসিরের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কারণে তাদের জনশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে কুরাইশ কাফেলা ও আবু বসিরের এই দলের মাঝে লড়াইয়ের তীব্রতাও বেড়ে যায়। অবশেষে কুরাইশরা বাধ্য হয়ে রাসুলের কাছে আগমন করে এবং এই মুসলমান দলকে মদিনায় তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার আবেদন করে।[৬৩৯] যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত অর্থেই আশপাশের মুশরিকদের সাথে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বসবাস করার ইচ্ছা করতেন, এ কারণে তিনি তাদের আবেদন গ্রহণ করেন এবং এই মুসলমানদেরকে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নেন।

লক্ষণীয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে তাদেরকে আগের অবস্থায় ছেড়ে রাখতে পারতেন। আর এভাবেই তারা অতর্কিত আক্রমণে কুরাইশদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুলত। তাদের শক্তি খর্ব করে দিত। ধনসম্পদ নিঃশেষ করে দিত। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় কুরাইশদের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আচার-ব্যবহার করেছেন। এটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তারাই, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনেছে এবং জেনেছে।

---

৬৩৯. প্রাগুক্ত।

CamScanner

এমনটাই ছিল অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সন্ধিচুক্তি, যে চুক্তিগুলোর মূল ভিত্তিই ছিল প্রতিশ্রুতি পালন, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তির প্রতি আগ্রহবোধ। বর্তমান বিশ্বের জন্যও কতই-না প্রয়োজন তাঁর এই রীতিনীতিগুলো ধারণ করার!

* * *

CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ-জিহাদ

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটি সামাজিক ও সনাতন বিষয়। পৃথিবীতে মানব আগমনের সূচনা লগ্ন থেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে একেক চিন্তাধারাতে যুদ্ধবিগ্রহ একেকরকম। ইহুদিদের নিকট যুদ্ধ হলো বিনাশমূলক। কারণ তারা মনে করে, তারাই হলো জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আবার খ্রিষ্টানদের নিকট যুদ্ধটা হলো এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছে পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য। বিকৃত ইনজিলে এ কথাটিই এভাবে বলা হয়েছে—

> তোমরা মনে করো না যে আমি এসেছি পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারের জন্য। আমি শান্তির মশাল বহন করি না। আমি যা বহন করি তা হলো তরবারি।[৬৪০] বরং ইনজিল সরাসরি এ কথাই বলেছে যে, আমি এসেছি পৃথিবীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপণ করতে। এর দ্বারা আমি পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দিতে চাই।[৬৪১]

খ্রিষ্টানরা তাদের এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, যখন বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের হস্তগত হয়। সে সময় তারা সেখানে সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিল।

আর মুসলমানদের নিকট দাওয়াতের পথকে সুগম ও নিরাপদ করার জন্য এবং ইসলামি বিশ্বাস ধারণের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু হেফাজতের প্রয়োজনে যুদ্ধ সর্বদা বাধ্যতামূলক। এটা নিছক নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যদের অধীনস্থ করার জন্য নয়। অতএব, শুধু ইসলামগ্রহণই হত্যার প্রতিবন্ধক নয় আবার শুধু কুফরিও হত্যাকে আবশ্যক করে না। এই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন হানাফি, মালেকি ও হাম্বলি মাজহাবের সকল ফিকহবিদ। তারা বলেন,

CS CamScanner

> কারও সঙ্গে লড়াইয়ের ভিত্তিমূল হলো, তার পক্ষ থেকে যুদ্ধ, লড়াই ও আক্রমণ, নিছক তার কুফরি নয়। অতএব, কোনো ব্যক্তিকে শুধু ইসলামি বিশ্বাসের বিরোধী হওয়ার কারণে হত্যা করা যাবে না। তবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে ইসলামের ওপর আক্রমণ করার কারণে। আর যারা লড়াই করতে পারে না, তাদের সঙ্গে লড়াই করা কিংবা তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাদের সঙ্গে সন্ধিমূলক আচরণ করা আবশ্যক।[৬৪২]

যুদ্ধকে অত্যাবশ্যক বলার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এমন নয় যে, আমরা সেটা কামনা করি কিংবা তা সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকি। বরং আমাদের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মুসলমানগণ সকল কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর সবশেষে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। যুদ্ধকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা যুদ্ধের প্রতি ধাবিত হই কেবল সত্য প্রতিষ্ঠা, মন্দকে নির্মূল অথবা জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

যুদ্ধ যেহেতু একটি অত্যাবশ্যক বিষয়, তা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, সেহেতু ইসলাম মুসলমানদের যুদ্ধ-জিহাদের জন্য নৈতিক কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে। যাতে তা তাদেরকে মন্দ কর্ম থেকে এবং নিন্দনীয় বিষয়াবলি থেকে বিরত রাখতে পারে। ইসলামে এ বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরআনুল কারিমে, রাসুলের সুন্নাত ও সিরাতেও। আশা করা যায়, নিচের দুটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে জানতে সক্ষম হব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের পরে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

যুদ্ধবন্দিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

---

৬৪২. ইমাম মালেক : আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা : ৩/৬, শাওকানি : ফাতহুল কাদির : ৪/২৯১।

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদের শরয়ি বিধান অন্য সকল মতবাদ ও মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে ব্যক্তি ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, তাকে প্রথমে ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে জানতে হবে। যাতে সে ইসলামের এই যুদ্ধ-জিহাদকে অন্যদের শিথিলতামূলক কিংবা সীমালঙ্ঘনমূলক যুদ্ধবিগ্রহের মানদণ্ড দিয়ে পরিমাপ না করে।[৬৪৩]

যেসব কারণে যুদ্ধ হওয়া উচিত, সেসব কারণ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। আর সেগুলো ছিল এমন কারণ, যা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না এবং কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি সে সম্পর্কে কোনো আপত্তিও তুলতে পারে না। এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, অন্যের আক্রমণ প্রতিহত করা। নিজের জীবন ধনসম্পদ, পরিবার-পরিজন, দেশ ও ধর্মকে রক্ষা করা। একইভাবে সেইসব মুমিনের ধর্ম ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কাফেররা যাদেরকে তাদের ধর্মের কারণে কষ্ট দেয় এবং ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে। যুদ্ধের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াতের পথকে সুগম করা, যাতে সকল মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। আর সর্বশেষ, যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া।[৬৪৪]

যদিও ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ মহৎ ও কল্যাণকর, তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও তারা (অমুসলিম মানুষেরা) সব সময় আগে বেড়ে শত্রুতা করত আর মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল প্রকাশ্যে। এ কারণে আমরা দেখি, হজরত ইবনুল কাইয়িম

---

৬৪৩. ড. আবদুল লতিফ আমের : *আহকামুল আসরা ওয়াস-সাবায়া ফিল-হুরুবিল ইসলামিয়্যা* : ৪৫-৪৬।

৬৪৪. আনোয়ার জুনদি : *বিমাযা ইনতাসারাল মুসলিমুন* : ৫৭-৬২ (ইষৎ পরিমার্জিত)।

CamScanner

রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাদুল মাআদ'-এ 'লড়াইয়ের পূর্বে দাওয়াত প্রদান' শিরোনামে লিখেছেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্যদলের প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করতেন, সে যেন লড়াইয়ের পূর্বে শত্রুকে এই প্রস্তাব করে, হয় তারা ইসলামগ্রহণ করবে এবং হিজরত করে মদিনায় চলে আসবে অথবা হিজরত ব্যতীত শুধু ইসলামগ্রহণ করবে আর তখন তারা মুসলিম বেদুইনদের মতো নিরাপদে অবস্থান করবে। তখন বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ এবং কর হিসেবে আদায় করা সম্পদে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। তারা যদি উক্ত প্রস্তাবে সাড়া দেয় তাহলে সে তা গ্রহণ করবে আর যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দেবে।[৬৪৫]

শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো যুদ্ধ-জিহাদ পরিচালনা করেছেন। কখনো শত্রু ছিল মুশরিক, কখনো ইহুদি, কখনো খ্রিষ্টান। তবে কেউ যদি তাঁর এসব যুদ্ধ-জিহাদকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে সে দেখতে পাবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত অমায়িক আচরণ করেছেন সেসব লোকের সাথেও, যারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর ওপর জুলুম ও নির্যাতন করেছে। যারা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তিনি তাদের সঙ্গে তার বিপরীতে উত্তম আচরণ করেছেন।

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রগামী মুজাহিদ সাহাবিদের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ওসিয়ত নিয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থা নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন আমরা তার সেই ওসিয়তের মধ্যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা এবং লক্ষ্যের মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.-কে ওসিয়ত করেন। ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে 'দোমাতুল জান্দাল'-এ বসবাসরত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী 'কালব' গোত্রের উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করেছিলেন। রওয়ানার মুহূর্তে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফকে নবীজি বলেন,

---

৬৪৫. ইবনুল কাইয়িম : জাদুল মাআদ : ৩/৯০।

CamScanner

> তোমরা সকলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। যারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তবে তোমরা খেয়ানত করবে না, ধোঁকা দেবে না, কারও চেহারা বিকৃত করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না। তোমাদের জন্য এটাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং তোমাদের নবী মুহাম্মাদের আদর্শ।[৬৪৬]

একইভাবে 'মুতা'-র যুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

> তোমরা আল্লাহর নামে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তবে খেয়ানত করবে না, ধোঁকা দেবে না, কারও চেহারা বিকৃত করবে না, শিশু, মহিলা, অতিশয় বৃদ্ধ এবং ইবাদতখানায় ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।[৬৪৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতেও ন্যায়পরতার আচরণ করেছেন। তিনি প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে অথবা তাঁর সঙ্গে খেয়ানত করতে উদ্যত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো সীমালঙ্ঘন করতেন না। তার জীবনের বহু ঘটনাতেই আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই। সেগুলোর মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা হলো, খায়বার বিজয়ের পর যে-সকল ইহুদি তাঁকে হত্যার জন্য গোপনে তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়েছিল, তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা। হজরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করে বলেন, খায়বার বিজয়ের পর ইহুদিদের পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি ভুনা ছাগল হাদিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ছাগলের গোশতে বিষ মিশ্রিত ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখানে যত ইহুদি আছে তাদের সবাইকে আমার কাছে একত্রিত করো। নির্দেশ অনুযায়ী তারা সকলে তাঁর কাছে একত্রিত হলো। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা কি সে ব্যাপারে আমাকে সঠিক তথ্য দেবে?'

---

৬৪৬. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৮৬২৩, তাবারানি : *মুজামুল আওসাত* : ৪৬৭১, *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* : ৫/১৪৪।

৬৪৭. *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩১, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬১৩, *সুনানে তিরমিজি* : ১৪০৮।

CS CamScanner

ইহুদিরা বলল, 'জি, অবশ্যই।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ। বরং তোমাদের পিতা অমুক!'

তারা বলল, 'আপনি সত্য বলেছেন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আবার বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে আরেকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে কি তোমরা আমাকে সঠিক তথ্য দেবে?'

তারা বলল, 'জি, অবশ্যই। আমরা যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আপনি আমাদের মিথ্যাকে ধরতে পারবেন, যেমনটি ধরেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা জাহান্নামি হবে?'

তারা বলল, 'আমরা সেখানে অল্প কিছুদিন অবস্থান করব, এরপর তোমরা সেখানে যাবে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরাই সেখানে অপদস্থ হয়ে পড়ে থাকো। আল্লাহর কসম! তোমাদের পরে আমরা সেখানে যাব না।' এরপর নবীজি তাদের আবার বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে আরেকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি আমাকে সঠিক তথ্য দেবে?'

তারা বলল, 'অবশ্যই, হে আবুল কাসেম!'

নবীজি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এই ছাগলের গোশতে বিষ মিশিয়েছ?'

তারা বলল, 'জি, মিশিয়েছি।'

নবীজি বললেন, 'তোমরা কেন এই কাজ করেছ?'

তারা বলল, 'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা এর মাধ্যমে আপনার অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাব

CS CamScanner

আর যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এই বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'(৬৪৮)

এখানে আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্যতম উত্তেজিত না হয়ে ধীরস্থিরতার সাথে ইহুদিদের বিষয়টি যাচাই করে দেখেছেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেন, যার কারণে তারা নিজেরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তারা গোপনে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তিনি জানতে পারেন, এই ইহুদিরা তাদের এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যেন ছাগলের গোশতে বিষ মিশ্রিত করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করে। অতএব দেখা যায়, মূলত ইহুদি পুরুষগণ এই ষড়যন্ত্রের নির্দেশ দিয়েছিল আর প্রকাশ্যভাবে কাজটি সম্পাদন করেছিল এবং কাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল ইহুদি মহিলা।

এই ঘটনার পর সাহাবিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি কি এই বিষ প্রয়োগকারী মহিলাকে হত্যা করবেন না?

নবীজি তখন তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এটা তো হত্যা নয়, হত্যার চেষ্টা মাত্র। সুতরাং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। অবশ্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মহিলাকে অন্য কোনো শাস্তিও প্রদান করেননি। এমনকি যে-সকল ইহুদি মহিলাটিকে বিষ মেশানোর নির্দেশ দিয়েছিল, তাদেরকেও তিনি কোনো শাস্তির মুখোমুখি করেননি। কারণ, তিনি তাদের কথা যৌক্তিক মনে কারছিলেন যে, তিনি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে তারা তাঁর অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবে আর যদি তিনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এই বিষ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদিও তিনি তাদের এই যুক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাদের কেউ তখনও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

উক্ত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তারা সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কাজটি করেনি। বরং রাসুলের প্রতি তাদের সীমাহীন হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই এমনটি করেছে। আশ্চর্য জনক হলো, এরপরও নবীজি তাদেরকে কোনো ধরনের শাস্তি প্রদান করেননি।

---

৬৪৮. সহিহ বুখারি : ৫৭৭৭, সুনানে আবু দাউদ : ৪৫০৮, মুসনাদে আহমাদ : ৯৮২৬।

CS CamScanner

তবে বিশর বিন বারা বিন মারুর[৬৪৯] নামে একজন সাহাবি নবীজির সাথে বসে বিষমিশ্রিত এক টুকরা গোশত খেয়ে ফেলেন এবং বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। এই হত্যা সংঘটিত হওয়ার কারণে পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহিলাকে কিসাস হিসেবে হত্যার নির্দেশ দেন। তবে তার সঙ্গে খায়বারের অন্য কোনো ইহুদিকে হত্যা করা হয়নি।

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন,

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গোশতে মহিলার বিষ মিশ্রণ সম্পর্কে অবগত হন, তখনই তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন বলা হলো, আপনি কি তাকে হত্যা করবেন না? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, না। কিন্তু পরে যখন সেই বিষক্রিয়ায় সাহাবি বিশর বিন বারা নিহত হলেন, তখনই কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহিলাকে নিহত সাহাবির পরিবারের নিকট অর্পণ করলেন। তারপর তার পরিবারের লোকেরা সেই মহিলাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করে।[৬৫০]

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যের প্রতি সদয় আচরণ। তাই যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি শত্রুপক্ষের শিশু-কিশোর, অতিশয় বৃদ্ধ, মহিলা, অসুস্থ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করেছেন। তিনি সর্বদা যুদ্ধের সেনাপতিদের উপদেশ দিতেন, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ রাখে। তাহলে এটা যুদ্ধনীতি মেনে চলতে এবং যুদ্ধের সকল কার্যক্রমে দয়ার্দ্র আচরণ করতে সাহায্য করবে; যদিও তা মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই হোক না কেন এবং নবীজি শুধু

---

৬৪৯. বিশর বিন বারা বিন মারুর : তিনি ২য় বায়আতে আকাবাতে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। খায়বার বিজয়ের পর সেখানেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিষযুক্ত গোশত খেয়ে মারা যান। এক বর্ণনায় বলা হয় গোশত যেখানে খেয়েছিলেন সেখানেই মারা গিয়েছিলেন। সূত্র : *উসদুল গাবাহ* : ১/১১৫-১১৬, *আল-ইসতিআব* : ১/৫১, *আল-ইসাবা* : ৬৫৪।

৬৫০. ইমাম নববি : *আল-মিনহাজ* : ১৪/১৭৯।

CamScanner

এতটুকু আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং স্পষ্টভাবে কোনো বাচ্চাকে হত্যা করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।[৬৫১]

হজরত বুরাইদা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে সৈন্যবাহিনীর আমির নিযুক্ত করতেন; বাহিনী ছোট হোক কিংবা বড়, তখন তিনি সেই আমিরকে বিশেষভাবে বলতেন, সে যেন নিজের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তার সঙ্গে বিদ্যমান মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণ করে। তাকে আরও বলে দিতেন, তোমরা ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না...।[৬৫২]

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মুসলমানরা যদি কোনো ভুল করে ফেলতেন এবং কোনো ছোট বাচ্চাকে হত্যা করে ফেলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে চরম রাগান্বিত হতেন। আমরা এর উদাহরণ পাই হজরত আসওয়াদ ইবনে সারি রা.-এর বর্ণনায়। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনযুদ্ধের দিন একটি ছোট দলকে একদিকে প্রেরণ করেন। তারা মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই করে। লড়াইয়ের একপর্যায়ে তারা কিছু বালককেও হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা যখন রাসুলের নিকট ফিরে এলো, তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা ছোট বালককে হত্যা করেছ কেন?'

তারা বলল, 'হে আল্লাহর নবী, তারা তো মুশরিকদের সন্তান!'

নবীজি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আজ যারা শ্রেষ্ঠ, তারাও কি একদিন মুশরিকদের সন্তান ছিল না! ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! প্রতিটি নবজাতক সন্তান ইসলামগ্রহণের যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, যতক্ষণ না সে তার জিহ্বা দিয়ে তার সম্পর্কে ভিন্ন কিছু প্রকাশ করে।[৬৫৩]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদেরও হত্যা করতে নিষেধ করতেন। হজরত রবাহ ইবনে রবি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৬৫১. ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ১/৩৩৭, ইবনে হিব্বান : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৩৪৬, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৫/১২৭, *আর-রওজুল উনুফ* : ১/৩৯৫।

৬৫২. *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩১।

৬৫৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ১৫৬২৬, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২৫৬৬, *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ২০০৯১, *আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি* : ১৮১১৪।

CamScanner

ওয়াসাল্লামের সাথে একটি যুদ্ধে ছিলাম। তিনি দেখলেন, লোকেরা একটি বিষয় নিয়ে জটলা পাকিয়েছে। তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নবীজি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেন, দেখে এসো তো লোকেরা কেন জটলা পাকিয়েছে!

লোকটি ফিরে এসে বলল, নিহত এক মহিলাকে ঘিরে তারা জটলা পাকিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলা তো লড়াই করার মতো ছিল না।

(বর্ণনাকারী বলেন,) অগ্রগামী বাহিনীর প্রধান ছিলেন হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.। নবীজি এক ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠিয়ে বলে দিলেন, তুমি তাকে গিয়ে বলে দাও, সে যেন কোনো মহিলাকে এবং কোনো শ্রমিককে হত্যা না করে।[৬৫৪]

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সেসব ব্যক্তির অপারগতা বিবেচনায় রাখতেন, যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধ শুরু হওয়ার সামান্য পূর্বে সাহাবিদেরকে বলেছিলেন, আমি জানি, বনু হাশেম এবং অন্যগোত্রের কয়েকজন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক যুদ্ধে আনা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার তাদের কোনো প্রয়োজন বা ইচ্ছা নেই। অতএব, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বনু হাশেমের কাউকে সামনে পায়, সে যেন তাকে হত্যা না করে। যে ব্যক্তি আবুল বুখতুরি বিন হিশাম বিন হারেস বিন আসাদকে সামনে পাবে, সে যেন তাকেও হত্যা না করে। একইভাবে আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে যে ব্যক্তি সামনে পাবে, সে যেন তাকেও হত্যা না করে। কারণ, তাকেও বের হতে বাধ্য করা হয়েছে।[৬৫৫]

---

৬৫৪. *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬৬৯, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৮৪২, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৬৪৭, *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৪৭৮৯, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২৫৬৫।

৬৫৫. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*: ১/৬২৮, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪৩৬।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানেও সাহাবিগণের অন্তরে প্রতিশ্রুতি পালনের গুরুত্ব জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি সৈন্যদলকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে ওসিয়ত করে বলতেন,

«ولا تغدروا»

তোমরা ধোঁকা দেবে না।[৬৫৬]

নবীজির নিকট বিষয়টির গুরুত্ব এতটাই বেশি ছিল যে, তিনি ধোঁকা দানকারীদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিতেন, যদিও ধোঁকা দানকারী হতো মুসলমান আর ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তি হতো কাফের। তিনি ইরশাদ করেছেন,

> যে ব্যক্তি কাউকে জানের নিরাপত্তা দেবে, এরপর তাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে সেই হত্যাকারীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, নিহত ব্যক্তি যদি কাফেরও হয়।[৬৫৭]

একইভাবে মানুষের জানের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পূর্ণ আগ্রহী। এ কারণে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোনো ব্যক্তির ইসলামগ্রহণ মেনে নিতেন, যদিও তার অতীত কার্যাবলি শত্রুতায় ভরপুর থাকত। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো, হজরত উসামা বিন জায়েদ রা.-এর কাজটিকে নবীজির নিন্দা করা। তিনি এক মুশরিক যোদ্ধাকে তার সামনে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করার পরও হত্যা করেছিলেন, যদিও পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা নির্দেশ করছিল তার ইসলামগ্রহণের স্বীকারোক্তি ছিল নিছক প্রাণ রক্ষার্থে। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ.। তিনি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানদের একটি বাহিনীকে প্রেরণ করলেন।[৬৫৮] একসময় উভয় দল

---

৬৫৬. *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩১, *মুয়াত্তা মালেক* : ৯৬৬, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬১৩, *সুনানে তিরমিজি* : ১৪০৮, *সুনানে ইবনে মাজা* : ২৮৫৭।

৬৫৭. ইমাম বুখারি : *আত-তারিখুল কাবির* : ৩/৩২২, *ইবনে হিব্বান* : ৫৯৮২, *মুসনাদুল বাযযার* : ২৩০৮, *মুজামুল কাবির* : ৬৪, *মুজামুস সগির* : ৩৮, *মুসনাদুত তয়ালিসি* : ১২৮৫, *হিলয়াতুল আউলিয়া* : ৯/২৪।

৬৫৮. বিভিন্ন বর্ণনা এ কথা উল্লেখ করে যে, ঘটনাটি ঘটেছিল ৭ম হিজরির রমজান মাসে 'মায়ফায়া' গ্রামে অবস্থিত বনু উয়াল ও বনু আবদ বিন ছালাবার উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত গালেব বিন আব্দুল্লাহ আল-লাইসির বাহিনীতে। এক বর্ণনায় বলা হয়,

CamScanner

পরস্পরের মুখোমুখি হলো। মুশরিক বাহিনীর মধ্যে একজন চতুর ব্যক্তি[৬৫৯] ছিল, যখনই সে কোনো মুসলমানকে লক্ষ্যবস্তু বানাতো, আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শহিদ করে দিত। এটা টের পেয়ে একজন মুসলিম লোকটির অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন...(বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে বলা হতো, তিনি ছিলেন হজরত উসামা বিন জায়েদ)। সুযোগ পেয়ে উক্ত মুসলিম যখন হত্যার উদ্দেশ্যে সেই মুশরিকের ওপর তরবারি উত্তোলন করলেন, অমনি সেই কাফের বলে উঠল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। তবুও সেই মুসলিম ব্যক্তি উক্ত মুশরিককে হত্যা করে ফেললেন।

যুদ্ধ শেষে, মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে একজন সংবাদবাহক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলেন। নবীজি তাকে যুদ্ধের সকল পরিস্থিতি জিজ্ঞাসা করলেন। সংবাদবাহক নবীজিকে পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ দিলেন। এমনকি সেই মুসলিমের উল্লিখিত ঘটনার কথাও নবীজিকে জানালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ সেই মুসলিমকে ডাকলেন এবং বললেন, 'তুমি কেন তাকে হত্যা করলে?'

সাহাবি বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, সে অনেক মুসলমানকে আহত করেছে এবং অমুক অমুককে হত্যা করেছে (এ কথা বলে তিনি কয়েকজন শহিদ সাহাবির নাম উল্লেখ করলেন)। এরপর আমি তার ওপর হামলা করি, সে আমার উদ্যত তরবারি দেখে ভয়ে বলে ওঠে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এরপরও তুমি তাকে হত্যা করেছ?'

সাহাবি বললেন, 'জি... হে আল্লাহর নবী!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিয়ামত দিবসে যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তার পক্ষে বাদী হয়ে আসবে, তখন তুমি কী করবে?'

বাহিনীটি পাঠানো হয়েছিল জুহায়না গোত্রের শাখাগোত্র হুরাকাতের উদ্দেশ্যে, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০ জন। সূত্র : *উয়ুনুল আছার* : ২/১৫৬

৬৫৯. বলা হয় যে, সে হলো নাহিক বিন মিরদাস।

CamScanner

সাহাবি বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন!'

বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার একই কথা বলতে ছিলেন...। এর অতিরিক্ত আর কিছুই তিনি তখন বলেননি।[৬৬০]

এটি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর সকল উম্মতের জন্য একটি অনিবার্য শিক্ষা এবং অসমর্থিত হত্যার ব্যাপারে একটি কঠিন সতর্কবার্তা। বরং অন্যভাবে বলা যায়, যেখানে হত্যা না করার সামান্যতম সুযোগ রয়েছে, সেখানে হত্যা না করার ব্যাপারে এটা ছিল রাসুলের প্রচণ্ড আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, ইসলামের যুদ্ধ-জিহাদ এমন একটি বিষয়, যা কেবল প্রয়োজনের কারণেই হয়ে থাকে। আর যখন এবং যেখানেই লড়াই ও রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার সামান্যতম সুযোগ থাকে, তখন এবং সেখানে তা এড়িয়ে যাওয়াই ইসলাম ও তার রাসুলের কর্মনীতি।

অতএব, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুতেই অনর্থক যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি যথাসম্ভব যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। এ কারণেই তিনি প্রথমে শত্রুদের সামনে ইসলামগ্রহণ বা কর প্রদানের প্রস্তাব পেশ করতেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি লড়াই করার ব্যাপারে অটল থাকত, তাহলেই কেবল তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। কিন্তু এরপরও তিনি তাদের জন্য সন্ধিচুক্তির দরজা খুলে রাখতেন।

শত্রুরা সন্ধির প্রস্তাব করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন এবং সন্ধি করে নিতেন, এমনকি প্রস্তাবটা যদি মুসলমানদের বিজয়ের আলামতসমূহ স্পষ্ট হওয়ার পরও করা হতো। এর একটি উজ্জ্বল নমুনা হলো খায়বার যুদ্ধের ঘটনা। আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন,

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ইহুদিদেরকে ১৪ দিন অবরোধ করে রাখার পর তারা যখন তাদের পরাজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন তাদের পক্ষ থেকে ইবনু আবিল

---

৬৬০. *সহিহ মুসলিম* : ৯৭।

CS CamScanner

হুকাইক রাসুলের নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলো। সে রাসুলের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে যে, নবীজি তাদের প্রাণ রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে খায়বার থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দেবেন। আর তারা রাসুলের কাছে তাদের মালিকানাধীন সকল জমি, সম্পদ, সোনা-রুপা, ঘোড়া, যাবতীয় অস্ত্র ও গচ্ছিত পোশাক রেখে যাবে। তবে নিজেদের শরীরে পরিহিত পোশাক ও অলংকার তারা নিয়ে যেতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আরেকটি শর্ত যুক্ত করে বললেন, 'কিন্তু তোমরা যদি কোনো কিছু গোপন করো, তাহলে তোমাদের থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা উঠে যাবে।' ইহুদিরা রাসুলের এই শর্তটি মান্য করেই সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[৬৬১]

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি মহৎ গুণ ছিলো, তিনি তাঁর পুরো জীবনে একটিবারের জন্যও কাউকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করার চিন্তা করেননি। অবশ্য এ গুণটি রাসুলের জীবনের অন্য প্রতিটা ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে সেই বেদুইনের ঘটনা, যে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখল এলাকায় অবস্থিত খাসফা গোত্রের শাখাগোত্র মুহারেবের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। লড়াইয়ের দিনগুলোতে একসময় অমুসলিমরা মুসলমানদের অসতর্ক অবস্থায় (নবী ও সাহাবিগণ দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন) দেখতে পায়। তখন তাদের একজন কিছুটা দূরে বিশ্রামরত রাসুলের দিকে এগিয়ে এলো, তার নাম গাওরাছ ইবনে হারেস। লোকটি এসে রাসুলের মাথার নিকট একটি তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর রাসুলকে লক্ষ্য করে বলল, 'এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ।' কথাটি শোনামাত্র লোকটির হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। এরপর নবীজি

---

৬৬১. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৩৭৬।

CamScanner

তরবারিটা নিজের হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন তুমি বলো, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?'

লোকটি বলল, 'আপনি তরবারিটির উত্তম ধারক হোন।'

নবীজি বললেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?'

লোকটি বলল, 'না, তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব না। এমন কোনো সম্প্রদায়েরও পক্ষ নেব না, যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে।'

নবীজি লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে ফিরে এলাম।'[৬৬২]

আমরা দেখতে পাই, এই কাফের ব্যক্তি তরবারি হাতে রাসুলের শিয়রে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁকে হত্যা করার ভয়ও দেখিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে বিপদমুক্ত করলেন আর ঘটনার প্রেক্ষাপট পালটে গেল। তরবারি বেদুইনের হাত থেকে রাসুলের হাতে চলে এলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! এরপরও রাসুলের অন্তরে হিংসা বা প্রতিশোধপরায়ণতা স্থান পায়নি! তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তার কাছে ইসলামগ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। লোকটি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তবে নবীজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। নবীজি প্রশস্ত হৃদয়ে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাকে ক্ষমা করে দেন এবং নিরাপদে নিজ গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন, তাকে ইসলামগ্রহণেও বাধ্য করেননি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ যেসব যুদ্ধ করেছেন, সেখানে কোনো প্রতিশোধের উদ্দেশ্য ছিল না। এ কারণে পরাজিতদের সঙ্গে রাসুলের আচরণ ছিল অমায়িক, ক্ষমা ও মুক্তির মহৎ গুণে গুণান্বিত। কেউ বিরূপ আচরণ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ঘৃণা করতেন। নবীজির এই ক্ষমার নমুনা পাওয়া যায় হুদাইবিয়ার ঘটনাতে। ইমাম মুসলিম রহ. তার 'সহিহ' গ্রন্থে হজরত

[৬৬২]. *সহিহ বুখারি* : ৪১২৭, *সহিহ মুসলিম* : ৮৪৩।

CamScanner

CS CamScanner

তিনি বলেন, এরপর আমি তাদেরকে বন্দি করে রাসুলের নিকট নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, আমার চাচা আমেরও[৬৬৪] 'আবালত' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসছে। তার নাম মিকরাজ। মিকরাজ সে সময় বর্ম পরিহিত ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেছিল এবং মিকরাজের সঙ্গে আমার চাচা আরও ৭০ জন মুশরিককে ধরে নিয়ে এসেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তাদেরকে ছেড়ে দাও। বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা হোক তাদের থেকেই এবং শেষটাও!'

তিনি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

> আল্লাহই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের পর্যন্ত পৌছা হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের পর্যন্ত পৌছা হতে নিবৃত্ত রেখেছেন। তাদের ওপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করার পর।
>
> [সুরা ফাতহ : ২৪]

সালামা রা. বলেন, এরপর আমরা মদিনার উদ্দেশে বের হয়ে পড়ি।[৬৬৫]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বিষয় প্রশস্ত হৃদয় ও সহজতার সাথে গ্রহণ করেছেন। কখনো কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি কখনো কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতে রক্তপাত ঘটাননি। কারও ধনসম্পদ নষ্ট করেননি। বাড়িঘর লুটপাট করেননি। বরং সবসময় সবধরনের শত্রুর ক্ষেত্রে ক্ষমাই ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর ক্ষমা শুধু সেসব একক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, যারা

---

৬৬৪. আমের বিন সিনান আল-আনসারি : তিনি সালামা বিন আমর বিন আকওয়া রা.-এর চাচা ছিলেন। খায়বারযুদ্ধে শহিদ হন। খায়বারযুদ্ধে বের হওয়ার মুহূর্তে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, بِاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا —আল্লাহর কসম! আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, দান-সদকা করতে পারতাম না এবং নামাজও আদায় করতে পারতাম না। সূত্র : *উসদুল গাবাহ* : ২/১৯, *আল-ইসাবা* : ৪৩৯১।

৬৬৫. *সহিহ মুসলিম* : ১৮০৭, *মুসনাদে আহমাদ* : ১৬৫৬৬।

কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। বরং তিনি সম্প্রদায়ের সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো মক্কাবাসীকে তাঁর ক্ষমা করে দেওয়া। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের অহমিকা এবং বংশগৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন। মানুষমাত্রই আদম থেকে সৃষ্ট আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।' অতঃপর নবীজি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

[সুরা হুজুরাত : ১৩]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা আশা করো?'

তারা (কুরাইশরা) বলল, 'আমরা উত্তম আচরণের আশা করি। তুমি আমাদের সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঠিক আছে, যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত-স্বাধীন।'[৬৬৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও ক্ষমা এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, যেসব গোত্র তাঁর আহ্বানের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে, পরে যখন তিনি তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন, তখন ক্ষমার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ব-

---

৬৬৬. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪১১, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ৩/৩৫৬, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৫৭০, *ফাতহুল বারি* : ৮/১৮।

CamScanner

পদমর্যাদাও ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন বনু ফাযারার নেতা উয়াইনা ইবনে হিসনকে তার পূর্ব নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ নবীজি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, 'আহজাব' যুদ্ধের দিনগুলোতে মদিনা মুনাওয়ারাকে অবরোধকারী বাহিনীর মাঝে সেও ছিল। সে তখন গাতফান গোত্রের পতাকাতলে অবস্থান করছিল। আব্বাস বিন মিরদাসকে বনু সুলাইমের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। একইভাবে আকরা ইবনে হাবেসকে তামিম গোত্রের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৬৬৭] জাইফার ও আব্বাদকে ওমানের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৬৬৮] ইয়ামেনের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন বাযানকে।[৬৬৯] আর মুনযির ইবনে সাবাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন বাহরাইনের নেতৃত্ব...[৬৭০]। আরও অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটার কারণে সবগুলো দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা কষ্টকর। এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনন্যসুন্দর মহত্ত্ব ও ক্ষমার ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে।

এমনটাই ছিল যুদ্ধের ময়দান ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ। কতই-না চমৎকার ছিল তাঁর এই চারিত্রিক গুণাবলি! যেগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে প্রতিপালকের সঙ্গে তাঁর গভীরতম সম্পর্ক, যিনি তাঁকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং অতি উত্তমভাবেই তিনি সেই শিক্ষাদান পূর্ণ করেছেন।

---

৬৬৭. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ২/১৫৩।
৬৬৮. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/২৬৩।
৬৬৯. ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৪/২৭০।
৬৭০. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/২৬৩।

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইহুদিদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধিচুক্তি

মদিনায় হিজরতের পরপরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার ইহুদিদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। (মানচিত্র নং-৫) তাঁর এই সন্ধিচুক্তি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তিনি অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে[৫৮৯] শান্তিতে বসবাস করতে চাইতেন এবং এটার প্রতিই তিনি আগ্রহী ছিলেন। উক্ত চুক্তিনামাতে লিখিত ধারাগুলো ছিল এমন :

- বনু আউফের ইহুদিরা (স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে) মুসলমানদের সাথে (সম্পর্কযুক্ত হয়ে) বসবাস করবে। ইহুদিরা পালন করবে ইহুদিদের ধর্ম, মুসলমানরা পালন করবে মুসলমানদের ধর্ম। এই বিধান প্রযোজ্য হবে তাদের নিজেদের জন্য, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ লোকদের জন্যও।
- ইহুদিদের যাবতীয় খরচ ইহুদিরা বহন করবে, মুসলমানদের যাবতীয় খরচ মুসলমানরা বহন করবে।

---

৫৮৯. একজন মুসলিমের জন্য একজন অমুসলিমের সঙ্গে সম্পর্কের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি। যথা :

- মুওয়ালাত : তথা হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা বা আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসা। এটি কেবল মুমিনদের সাথে বিশিষ্ট। কোনো অমুসলিমের সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়।
- মুওয়াসাত : তথা সহমর্মিতা, কল্যাণকামনা ও উপকার সাধন। যেসব কাফের যুদ্ধবাজ ও মুসলমানদের ওপর আক্রোমণোদ্যত, তারা বাদে অন্য সব অমুসলিমের সাথে এই স্তর জায়েজ।
- মুদারাত : তথা বাহ্যিক সদ্ব্যবহার ও বন্ধুসুলভ আচরণ। সমস্ত অমুসলমানের সাথে এই স্তর অবলম্বন করা জায়েজ। তাদের উপকার সাধন, তারা মেহমান হলে, তাদের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি অবস্থায় এটি অবলম্বন করা যাবে।
- মুওয়ামালাত : তথা অমুসলিমদের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য, ভাড়া-বন্ধক, চাকরি, লেনদেন। এটিও সমস্ত অমুসলিমের সাথে জায়েজ, তবে মুসলমানদের ক্ষতি না হওয়া শর্ত। যেমন যুদ্ধরত কাফেরদের নিকট অস্ত্র বিক্রি।

–সূত্র : মুফতি তাকি উসমানি : *ইসলাম ও রাজনীতি* : ৩৪৩-৩৪৪ (সংক্ষেপিত)।-সম্পাদক

CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

যুদ্ধবন্দিদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচারব্যবহারের নীতিমালা একেক ধর্মে, একেক সমাজে একেক রকম। তবে ইসলাম আগমনের পূর্বে সকল নীতিমালাতেই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল কঠোর আচরণ, অত্যাচার ও নির্যাতন। আর যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচারব্যবহারের এই নীতিগুলোই মানুষদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচারব্যবহারে তাঁর স্বভাবজাত দয়ার্দ্র মনোভাব থেকে একচুলও সরে আসেননি। তিনি তাদেরকে কখনো এই দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি যে, তারা সর্বদা সর্বদিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে, তাঁকে হত্যা করে পৃথিবী থেকে মুসলমানদের নামনিশানা মুছে ফেলতে চায়।

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচারব্যবহারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের উচ্চতা ও মহত্ত্ব অনুধাবন করতে আমরা তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। তাঁর জীবনের চিরন্তন ও অমর কীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, বদরের যুদ্ধবন্দিদের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার। সকলেই জানি, বদরযুদ্ধ ছিল মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে সংঘটিত প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ। উক্ত যুদ্ধে সৈন্য ও অস্ত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরাই বিজয় অর্জন করেন। (সত্তরজন মুশরিককে হত্যা করেন) সেইসাথে তারা সত্তরজন মুশরিককে বন্দি করেন। এইসব যুদ্ধবন্দির ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন, যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হজরত উমর রা.। তিনি বলেন, (বদরযুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে) আবু বকর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এরা তো আমাদেরই আত্মীয়, কেউ হয়তো চাচাতো ভাই, কেউ আপন ভাই, কেউ-বা পরিবারের অন্য সদস্য। এতএব, আমার মত হলো তাদের থেকে ফিদয়া নেওয়া হোক। তাহলে সেই সম্পদগুলো পরে কাফেরদের বিরুদ্ধে

CamScanner

লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি জোগাবে। সেইসাথে সম্ভাবনা আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দেবেন, তখন তারাও আমাদের সহযোগী হয়ে যাবে।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র, তোমার কী মত?'

উমর রা. বলেন, আমি তখন বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমার মতটা আবু বকরের মতের মতো নয়। বরং আমার মত হলো, আপনি অমুককে (তার নিজের এক আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করলেন) আমার হাতে ছেড়ে দেবেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আলির হাতে ছেড়ে দেবেন আকিলকে, সে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। আর হামজার হাতে দেবেন তার অমুক ভাইকে, সেও তার গর্দান উড়িয়ে দেবে (এভাবে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ মুশরিক বন্দি আত্মীয়কে হত্যা করবে)। যাতে আল্লাহ তাআলা দেখে নেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি কোনো নমনীয়তা নেই। আর তারাই হলো মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় লোক, তাদের নেতা ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ...।'

(হজরত উমর রা. বলেন,) তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মত গ্রহণ করলেন না, বরং তিনি হজরত আবু বকরের মত গ্রহণ করলেন এবং তাদের (যুদ্ধবন্দিদের) থেকে ফিদয়া গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।[৬৭১]

যদিও এই ঘটনার পর এই প্রেক্ষাপটে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যেখানে এইসব যুদ্ধবন্দিদের সাথে নরম ও কোমল আচরণের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত এক বিধান পূর্বে না থাকত, তবে তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছ, সে কারণে তোমাদের ওপর বড় কোনো শাস্তি আপতিত হতো। [সুরা আনফাল : ৬৮]

---

৬৭১. ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ২/৪৫৭।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল যুদ্ধবন্দির সাথে কঠোর আচরণ করেননি, অথবা তাদেরকে হত্যা থেকে রেহাই দেওয়া এবং সক্ষম ব্যক্তিদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি।[৬৭২] তা ছাড়া, মুক্তিপণের পরিমাণেও তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। প্রতিটি বন্দির সামর্থ্য অনুপাতে মুক্তিপণের পরিমাণ ও প্রকার ভিন্ন-ভিন্নভাবে ধার্য করা হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু যুদ্ধবন্দিকে, যেমন আমর ইবনে আবি সুফিয়ানকে মুক্ত করে দেন এই শর্তে যে, মুশরিকরা তার বিনিময়ে সাদ ইবনে নুমান ইবনে আক্কালকে মুক্ত করে দেবে, যাকে আবু সুফিয়ান ওমরা করা অবস্থায় আটক করেছিল।[৬৭৩]

যুদ্ধবন্দিদের অনেকেই মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বন্দির আর্থিক অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখেন এবং সে অনুযায়ী তাদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন। এ কারণে কোনো কোনো বন্দি মুক্তিপণ হিসেবে চার হাজার দিরহাম প্রদান করে। যেমন আবু ওদাআতা ও আবু আজিজ। তার আসল নাম হলো যুরারা ইবনে উমায়ের। সে ছিল প্রখ্যাত সাহাবি মুসআব ইবনে উমায়েরের ভাই। তার মা তার মুক্তিপণ পরিশোধ করে। তার মা বেশ সম্পদশালী মহিলা ছিলেন।

আবার বন্দিদের মধ্যে কেউ প্রদান করে একশ উকিয়া[৬৭৪]। যেমন রাসুলের চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.। কেউ প্রদান করে আশি উকিয়া। যেমন রাসুলের চাচাতো ভাই আকিল ইবনে আবি তালিব। অবশ্য আব্বাস রা. তার মুক্তিপণ তাকে প্রদান করেন। আবার কেউ কেউ মাত্র চল্লিশ উকিয়া প্রদান করেই মুক্তি পেয়ে যায়।[৬৭৫]

---

৬৭২. বস্তুত এখানে সিদ্ধান্ত বহাল রাখার অনুমতি ছিল, তাই বহাল রেখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান অমান্য করেননি।-সম্পাদক

৬৭৩. ইবনে কাছির : *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৩/৩১১।

৬৭৪. এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম। আর এক দিরহাম = ৩.০৬১৮ গ্রাম। সুতরাং এক উকিয়া ৪০×৩.০৬১৮ = ১২২.৪৭২ গ্রাম।

৬৭৫. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ৪/১৪।

CamScanner

আর যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে যাদের কোনো সম্পদ ছিল না, তবে লেখাপড়া জানত, কয়েকজন আনসারি মুসলিম সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের মুক্তিপণ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করে বলেন, বদরযুদ্ধের সময় কিছু মুশরিক বন্দির মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কোনো অর্থসম্পদ ছিল না। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন, তারা আনসারি সাহাবিদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে।[৬৭৬]

তা ছাড়া এই যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল, যাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ অনুগ্রহ করে কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন মুত্তালেব বিন হানতাব, কবি আবু ইজ্জা ও ছয়ফি বিন আবি রিফাআ।[৬৭৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের মহান নেতা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী সুহাইল ইবনে আমরের সাথেও অতি উত্তম আচরণ করেছিলেন। তিনি তাকে অপদস্থ করতে কিংবা তার চেহারা বিকৃতি ঘটাতে রাজি হননি, যদিও সেটা করার পূর্ণ সক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সুহাইল ইবনে আমরের সামনের দুই দাঁত ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। যাতে সে আর কখনোই কোনো স্থানে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করে বলেছিলেন, 'আমি কিছুতেই তার চেহারা বিকৃত করতে পারি না। তাহলে আশঙ্কা হয় আল্লাহ তাআলা আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন, যদিও আমি নবী।'[৬৭৮]

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আবুল আস বিন রবি'-ও ছিল। সে ছিল রাসুলের মেয়ে হজরত জয়নাবের স্বামী। স্বামীকে মুক্ত করার জন্য হজরত জয়নাব তার একটি হার পাঠিয়েছিলেন। স্বামী আবুল আস তাকে বিবাহ করে উঠিয়ে নেওয়ার সময় এই হারটি দিয়েই মাতা হজরত খাদিজা তাকে স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। এই হারটি দেখে (হজরত খাদিজার রা.-এর কথা মনে

[৬৭৬]. মুসনাদে আহমাদ : ২২১৬, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৪/১৭২।
[৬৭৭]. ইবনে সাইয়েদিন নাস : উয়ুনুল আছার : ১/৩৫২।
[৬৭৮]. মুসতাদরাকে হাকেম : ৩/৩১৮, ইবনে হিশাম : আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা : ৩/২০০।

পড়ায়) নবীজির হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, 'তোমরা যদি ভালো মনে করো, তাহলে জয়নাবের বন্দি আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দাও এবং তার হার তাকে ফেরত দিয়ে দাও।' সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমরা সন্তুষ্ট।' পরে তারা আবুল আসকে মুক্ত করে দেন এবং সাথে জয়নাবের হারও ফেরত দিয়ে দেন।(৬৭৯) অতএব, অনেকের মতো আবুল আসকেও কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল যুদ্ধবন্দিকেই মুক্তিপণ ছাড়া মুক্ত করে দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, যদি তাদের ব্যাপারে কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা মুতইম ইবনে আদি সুপারিশ করতেন। কিন্তু তিনি এর আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে একটি ইঙ্গিতও করেছেন। যেমন *সহিহ বুখারিতে* বর্ণিত হয়েছে হজরত জুবায়ের ইবনে মুতইম থেকে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে বলেছিলেন, যদি মুতইম বিন আদি বেঁচে থাকতেন আর আমার নিকট এই (কুফরির) দুর্গন্ধযুক্ত লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তাহলে আমি তার সুপারিশে এদেরকে ছেড়ে দিতাম।(৬৮০)

মুতইম বিন আদির প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শনের কারণ হলো, কুরাইশরা বনু হাশেমের সাথে বয়কট করে যে অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করে, তিনি সেই অঙ্গীকারনামা ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ থেকে ফিরে আসেন, তখন মুতইম তাকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন।

আর এটা সুস্পষ্ট যে, বদরযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ে অবশিষ্ট সকল যুদ্ধবন্দির মুক্তকরণ সম্পন্ন হয়ে যায়। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, ওহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা তাদের কোনো বন্দিকে মুক্ত করার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়নি।

---

৬৭৯. ইবনে সাইয়্যেদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/৩৫১-৩৫২।

৬৮০. *সহিহ বুখারি* : ৩১৩৯, *সুনানে আবু দাউদ* : ২৬৮৯, *মুজামুল কাবির* : ১৫০৪ *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ৯৪০০, *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি* : ১২৬১৬

24/12/05 13:43

CamScanner

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আচার-আচরণের ক্ষেত্রে চির ভাস্বর হয়ে আছে হজরত ছুমামা বিন উছালের সাথে সংঘটিত সেই অনন্যসাধারণ ঘটনা। হজরত ছুমামা ছিলেন বনু হানিফার এক প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মদিনায় এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবেন।[৬৮১] কিন্তু ঘটনাক্রমে রাসুলের সাহাবিগণ তাকে আটক করে ফেলেন। তাকে বন্দি করে মসজিদে নববিতে নিয়ে আসেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা তার বন্দিত্বের সময় তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।'[৬৮২]

নবীজি আরও বলেন, 'তোমাদের নিকট বিদ্যমান খাদ্য-খাবার একত্রিত করে তার কাছে পাঠাও।' একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবিগণ রাসুলের দুগ্ধবতী উটনীর দুধও বন্দি ছুমামাকে খেতে দিতেন।[৬৮৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বন্দির সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্মান, ভদ্রতা ও ক্ষমার আচরণ করেছেন। তিনি একবার তাকে এসে বললেন, 'ছুমামা! তোমার ব্যাপারে আমি কী সিদ্ধান্ত নেব বলে তোমার মনে হয়?'

উত্তরে ছুমামা বলেন, 'মুহাম্মাদ, আপনি আমার ব্যাপারে ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই মনে করি। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি একজন খুনিকেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই আপনি অনুগ্রহ করবেন। আর আপনি যদি সম্পদ চান, তাহলে বলুন, আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলে ছুমামাকে রেখে চলে গেলেন। দিন পার হলো। পরের দিন নবীজি আবার এসে তাকে একই প্রশ্ন করে বললেন, 'ছুমামা, তোমার ব্যাপারে আমি কী সিদ্ধান্ত নেব বলে তোমার মনে হয়?'

ছুমামা বললেন, 'আমার কাছে তেমনই মনে হচ্ছে যেটা আমি আপনাকে আগে বলেছিলাম। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি

---

[৬৮১]. বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৭৮১০, ইবনে হাজার : *আল-ইসাবা* : ১/৩০২, ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ১/৩৩৭।

[৬৮২]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৬/৫১।

[৬৮৩]. ইবনে হাজার : *ফাতহুল বারি* : ৮/৮৮।

একজন খুনিকেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই আপনি অনুগ্রহ করবেন। আর আপনি যদি সম্পদ চান, তাহলে বলুন, আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলে এ দিনও তাকে রেখে চলে গেলেন। পরদিন নবীজি আবার এসে তাকে একই প্রশ্ন করে বললেন, 'ছুমামা, তোমার ব্যাপারে আমি কী সিদ্ধান্ত নেব বলে তোমার মনে হয়?'

ছুমামা বললেন, 'আগের মতোই। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি একজন খুনিকেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই আপনি অনুগ্রহ করবেন। আর আপনি যদি সম্পদ চান, তাহলে বলুন, আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে।'

এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও।'

ছাড়া পেয়ে ছুমামা প্রথমে মসজিদে নববির নিকটস্থ একটি খেজুরবাগানে গিয়ে গোসল করলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নিজের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা করে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল।'

এরপর তিনি রাসুলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার নিকট পৃথিবীতে আপনার চেহারা থেকে অধিক অপছন্দনীয় আর কোনো চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার নিকট পৃথিবীর সকল চেহারা থেকে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আগে আমার কাছে আপনার ধর্ম থেকে অধিক ঘৃণিত আর কোনো ধর্ম ছিল না। কিন্তু এখন আপনার ধর্মই আমার নিকট পৃথিবীর সকল ধর্ম থেকে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আগে আমার নিকট আপনার শহর থেকে অধিক ঘৃণিত শহর আর কোনোটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার নিকট সকল শহর থেকে অধিক প্রিয়।'

CS CamScanner

ছুমামা আরও বলেন, 'আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, সে সময় আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে আটক করে! আপনি এখন আমাকে কী নির্দেশ দেন?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছুমামাকে কিছু সুসংবাদবাণী শোনান এবং ওমরা করার নির্দেশ দেন। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী ছুমামা যখন ওমরা করার জন্য মক্কায় গেলেন, তখন এক ব্যক্তি তাকে (তাচ্ছিল্য করে) বলল, 'তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?'

ছুমামা রা. বললেন, 'না, আমি বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামগ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুল অনুমতি দেওয়া ব্যতীত ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছবে না।'[৬৮৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মহৎ আচরণ ছুমামার অন্তরে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং কোনোপ্রকার জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য 'ইসলামধর্ম' গ্রহণ করেন। বরং তার ইসলামগ্রহণ এতটাই শক্তিশালী ও জোরদার ছিল যে, তিনি কুরাইশদের সাথে সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাদের ওপর খাদ্য-অবরোধ আরোপ করেন। কারণ, কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। অবশ্য এজন্য ছুমামাকে বিপুল পরিমাণ অর্থও লোকসান দিতে হয়, যে অর্থ আসত কুরাইশদের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য করার মাধ্যমে, তাদের নিকট গম রপ্তানি করার মাধ্যমে। এবং রাসুলের ভালোবাসায় তিনি কুরাইশ নেতাদের সাথে সামাজিক ও কূটনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সকল ও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।

এদিকে, মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অনেক মুশরিক বন্দি হয়। সেইসব যুদ্ধবন্দির সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে একটি ব্যাপক নীতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলেন,

«اسْتَوْصُوا بِالأُسَارَى خَيْرًا»

---

৬৮৪. *সহিহ বুখারি* : ৪৩৭২, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৬৪।

তোমরা যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে সদাচারের উপদেশ গ্রহণ করো।'[৬৮৫]

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দিদের সাথে মুসলমানদের উত্তম আচরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা নিছক এমন কোনো তাত্ত্বিক নীতি বা দর্শন ছিল না, বাস্তবজীবনে যার কোনো প্রয়োগ নেই। বরং মুসলমানদের জীবনের বহু ক্ষেত্রে এগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। এগুলো প্রমাণ করে, তাদের অন্তর ছিল দয়া ও অনুগ্রহে ভরপুর।

এ কারণে আমরা দেখি, বদরযুদ্ধের সময় নবীজি সাহাবা কর্তৃক কুরাইশদের দুই গোলামকে প্রহার করাকে নিন্দা করেছেন। নবীজি সাহাবিদের তিরস্কার করে বলেন, 'তারা দুজন যখন তোমাদের সত্য বলে, তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করো, আর যখন তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা বলে, তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা সত্য বলেছে। আল্লাহর কসম! তারা কুরাইশদের গোলাম...।'[৬৮৬]

যদিও এই যুবকদ্বয় ছিল শত্রুসেনাদের লোক এবং তাদেরকে প্রহার করার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য শত্রুবাহিনীর গোপন দুর্বলতার বিষয়ে জানার সম্ভাবনা ছিল, এরপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রহার করা এবং কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করেছেন। ঠিক এই বিষয়ে ইমাম মালেক রহ. তার মত ব্যক্ত করেছেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোনো বন্দির ব্যাপারে যদি আশা করা যায়, তাকে শাস্তি দেওয়া হলে সে শত্রুপক্ষের গোপন তথ্যাবলি অবহিত করবে, তাহলে কি এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে?'

ইমাম মালেক বলেন, 'এমন কথা আমি আগে কখনো শুনিনি (অর্থাৎ এমন কর্ম আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে কখনো পাওয়া যায়নি)।'[৬৮৭]

আর শুধু এতটুকুই নয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বন্দির শারীরিক স্বস্তি ও সুস্থতার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখতেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার এসব কর্মপন্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে খোদাপ্রদত্ত, এটা মানুষের উদ্ভাবিত নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত মানুষের প্রতি

---

৬৮৫. আল্লামা তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ৯৭৭, *মুজামুস সগির* : ৪০৯, *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* : ৬/১১৫

৬৮৬. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৬১৬, ৬১৭; সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ৪/২৭, *আর-রউজুল উনুফ* : ৩/৫৮।

৬৮৭. [illegible] : ৩/৩৫৩।

অধিক অনুগ্রহশীল ও দয়াশীল আর কেউ নেই। তাঁর সেই দয়া ও অনুগ্রহের একটি বহিঃপ্রকাশ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বন্দিদের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি এই বন্দি যদি তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীও হয়ে থাকে।

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত এই সহানুভূতিশীল নীতি তার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণে, আমরা ইতিহাসে দয়া ও সহানুভূতির এমন বহু ঘটনা উদ্ধৃত হতে দেখি। এগুলোর ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, মুসলিমজাতি ব্যতীত অন্য কোনো জাতির মধ্যে দয়া ও সহানুভূতির এত দৃষ্টান্ত নেই।

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে উত্তম আচরণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাদের খাদ্য-খাবারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বদরযুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে যুদ্ধবন্দিদের যথাযথ সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এ কারণে সাহাবিগণ খাবারের সময় নিজেদের ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দিতেন। এই কথাটি আরও অনেকেই বর্ণনা করেছেন। যেমন হজরত সাইদ বিন জুবায়ের, আতা, হাসান এবং কাতাদা রহ.।[৬৮৮]

নিজেদের পানাহারের পর অবশিষ্ট যে খানা থাকত, সাহাবিগণ বন্দিদেরকে সেই খানা প্রদান করতেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং তারা তাদের নবীর উপদেশ যথাযথভাবে পালনার্থে নিজেদের কাছে থাকা সবচেয়ে উত্তম খাবার নির্বাচন করতেন এবং বন্দিদেরকে সেই খাবার খাওয়াতেন। এই যেমন বন্দি আবু আজিজ। তিনি ছিলেন মুসআব বিন উমায়েরের সহোদর। তিনি তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তারা যখন আমাকে বদরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বন্দি করে নিয়ে আসেন, তখন আমি (বন্দি হিসেবে) আনসারি সাহাবিদের একটি দলের সাথে অবস্থান করতাম। তারা আমাকে এমন সম্মান দেখতেন যে, সকালের কিংবা রাতের খাবারের সময় হলে তারা নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন আর আমাকে রুটি দিতেন । এমনকি খাবার

৬৮৮. ইবনে কাছির : *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম* : ৪/৫৮৪।

2024.12/05 18:43
CamScanner

খেতে তাদের কারও ভাগে যদি রুটির কোনো টুকরা এসে পড়ত, তবুও তিনি নিজে না খেয়ে সেটা আমাকে দিয়ে দিতেন। আমার লজ্জা লাগত, আমি ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি তা গ্রহণ করতেন না, আমাকেই আবার ফিরিয়ে দিতেন।

ইবনে হিশাম বলেন, বদরযুদ্ধের দিন নজর বিন হারেসের পর এই আবু আজিজই মুশরিকদের ঝান্ডা বহন করেছিল।(৬৮৯) অতএব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, লোকটা শত্রুপক্ষের সাধারণ কোনো ব্যক্তি ছিল না সে ছিল মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর মনো ভাবাপন্ন মুশরিকদের একজন। কারণ, যুদ্ধের সময় তারাই ঝান্ডা বহন করে, যারা দলের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও নেতৃস্থানীয় হয়। কিন্তু এটা মুসলমানদের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করতে পারেনি। কারণ, 'যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দয়া দেখানো' এমন একটি আচরণনীতি, যা কোনো কাল, স্থান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্জন করা বৈধ নয়।

তা ছাড়া মুসলমানগণ যুদ্ধবন্দিদের শুধু খাদ্য-খাবার দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেরও ব্যবস্থা করতেন। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারি রহ. তার *সহিহ* নামক গ্রন্থে একটি অধ্যায় এনেছেন। অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন, 'যুদ্ধবন্দিদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান' সেখানে তিনি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বদরযুদ্ধ শেষ হলে বন্দিদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হয়। বন্দিদের মধ্যে হজরত আব্বাসও ছিলেন। তার গায়ে ভালো কোনো পোশাক ছিল না। নবীজি তার জন্য পোশাক খুঁজতে শুরু করলেন। সাহাবিগণ খোঁজ নিয়ে দেখলেন আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পোশাকটি আব্বাস রা. এর শরীরের সঙ্গে খাপ খায়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আব্বাসকে সেই পোশাক পরিয়ে দিলেন।(৬৯০)

আরও বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াজিন গোত্রের বন্দিদেরকে পোশাক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে মক্কায় গিয়ে বন্দিদের জন্য 'মুআক্কাদ' নামক পোশাক ক্রয় করে

---

৬৮৯. ইবনে সাদ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ২/১৫, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/৪৭৫।
৬৯০. *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৬, বাইহাকি : *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৮৫৭০।

CS CamScanner

আনার আদেশ করেন। ফলে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে যারা বন্দিমুক্ত বের হতো, তারা পোশাক পরিহিত অবস্থায় বের হতো।[৬৯১]

যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম ওসিয়ত ছিল তাদের সঙ্গে নরম ও কোমল আচরণ করার, যাতে তারা স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি বন্দিদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন। বন্দিদের প্রশ্নের কারণে তিনি বিরক্ত হতেন না এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। এটা প্রমাণ করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই সুপ্রশস্ত হৃদয় এবং গভীর ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন, যা সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সহিহ মুসলিমে ইমরান বিন হুসাইনের বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন, ছাকিফ গোত্র ছিল বনু উকাইলের মিত্র। ছাকিফ গোত্রের লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন সাহাবিকে বন্দি করে নিয়ে আসে। এদিকে সাহাবিরা বন্দি করেন বনু উকাইল গোত্রের এক ব্যক্তিকে। তার সাথে তার আযবা নামক উটকেও আটক করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দি লোকটির দিকে এগিয়ে এলেন। বন্দি তখন শেকলে আবদ্ধ ছিল। লোকটি বলল, 'হে মুহাম্মাদ!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বন্দি লোকটির নিকট এসে বললেন, 'বলো, তোমার কী খবর?'

সে বলল, 'তুমি কেন আমাকে ধরে এনেছ? আর কেনই-বা আমার ছাবিকাতুল হাজকে[৬৯২] আটক করেছ?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বড় কোনো কারণেই আটক করা হয়েছে, তোমার মিত্র ছাকিফ গোত্রের অপরাধে আমি তোমাকে ধরেছি।'

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে চলে গেলেন । সে আবার ডাক দিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!'

---

৬৯১. বাইহাকি : *দালায়িলুন নুবুওয়া* : ৫/২৬৪।
৬৯২. এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল তার আসবা নামক উটটি।

CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল ও নম্র স্বভাবের। তাই তিনি আবার বন্দি লোকটির কাছে গেলেন এবং বললেন, 'বলো, কী বলবে?'

সে বলল, 'আমি একজন মুসলমান।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি এই কথাটি তখন বলতে, যখন তোমার ব্যাপারে তোমার অধিকার ছিল, (যদি বন্দি হওয়ার পূর্বে ইসলামগ্রহণ করতে) তাহলে তুমি পূর্ণ সফলকাম হয়ে যেতে।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলেন। লোকটি পুনরায় ডাক দিলো, 'হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তার কাছে এলেন এবং বললেন, 'বলো, তুমি কী বলতে চাও?'

সে বলল, 'আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দাও! আমি পিপাসার্ত, আমাকে পানি পান করাও!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ... ঠিক আছে, এটা তোমার প্রয়োজন।'(৬৯৩)

একজন বন্দির পক্ষে এভাবে বারবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া, যিনি ছিলেন পুরো ইসলামি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ নেতা এবং শুধু তাঁর নাম ধরে ডাকতে পারা (যার কারণে তিনি একটুও বিরক্তবোধ করেননি)-র দ্বারাও বোঝা যায়, প্রতিটি মানুষের জন্য তিনি তাঁর হৃদয়ে কী পরিমাণ দয়া ও মানবতাবোধ পোষণ করতেন!

হয়তো এরচেয়ে আরও বড় ব্যাপার এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের অন্তরের আকুতি-আবেদনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় মানুষের সংকটময় কঠিন মুহূর্তগুলোতে, বিশেষ করে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে।

---

৬৯৩. সহিহ মুসলিম : ১৬৪১, সুনানে আবু দাউদ : ৩৩১৬, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪৮৫৯।

4/12/05 18:44

CS canner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত সাহাবিদেরকে যুদ্ধবন্দি মহিলা ও শিশুদের সাথে আচার-আচরণে উন্নত মানবিকতা প্রদর্শনের নির্দেশনা দিতেন। তিনি শিশুকে তার মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে নিষেধ করতেন।

আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও তার শিশুর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাআলা তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে কিয়ামতদিবসে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেবেন।[৬৯৪]

আশা করি আমাদের এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য সামনের ঘটনাটি খুবই চমৎকার একটি বিষয় হতে পারে! কারণ, উক্ত ঘটনাতে যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচার-আচরণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্রের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। ঘটনাটি হলো এই :

আবু উসাইদ আনসারি রা.[৬৯৫] বাহরাইন অঞ্চলের কিছু যুদ্ধবন্দিকে ধরে নিয়ে আসেন। এরপর তাদেরকে এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে বন্দিদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। দেখলেন, তাদের মধ্যে একজন মহিলা বন্দিনি কান্না করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

উত্তরে মহিলা বলল, 'আমার সন্তানকে বনু আবসে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উসাইদকে বললেন, 'তুমি এখনই দ্রুত বাহনে উঠে সেখানে যাও এবং তার সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

নির্দেশ মোতাবেক আবু উসাইদ দ্রুত বাহনে উঠে রওয়ানা দিলেন এবং মহিলার সন্তানকে নিয়ে ফিরে এলেন।[৬৯৬]

কী আশ্চর্য! একজন বন্দি মহিলার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর বিগলিত হয়েছে। তিনি তাঁর এক সৈনিককে সেই

---

[৬৯৪]. *সুনানে তিরমিজি* : ১৫৬৬, *মুসতাদরাকে হাকেম* : ২৩৩৪।

[৬৯৫]. আবদুল্লাহ বিন সাবেত আনসারি। উপনাম : আবু উসাইদ। ইনি আবু উসাইদ আস্ সাইদি নন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন। সূত্র : ইবনুল আসির : *উসদুল গাবাহ* : ৫/১৩।

[৬৯৬]. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৬১৯৩, *সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর* : ২৬৫৪।

CS CamScanner

সুদূর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন তার সন্তানকে ফিরিয়ে আনার জন্য। যাতে মহিলার অন্তর প্রশান্ত হয় এবং তার চোখের অশ্রু বন্ধ হয় ।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর সেসব আচার-আচরণ একত্র করা সম্ভব নয়, যেগুলো তাঁর অন্তরের প্রকৃত অবস্থা এবং যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে তাঁর অনন্যসাধারণ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তবে আমরা এখানে অল্প যে কয়েকটি উল্লেখ করেছি, সেগুলোও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে তাঁর সেই চারিত্রিক পূর্ণতা এবং রিসালাতের মহত্ত্ব, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহির মাধ্যমে দান করেছেন।

* * *

12/05 18:44
CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিছু সংশয় ও তার নিরসন

ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতেন। এরপরও কিছু মানুষ, যাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সত্য ও আলো তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। বাস্তব ও সত্য বিষয়কে তারা অবাস্তব ও মিথ্যায় রূপান্তরিত করে এবং প্রশংসনীয় বিষয়কে করে নিন্দনীয়। এর মাধ্যমে তারা চায় ইসলামকে কলুষিত করতে এবং ইসলামের প্রকৃত রূপরেখাকে বিকৃত করতে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান বিনষ্ট করতে। এই উদ্দেশ্যে তারা কখনো রাসুলের জীবনচরিত নিয়ে সমালোচনা ও কুৎসা রটনার কাজে লিপ্ত হয়েছে আর কখনো-বা তার জীবন-ইতিহাসে মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয় ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

আমরা আমাদের এই অধ্যায়ে এসব স্বার্থান্বেষী লোকদের উত্থাপিত সকল অভিযোগ-আপত্তি উল্লেখ করতে পারব এমন নয়, বরং সেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু আপত্তি উল্লেখ করেই সীমাবদ্ধ থাকব। তবে এগুলোর ভ্রান্তি ও অশুদ্ধতা প্রমাণিত হলে, অন্য আপত্তিগুলো এমনিতেই ভেঙে পড়বে।

2024/12/05 18:44
CamScanner

নিচের অনুচ্ছেদসমূহের মধ্যে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে উত্থাপিত প্রধান আপত্তিসমূহ ও তার উত্তর প্রদানের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অনুচ্ছেদ

কামপ্রবণতা ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অভিযোগ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের অভিযোগ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

দাসপ্রথা বহাল রাখার অভিযোগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সূত্রে কুরআন রচনার অভিযোগ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশদের ব্যবসায়ি কাফেলায় আক্রমণের অভিযোগ

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

ইহুদিদের প্রতি জুলুমের অভিযোগ

CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ

কামপ্রবণতা ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অভিযোগ

কিছু মতলববাজ স্বার্থান্বেষী মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে-সকল অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করে, তার মধ্যে একটি হলো, তিনি ছিলেন কামুকপ্রকৃতির, নারীলিপ্সু (নাউজুবিল্লাহ)। তিনি নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং নারী-আসক্তি পূরণের জন্য সর্বদা চেষ্টায় থাকতেন। তারা এর প্রমাণ হিসেবে দুটি বিষয়কে হাতিয়ার বানায়। যথা :

এক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক স্ত্রী থাকা।

দুই. নয় বছরের বালিকা আয়েশা রা.-কে বিবাহ করা।

কিন্তু অকাট্য বাস্তবতা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামুকপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মানুষ, একজন নবী। অন্য মানুষেরা যেমন বিবাহ করে, তিনিও বিবাহ করেছেন। অন্য নবীগণ যেমন একাধিক বিবাহ করেছেন, তিনিও একাধিক বিবাহ করেছেন। তিনি অন্য নবীদের থেকে ভিন্নপ্রকৃতির কেউ ছিলেন না যে, তাদের রীতিনীতির বাইরে কোনো কাজ করবেন অথবা তাদের অনুসৃত পথ পরিহার করে চলবেন। পূর্ববর্তী নবীদের নীতির ব্যাপারে যথাসম্ভব সবচেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য হলো তাওরাতের বর্ণনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম কয়েকশ স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন।

তাদের উত্থাপিত আপত্তির জবাব আমরা কয়েকভাবে দিতে পারি।

এক.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল মানবজাতিকে ইসলাম ও ঈমানের প্রতি আহ্বান করা এবং মৃত্যুর পূর্বেই ইসলামধর্মের ভিত্তিমূলগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া। কিন্তু এই দীর্ঘ ও ব্যাপকতর কাজের জন্য তার সামনে সময় ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই তিনি সকল মানুষকে কল্যাণের দিকে

CamScanner

আহ্বানের সবচেয়ে দ্রুততম পথগুলোই বেছে নিয়েছিলেন। এই পথগুলোর একটি ছিল রাজনৈতিক বিবাহবন্ধন, যা তাঁর ও শত্রুদের মধ্যকার শত্রুতা মিটিয়ে দিত। আরব অঞ্চলে, বরং গোটা বিশ্বেই ব্যাপকহারে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিশ্বের বহু রাজা-বাদশার মাঝে এই বৈবাহিক বন্ধন ও কুটুম্বিতা স্থাপিত হয়েছে, যাতে তাদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধের অবসান হয় কিংবা শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়। সন্ধিগুলো মজবুত ও স্থায়ী থাকার জন্য এই বৈবাহিক সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ ধরনের বিবাহ যে আরবদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার উজ্জ্বল প্রমাণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক শত্রু বা বিরোধীদের মধ্যে কেউই কখনো তাঁর এই বহুবিবাহ নিয়ে আপত্তি তোলেনি এবং এটা নিয়ে কেউ তার মানমর্যাদায় কালিমা লেপনেরও চেষ্টা করেনি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের বিবাহের মধ্যে অন্যতম হলো আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, যিনি নিজের স্বামীর সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে হিজরত করার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাকে দেখেননি। তবে তিনি জানতেন, পিতা মুশরিকদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন। আর এটাও জানতেন, হাবশায় গিয়ে স্বামী ইসলাম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ইসলামের ওপর অটল রয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিবাহের মূল কারণ ছিল, তার পিতা কুরাইশ নেতা ও সর্দার আবু সুফিয়ানকে সান্ত্বনা দান এবং ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়া রা. এবং ‘বনু মুসতালিকের’ নেতা হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়া রা.-কে বিবাহ করেন। জুয়াইরিয়াকে বিবাহের কারণে মুসলমানগণ তার গোত্র বনু মুসতালিকের সকল যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে দেন। তা ছাড়া তার পিতা পুরো গোত্রসহ মুসলমান হয়ে যান।

CamScanner

দুই.

বিবাহের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করা। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রের বড় বড় ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তার মাধ্যমে নিজের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিলকৃত ওহির মাধ্যমে তিনি যাদের ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন যে, তারা পরে মুসলমানদের শাসন করার কাজে তাঁর প্রতিনিধি হবেন। প্রমাণ হলো, তিনি বেশ কিছু হাদিসের মধ্যে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মানুষদেরকে তাদের রীতিনীতি অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين»

তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো আমার রীতিনীতি এবং সঠিক পথের হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের রীতিনীতি অনুসরণ করা।[৬৯৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন, বিবাহবন্ধন এই সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে। আর এই কারণেই দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যাদের সাথে তাঁর বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তা ছিল, তারা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। যেমন তিনি বিবাহ করেছিলেন আবু বকর রা.-এর কন্যা আয়েশা রা.-কে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা.-এর ব্যাপারে বলেছেন, আমাদের প্রতি অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ ছিল, আমরা তার বদলা দিয়ে দিয়েছি, শুধু আবু বকর ব্যতীত। কারণ, আমাদের প্রতি তার এত বেশি অনুগ্রহ রয়েছে যে, তার প্রতিদান কেয়ামত দিবসে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দিতে পারেন।[৬৯৮]

একইভাবে তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কন্যা হাফসাকে বিবাহ করেন। হাফসা ছিলেন উমরের চোখের শীতলতা। আর উমরের

---

[৬৯৭]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৬০৭, *সুনানে তিরমিজি* : ২৬৭৬, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ৪২।
[৬৯৮]. *সুনানে তিরমিজি* : ৩৬৬১।

CamScanner

সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং দ্বীনের পথে তার ত্যাগ ও কুরবানি ছিল প্রবাদতুল্য।

ঠিক একই উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাদের উসমান ও আলি রা.-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। আর এভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈবাহিকসূত্রে সাহাবিদের মধ্যে যারা ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত এবং দাওয়াতের খেদমতে যারা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী, তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ককেও মজবুত করেছিলেন।

তিন.

হাদিস ও সুন্নাতের সংরক্ষণ এবং সেগুলোর প্রচার-প্রসারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের অনেক ভূমিকা রয়েছে। কারণ, তার জীবনাচারের ছোট-বড় সকল সুন্নাত বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্মানিতা স্ত্রীগণের রয়েছে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি ছিলেন সকল মুসলমানের অনুকরণীয় এবং আদর্শ ব্যক্তি। এজন্য সুন্নাতে নববি হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। আর উম্মাহাতুল মুমিনিন (নবীজির স্ত্রীগণ) ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছের এবং ঘনিষ্ঠজন। তারা তাঁকে যে কাজ করতে দেখেছেন বা যে কথা বলতে শুনেছেন, তারা সেসব কাজ ও কথা অন্য মুসলমানদের নিকট বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে বহু সুন্নাত মুসলমানদের নিকট পৌঁছাতে পেরেছে।

বর্ণনাকারীরা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। তাদের মধ্যে হাদিস বর্ণনায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন আয়েশা রা.। তিনি একাই বর্ণনা করেছেন ১২১০টি হাদিস। তার পরেই রয়েছেন উম্মে সালামা রা.। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৩৭৮টি। অন্য স্ত্রীদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১ থেকে ৭৬-এর মধ্যে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পরও তারা দীর্ঘদিন বেঁচে

CS CamScanner

ছিলেন। এ সময় তারা মুসলমানদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদিস শুনিয়েছেন।[৬৯৯]

চার.

বিবাহ বিষয়টা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে দীর্ঘ কোনো সময় কেড়ে নেয়নি এবং এ কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি থেকে উদাসীনও থাকেননি। অথচ আমরা দেখি, বর্তমানেও কত মানুষ একজন স্ত্রী বা প্রেমিকার জন্য দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। কিন্তু একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নামাজে পেছনে পড়েননি, জিহাদ থেকে বিরত থাকেননি, মানুষদের মাঝে সমস্যার সমাধান বা বিচারকার্য ছেড়ে দেননি। ছাড়েননি দাওয়াত, উপদেশ কিংবা কারও জানাজার নামাজ। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মতো বিষয়ও তাঁর থেকে বাদ পড়েনি।

পাঁচ.

প্রথমদিকের স্ত্রীগণের পর আল্লাহ তাআলা রাসুলকে আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾

এরপর অন্য নারী আপনার পক্ষে হালাল নয় এবং এটাও জায়েজ নয় যে, আপনি এদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবেন, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে। অবশ্য আপনার মালিকানায় যে দাসীগণ আছে (তারা আপনার জন্য হালাল)। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। [সুরা আহজাব : ৫২]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রথমদিকের স্ত্রীগণের পর আর

৬৯৯. ইবনে হাজম : *জাওয়ামিউস সিরাহ* : ১/২৭৫।

কারও সঙ্গে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছিল (এরপর তিনি আর বিবাহ করেননি)।[৭০০]

ছয়.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছায় কোনো বিবাহ করেননি বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তাঁকে বিবাহের নির্দেশ প্রদান করতেন। সেই উদ্দেশ্যের হয়তো কোনো একটা দিক আমাদের সামনে প্রকাশ পায়, আর অন্য দিকগুলো আমাদের সামনে অস্পষ্টই থেকে যায়। মুসলমানদের নিকট এ বিষয়টি তাদের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসুল। তিনি কখনোই তাঁর রবের নির্দেশের অন্যথা করতে পারেন না।

সাত.

স্ত্রীগণের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সারল্য ও দারিদ্র্য ছিল সেই জীবনযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

হে নবী, নিজ স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও; তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিই। [সুরা আহজাব : ২৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই আয়াতটি নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো, আয়েশা রা. রাসুলের নিকট দুনিয়াবি কোনো বিষয় চেয়েছিলেন, সেটা হয়তো ভরণপোষণ বৃদ্ধি করা কিংবা অন্যকিছু। বর্ণিত আছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাস পৃথক ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন স্ত্রীদেরকে এ স্বাধীনতা প্রদান

[৭০০]. ইমাম তাবারি : *জামিউল বায়ান* : ২/২৯৭।

CamScanner

করেন, হয় তারা ধৈর্যধারণ করবে এবং তাদেরকে যতটুকু প্রদান করা হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে, নতুবা তিনি তাদেরকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে ছেড়ে দেবেন, যদি তাদেরকে যতটুকু প্রদান করা হয়, তাতেই তারা সন্তুষ্ট না হয়। আর কারও মতে, এই আয়াত নাজিলের কারণ হলো, আয়েশা রা.-এর সেই আত্মমর্যাদাবোধ, যা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রকাশ করেছিলেন।[৭৩১]

আট.

আমরা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি প্রদান করি, বিশেষ করে তাঁর বৈবাহিক পূর্ব-জীবনের প্রতি, তাহলে দেখতে পাব, তিনি ছিলেন যৌবনে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর বৈবাহিক জীবনে একাধিক বিবাহ করেছেন জীবনের ৫০টি বছর অতিক্রম করার পর। তিনি ২৫ বছরের তরুণ বয়সে বিবাহ করে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.-কে। খাদিজা রা. তখন ছিলেন ৪০ বছরের নারী। তার সঙ্গেই প্রায় ২৫ বছর নিরবচ্ছিন্ন সংসার করেন। খাদিজা রা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি।

প্রথম স্ত্রী খাদিজা রা. ইনতেকাল করলে আরেক ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনিও ছিলেন খাদিজা রা.-এর কাছাকাছি বয়সের। তিনি সাওদা বিনতে যামআ রা.। তিনিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিসেবে মদিনা হিজরত করেন।

এটা ঠিক যে, জীবনের শেষ দশ বছরে আরও কয়েকজন স্ত্রী তাঁর বিবাহবন্ধনে আসেন। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, কেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিবাহ করেছিলেন?

---

[৭৩১]. ইমাম তাবারি : *জামিউল বায়ান* : ২০/২৫১।

অন্যদিকে আপত্তির দ্বিতীয় অংশ ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-কে বিবাহ করেছিলেন, যখন তিনি নয় বছরের ছোট বালিকা। এ আপত্তির জবাবও কয়েকভাবে প্রদান করা যায়। যথা :

এক.

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের প্রস্তাব দানকালে তিনিই প্রথম প্রস্তাব দানকারী ছিলেন না। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই জুবায়ের বিন মুতইম বিন আদি রা. তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, আয়েশা রা. তখন বিবাহের বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। বিবাহের জন্য উপযুক্ত ছিলেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহের প্রস্তাবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দুই.

এই বিবাহটা মূলত খাওলা বিনতে হাকিমের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে আরও মজবুত করে দিতে। সেই প্রিয় মানুষটি ছিলেন আয়েশা রা.-এর পিতা আবু বকর সিদ্দিক রা.। এই বিষয়টি প্রমাণ করে, আয়েশা রা. তখন বিবাহের বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

তিন.

কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার সুযোগ সন্ধানে থাকত। অপবাদ দেওয়ার সম্ভাব্য সকল পন্থায় তারা চেষ্টা করত, যদিও এ কারণে তাদেরকে বহু মিথ্যা ও অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হতো। সেই কুরাইশদেরকে যখন জানানো হলো, সবচেয়ে প্রিয় দুই সঙ্গী এবং অতি বিশ্বস্ত দুই বন্ধুর মাঝে জামাই-শ্বশুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে (তখন তারা এতে একটুও আশ্চর্যবোধ করেনি)। বরং জগতের অন্যান্য স্বাভাবিক বিষয়াবলির মতো তারা এটাকেও গ্রহণ করে নিয়েছে।

CamScanner

চার.

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আয়েশা রা. তখন পরিপূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। কারণ তখন থেকেই তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারকে নিজের মেধাবলে পূর্ণ আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেকোনো বিষয় তিনি খুব দ্রুত শিখে নিতে পারতেন। একপর্যায়ে তিনি মুসলিম জ্ঞানী-গুণী নারীদের মধ্যে অনন্যা হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া তার বুদ্ধিমত্তার পূর্ণতা, জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং মেধার তীক্ষ্ণতাকে নির্দেশ করে। বিয়েশাদির বিষয়ে অনুপযুক্ত ছোট বাচ্চার পক্ষে যা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া অবশ্যই স্থান ও কালের ভিন্নতার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। কারণ, শীতপ্রধান অঞ্চলের একজন বালিকার তুলনায় উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের একজন বালিকা অনেক আগেভাগেই উপযুক্ত ও পরিণত হয়ে ওঠে।

2024/12/05 18:46
CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের অভিযোগ

'ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে তলোয়ারের জোরে' এই বলে বেশ জোরালো আপত্তি উত্থাপন করে একদল স্বার্থান্বেষী। তারা দাবি করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কঠিন প্রকৃতির লোক। তিনি রক্তপাত পছন্দ করতেন। ইসলাম তাঁর সেই তরবারির জোরেই বিস্তার লাভ করেছে। যারা ইসলামগ্রহণ করেছে, তারা সাগ্রহে ইসলামধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং জোরপূর্বক, বাধ্য করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে...।

বাস্তবতা হলো, ইসলামের মৌলিকতা এবং ইতিহাসের তাবৎ সংবাদ এই অপবাদকে মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করে এবং এর ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটন করে।

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছেন এবং ২০ বছরাধিক সময় ইসলাম বিমুখ থাকার পর ঈমান এনেছেন, সেই আবু সুফিয়ান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনার সঙ্গে লড়াই করেছিলাম, আপনি কতই-না উত্তম লড়াকু ছিলেন। আপনার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছি, আপনি কতই-না উত্তম সন্ধিকারী ছিলেন!'[৭০২]

অন্যদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট এক মূলনীতি হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

দ্বীনের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। [সুরা বাকারা : ২৫৬]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরবর্তীতে মুসলমানরা কাউকে জোরপূর্বক ইসলামগ্রহণের নির্দেশ দেননি। এমনকি তারা অন্য মানুষদের মৃত্যু থেকে কিংবা শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য শুধু

---

৭০২. সফাদি : *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত* : ১/২২৪০।

CamScanner

মৌখিকভাবে ইসলামের স্বীকারোক্তি দিতেও বাধ্য করেননি। আর মুসলিমজাতির জন্য কীভাবেই-বা এটা করা সম্ভব হতে পারে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে ইসলামগ্রহণ করে, আখিরাতে তার কোনো মূল্য নেই। আর বস্তুত সকল মুসলমান আখিরাত প্রাপ্তিরই চেষ্টা করে।

পূর্বোক্ত আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট হিসেবে বর্ণিত আছে, মদিনায় বনু সালেম ইবনে আউফ গোত্রে এক ব্যক্তির দুটি পুত্রসন্তান ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বেই তারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে মদিনার বাইরে গিয়ে বসবাস করত। একবার কিছু খ্রিষ্টানের সাথে তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনায় তেল নিয়ে এলো। তখন পিতা তাদেরকে আটক করে বললেন, 'ইসলামগ্রহণ করা ব্যতীত তোমাদেরকে ছাড়ব না। তারা ইসলামগ্রহণ করতে অস্বীকার করল।' সকলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এলো। আনসারি সাহাবি বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমার চোখের সামনে আমারই এক অংশ (সন্তান পিতার অংশবিশেষ) জাহান্নামে যাবে, এটা আমি কী করে সহ্য করব!' এই সময় আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন,

﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾

দ্বীনের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। [সুরা বাকারা : ২৫৬]

তাই তিনি পুত্রদ্বয়কে ছেড়ে দিলেন।[৭০৩]

ভালো করে বোঝার কথা হলো, ইসলামধর্ম ঈমান গ্রহণ করা না-করাকে ব্যক্তির আন্তরিক ইচ্ছা এবং অভ্যন্তরীণ আস্থার বিষয় বলে গণ্য করে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক।

[সুরা কাহাফ : ২৯]

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বারবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিকে এই বাস্তবতার দিকে ফিরিয়েছেন এবং তাঁকে

---

৭০৩. ওয়াহেদি : আসবাবু নুজুলিল কুরআন : ৫২-৫৩, সুয়ুতি : লুবাবুন নুজুল : ৩৭।

2024/12/05 18:46
CamScanner

সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর দায়িত্ব শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে জোর করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার কোনো ক্ষমতা বা প্রয়োজন তাঁর নেই। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

তবে কি আপনি মানুষের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়? [সুরা ইউনুস : ৯৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾

আপনাকে তাদের ওপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

[সুরা গাশিয়া : ২২]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

(হে রাসুল!) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি আপনাকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। (বাণী) পৌঁছানো ছাড়া আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। [সুরা শুরা : ৪৮]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, কাউকে জোরপূর্বক ইসলামগ্রহণ করানোকে মুসলমানদের সংবিধান চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করে।[৭০৪]

এর বাস্তব প্রয়োগ হলো :

এক যুদ্ধে মুসলমানগণ বনু হানিফার নেতা ছুমামা বিন উছাল আল হানাফিকে আটক করেন। তারা তাকে চিনতেন না। বন্দি করে আনলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনদিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেন। প্রতিদিন তার সামনে সম্মানের সাথে ইসলামগ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনিও প্রতিদিনই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'যদি আপনি সম্পদ চান, তাহলে আপনাকে তা দেওয়া হবে। যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি একজন খুনিকেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ

৭০৪. মাহমুদ হামদি যাকযুক : *হাকায়িকু ইসলামিয়া ফি মুয়াজাহাতি হামালাতিত-তাশকিক* : ৩৩।

করে ছেড়ে দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই আপনি অনুগ্রহ করবেন।'

একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিলেন। ছাড়া পেয়ে ছুমামা প্রথমে মসজিদের নিকটস্থ একটি খেজুরবাগানে গিয়ে গোসল করলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে নিজের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল।'

এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার নিকট জমিনের ওপর আপনার চেহারা থেকে অধিক অপছন্দনীয় আর কোনো চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার নিকট পৃথিবীর সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আমার কাছে আপনার ধর্ম থেকে অধিক ঘৃণিত আর কোনো ধর্ম ছিল না। কিন্তু এখন আপনার ধর্মই আমার নিকট পৃথিবীর সকল ধর্ম থেকে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আমার নিকট আপনার শহর থেকে অধিক খারাপ শহর আর কোনোটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরই আমার নিকট সকল শহরের থেকে অধিক প্রিয়। আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, সে সময় আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে আটক করেছে! আপনি এখন আমাকে কী নির্দেশ দেন?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে কিছু সুসংবাদ প্রদান করেন এবং ওমরা করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি ওমরা করার জন্য যখন মক্কায় গেলে এক ব্যক্তি তাকে (তাচ্ছিল্যে করে) বলল 'তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?'

ছুমামা রা. বললেন, 'না, আমি বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামগ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেওয়া ব্যতীত ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও তোমাদের কাছে রফতানি হবে না।'(৭০৫)

কোনোপ্রকার জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ছুমামা রা. ইসলামগ্রহণ করেন। বরং তার ইসলামগ্রহণ এতটাই শক্তিমত্তার সাথে হয়েছিল যে,

৭০৫. সহিহ বুখারি : ৪৩৭২।

2024/12/05 18:46
CamScanner

তিনি কুরাইশদের সাথে সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাদের ওপর খাদ্য-অবরোধ আরোপ করেন। কারণ, কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করত, তাঁকে কষ্ট দিত। অবশ্য এজন্য ছুমামাকে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ কুরবানি দিতে হয়, যা আসত কুরাইশদের সাথে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে। অনুরূপ তিনি কুরাইশ নেতাদের সাথে সামাজিক ও কূটনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ত্যাগ স্বীকার করেন।

(ঘটনাটিতে দেখা যায়, ছুমামাকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। তিনি বরং মুক্তি পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করেছেন।) সাধারণ যুক্তির কথা হলো, যাকে জোর করে কিছু করানো হয়, সুযোগ পাওয়ামাত্রই, কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে, বরং যে কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, পরে সে সেই কাজের চরম বিরোধী ও শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত ইতিহাস ইসলামের ক্ষেত্রে এমনটা প্রমাণ করে না, বরং ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, যিনি ইসলামগ্রহণ করতেন, তিনি এই নবদীক্ষিত ধর্মের পক্ষে তার যথাসাধ্য সক্ষমতা দিয়ে কাজ করতে মুহূর্তের জন্যও পিছপা হতেন না। আরও সহজ কথা হলো, আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন জরিপও অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, যদিও ইসলামগ্রহণের কারণে তাদেরকে নানাধরনের জুলুম, নির্যাতন ও প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়।

আমরা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মারা গিয়েছেন, মুসলমান শহিদ হোক অথবা শত্রুপক্ষের নিহত ব্যক্তি, তাদের সম্মিলিত সংখ্যা একত্র করি এবং এরপর সেই সংখ্যাকে যদি বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধ-সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে দেখি, তাহলে আমরা খুব আশ্চর্যজনক একটা পার্থক্য দেখতে পাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় পূর্ণ ১০ বছরে যত যুদ্ধ হয়েছিল, সে সকল যুদ্ধে মুসলমান শহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬২ জন বা এর কাছাকাছি। আর শত্রুপক্ষের নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ১০২২ জনের মতো। অর্থাৎ উভয়পক্ষের নিহতদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৮৪।

CamScanner

অবশ্য, কারও জন্য এই আপত্তি করার সুযোগ নেই যে, সেই সময় যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল কম, এ কারণে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যাও এমন স্বল্প হয়েছে! কারণ, আমি বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সৈন্যসংখ্যা হিসাব করেছি। এরপর সৈন্য সংখ্যার সাথে নিহতদের সংখ্যার তুলনা করে দেখেছি। এর ফলাফল আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। যেমন, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যার তুলনায় তাদের মধ্যে শহিদ হয়েছেন মাত্র ১%। আর শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের তুলনায় তাদের নিহত ব্যক্তির সংখ্যা হলো ২%। অতএব, উভয় পক্ষ মিলে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে মাত্র ১.৫%।

আমরা জানি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ২৫ থেকে ২৭টি গজওয়া (ব্যাপক লড়াই) এবং ৩৮টি ছারিয়া (খণ্ড লড়াই) সংঘটিত হয়েছিল।[৭০৬] অর্থাৎ মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যকার লড়াইয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৬৩টিরও বেশি। এতগুলো লড়াইয়ে নিহতদের সংখ্যার স্বল্পতা অকাট্য প্রমাণ যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের যুদ্ধগুলো নিছক কোনো হিংস্র-রক্তপাতের যুদ্ধ ছিল না।

বিষয়টি আরও ভালোভাবে অনুধাবন ও সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমি আধুনিক সভ্যতার যুদ্ধের নমুনা হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা হিসাব করেছি। আধুনিক সভ্যতার এই যুদ্ধে নিহতের পার্সেন্ট পেয়েছি ৩৫১%। এই সংখ্যাটি অকাট্য এবং অনস্বীকার্য। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ১৫,৬০০,০০০ (এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখ) সৈনিক। এ সত্ত্বেও এই যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৫,৮০০,০০০ (চার কোটি আটান্ন লাখ)। অর্থাৎ নিহতদের সংখ্যা অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি! এত ব্যাপক নিহতের কারণ হলো, উভয় পক্ষের (মিত্রপক্ষ) সৈনিকরাই ব্যাপকহারে সাধারণ নাগরিক হত্যা করেছে। বহু নিরাপদ শহর ও গ্রামের ওপর হাজার হাজার টন বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করেছে। ব্যাপকহারে মানুষ হত্যা করেছে। যেন পুরো মানব সম্প্রদায়কে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছে। আর অসংখ্য ঘরবাড়ি, ভবন, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ধ্বংস করা তো আছেই। সকল দিক দিয়ে এটা ছিল মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভয়াবহ দুর্যোগ।

---

৭০৬. ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৪/৪৩২, ইবনুল কাইয়িম : *জাদুল মাআদ* : ১/১২৫, ইবনে হাজম : *জাওয়ামিউস সিরাহ* : ১/১৬।

2024 12 05 13:46
CamScanner

অবশ্য, বাস্তবতা বোঝার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত যুদ্ধ ও তার কারণসমূহ বিশ্লেষণের চেয়ে আরেকটি সহজ উপায় রয়েছে, সেটা হলো, বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি প্রদান করা। মানচিত্রের দিকে অতি সাধারণভাবে দৃষ্টি দিলেই বুঝে আসে, ইসলামধর্মের প্রচার-প্রসারে প্রধানত তলোয়ারের ভূমিকা নেই। কারণ, যে-সকল দেশে ইসলামের যুদ্ধ-জিহাদ সবচেয়ে কম সংঘটিত হয়েছে, সে সকল দেশেই বর্তমান পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বসবাস। যেমন ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চীন, আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং এর আশপাশের বিশাল বিস্তৃত মরুভূমির এলাকাগুলো। এ সকল দেশে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন, অথচ মুসলমান এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে খুব অল্প কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা কোনোভাবেই লাখো ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে ভিন্ন ধর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে না। এবং আমরা যখন এই দেশগুলোর সাথে ইসলামি জাগরণের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের সাথে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ-জিহাদ সংঘটিত দেশগুলোর তুলনা করি, যেমন ইরাক, সিরিয়া এবং এর আশপাশের অঞ্চল, তখন আমরা দেখতে পাই, বর্তমানে সে সকল অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন থেকে খুব বেশি নয়। এ সকল মুসলমানদের মাঝে নিঃসংকোচে সেইসব অমুসলিম ব্যক্তিরাও বসবাস করছে, যারা নিজেদের পূর্ব-ধর্মের ওপর বিদ্যমান থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন খ্রিষ্টান, ইহুদি, মূর্তিপূজক এবং আরও অনেকেই।[৭০৭]

ফ্রান্সের ইতিহাসবিদ গুস্তাভ লি বোন তার *আরব সভ্যতা* গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরে বিভিন্ন বিজয়-অভিযানকালে ইসলামের বিস্তার লাভের মূল রহস্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ইতিহাস প্রমাণ করে কখনো কোনো ধর্মকে মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অতএব, ইসলামধর্মও কখনো তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি, বরং ইসলাম শুধু তার দাওয়াতের মাধ্যমেই প্রসারতা লাভ করেছে এবং যেসব জাতি একসময় আরবদেরকে পদানত করেছিল, এই দাওয়াতের মাধ্যমেই অবশেষে তারাও ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন তুর্কি ও মঙ্গোলিয়া জাতি। একসময় যে ভারতে আরবগণ শুধু মুসাফির হিসেবে এসেছিলেন, সেই ভারতেও কুরআনের

...ফির খসায়িহি : ১৬৯-১৭০।

প্রসারতা এই পরিমাণ হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ মিলিয়নকেও ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া চীনদেশেও ইসলামের প্রসারতা কম হয়নি। অথচ আরবরা কখনো চীনের কোনো অঞ্চল বিজয় করেনি।[৩৮]

অতএব অবধারিতভাবেই বলা যায়, ইসলাম যুদ্ধ করেছে মানবের অন্তর্জগতে, জয় করে নিয়েছে তার হৃদয়রাজ্য। কারণ, তরবারির জোরে যদিও ভূখণ্ড জয় করা যায়, কিন্তু তাতে কি কখনো মানবের হৃদয়রাজ্য জয় করা সম্ভব!

৩৮. গুস্তাভ লি বোন : *হাজারাতুল আরব* : ১৬৭-১৬৯।

CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

দাসপ্রথা বহাল রাখার অভিযোগ

কেউ কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, তিনি মানুষকে দাস বানানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধবন্দি ব্যক্তিদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অথচ বাস্তবতা ও ইনসাফের কথা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাসপ্রথায় উদ্বুদ্ধকারীর পরিবর্তে দাসমুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা! তবে দাসমুক্তির ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে, তাঁর আগমনের পূর্বে তৎকালীন জাজিরাতুল আরব এবং সমগ্র বিশ্বে এর শিকড় কতটুকু গভীরে প্রোথিত ছিল। তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব, বৈশ্বিকভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এমন ব্যাপক একটি প্রথার বিরুদ্ধে হঠাৎ করেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিষেধবাণী ঘোষণা করা সম্ভব ছিল কি না।[৭০১]

আরব অঞ্চলের অবস্থা ছিল এরকম যে, সময়ে-অসময়ে গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে যুদ্ধের আগুন লেগেই থাকত। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ত পরাজিত পক্ষের ওপর। তাদের মহিলা এবং ছোট বাচ্চাদেরকে বন্দি করা হতো, সম্ভব হলে পুরুষদেরকেও বন্দি বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। এরপর হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হতো অথবা দাস-দাসী বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হতো। বন্দিদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কিংবা বিনিময় ছাড়া মুক্ত করার মতো

---

৭০১. একটি সতর্কতা : এখানে লেখকের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি সত্য বিধান উচ্চারণ করতে গিয়ে সমাজের ভয়ে পিছিয়ে থেকেছেন। বরং মানুষের বদ্ধমূল মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত বিধানের জন্য প্রস্তুত করে তোলার জন্য প্রজ্ঞার সাথে বিধান প্রদান করার যে পন্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা উদ্দেশ্য।
দাসপ্রথা প্রসঙ্গে এই কথাটিও পাঠকের জানা প্রয়োজন, মৌলিকভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা বা তৎকালে দাসপ্রথার সঙ্গে চর্চিত জুলুম, নির্যাতনকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া, কোনোটিই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর ইনতেকালের সময় প্রসঙ্গটি যেভাবে বিধিবদ্ধরূপে ছিল, সেটাই এখন ইসলামি শরিয়তের চিরন্তন বিধান।-সম্পাদক

CamScanner

কোনো সৎকর্ম তাদের স্বভাবে ছিল না। আরবদের নিকট এ সকল যুদ্ধাবন্দি দাসব্যবসার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল। আর এই দাসব্যবসা আরব অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো।

এদিকে রোমান সাম্রাজ্যের দাস-দাসীরাও এর থেকে ভালো অবস্থায় ছিল না। এমনকি উন্নত নগরায়ণের প্রবর্তক গ্রিক দার্শনিক প্লেটো মনে করতেন, দাস-দাসীদের কখনোই নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত নয়।

আর পারস্যসাম্রাজ্যে নাগরিকরা সাতটি স্তরে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিল সাধারণ জনগণ। অথচ তাদের সংখ্যার হার ছিল মোট অধিবাসীদের ৯০% থেকেও বেশি! এই শ্রেণিতে ছিল শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক এবং দাস-দাসী। সমাজে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে শেকলে আবদ্ধ করে হলেও যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হতো। উবুল্লা[৬০] যুদ্ধে যেমনটি দেখা গিয়েছিল। হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর নেতৃত্বে এটাই ছিল পারস্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম লড়াই।

ইসলাম আগমনের পূর্বে এমনই এক জটিল অবস্থায় ছিল দাসপ্রথা। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ রিসালাত নিয়ে আগমন করলেন, তখন তিনি দাসপ্রথাকে অকার্যকর (অর্থাৎ সীমিত) করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা :

এক. দাসত্বের উৎসধারাকে সীমিত করা, যা একে ব্যাপকতা দান করত এবং এর স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতো ।

দুই. দাস-দাসী মুক্তির পথগুলোকে আরও প্রশস্ত করা।

এই দুটি নীতির সর্বোত্তম প্রয়োগ দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারে। সদ্য মুকুল ফোটা মুসলিম সমাজকে তিনি দাসমুক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এর বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে বড় ধরনের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৬০]. বসরার দজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এখানে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর নেতৃত্বে লড়াই হয়। এই যুদ্ধকে 'জাতুস সালাসিল' (শেকলের যুদ্ধ) বলা হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার আর পারস্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়লাভ করে। সূত্র : ইয়াকুত হামাবি : *মুজামুল বুলদান* : ১/৪৩।

2024/12/05 18:45
CamScanner

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»

যে ব্যক্তি কোনো দাস আজাদ করবে, আল্লাহ তাআলা সেই দাসের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে আজাদকারীর একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকেও।(৭১১)

তদ্রূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তার পাপের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাসমুক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যক দাসমুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, পাপ ও গুনাহ এমন একটি বিষয়, যা কখনো বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রতিটি আদম সন্তানই তো গুনাহগার। দাসমুক্তির এ পদ্ধতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো মুসলমান পুরুষ অপর কোনো মুসলমান দাসকে আজাদ করলে আজাদকৃত দাস তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। আজাদকৃত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজাদকারীর একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। তদ্রূপ কোনো মুসলমান পুরুষ দুজন মুসলিম দাসীকে আজাদ করলে তারা তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। তাদের প্রতিটি অঙ্গ আজাদকারীর একেকটি অঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে কোনো মুসলিম নারী অপর কোনো মুসলিম দাসীকে আজাদ করলে সেই আজাদকৃত দাসী তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। আজাদকৃত দাসীর প্রতিটি অঙ্গ তার প্রতিটি অঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।'(৭১২)

আর এ বাণীর বাস্তবায়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছিলেন অন্য সকলের জন্য আদর্শ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত। কারণ, তিনি নিজেও তাঁর দাস-দাসীদের আজাদ করেছিলেন।

তাঁর নির্দেশনাগুলো শুধু দাসমুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মানুষকে তিনি দাস-দাসীদের প্রতি এমন সব মানবিক আচরণ প্রদর্শনের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের মানুষ দাসমুক্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে। যেমন, প্রথমে তিনি মানুষকে তাদের দাস-

---

৭১১. *সহিহ বুখারি* : ২৫১৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৫০৯।
৭১২. *সহিহ মুসলিম* : ১৫০৯, *সুনানে তিরমিজি* : ১৫৪৭, *সুনানে ইবনে মাজাহ* : ২৫২২।

2024.12.05 18:47
CamScanner

দাসীদের সাথে সদাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি তাদের সাথে শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন (তার দাস-দাসীকে) 'হে আমার বান্দা/বান্দি' বলে না ডাকে। কারণ, তোমরা সকল নারী-পুরুষই আল্লাহর বান্দা ও বান্দি। সুতরাং বলবে, 'হে আমার সেবক/সেবিকা'।[৭১৩]

শুধু এতটুকুই নয়, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও নির্দেশ হলো, পরিবারের লোকেরা যে খাবার ও পোশাক ব্যবহার করে, তাদের দাস-দাসীকেও সে ধরনের খাবার ও পোশাক প্রদান করা এবং তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজে তাদের বাধ্য না করা। এ সম্পর্কে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসীদের ব্যাপারে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, ...তোমরা যা খাও, তাদেরকেও সেই খাবার খাওয়াও। তোমরা যে পোশাক পরিধান করো, তাদেরকেও সেই পোশাক পরিধান করাও। আর তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে শাস্তি দিয়ো না...।[৭১৪]

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আরও অনেক অধিকার নিশ্চিত করেছেন, যা একজন দাসকে মানবমর্যাদা প্রদান করে, তার যে সম্মান ও মর্যাদা তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এরকম নীতিগত শিক্ষার পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজকে প্রয়োগিক অর্থেই দাসমুক্তির স্তরে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা বলবৎ রেখেছেন। যেমন, তিনি দাস-দাসীকে শাস্তি দেওয়া কিংবা প্রহার করার ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করেছেন তাদের মুক্তি প্রদানের মধ্যে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একবার তার এক গোলামকে প্রহার করেছিলেন। এরপর তিনি তাকে কাছে ডেকে দেখলেন তার পিঠে দাগ বসে গেছে। তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাকে ব্যথা দিয়েছি?'

সে বলল, 'না।' তবুও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাকে বললেন, 'আজ থেকে তুমি স্বাধীন।'

---

৭১৩. *সহিহ বুখারি* : ২৫৫২, *সহিহ মুসলিম* : ২২৪৯।

৭১৪. *সহিহ মুসলিম* : ১৬৬১, *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৫২১, *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ১/৭৬।

2024.12.05 18:47
CamScanner

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. জমিন থেকে কিছু একটা তুলে নিয়ে বললেন, তাকে স্বাধীন করার কারণে আমি এই বস্তু সমপরিমাণ প্রতিদানও পাব না। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

> যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে তার গোলামকে প্রহার করল অথবা তাকে চড়-থাপ্পড় দিলো, তাহলে তার সেই গুনাহ মোচনের পন্থা হলো, সেই গোলামকে আজাদ করে দেওয়া।(৭১৫)

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসী আজাদসংক্রান্ত বাক্যকে এমন এক বাক্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, বলার সাথে সাথে যা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয়ে রসিকতা প্রযোজ্য নয়—তালাক, বিয়ে ও দাসমুক্তি। এগুলো বলামাত্রই কার্যকর হয়ে যায়।(৭১৬)

এমনইভাবে ইসলামি শরিয়ত বিভিন্ন গুনাহ ও অপরাধের একপ্রকার কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) নির্ধারণ করেছে দাস মুক্ত করাকে। যেমন, কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করা, কসম ভঙ্গ করা, জিহার করা (অর্থাৎ, স্ত্রীকে চিরস্থায়ী মাহরাম কোনো মহিলার সাথে তুলনা করা), রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গ করা ইত্যাদি। আর নবীজীবনে আমরা এই বিধি প্রয়োগের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে তুমি ধ্বংস হলে?!'

সে বলল, 'রমজানের দিন আমি স্ত্রীসহবাস করে ফেলেছি!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি কি একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে?'

সে বলল, 'জি না।'

...৬১। ...-সম্পাদক)।

CS CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে কি একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?'

সে বলল, 'তাতে আমি সক্ষম নই।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি ষাটজন মিসকিনকে আহার করাতে পারবে?'

সে বলল, 'এই সামর্থ্যও আমার নেই।'

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন বসে রইল। এর কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেজুরভরতি একটি ঝুড়ি এলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকটিকে ডেকে বললেন, 'নাও, তোমার পক্ষ থেকে এই খেজুরগুলো সদকা করে দাও।'

সে বলল, 'আমার চেয়েও অভাবগ্রস্ত কাউকে?! কিন্তু মদিনার দুই প্রান্তের মাঝে আমার পরিবার থেকে তো অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই!'

লোকটির কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি হাসিতে তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি লোকটিকে বললেন, 'যাও, এগুলো তোমার পরিবারকেই আহার করাও।'[৭১৭]

এরচেয়েও বড় ব্যাপার হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী জাকাত প্রদানের একটি খাত নির্ধারণ করেছেন দাসমুক্তির জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত উসুলকারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। (ইত্যাদি খাতে ব্যবহারযোগ্য)। [সুরা তাওবা : ৬০]

---

[৭১৭] *সহিহ বুখারি* : ১৯৩৬, ২৬০০; *সহিহ মুসলিম* : ১১১১।

2024/12/05 18:47
CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারসি রা.-এর সাথে যে আচরণ করেছেন, তার দিকে লক্ষ করলে আমরা ইসলামের এই নীতি বাস্তবায়নে তাঁর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

সালমান ফারসি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'যাও, তোমার মনিবের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নাও!'

সালমান ফারসি রা. বলেন, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার মনিবের নিকট গিয়ে বললাম, 'আপনি আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন।'

মনিব বলল, 'ঠিক আছে, মুক্ত করে দেবো। তবে বিনিময়ে তুমি আমার জন্য একশ খেজুর গাছ রোপণ করবে। এরপর সেই গাছগুলো যখন (শক্তপোক্তভাবে ভালো করে) গজিয়ে উঠবে, তখন তুমি আমার নিকট একটি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে আসবে (তখন আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো)।'

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তার দাবি অনুযায়ী তুমি রাজি হয়ে যাও। আর যে কুয়া থেকে তুমি সেই খেজুর গাছগুলোতে পানি সিঞ্চন করবে, সেখান থেকে এক বালতি পানি আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সালমান ফারসি রা. বলেন, আমি পানি নিয়ে এলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বরকতের দোয়া করে দিলেন। এরপর আমি সেই পানি দিয়ে খেজুরগাছে পানি সিঞ্চন করলাম। আল্লাহর কসম! আমি ঠিক একশ খেজুরগাছই রোপণ করলাম আর প্রতিটি গাছই গজিয়ে উঠল!

তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সংবাদ জানালাম। এবার তিনি আমাকে এক টুকরো স্বর্ণ দিলেন। আমি স্বর্ণের টুকরা নিয়ে মনিবের কাছে চলে গেলাম। এক পাল্লায় রাখলাম স্বর্ণের টুকরা আর অন্য পাল্লায় রাখা হলো খেজুরের বিচি। আল্লাহর কসম! স্বর্ণের টুকরার পাল্লাটিই ভারী হয়ে রইল। (এভাবে মনিবের পাওনা পরিশোধ

হয়ে গেলে) আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে এলাম। তখন তিনি আমাকে আজাদ বলে ঘোষণা দিলেন।[৭১৮]

এ ছাড়াও ইসলাম গোলামকে মুকাতাবা চুক্তির মাধ্যমে নিজের স্বাধীনতা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। মুকাতাবা চুক্তি হলো, মালিক ও গোলামের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে গোলামকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া।

অন্যদিকে ইসলাম মুসলমানদেরকে চুক্তিবদ্ধ গোলামদের অর্থ জোগানোর জন্য সহযোগিতার নির্দেশ দেয়। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের প্রকৃত অবস্থা হলো স্বাধীনতা, দাসত্ব আসে অবস্থার প্রেক্ষিতে। (সুতরাং যথাসম্ভব মানুষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো উচিত।)

মুকাতাবা চুক্তির অর্থ সহযোগিতার ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উত্তম আদর্শ। তিনি জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস রা.-এর পক্ষ থেকে তার মুকাতাবা চুক্তির অর্থ পরিশোধ করে দেন এবং তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে নেন। মুসলমানরা যখন জুওয়াইরিয়া রা.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের কথা শুনলেন, তখন তারা এই বলে তাদের হাতে থাকা বনু মুস্তালিক গোত্রের সকল গোলামকে আজাদ করে দিলেন যে, তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়! এভাবে এই বিবাহের মাধ্যমে বনু মুস্তালিকের একশ পরিবারের লোক আজাদ হয়ে যায়।[৭১৯]

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে স্বাধীন করে বিবাহের মাধ্যমে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ...»

---

৭১৮. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৬৫৪৪, *মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি* : ৬০৭৩।

৭১৯. সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ১১/২১০, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৪/১৮, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৩০৩।

CamScanner

> যে আপন ক্রীতদাসীকে উত্তমরূপে ইলম শিক্ষা দেয় এবং উত্তমভাবে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।[৭২০]

এ কারণে আমরা দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা.-কে স্বাধীন করে বিবাহ করে নেন। আর এই বিয়েতে সফিয়্যা রা.-এর স্বাধীনতাকেই তার মহর ধার্য করা হয়েছিল।[৭২১]

যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানোর যে নীতিটি নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে, সেই পথটিকেও মূলত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সংকোচন করে দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধবন্দিদের জন্য এমন কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতাদর্শে ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত করেছেন, যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেবে কেবল রাষ্ট্রপ্রধান। আর রাষ্ট্রপ্রধান তাদের ব্যাপারে দাসত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলোও গ্রহণ করতে পারবে। যথা :

এক. বন্দিবিনিময়। অর্থাৎ মুসলমান যুদ্ধবন্দিদের বিনিময়ে শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দেওয়া।

দুই. মুক্তিপণ গ্রহণ করা। তা হতে পারে অর্থের বিনিময়ে কিংবা শিক্ষা-প্রশিক্ষণসংক্রান্ত কোনো বিষয়ের বিনিময়ে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাউকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করেন আর কারও ক্ষেত্রে মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন কতক মুসলমানকে লেখাপড়া শেখানো।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানো তৎকালে যুদ্ধের সাধারণ রীতি ছিল এবং শত্রুরাও মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের সাথে এ আচরণ করত। যেমন যায়েদ বিন দাছিন্না রা. ও খুবাইব বিন আদি রা.-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।[৭২২] সুতরাং প্রতিব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানরাও যদি শত্রুদের সাথে তেমন আচরণ না করত, তাহলে তারা আরও বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠত। এরপরও ইসলামে শত্রুদলের সাথে এই সন্ধিচুক্তির

---

[৭২০]. *সহিহ বুখারি* : ৫০৮৩।
[৭২১]. *সহিহ বুখারি* : ২৮৮৯, *সহিহ মুসলিম* : ১৩৬৫।
[৭২২]. ইবনে হাজার আসকালানি : *আল-ইসাবা* : ২/২৬৩।

সুযোগ রয়েছে যে, তারা কেউ কাউকে দাস বানাবে না। তারা যদি প্রতিজ্ঞা করে তবে আপনিও তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।

দাস-দাসীদের স্বাধীন করার বিষয়ে ইসলাম এমনই বিজ্ঞ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে। যেভাবে দাসত্বের পথকে যেভাবে সংকোচন করে এনেছে, ঠিক সেভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথকে করেছে সম্প্রসারিত, যা ছিল পর্যায়ক্রমিক উন্নতির পন্থায় এবং তৎকালীন পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ।[৭২৩]

---

৭২৩. প্রিয় পাঠক, আমরা আল্লাহর সৃষ্ট অতি দুর্বল বান্দা মাত্র। বাহ্যিক থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক, সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সীমাবদ্ধতার পরিমাণ বেশি। আর প্রভু হিসেবে এই জগৎসংসারের জন্য প্রযোজ্য অনিবার্য নিয়মনীতি ও বিধিবিধানের ব্যাপারে তিনিই সর্বজ্ঞাত। এটি একজন মুসলিমের অন্যতম প্রধান বিশ্বাস। সুতরাং দাসপ্রথা হোক বা অন্যকিছু, আল্লাহ তাআলা যে-সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে আমাদের 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'-এর পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। বিশেষত বুদ্ধিবৃত্তিক পাশ্চাত্য আগ্রাসনের এ যুগে 'আনুগত্য করলাম'-এর নীতি পালন আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমাদের মনে গেঁথে নিতে হবে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতি মুহূর্তের রিজিকদাতা। আমাদের প্রত্যাবর্তনও তাঁর দিকে। সর্বদিক দিয়ে আমরা তাঁর বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্বের পুরোটুকুতেই তাঁর একচ্ছত্র অধিকার এবং তাঁর বিজ্ঞতাও অপরিসীম। সুতরাং তিনি আমাদেরকে যেসব নীতি ও বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, সেসবের সুষ্ঠুতা ও নৈতিকতার বিশ্বাস এবং তা পালনের ক্ষেত্রে মনোবল ও সাহসিকতা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর রিজিক ও অবদান অস্বীকারকারী অকৃতজ্ঞ কতক দুর্বল সৃষ্টি ও ইসলামবিদ্বেষীর আপত্তির মুখে আল্লাহর মতো মহান সত্তার বিধানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ কোণঠাসা মনোভাব পোষণ করা শক্তিশালী ঈমানের পরিচয় নয়। বরং আমরা তাদের সৃষ্ট নৈতিকতার মানদণ্ড ছুড়ে ফেলে উচ্চৈঃস্বরে বলে যাব, 'আমাদের আল্লাহর বাণীই চিরসত্য, তার মানদণ্ডই সর্বোপযোগী।'-সম্পাদক

CamScanner

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সূত্রে কুরআন রচনার অভিযোগ

কেউ কেউ অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসমান থেকে মূলত কোনো ওহি আসেনি, বরং তিনি এই কুরআন সৃষ্টি করেছেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থাবলি (তাওরাত-ইনজিল) থেকে। তারা তাদের এই দাবির পক্ষে যেগুলো দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে, সেগুলো নিছক তাদের অনুমান ও ধারণা, যা প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার মতো নয়।

তাদের এসব অমূলক ধারণার মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক অবস্থায় সারজিয়াস, গারজিস অথবা বাহিরা (বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়) নামক পাদরির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

দ্বিতীয় একটি ধারণা হলো, সম্ভাবনা আছে যে তিনি এই কুরআনের ধারণা লাভ করেছেন (খ্রিষ্টান পাদরি) ওরাকা বিন নাওফলের কাছ থেকে।

এর পাশাপাশি আরও নানা ধরনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়, যেগুলো এর থেকে আরও দুর্বল। যেমন, আরব অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় ইহুদিরা বসবাস করত এবং পুরো আরবজুড়ে ছিল অনেক হাবশি গোলামের বসবাস, যাদের শেকড় ছিল খ্রিষ্টান অঞ্চল হাবশা। তা ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক বয়সে খাদিজার ব্যবসার মালামাল নিয়ে খ্রিষ্টান অঞ্চল শাম[৭২৪] সফর করেছিলেন।

---

৭২৪. শাম : বর্তমানে যদিও আধুনিক সিরিয়াও শাম নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন শাম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ১৯২১ সালে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলোও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সানজাকে ইসকানদার (The Sanjak of Alexandretta) অঞ্চলও শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও বর্তমান মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও

2024/12/05 13:48
CamScanner

প্রাচ্যবিদ এমিল ডারমেনহেম (Emile Dermenghem) তার লেখা *হায়াতু মুহাম্মাদ* (মুহাম্মাদের জীবন) নামক গ্রন্থে এ ধরনের সকল সম্ভাবনা এবং মক্কাতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানের প্রতি নির্দেশ করে, এমন সকল বিবরণ একত্র করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি কুরআন তৈরির জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশ্যই তাদের নিকট গমনাগমন ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে বলে চেঁচামেচি করেছে। এমিল ডারমেনহেমের মতো উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াটও একই কাণ্ড করেছে তার *মুহাম্মাদ ফি মাক্কা* (মক্কায় মুহাম্মাদ) নামক গ্রন্থে।

তবে বাস্তব কথা হলো, তাদের এসব অভিযোগ নানা ধরনের ফাঁকফোকরে ভরপুর। আমার মনে হয়, কোনো বুদ্ধিমান মানুষ এ ধরনের কথাবার্তার ওপর ভিত্তি করে কখনোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। নিম্নে এ সকল কথাবার্তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কিছু কারণ তুলে ধরছি। যথা :

এক.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-ইতিহাস অতীতের যেকোনো ব্যক্তির তুলনায় অধিক জ্ঞাত ও পরিচিত। তাঁর জীবনের সকল তথ্য ও ঘটনা বহু বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। ফলে (তালাশে আগ্রহী) যেকোনো মানুষের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে উত্থাপিত কোনো কথা ও বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই সহজ। সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা, এমনকি দুর্বল বর্ণনাও ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুমান ও কল্পনার পেছনে দৌড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। এসব অনুমাননির্ভর কথার কী মানে যে, আরব অঞ্চলে বেশ কিছু ইহুদি-খ্রিষ্টানের বসবাস অথবা শাম দেশে ব্যবসার জন্য যাতায়াতের সময় আহলে কিতাবদের সাথে তাঁর দেখা হওয়ার মধ্য দিয়েই তিনি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের শিক্ষা থেকে কুরআন তৈরিতে মূল শক্তি পান?!

দুই.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, জন্ম থেকে আমরণ তিনি কিছু লিখতে-পড়তে জানতেন

বর্তমান ইরাকের মসুল অঞ্চলের কিছু অংশ শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে পুরো সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাসও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।-সম্পাদক

2024/12/05 18:48
CamScanner

না। অথচ কারও থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য লেখাপড়া জানা এক অপরিহার্য বিষয়, বিশেষ করে সেটা যদি হয় ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য হলো শিক্ষকের নিকট ছাত্রের অব্যাহত যাতায়াত এবং তার নিকট অবস্থান। অথচ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিহাসে এমন কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা, এমনকি দুর্বল বর্ণনাও পাই না, যেখানে তাঁর কোনো স্থানে কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তির নিকট নিয়মতান্ত্রিক যাতায়াতের সংবাদ রয়েছে। বিশেষত তাঁর প্রথম ব্যবসায়িক ভ্রমণে তিনি কখনো তাঁর চাচার থেকে আলাদা হননি। তদ্রূপ বুসরা গমনকালে হজরত খাদিজা রা.-এর গোলাম মায়সারা থেকেও তিনি কখনো পৃথক হননি। কারণ, উক্ত সফরে মায়সারা স্বীয় মালিক খাদিজা রা.-এর মালামাল হেফাজতের জন্য তাঁকে গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছিল। তা ছাড়া এই ধরনের ভ্রমণগুলোতে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ততটুকুই জ্ঞানার্জন করতে পারে, যেমনটি বলেছে কারেন আর্মস্ট্রং[৭২৫], 'খুবই সামান্য কিছু জ্ঞান।'[৭২৬]

তিন.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতান্ত বালক বয়সে তাঁর চাচার সাথে বৈদেশিক ভ্রমণ করেছিলেন। সেই ভ্রমণে এক নাসতুরি[৭২৭] পাদরির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখনও ১২ পেরোয়নি। তাহলে বলুন, কীভাবে এত অল্প বয়সের এক বালকের পক্ষে মাত্র একবারের সাক্ষাতে সেই পাদরির কাছ থেকে কিছু আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব?! এ ছাড়া তাদের উভয়ের ভাষাও ছিল ভিন্ন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না, আবার পাদরি ছিল সুরয়ানি ভাষার লোক। উপরন্তু এর কি কোনো সদুত্তর আছে যে, তিনি এই ঘটনার পর মক্কায় ফিরে এতগুলো বছর অবস্থান করলেন, এ সময়ে তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখা

---

৭২৫. একজন ব্রিটিশ নাগরিক। প্রসিদ্ধ একজন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব গবেষক। (১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর মারা যান।)

৭২৬. কারেন আর্মস্ট্রং : *সিরাতুন নাবি মুহাম্মাদ* : ১৫১।

৭২৭. একটি খ্রিষ্টান উপদল।-সম্পাদক

CamScanner

গেল না, বরং সুদীর্ঘ আটাশ বছর পর তিনি সেটা প্রকাশ করলেন আর তার প্রচার-প্রসারে অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন ভোগ করে গেলেন?!

প্রখ্যাত ইংরেজ চিন্তাবিদ থমাস কার্লাইল বলেন, আমি বুঝি না, যে সারজিয়াস (বাহিরা) পাদরি আবু তালিব ও মুহাম্মাদ তার ঘরে মেহমান হওয়ার কথা জানিয়েছে তার ব্যাপারেই কী বলব, আবার এত অল্প বয়সের একজন বালক কোনো ধর্মপণ্ডিতের কাছে কী শিখবে বলে বাহিরা আশা করেছিলেন সে ব্যাপারেই কী বলব! কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখনও ১৪ পেরোয়নি, আবার তিনি তাঁর ভাষা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষাও জানতেন না। এ ছাড়াও নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৎকালীন শামদেশের পরিবেশ ও বহু পরিস্থিতি তাঁর দৃষ্টিতে ছিল গোলমেলে, না সেগুলো তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল আর না সেগুলো বোধগম্য করা।[৭২৮]

চার.

এর কি সদুত্তর হবে যে, আল-কুরআনের বাণীগুলো এত বেশি ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্যসংবলিত যে, তার মাধ্যমে পুরো আরবজাতির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ আরবরা হলো আরবি ভাষা-সাহিত্যের সর্বোচ্চ পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অন্যদিকে আরবি ভাষা সম্পর্কে সেই পাদরির কোনো জ্ঞানই ছিল না।

তা ছাড়া কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কথা তো এমন ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছে, যারা আরবি ভাষাও ভালো করে জানে না আবার ইসলাম ও মুসলমানদেরকেও পছন্দ করে না। যেমন থমাস আর্নল্ড লিখেছেন, খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেককেই আমরা দেখি, যেমন আলভার (যার ইসলামবিদ্বেষ সর্বজন-পরিচিত) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, অতি চমৎকার ও আলংকারিক বাক্যরীতিতে কুরআনের রচনা সম্পন্ন হয়েছে। তার আকর্ষণ এতটাই তীব্র যে, খ্রিষ্টানরা পর্যন্ত বাধ্য হয় তা পাঠ করতে এবং মুগ্ধ হতে![৭২৯]

---

৭২৮. থমাস কার্লাইল : *আবতাল* : ৬১, ৬২।

৭২৯. থমাস আর্নল্ড : *আদ-দাওয়াতু ইলাল-ইসলাম* : ১৬২।

CamScanner

আলোচিত বিষয়টির খণ্ডনেই কুরআনুল কারিমের এই আয়াতটি নাজিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾

(হে নবী,) আমার জানা আছে যে, তারা আপনার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। (অথচ) তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে, তার ভাষা আরবি নয়[৭৩০] আর এটা (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবি ভাষা! [সুরা নাহল : ১০৩]

পাঁচ.

মক্কার মুশরিকদের কেউ কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবিলায় এ ধরনের কথা বলেনি। বস্তুত তাদের নিকট এই অপবাদের যদি কোনো মূল্য থাকত কিংবা আহলে কিতাব কোনো আলেমের সাথে তাঁর দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে সম্ভাবনা থাকত বা এ ধরনের কোনো ব্যাপারের ক্ষীণতর চিহ্নও দেখা দিত, তাহলে অবশ্যই তারা তা নিয়ে হইচই করত এবং তাঁর ওপর অপবাদের বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত! কিন্তু না, তারা এমন কিছুই করেনি। তবে হ্যাঁ, মাত্র একবার তারা এ চেষ্টা করেছিল। তারা তখন সম্ভব-অসম্ভব যেকোনো উপায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আঘাত ও অপবাদ আরোপের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাদের সেই অপলাপটিও সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। তখনও তারা তাঁর শিক্ষকের ভূমিকায় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম বলতে ব্যর্থ হয়।

এ ছাড়া তাদের মূল অপবাদটি ছিল এই যে, এগুলো (কুরআনুল কারিমের বাণী) ছিল বানোয়াট কথাবার্তা এবং প্রাচীন কালের অলিক কল্পকাহিনি। সুতরাং তাদের নিকট সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল না যে,

---

৭৩০. মক্কায় একজন কামার ছিল, যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাঝে মাঝে তার কাছে যেতেন এবং তাকে দ্বীন ও ঈমানের কথাবার্তা শোনাতেন। এ সময় সেই কামারও তাঁকে ইনজিলের দু-একটি কথা শোনাতো। আর এরই ভিত্তিতে মক্কার কোনো কোনো কাফের বলতে শুরু করল যে, তাঁকে সেই কামারই কুরআন শেখাচ্ছে। সেই কথার খণ্ডনেই এই আয়াত নাজিল হয়। (*তাওযীহুল কুরআন*, আয়াতসংশ্লিষ্ট টীকা)-সম্পাদক

2024.12.05 18:49
CamScanner

কুরআন আহলে কিতাব কোনো শিক্ষক থেকে গৃহীত কিংবা তা মূলত আহলে কিতাবদের নিকট সংরক্ষিত জ্ঞানের উচ্চারণ। কাফেরদের বিবরণ উপস্থাপন করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

যারা কুফরি করেছে তারা বলে, এটি (অর্থাৎ কুরআন) এক মনগড়া জিনিস ছাড়া কিছুই নয়, যা সে নিজে রচনা করেছে এবং অপর এক গোষ্ঠী তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছে। এভাবে (এ মন্তব্য করে) তারা ঘোর জুলুম ও প্রকাশ্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তারা (আরও) বলে, এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের লেখা আখ্যান, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেটাই তাঁর সামনে পড়ে শোনানো হয়।' [সুরা ফুরকান : ৪-৫]

বরং মক্কার মূর্খ কাফেররাই বারবার আহলে কিতাবদের নিকট ছুটে গিয়েছে, যেন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বক্তব্য সম্পর্কে মূল্যায়ন ব্যক্ত করে, তাঁর সত্য-মিথ্যা নিয়ে কোনো মন্তব্য প্রদান করে।

ছয়.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামসময়িক কেউ কখনো এমন দাবি করেনি যে, তার থেকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু শিখেছে। বাহিরা পাদরিও না, আবার আরব অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কোনো আহলে কিতাবও না। বরং আহলে কিতাবরা সর্বদা তাঁর সামনে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর মুশরিক সম্প্রদায়কে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এমনকি তাদের কাছে আসমানি গ্রন্থের জ্ঞান থাকার যে কথা প্রসিদ্ধ ছিল, সেটাকে পুঁজি করে তারা বলে বেড়াত,

﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾

CamScanner

তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, মুমিনদের চেয়ে তারাই বেশি সরল পথে আছে। [সুরা নিসা : ৫১]

কখনো কখনো মুশরিকরা আহলে কিতাবদের শরণাপন্ন হতো, তখন তারা মুশরিকদের এমন কিছু প্রশ্ন শিখিয়ে দিত, যেগুলোর উত্তর কেবল একজন নবীই বলতে পারেন। যেমন, একবার নজর ইবনে হারেস এবং উকবা বিন আবি মুয়িত মদিনার ইহুদিদের কাছে গেল এবং তাদেরকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর শোনালো। ইহুদি পণ্ডিতরা তাদেরকে বলল, তোমরা গিয়ে তাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবে, যদি সে প্রশ্ন তিনটির যথাযথ উত্তর দিতে পারে তাহলে বুঝবে, সে আসলেই একজন নবী, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসুল। আর যদি উত্তর দিতে না পারে, তাহলে বুঝবে সে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার। প্রশ্ন তিনটি হলো :

১. তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, পূর্বযুগের সেই যুবকদের (অর্থাৎ আসহাবে কাহফ) ঘটনা কী ছিল? তাদের সাথে বেশ আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল।

২. এরপর জিজ্ঞেস করবে, সেই পরিভ্রমণকারী ব্যক্তির (অর্থাৎ বাদশাহ জুলকারনাইন) ঘটনা কী, যিনি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ভ্রমণ করেছিলেন?

৩. এরপর জিজ্ঞেস করবে রুহ সম্পর্কে, রুহ কী?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, অর্থাৎ প্রথম দুই প্রশ্নের প্রকৃত ঘটনা আর তৃতীয়টির বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ, রুহ আল্লাহ তাআলার বিশেষ আদেশ হওয়ার কথা), তাহলে বুঝবে তিনি আল্লাহর নবী, তার আনুগত্য মেনে নিয়ো।[৭৩১]

আহলে কিতাবদের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক না থাকার আরও বড় প্রমাণ হচ্ছে, স্বয়ং মদিনার ইহুদিরাই এই প্রত্যয়ে ছিল যে, তিনি তাদের কিতাবের ইলম রাখেন না। এ কারণে তিনি মদিনাতে থাকাকালীন একবার তারা তাঁর ব্যাপারে এই

[৭৩১]. *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা* : ১/৪৯৯, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/১৩৯, ইবনে কাছির : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ১/৪৮৩, ৪৮৪।

আপত্তি উত্থাপন করল যে, মুহাম্মাদ কীভাবে ইবরাহিমের ধর্ম অনুসরণের দাবি করে, আবার সে উটের গোশত ও দুধও খায়, অথচ তা ইবরাহিমের ধর্মে নিষিদ্ধ?! তখন তাদের কথার খণ্ডনে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাজিল করেন,

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِالتَّوۡرَىٰةِ فَاتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾

তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে বনি ইসরাইলের জন্য সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই হালাল ছিল (যা বর্তমান মুসলিমদের জন্য হালাল), কেবল সেই বস্তু ছাড়া যা ইসরাইল (অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য হারাম করেছিল। (হে নবী, ইহুদিদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসে তা পাঠ করো। [সুরা আলে ইমরান : ৯৩]

আরেকবার ইহুদিরা তাদের দুই ব্যভিচারীকে রজমের শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। তারা ব্যভিচারীদের বিচার নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাওরাতে (ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে) রজমের[৭৩২] ব্যাপারে কী বলা আছে?'[৭৩৩]

তারা বলল, 'ব্যভিচারীদেরকে অপদস্থ করা হবে এবং বেত্রাঘাতের সম্মুখীন করা হবে।'

মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলছ, তাওরাতে রজমের বিধান রয়েছে!' তখন তারা তাওরাত নিয়ে এসে খুলে বসল এবং তাদেরই একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে আগে-পরের আয়াতগুলো পড়ে শোনালো।

---

৭৩২. রজম : বিবাহিত ব্যভিচারীদের পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা।-সম্পাদক

৭৩৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত এই প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে তাদেরই কিতাবের বিধান দেখিয়ে লা জবাব করার জন্য, তবে ইহুদিরা তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে অবগত ছিল না। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিই আমাদের আলোচনার প্রামাণ্য বিষয়।-সম্পাদক

CS CamScanner

তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. তাকে বললেন, 'হাত ওঠাও!' বাধ্য হয়ে সে হাত ওঠালো। হাত ওঠালে দেখা গেল সেই স্থানেই রজমের আয়াতটি রয়েছে। তখন ইহুদিরা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সত্য বলেছে। এখানে রজমের আয়াত রয়েছে।'[৭৩৪]

মূলকথা, স্বয়ং আহলে কিতাবরাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এই ধরনের আজগুবি সম্ভাবনার কথা বলেনি। তারা এই অনুমানও করেনি যে, তিনি তাদের গ্রন্থের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত আছেন।

সাত.

এমন একটা দাবি কি পুরোপুরি হাস্যকর ও বোকামি নয় যে, তখন এমন একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এতটা উন্নত, যুগশ্রেষ্ঠ মতবাদ ও জ্ঞানের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন?! উপরন্তু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানগরিমা মানুষের নিকট পৌছানোর প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এতটা নিভৃতচারী এবং দুনিয়াবিমুখ?! তবুও যদি তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয় এবং তাঁকে একজন আরব হিসেবেই গণ্য করা হয়, তবুও তাঁর থেকে সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য অব্যাহত সাক্ষাৎ ও অবিরাম সাহচর্যের মাধ্যমে সেই শিক্ষা আত্মস্থ করার আবশ্যকতা রয়েছে। কারণ, নিছক দু-একবারের সাক্ষাতে কুরআন-হাদিসের মতো এই বিশাল অলৌকিক জ্ঞানভান্ডার অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই অনিবার্যভাবেই তাদের বহু সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়েছে। এবার আপনারাই বলুন, এই অবস্থায় তাদের জন্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তার ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা কি তাতে সফল হতে পারবে?!

এটাও কি চরম পর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, এমন একজন ব্যক্তি যিনি বহু যোগ্যতা, প্রশাসন পরিচালনা ও নেতৃত্বের মতো মহৎ গুণে গুণান্বিত, একইসাথে যিনি নিজের অভিজাত বংশ, মানুষের ভালোবাসা ও মূল্যায়ন লাভের মাধ্যমে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উপবিষ্ট। এরপর তিনি নবুয়তের দাবি করলেন। তারপর থেকে তাঁর সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম, ওঠাবসা লক্ষ করা শুরু হলো, সকলেই

---

[৭৩৪]. *সহিহ বুখারি* : ৬৮৪১, *সহিহ মুসলিম* : ১৬৯৯।

2024/12/05 18:49

CS CamScanner

তাঁর গোমর ফাঁস হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। অথচ মানুষের এই সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি তাঁর সেই গোপন শিক্ষকের সাথে বারবার সাক্ষাৎ ও শিক্ষাগ্রহণের কাজ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়ে গেলেন! তা ছাড়া (এমন মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি হয়েও) তিনি জীবনে একটিবারের জন্যও সেই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন না, যে কারণে এই জ্ঞান-প্রজ্ঞার কোনোকিছুই প্রকৃত দাতার দিকে সম্বন্ধিত হলো না!!

আট.

কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হতো অল্প অল্প করে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে। এভাবে দীর্ঘ তেইশ বছরে কুরআনের অবতরণ সম্পন্ন হয়। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর সেই ছড়িয়ে থাকা কুরআনকে একত্র করে একটি গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কুরআন এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না, যা পূর্ণাঙ্গরূপে রচনার পর একবারে মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়েছে। বরং তা ছিল যুগের এক গতিশীল অধ্যায়, যা প্রতিনিয়ত কিছু কিছু করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এই একটি ব্যাপারই 'কুরআন কারও কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়া'-সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য যথেষ্ট।

নয়.

এমন বহু বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কখনো ওহি আসত ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ করে, ওহি নাজিলের ক্ষেত্রে যা ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর। সেই অবস্থা শেষ হতেই তিনি দেখতেন, (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) যা বলেছেন, সেটা তাঁর আত্মস্থ ও মুখস্থ হয়ে গেছে।[৭৩৫]

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. প্রচণ্ড শীতের দিনেও ওহি নাজিল হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ললাট দিয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়তে দেখেছেন।[৭৩৬]

---

৭৩৫. *সহিহ বুখারি* : ২, *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৩।

৭৩৬. *সহিহ বুখারি* : ২, *সুনানে তিরমিজি* : ৩৬৩৪, *সুনানে নাসায়ি* : ৯৩৪, *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬২৪১।

2024/12/05 18:49
CamScanner

বস্তুত এগুলো এমন কিছু অবস্থা, যে ক্ষেত্রে অভিনয় করা সম্ভব নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অস্বাভাবিক অবস্থাগুলোর কারণে কিছু সমালোচকের মন্তব্য ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃগী কিংবা এ জাতীয় কোনো রোগে আক্রান্ত। এ ব্যাপারে রোনাল্ড বডলির[৭৩৭] কথা উল্লেখ করে দেওয়াই তাদের জবাবের জন্য যথেষ্ট হবে আশা করি। তিনি লিখেছেন, মৃগী, ম্যালেরিয়া কিংবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমায় আক্রান্ত ছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রে এ জাতীয় যা কিছুই বলা হোক না কেন, এর কোনোটিই (তাদের স্বার্থ উদ্ধারে) কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, মৃগীরোগ কখনো কাউকে নবী বা জীবনবিধান প্রবর্তকের আসনে উন্নীত করতে পারে না। কখনো কাউকে সম্মান ও নেতৃত্বের আসনেও বসাতে পারে না। বরং কারও মধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে আগেকার মানুষেরা তাকে মনে করত পাগল কিংবা জিনের আছরগ্রস্ত। তবে এই অবস্থা সত্ত্বেও যাকে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণে গুণান্বিত করা যায়, তিনিই হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৭৩৮]

দশ.

কুরআনুল কারিম অতি স্পষ্টভাষায় আহলে কিতাবদের বিভিন্ন বিষয়ের নিন্দা জানিয়েছে। যেমন, তাদের অন্তরের রুক্ষতা, আসমানি গ্রন্থের বিকৃতি সাধন, স্বয়ং তাওরাত ও ইনজিলে যে নবীর অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, তাকে অস্বীকার। কুরআন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনেক মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসকেও প্রত্যাখ্যান করেছে, যেমন হজরত উজাইর ও ঈসা আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করা, খ্রিষ্টানদের নিকট ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর বিশ্বাস, সমগ্র মানবজাতির ওপর ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস। এমন

---

৭৩৭. রোনাল্ড ভিক্টর বডলি। ব্রিটিশ আর্মি অফিসার (১৯০৮ খ্রি.)। ইরাক এবং জর্দানে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মুসকাত অঞ্চলে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। তিনিই প্রথম 'রুবউল খালি' (Empty Quarter) মরুভূমি পাড়ি দেন। এরপর সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আরবের মরু অঞ্চলে বসবাসের জন্য আরবে চলে আসেন। তিনি মরুভূমি এবং প্রাচ্য নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। তার একটি প্রসিদ্ধ রচনা হলো, *আর-রাসুল : হায়াতু মুহাম্মাদ* (The Messenger : The Life of Mohammed)।

৭৩৮. রোনাল্ড ভিক্টর বডলি : *আর-রাসুল : হায়াতু মুহাম্মাদ* : ৫৮, ৫৯।

আরও বহু মৌলিক বিষয়ের পার্থক্যও তুলে ধরেছে কুরআনুল কারিম। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, আহলে কিতাবদের সীমালঙ্ঘনপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে ইসলাম কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যার মাধ্যমে ইসলামধর্মের সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এ ছাড়া পবিত্র কুরআন আহলে কিতাবদের কাছের মনে করার এবং কাফের, মুশরিকদের তুলনায় তাদেরকেই মুসলমানদের অধিকতর নিকটবর্তী ভাবার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের নারীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতা দিয়েছে। তাদের নবী হজরত ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, দাউদ, সুলাইমান, ইয়াসা, মুসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালামের নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে তাদের আলোচনা বিবৃত করেছে। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজার কথা, তার পবিত্র কুমারী মায়ের দোষমুক্তির ঘোষণা করেছে। এভাবে উভয় জাতির মাঝে বিশাল মিল ও সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি হওয়ারও আহ্বান করা হয়েছে। নিশ্চয় এগুলো অন্য কিছু থেকে নকলকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যও নয়, আবার পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল কোনো বিষয় বা নবদীক্ষালাভকৃত বিষয়ের অনুসরণও নয়। বরং তাঁর এ সমস্ত অবস্থান ও সিদ্ধান্ত ছিল অতি সচেতনতাপূর্ণ, স্পষ্ট, সুদৃঢ় এবং স্থানকালের প্রভাবমুক্ত। এই ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজ চিন্তাবিদ লেটনারের[৭৩৯] একটি বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আমার যতটুকু জানাশোনা আছে সে অনুযায়ী বলতে পারি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জ্ঞান লাভ করেছেন সেটা (মানুষ) কারও থেকে গৃহীত নয়, বরং তাঁর নিকট প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই তা প্রদান করা হয়েছে।[৭৪০]

---

৭৩৯. লেটনার। একজন ইংরেজ গবেষক। আইন, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মতো একাধিক বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে (কাজাখস্তানের রাজধানী) আসতানা ভ্রমণ করেন। এ ছাড়াও আরও অনেক ইসলামি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত ব্যক্তি ও আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৭৪০. লেটনার : *দীনুল ইসলাম* : ৪, ৫।

CS CamScanner

এগারো.

ড. মরিস বুকাইলির গবেষণা। তিনি ছিলেন অনারব, ফ্রান্সের অধিবাসী। তিনি কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং মুসলমান হওয়ার কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না। তিনি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন এই তিন গ্রন্থের তথ্যের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলোর তুলনামূলক পাঠ-পর্যালোচনা করেন। তিনি তখন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন, একমাত্র কুরআনের বর্ণনাগুলোই এমন, যার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের (প্রমাণিত) কোনো তথ্যই সাংঘর্ষিক নয়। কুরআন অবতরণের চৌদ্দশ বছর পরও কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষ না থাকা প্রমাণ করে, এটা কোনো মানব হাতে রচিত নয়।

আর যদি মেনে নেওয়া হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, তখন কি এ কথা বলার কোনো সুযোগ আছে যে, তিনি সেগুলোর বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলি সেই বিজ্ঞানহীন যুগে পরীক্ষানিরীক্ষাপূর্বক সেগুলোর সঠিক তথ্যগুলো রেখে দিতে আর তার ভুলগুলো চিহ্নিত করে নিজের গ্রন্থ থেকে বাদ দিতে সক্ষম হয়েছেন?![৭৪১]

---

৭৪১. দ্রষ্টব্য : ডক্টর মরিস বুকাইলি রচিত *আল-কুরআন ওয়াত-তাওরাত ওয়াল-ইনজিল ওয়াল-ইলম* (কুরআন, তাওরাত, ইনজিল ও বিজ্ঞান)।

CamScanner

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলায় আক্রমণের অভিযোগ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে-সকল অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তার একটি হলো, তিনি বিভিন্ন সময় কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলার ওপর আক্রমণ করতেন। আর এটা তো চোর-ডাকাতদের কাজ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। (তাদের এসব অভিযোগ-আপত্তি থেকে আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কতই-না পবিত্র!) তারা উদাহরণ হিসেবে বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার পিছু ধাওয়া করেছিলেন। পরে এর সূত্র ধরেই বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তবে বাস্তবতা হলো, এই কথা যারা বলে, তারা জানে না যে মক্কা ও মদিনার মাঝে ইতিমধ্যেই পূর্ণরূপে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই এই দ্বন্দ্বের শুরু। তা ছাড়া এটা খুবই যৌক্তিক এবং প্রাসঙ্গিক ছিল যে, কুরাইশরা মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনোভাবেই চুপ করে বসে থাকবে না। তারা তো সেই লোক, যারা নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনায় পৌঁছতে না দেওয়ার জন্য। এমনকি শেষ মুহূর্তে তিনি যখন মক্কা ছেড়ে মদিনার পথ ধরেন, তখনও তারা পথিমধ্যে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর হত্যাকারীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে।

মক্কা ও মদিনার মাঝে যে শত্রুতার সূচনা হয়েছিল, তার ঘোষণা পাওয়া যায় আবু জাহেলের বক্তব্যে। সাদ ইবনে মুয়াজ রা. ও উমাইয়া ইবনে খালফের মাঝে পুরাতন বন্ধুত্ব ছিল। এ কারণে সাদ রা. মক্কায় এলে উমাইয়ার বাড়িতে উঠতেন। একইভাবে উমাইয়া মদিনায় আগমন করলে সাদ রা.-এর মেহমান হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর সাদ রা. একবার মক্কায় এলেন ওমরা করতে। মক্কায় এসে তিনি যথারীতি উমাইয়ার বাড়িতে উঠলেন। তাকে বললেন, 'আমাকে একটু নিরিবিলি সময়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার ব্যবস্থা করে

2024/12/05 18:50
CamScanner

দিয়ো।' কথা অনুযায়ী উমাইয়া দুপুরের দিকে সাদ রা.-কে নিয়ে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলো।

ঘটনাক্রমে সেখানে আবু জাহেলের সাথে তাদের দেখা হয়ে যায়। তখন সে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার সাথে এ লোক কে?' উমাইয়া বলল, 'এ হচ্ছে সাদ।' তখন আবু জাহেল সাদ রা.-কে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করছ, এরপর আবার তুমি খুব নিরাপদে তওয়াফ করতে যাচ্ছ! আল্লাহর কসম! তুমি যদি আজ আবু সফওয়ানের (উমাইয়ার উপনাম) অতিথি না হতে, তাহলে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না!'

আবু জাহেলের কথা শুনে সাদ রা. উচু স্বরে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে এটা (তাওয়াফ) থেকে বাধা দাও, তবে আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় বিষয়ে বাধা দেবো! মদিনার পাশ দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা আর পাবে না!'[৭৪২]

বস্তুত উভয় শহরের মাঝে যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিরাজের ব্যাপারে এটি ছিল আবু জাহেলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা। সাদ রা. সেদিন রক্ষা পেয়েছেন মূলত এক কুরাইশ নেতার নিরাপত্তাবলয়ে থাকার কারণে।

কিন্তু আমরা যদি ধরেও নিই, এই ঘটনাটি ঘটেনি, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায়, যখন আরব অঞ্চলগুলোর প্রাণকেন্দ্র ও সবচেয়ে প্রভাবশালী নগরী মক্কার প্রতিপক্ষ হয়ে আরেকটি শক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল প্রতিবেশী অঞ্চল মদিনাতে, যার ওপর দিয়েই মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো শামে যাতায়াত করে, তখন আবশ্যকভাবেই একপক্ষ অপরপক্ষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, মক্কার জন্য আবশ্যক ছিল নিজ মর্যাদা টিকিয়ে রাখা, তার যাতায়াতের পথটি সুরক্ষিত করা এবং এই ইসলামি জাগরণের বিস্তার রোধ করা, যা মক্কাভূমিতে জন্মলাভের পর থেকেই তার সাথে ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর সেটি ধীরে ধীরে মক্কার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে একটি নতুন দেশে শিকড় গাড়া শুরু করে, যা মক্কাবাসীর জন্য কিছুতেই বরদাশত করার উপযোগী ছিল না। অপরদিকে মদিনা

---

৭৪২. *সহিহ বুখারি* : ৩৯৫০, *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৭৯৪

2024/12/05 18:50
CamScanner

রাষ্ট্রের জন্যও আবশ্যক ছিল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তার সূচনাকালের এইসব সম্ভাব্য আক্রমণ শক্ত হাতে প্রতিহত করা।

বস্তুত সাদ রা.-এর সাথে সংঘটিত ঘটনাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র তখনও পর্যন্ত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর ওপর চড়াও হয়নি, যদিও সেটার পূর্ণ সক্ষমতা তাদের ছিল। এ কারণেই সাদ রা. আবু জাহেলকে শামে গিয়ে ব্যবসা করার পথ রুদ্ধ করার হুমকি দিয়েছেন। সারকথা হলো, এই যুদ্ধপরিস্থিতি ঘোষিত হয়েছিল কুরাইশদের পক্ষ থেকে মক্কা নগরীতে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল। এই ঘটনা মদিনাকে অভ্যন্তরীণ প্রথম ফেতনা ও বিশৃঙ্খলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় বসবাস শুরু করার পর কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং আউস-খাজরাজের মূর্তিপূজারি মুশরিকদের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করে। কুরাইশদের চিঠির ভাষ্য ছিল—

> তোমরা আমাদের এক লোককে আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে অথবা তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে, নতুবা আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাদের ওপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করব ও তোমাদের মহিলাদেরকে বন্দি করে দাসী বানাব!

চিঠিটি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীদের নিকট পৌঁছল, তখন তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একত্রিত হলো। খবর পেয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, 'কুরাইশদের ভীতিপ্রদর্শন তোমাদেরকে অমূলক ভীত করে তুলেছে। আসলে তারা তোমাদের ততটা ক্ষতি করতে পারবে না, যতটা ক্ষতি তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্যে ডেকে আনবে। কারণ, তোমরা নিজেদের ভাই-বন্ধু ও সন্তানসন্ততিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছ!'

2024/12/05 18:50
CamScanner

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এসব শুনে তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছা চলে গেল এবং যে যার মতো পৃথক হয়ে গেল। এরপর কুরাইশরা একই কাজ করল ইহুদিদের সাথে।[৭৪৩]

এ ব্যাপারে কারেন আর্মস্ট্রং যথাযথ বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছেছেন এমন এক শরণার্থীর মতো যিনি বিস্ময়করভাবে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছেন। (সেখানে পৌঁছার পরও) তাঁর জীবনের ঝুঁকি অব্যাহত ছিল পাঁচ বছর। এই সময়ের মাঝে গোটা মুসলিমজাতি বিভিন্নবার একেবারে নির্মূল হয়ে যাওয়ার মুখোমুখিও হয়েছিল। অথচ পশ্চিমাবিশ্বের আমরা ধারণা করি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অতীতের এমন এক যুদ্ধবাজ নেতা, যে তাঁর ধর্মের প্রতি অনীহ এক সমাজের ওপর অস্ত্রের শক্তিতে ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রথম যুগের মুসলমানগণ নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদেই লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।[৭৪৪]

অতএব, স্বাভাবিকভাবেই এসব হুমকির মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। সুতরাং তিনি মদিনার আশপাশের এলাকাগুলোতে বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন এবং ছোট ছোট কিছু যোদ্ধাবাহিনীও পাঠান। অবশ্য এগুলোর অল্প কয়েকটিই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে জড়িত হয়। আশপাশের অনেক গোত্রের সাথেই তাঁর সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়। তিনি ছোট ছোট যেসব যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হচ্ছে :

১. আবওয়া অভিযান। এটাতে অবশ্য সরাসরি লড়াই সংঘটিত হয়নি, বরং বনু যমরা গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপিত হয়ে যায়।

২. উবাইদা ইবনুল হারেসের অভিযান। এটাতে কুরাইশদের সাথে ছোট আকারে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই লড়াইয়ে কুরাইশদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান।

---

[৭৪৩]. *সুনানে আবু দাউদ* : ৩০০৪।

[৭৪৪]. কারেন আর্মস্ট্রং : *সিরাতুন নাবি মুহাম্মাদ* : ২৫২।

2024.12.05 18:50

CamScanner

৩. হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অভিযান। এই বাহিনী আবু জাহেলের বাহিনীর সাথে প্রায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, তবে নিরপেক্ষ নেতা মাজদি বিন আমর জুহানির হস্তক্ষেপে তা পিছিয়ে যায়।

এসবের সম্মুখীন হওয়ার পর কুরাইশরা সচেতনতার সাথে ভাবতে থাকে যে, বিষয়টা এখন আর সহজ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী সময়ে শুধু হুমকির ওপরই বসে থাকবেন না (বরং কার্যতই তিনি আক্রমণ-হামলার পথে অগ্রসর হবেন)। বস্তুত তখনই তার ইচ্ছার পূর্ণতা ঘটবে। এ কারণেই আমরা আবু জাহেলকে বলতে দেখি, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ ইয়াছরিবে (মদিনায়) অবস্থান গ্রহণ করেছে। এবার সে তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠাতে শুরু করেছে। সে তোমাদের (ধনসম্পদ) ছিনিয়ে নিতে চায়। সুতরাং তোমরা তাঁর নিকটবর্তী পথ ব্যবহারে সতর্ক হও। নিশ্চয় সে এখন ওত পেতে থাকা সিংহের ন্যায়। তোমাদের ওপর তাঁর ক্রোধ এখন চরমে।[৭৪৫]

এবার বলুন, এটা কি অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে, কুরাইশদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট শত্রুতা, শামের পথে চলার ক্ষেত্রে স্বয়ং কুরাইশদের সতর্কতা ইত্যাদির মতো কেন্দ্রীয় বিষয় এড়িয়ে গিয়ে কেবল ইতিহাসের মধ্যখানের এক টুকরো চিত্র তুলে ধরে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে?! যেমন কিছু মানুষের আলোচনা শুনে মনে হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণের জন্য বের হওয়ার মাধ্যমেই এই যুদ্ধের সূচনা ঘটেছে! এভাবে ইসলাম ও কুরাইশদের ইতিহাসের ব্যাপারে পাঠকের অজ্ঞতার সুযোগে এমন কৌশলে অপবাদ ছড়ানো হয় যে, মনে হয় পুরো আরব উপদ্বীপ ছিল নিশ্চিন্ত-নিরাপদ-নিরুপদ্রপ। আর ঠিক তখনই কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা আকস্মিকভাবে এমন এক বিপদের মুখোমুখি হয়েছে!

মোটকথা, হিজরত-পরবর্তী ঘটনাবলি ও পারিপার্শ্বিকতা সাক্ষ্য দেয়, উভয় দলের মাঝেই তখন যুদ্ধপরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষেরই প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল। বস্তুত এই পরিস্থিতি সামনে থাকার কারণেই (ব্যবসায়ী কাফেলার সর্দার) আবু সুফিয়ান মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাখে আর এর মাধ্যমে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে

---

৭৪৫. তাবারানি : *মুজামুল কাবির* : ১৫৩৩।

2024/12/05 18:51
CamScanner

জানতে পারে। ফলে (কাফেলা মুসলমানদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে) তৎক্ষণাৎ সে কুরাইশদের নিকট সংবাদবাহক প্রেরণ করে এবং নিজেও ভিন্ন নিরাপদ রাস্তা অবলম্বন করে। আর কুরাইশরাও (পূর্ব থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার কারণে) সংবাদ পাওয়ামাত্রই দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে বদরপ্রান্তরে উপস্থিত হয়। এ সবকিছুই ঘটে যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ফলে মুসলমানগণ আর মদিনায় ফিরে আসার অবকাশ পায়নি কিংবা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণেরও সুযোগ হয়নি। বরং তারা ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণের জন্য বের হয়ে কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যায়। আলোচিত সবকিছুই প্রমাণ করে, মূলত কুরাইশরা আগে থেকেই মদিনাবাসীর সাথে চলমান যুদ্ধপরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক ছিল এবং আবু সুফিয়ান যখন তাদের নিকট সতর্ককারী সংবাদবাহক প্রেরণ করে, তখন তারা সেটাকে আকস্মিক কোনো বিষয় হিসেবে গণ্য করেনি।

এসব বিষয়ের সাথে সাথে পাঠককে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মুহাজির মুসলমানরা মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন চুপিসারে কপর্দকশূন্য অবস্থায়। তারা নিজেদের বাড়িঘর, ধনসম্পদ সাথে নিয়ে আসতে পারেননি, আবার সেগুলো বিক্রি করারও সুযোগ পাননি। বরং তাদের সবকিছুই দুর্বৃত্ত কুরাইশদের হাতে লুণ্ঠিত অবস্থায় রয়ে যায় এবং তারাই সেগুলোর ভোগদখলে লিপ্ত থাকে। আর বদরযুদ্ধ তাদের সে সকল লুণ্ঠিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রথম চেষ্টা ও পদক্ষেপ হিসেবেও কাজ করেছিল।

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (মুসলমানগণ যে ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধরার জন্য বের হয়েছিলেন, সেই কাফেলার সর্দারও সে-ই ছিল) মুসলমান মুহাজিরদের ঘরবাড়ি দখল করে এবং সেগুলো বিক্রি করে দেয়। চোখে পড়ার মতো তার জবরদখলের চিত্র ছিল বনু জাহাশ গোত্রীয় লোকদের বাড়িঘর দখলের ক্ষেত্রে। তাদের হিজরতের পর সে সব বাড়িঘর দখল করে নেয়। সে নিজেকে তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকারী জ্ঞান করে। কারণ, জাহাশ গোত্রীয় জনৈক আবু আহমাদের সাথে তার মেয়ে ফারিয়ার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আবু সুফিয়ান তাদের সকলের ঘরবাড়ি নিজের দখলে নিয়ে নেয় এবং সেগুলো বিক্রি করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. এ ঘটনা জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ

2024/12/05 18:5 CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যথিতচিত্তে অভিযোগ জানান। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আবদুল্লাহ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে এর চেয়েও উত্তম গৃহ দান করবেন?!'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. বলেন, 'অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তাহলে তোমার জন্য সেটাই পাওনা রইল।'[৭৪৬]

এভাবেই মক্কার নেতৃবর্গ মুসলমানদের সকল সম্পদ জবরদখল করে নিয়েছিল। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন উসামা বিন যায়েদ রা. তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি মক্কায় আপনার গৃহে অবস্থান করবেন?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আকিল কি আর আমাদের জন্য কোনো ঘরবাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে?!'[৭৪৭]

এই আকিল হলো আবু তালিবের এক সন্তান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। সে এবং তার ভাই তালিব তাদের পিতা আবু তালিবের সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। ইসলামগ্রহণ করার কারণে আবু তালিবের অন্য দুই ছেলে জাফর রা. ও আলি রা.-কে কিছুই দেয়নি। এরপর আকিল সেগুলো অন্যের নিকট বিক্রি করে দেয়। তো কুরাইশরা মুসলমানদের কাফের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক তাদের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করার এই হলো সামান্য কিছু নমুনা।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো, মক্কা বিজয়ের পর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব সম্পদে মুশরিকদের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা বাতিল করেননি। তাদের মন জয় করা এবং সদ্য পরাজয়ের পর তাদের ওপর নতুন করে আঘাত ও বিদ্বেষ সৃষ্টির পথ বন্ধ করার জন্য তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি

---

[৭৪৬]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/২৮, ফাকেহি : *আখবারু মাক্কাহ* : ৩/২৯২ (২১২১), ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/২২৮, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ৩/২২৫।

[৭৪৭]. *সহিহ বুখারি* : ১৫৮৮, *সহিহ মুসলিম* : ১৩৫১।

2024/12/05 CamScanner

মুহাজিরদের তিনি এ কথার ওপর মানিয়ে নেন যে, তাদের থেকে যা-কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো তারা আল্লাহর ওয়াস্তে ছেড়ে দিক।[৭৪৮]

এ ছাড়া এই আত্মসাতের ওপরই মুশরিকদের ঔদ্ধত্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা সম্পদশালী মুসলিমদের সেখান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বিতাড়িত করেও ছেড়েছে। যেমনটি আমরা সুহাইব রা.-এর ঘটনায় দেখতে পাই। আবু উসমান নাহদি রা. বর্ণনা করেন, সুহাইব রা. যখন মদিনায় হিজরত করার ইচ্ছা করলেন, তখন কুরাইশ কাফেররা তাকে (বাধা দিয়ে) বলল, 'তুমি আমাদের নিকট এসেছিলে নিঃস্ব অবস্থায়। আমাদের মধ্য থেকেই তোমার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুমি অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছ, কিন্তু আজ তুমি চাচ্ছ নিজের সম্পদসহ প্রস্থান করবে?! আল্লাহর কসম! এটা কিছুতেই হতে পারে না!'

তখন সুহাইব রা. বলেন, 'আচ্ছা, আমি আমার সকল সম্পদ তোমাদের দিয়ে দিলে তোমরা আমার পথ ছেড়ে দেবে?'

কাফেররা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এই প্রস্তাবে রাজি।'

সুহাইব রা. তখন বললেন, 'আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার সমস্ত সম্পদ (যারা আমার সাথে জটিলতা সৃষ্টি করছে) তাদের দিয়ে দিলাম।' পরে যখন এই সংবাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, তিনি বললেন,

«رَبِحَ صُهَيْبٌ رَبِحَ صُهَيْبٌ»

সুহাইবই লাভবান হয়েছে, সুহাইবই লাভবান হয়েছে।[৭৪৯]

মোটকথা, কুরাইশদের হাতে থাকা এসব ধনসম্পদ ছিল মুসলিম মুহাজিরদের থেকে জোরজুলুম করে আত্মসাৎ করা। অথচ তখন মুসলমানদের এ সকল সম্পদের খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে হিজরতের সময় এবং তাদের নতুন ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের সূচনাকালে। অতএব, নিজেদের সেসব সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার প্রতি নিন্দাবাদ করা কিংবা সেই প্রচেষ্টাকে (এক পক্ষের সীমালঙ্ঘনমূলক) নবহামলা বলা প্রকৃতপক্ষে খুবই অন্যায়ের বিষয়! এসব কথাবার্তার প্রেক্ষিতে মনে হয়,

---

৭৪৮. ইবনে সাইয়েদিন নাস : *উয়ুনুল আছার* : ১/২২৮।

৭৪৯. *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৭০৮২।

CamScanner

মুসলমানদের এই আক্রমণ যেন ছিল কোনো শান্তিকামী নিরাপদ দলের ওপর। যারা ছিল নিতান্ত নিষ্পাপ, জোরজুলুমের কোনো ইতিহাসই তাদের ঝুলিতে ছিল না। অথচ কুরাইশরা যে অপকর্ম ঘটিয়েছে, তার রেশ তখনও কাটেনি! (তাহলে পরিণামপ্রাপ্তির দিনে কেন এমন অস্বাভাবিক কথা?!)

এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে যে কথাটি বলা যায় তা হলো, স্বয়ং মক্কাবাসীও এই কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও চরিত্রে কোনো অপবাদ আরোপ করেনি। মুসলমানগণ তাদের সাথে যে আচরণ করেছে, এটাকে তারা কোনো ধরনের ধোঁকা, প্রতারণা হিসেবে গণ্য করেনি। কারণ তখনকার পরিস্থিতি ও চিত্র তৎকালীন সকলের নিকটই ছিল পরিষ্কার। আমরা যেরকম আলোচনা করে এসেছি, বস্তুত তারাও এটাকে সেরকম যুদ্ধপরিস্থিতি বলেই গণ্য করছিল। এ ছাড়া তারা এ কথাও খুব ভালোভাবেই জানত যে, তারাই প্রথমে জুলুম শুরু করেছে এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। শত্রুতা প্রদর্শন এবং যুদ্ধের ঘোষণাও তাদের পক্ষ থেকেই প্রথমে হয়েছে।

এবার তাহলে বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে বর্তমানে যারা ইসলামের দিকে শত্রুতার সূচনার কথা সম্পৃক্ত করতে চায়, তারা কি কুরাইশদের ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বয়ং কুরাইশদের চেয়েও বেশি ন্যায়বান দাবি করতে চায়?! তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তাদের থেকেও বেশি জ্ঞানবান হওয়ার দাবি জানাচ্ছে?!

2024/12/05 18:56
CamScanner

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

ইহুদিদের প্রতি জুলুমের অভিযোগ

এই অভিযোগটি উত্থাপিত হয় কেবল বৈশ্বিক জায়নবাদী[৭৫০] গোষ্ঠী এবং সেই ঘরানাগুলো থেকে, যারা শক্তিশালী জায়নবাদী প্রচারমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত। (নতুবা অন্যদের নিকট এটি একটি অসমর্থিত অভিযোগ)। কেননা, ইহুদিরা মুসলমান ব্যতীত অন্য কারও কাছেই আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশা করতে পারেনি। একদিকে তারা নবীযুগ থেকে নিরাপত্তা পেয়েছে, অন্যদিকে স্পেনের ইসলামি শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর স্প্যানিশ ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের হাতে তারা যে জুলুম, নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল, তা থেকে উদ্ধার করে উসমানি খেলাফত। বস্তুত স্পেনে মুসলিমশাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকেই ইউরোপে ইহুদি বিতাড়ন ও অবদমনের ইতিহাস শুরু হয়। অধিকাংশ সময় এই অবদমন ছিল ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে। আবার কখনো তাদের নিকৃষ্ট স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের কারণেও তাদেরকে আক্রোশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন, তাদের সুদি কারবার, মজুতদারি ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলামি শাসনকালে ইহুদিদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, আবার ভিন্ন ছিল ইসলামের সাথে ইহুদিদের আচরণও। (আমরা অচিরেই সেসব অবস্থার কথা জানতে পারব।) এ ছাড়া ইহুদি নির্যাতনের বিষয়টি খণ্ডন করার পাশাপাশি আমরা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতেও সক্ষম হব যে, ইউরোপীয়রাও এমন এক জাতি, যাদের ইহুদি নির্যাতন নিয়েও কথা ওঠা উচিত।

---

৭৫০. জায়নবাদী : বর্ণবাদী রাজনৈতিক একটি ধারা। ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে শাসন কায়েম করার প্রবণতা কাজ করে তাদের মধ্যে। জেরুজালেমে অবস্থিত জায়ন পাহাড়ের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে তারা জায়নবাদী নামে পরিচিতি লাভ করে। এই পাহাড়ে দাউদ আলাইহিস সালাম আবাস নির্মাণ করায় ইহুদিদের কাছে এর বেশ গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিককালে জায়নবাদী চিন্তাধারা উত্থানের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ান নাগরিক হার্টজেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে জায়নবাদী হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়া জরুরি নয়, আবার ইহুদি হলেও জায়নবাদী হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং খ্রিষ্টান বা নাস্তিকরাও জায়নবাদী হতে পারে।-সম্পাদক

CamScanner

উদারতা ছিল সাধারণ নীতি

আলোচনার শুরুতে আমরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করছি যে, আহলে কিতাবদের সাথে উদারতা প্রদর্শন ছিল ইসলামের সাধারণ এক নীতি। নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে ইসলামের সুদীর্ঘ শাসনামলে এই নীতির অনুসরণ অব্যাহত ছিল। এই সময়ে জিম্মিরা নিজেদের জীবনযাপন, চলাফেরা, বসতি গড়া, আকিদা-বিশ্বাস এবং ধর্মপালনে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো সময় পার করেছে। এ সময় তারা মুসলিম সমাজের সাথে মিলেমিশে সামাজিক উন্নয়ন-অগ্রগতিতে অংশগ্রহণেরও সুযোগ পেয়েছে।

এগুলো এমন এক বাস্তবতা, যার মাঝে সামান্যতম ন্যায়-নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রয়েছে, সে কখনো তা অস্বীকার করতে পারবে না। এ বিষয়টি প্রমাণে আমাদের অল্প কিছু উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। সুতরাং চলুন, পশ্চিমা অমুসলিম কিছু প্রাচ্যবিদের বক্তব্য শুনে নেওয়া যাক।

গুস্তাভ লি বোন বলেন, কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁর পূর্বে আগত ধর্মবেত্তাগণ, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তাগণ[৭৫১] এমন উদার নীতি প্রণয়ন করেননি। (পরবর্তী আলোচনায়) আমরা আরও দেখতে পাব, তাঁর ইনতেকালের পর মুসলিম খলিফাগণও কীভাবে তাঁর এই নীতি অনুসারেই চলেছেন। এই উদারতার কথা ইউরোপের সংশয়বাদী বা কিছুটা আস্তিক কয়েকজন বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছে, যাদের গভীর দৃষ্টির সাথে আরব-ইতিহাস অধ্যয়নের সুযোগও হয়েছে। এ জন্য সামনের আলোচনায় আমি সে সমস্ত

---

[৭৫১]. একটি সতর্কতা : ইহুদিধর্মের প্রবর্তক হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবর্তক ঈসা আলাইহিস সালাম, তারা দুজনই ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল। এ কথা তো ঠিক যে, তাদের শরিয়তের সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়তের অনেক বিধিবিধানে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের শরিয়তের উদারতা, সহনশীলতা তাদের শরিয়তের চেয়ে বেশিও হতে পারে। তবে এই পার্থক্যের কারণে তাদের শরিয়তের কোনোরূপ ত্রুটি প্রমাণিত হয় না এবং সেগুলোকে কখনো খাটো করেও দেখা যাবে না। বরং আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাদের শরিয়তের বিধিবিধানও ছিল ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। কেননা, আমাদের শরিয়ত হোক বা পূর্ববর্তী কোনো নবী-রাসুলের শরিয়ত, সবগুলোর বিধিবিধানই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহির মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।-সম্পাদক

2024/12/05 18:59
CamScanner

মানুষের বেশকিছু গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি চয়ন করেছি, যা প্রমাণ করে যে, এটি শুধু আমাদের একক অভিমত নয়। যেমন, রবার্টসন তার *তারিখু শারলিকান* (চার্লসের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেন, একমাত্র ইসলামধর্মের অনুসারীরাই নিজ ধর্মের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ লালনের পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মের প্রতি উদারতার আচরণকেও ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য তলোয়ার ধারণ করলেও যারা তাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে আগ্রহ পোষণ করেনি, তাদেরকে নিজেদের ধর্মকর্মের ওপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে।

এদিকে মিচড (Michaud) তার *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যা* (*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*) গ্রন্থে লিখেছেন, যে কুরআন মুসলমানদের জিহাদের আদেশ করেছে, সেই কুরআনই ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করেছে। গির্জাপ্রধান, পাদরি এবং তাদের সেবকদের থেকে কর মাফ করে দিয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাদরিদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা, তারা (যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের মতো) ইবাদতে মগ্ন থাকে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন, তখনও তিনি খ্রিষ্টানদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি। অথচ ক্রুশের বাহক খ্রিষ্টানরা যখন সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের জবাই করেছে এবং ইহুদিদেরকে পুড়িয়ে মেরেছে।

মিচড তার *রিহলাতুন দ্বীনিয়্যাতুন ফিশ-শারক* (প্রাচ্যে ধর্মীয় ভ্রমণ) নামক আরেকটি গ্রন্থে বলেছেন, আফসোসের কথা হলো, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের থেকে এই উদারতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, যা মূলত (কোনো জাতির জন্য) ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি সদাচার, তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ[৭৫২] এবং তাদের ওপর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাস চাপিয়ে না দেওয়ার ক্ষেত্রে নিদর্শন হিসেবে কাজ করে।[৭৫৩]

---

[৭৫২]. একটি সতর্কতা : একজন মুসলিম অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিংস আচরণ প্রদর্শন করবে না, ভিন্নধর্মীদের আচার-প্রথা পালনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানও করবে না এগুলো ঠিক, তবে এর মানে এই নয় যে, সে ভিন্নধর্মীদের শিরক-কুফরমূলক আকিদা-বিশ্বাস ও অন্যান্য ধর্মাচারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করবে। কেননা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপনের অর্থই হলো পূর্ণরূপে তাঁর তাওহিদকে মেনে নেওয়া এবং সকলপ্রকার আল্লাহদ্রোহিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। কিন্তু কোনোকিছুর প্রতি শ্রদ্ধা উদ্‌গত হয় মূলত অন্তরে সেই বস্তুর সত্যতার বিশ্বাস স্থাপন ও তার প্রতি ভালোবাসা লালনের মাধ্যমে। আর কুফর-শিরকের প্রতি সত্যতার বিশ্বাস ও

জার্মান প্রাচ্যবিদ জিগরিদ হুংকে বলেন, আন্দালুস, সিসিলি এবং বলকানে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘদিন ইসলামি শাসনের অধীনে লালিতপালিত হওয়ার পর আন্দালুসে (১৪৯২ খ্রি.) যখন ইসলামের ওপর খ্রিষ্টানদের বিজয় অর্জিত হয়, তখন তারা সেখান থেকে নির্বিচারে মুসলমান ও ইহুদিদেরকে বিতাড়ন করেছে। তাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়েছে। তাদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মমত গ্রহণকারীদের ওপর জেরা-পদ্ধতি (ইনকুইজিশন) প্রয়োগ করেছে। যারাই ইসলাম বা ইহুদিধর্মের অনুসরণ করেছে, তাদেরকে তারা নিজেদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময় প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।[৭৫৪]

হুংকে আরও বলেন, একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশপ (থিওডোসিয়াস) বাইজান্টাইনের প্রধান বিশপের (আগনাটিউস) নিকট পত্র লিখে জানান, এখানে আরবরাই আমাদের শাসক ও প্রধান। তারা খ্রিষ্টবাদের প্রতি বাধা সৃষ্টি করে না, বরং বিপরীতে তারা এর দেখভাল করে, অনিষ্টকর বিষয় থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করে।[৭৫৫] তারা আমাদের পাদরি, যাজকদের শ্রদ্ধা করে এবং আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের ভক্তি করে।[৭৫৬]

থমাস আর্নল্ডের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমরা এই আলোচনার ইতি টানছি। তিনি বলেন, আমরা এ পর্যন্ত অমুসলিমদেরকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করতে একটিও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা দেখিনি। তদ্রূপ খ্রিষ্টবাদকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্যও কোথাও কোনো সংঘবদ্ধ নিপীড়ন আমাদের চোখে পড়েনি। এই দুটি পদ্ধতির একটিও যদি মুসলিম খলিফাগণ অবলম্বন করতেন, তাহলে তারা ঠিক তেমন অনায়াসেই খ্রিষ্টবাদকে নির্মূল করে দিতে পারতেন, যেমনভাবে স্পেন থেকে ইসলামধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা। তদ্রূপ ফ্রান্সের রাজা লুই চতুর্দশের

ভালোবাসা লালন নিঃসন্দেহে কুফরি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানকে সতর্ক থাকতে হবে।-সম্পাদক

৭৫৩. গুস্তাভ লি বোন : *হাজারাতুল আরব* : (পার্শ্বটীকা-১) ১২৮।

৭৫৪. জিগরিদ হুংকে : *আল্লাহু লাইসা কাজালিকা* : ৪৫।

৭৫৫. অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত করে না এবং কাউকে অন্যায় আঘাত করারও সুযোগ দেয় না।-সম্পাদক

৭৫৬. জিগরিদ হুংকে : *আল্লাহু লাইসা কাজালিকা* : ২০।

CamScanner

মতো আচরণও করতে পারতেন, যে ফ্রান্সে বিদ্যমান প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারীদের ওপর জুলুম, নিপীড়নের খড়্গ চালিয়েছিল। ইংল্যান্ডে যেভাবে সাড়ে তিনশ বছর যাবৎ ইহুদি প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল, সেই পন্থাও অবলম্বন করা খুব সহজ ছিল মুসলিম খলিফাদের জন্য। এ ছাড়া প্রাচ্যের এশিয়ায় অবস্থিত গির্জাগুলো সমগ্র খ্রিষ্টানবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ তখন ছিল না। কারণ, খ্রিষ্টজগৎ তখন তাদেরকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য করত। কিন্তু এরপরও এখন পর্যন্ত প্রাচ্যে সেসব গির্জার উপস্থিতিই জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমশাসন তাদের প্রতি কতটুকু উদারতার পরিচয় দিয়েছিল।[৭৫৭]

ইহুদিদের ওপর জুলুম-নির্যাতন ও কঠোরতা আরোপের অভিযোগটি বিস্তারিতভাবে খণ্ডনের পূর্বে এই ভূমিকাটুকু অবতারণার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি। এবার নিম্নে আলোচিত কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আমরা তাদের অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যথা :

১. মদিনা সনদ

মানব-ইতিহাসের সেই সুদূরবর্তী সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের পরপরই ইহুদিদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। আমরা একে 'সহাবস্থানমূলক চুক্তি', কমপক্ষে এক দেশের নাগরিক হিসেবে 'স্বদেশ রক্ষার সম্মিলিত চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

এই চুক্তিনামার মাধ্যমে ইহুদিরা স্বীকার করে নেয় যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন এই নতুন রাষ্ট্রের প্রধান। আর তারা প্রাকৃতিকভাবেই এ দেশের একটি অংশ। নিম্নে এই চুক্তিনামার কিছু ধারা উপস্থাপন করা হলো। তবে আমরা এখানে কেবল সেগুলোই উল্লেখ করব, যেগুলো আমাদের আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। যথা :

- যে মুমিন এই সনদে লিখিত বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, তার জন্য বৈধ হবে না কোনো অপরাধীকে সাহায্য করা কিংবা তাকে আশ্রয় প্রদান করা। যে তাকে সাহায্য করবে কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে, কিয়ামতের দিন

CamScanner

তার ওপর আল্লাহর লানত ও ক্রোধ আপতিত হবে। কোনোরূপ মুক্তিপণ দিয়ে সেদিন তার মুক্তির সুযোগ থাকবে না।

- যখনই তোমরা কোনো বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হবে, তার সমাধানের জন্য আল্লাহ ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ধাবিত হবে।
- মুমিনরা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে ইহুদিরা তাদের জন্য অর্থসম্পদ জোগান দেবে।
- বনি আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে (সম্পর্কযুক্ত) একটি জাতি। (তবে) ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম (ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজেদেরটি পালন করবে)। (আর বনি আউফের ইহুদিদের মতো) তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর জন্যও (উল্লিখিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার নিয়ম) প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি নিজের ওপর জুলুম করবে ও অপরাধে লিপ্ত হবে, তার কথা ভিন্ন। সে শুধু নিজেকে এবং তার পরিবারকেই ক্ষতির সম্মুখীন করবে। (এই চুক্তির অন্য একটি ধারায় বলা আছে, বনি আউফ গোত্রের ইহুদিদের জন্য যে কথা, অন্য সকল ইহুদি গোত্রের জন্যও একই কথা।)
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত কেউ (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদিনা) ত্যাগ করতে পারবে না।
- ইহুদিরা তাদের নিজেদের খরচ বহন করবে, মুসলমানরা তাদের নিজেদের খরচ বহন করবে। এই চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো অংশ যুদ্ধে লিপ্ত হলে একে অন্যকে সাহায্য করবে। নিজেদের মাঝে সদুপদেশ ও সততা বজায় রাখবে, অন্যায় এড়িয়ে চলবে।
- এই চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য ইয়াছরিব (মদিনা) নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। (তথা সেখানে যুদ্ধ করা, গাছ কাটা, প্রাণী শিকার ইত্যাদি নিষিদ্ধ)
- কোনো আশ্রিত ব্যক্তি তার আশ্রয়দানকারীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেবে না।

2024/12/05 18:59
CamScanner

- এই চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মাঝে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে অথবা কোনো ঝগড়া-বিতর্কের সৃষ্টি হয়, যার ফলে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তা সমাধানের জন্য আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমাধান কামনা করতে হবে। নিশ্চয় এই সনদের মাধ্যমে (জুলুমের থেকে) আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র এবং (তা পালনার্থে) অত্যন্ত সততাপূর্ণ।
- ইয়াছরিবের ওপর আক্রমণকারীর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য করবে।
- কুরাইশগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদান করা যাবে না এবং যে তাকে সাহায্য করে, তাকেও না।[৭৫৮]

(মদিনার সকল অধিবাসীর নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়) অথচ এই চুক্তি-পরবর্তী দিনগুলোতে কতভাবেই-না সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায় মদিনার নতুন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত করতে এবং যুদ্ধ বাধাতে সচেষ্ট থেকেছে! হয়তো নিজেরাই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছে, নয়তো মুশরিক সম্প্রদায়গুলোকে মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি খেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। আবার কখনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে মারাত্মক প্রতারণাপূর্ণ আচরণ করেছে। এ ছাড়া তারা ব্যক্তিগতভাবেও বহুবার উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, যেগুলো মদিনাকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিল।

২. বিভিন্নরকম অস্থিরতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি

চুক্তির ধারাগুলো ইহুদিদের জন্য মান্য করা আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মুহাজিরগণ মদিনায় আগমনের পর থেকেই তারা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে থাকে। প্রথম তারা যে অপপ্রচার চালায়

---

[৭৫৮]. (মদিনা সনদের) সন্ধিচুক্তির ধারাগুলো সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে একত্র করা রয়েছে। যেমন, *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ৩/৩৪, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* (ইবনে কাছির) : ২/৩২২, *উয়ুনুল আছার* : ১/২৬১, *আর-রওজুল উনুফ* : ৪/১৭৬ ইত্যাদি। একত্রিতভাবে সবগুলো ধারা ও তার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ রচিত *মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়্যাতি লিল-আহদিন নাবাবি* : ৫৭, ড. ইবরাহিম আলি রচিত *সহিহুস সিরাতিন নাবাবিয়্যা* : ১৪০, ড. আকরাম উমারি রচিত *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সাহিহা* : ২/২৭২।
(উল্লেখ্য, এখানে উল্লেখিত কিছু ধারায় মূল আরবি পাঠের শব্দ ও বাক্যে ভিন্ন অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আমরা সেখান থেকে একটি ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে সেই অনুযায়ী অনুবাদ করেছি।-সম্পাদক)

2024/12/05 19:00
CamScanner

তা হলো, তারা সকল মুসলমানকে জাদু করেছে। এ কারণে মদিনায় তাদের কারও কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে না।[৭৫৯]

ইহুদিরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করত, তারা তাঁর উদ্দেশে বলত, اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ—অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, তোমার মৃত্যু হোক (নাউজুবিল্লাহ)।[৭৬০]

ইহুদিদের এক বড় নেতা আবু বকর রা.-কে এই বলে উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী নই, তিনিই বরং আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের প্রতি যেভাবে বিনয়ী হন, আমরা তাঁর প্রতি তত বিনয়ী হই না। তাঁর কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের নিকট তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা তিনি যদি আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষীই হতেন, তবে আমাদের সম্পদ করজ চাইতেন না, যেমনটি তোমাদের সাথি (নবী) বলে থাকেন। তিনি তোমাদেরকে সুদ থেকে নিষেধ করেন, অথচ সেটাই আমাদের প্রদান করেন। তিনি যদি আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হতেন, তবে আমাদেরকে সুদ প্রদান করতেন না।[৭৬১] (নাউজুবিল্লাহ!)

ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা ইসলামগ্রহণ করত, তারা তাদেরকে ভীষণ নিন্দা-মন্দ করত। তারা বলত, তারাই কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনে, যারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা যদি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই হতো, তবে কিছুতেই তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করত না।[৭৬২]

তারা কখনো ইসলামের প্রতি সামান্যতম সন্দেহ-সংশয় আরোপের সুযোগও হাতছাড়া করত না। বরং এটা নিয়ে তারা চারদিকে কথা ছড়ানোর চেষ্টা করত। এ ক্ষেত্রে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ইহুদি শাস ইবনে কায়েসের কুপ্রচেষ্টাটিও ছিল

---

৭৫৯. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৬৩৩০।

৭৬০. তাবারানি : *মুজামুল আওসাত* : ৪৯১০, *সহিহ ইবনে খুজাইমা* : ৫৭৪।

৭৬১. ইবনে আবু হাতেম : *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম* : ৩/৮২৯, ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৯৬।

৭৬২. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৯৫, সুহাইলি : *আর-রওজুল উনুফ* : ৪/২৫৩। ইবনে আসাকির : *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক* : ২৯/১১৫, কুরতুবি : *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন* : ৪/১৭৫।

CS CamScanner

অত্যন্ত ভয়ানক। সে মদিনায় প্রায় গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিল। একদিন সে দেখতে পেল, ইসলামগ্রহণের পর আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ভাই ভাইয়ের মতো মিলেমিশে এক জায়গায় বসে আছে। তখন শাস ইবনে কায়েস তার একটি গোলাম পাঠিয়ে তাদের মাঝে পূর্বে ঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে উভয় দলের মাঝে গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উভয়ই একে অপরকে লড়াইয়ের হুমকি দিতে থাকে। এ মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষান্ত হও! আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতেই তোমরা জাহেলিয়াতের আহ্বানে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছ! অথচ ইতিমধ্যে আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন এবং তার মাধ্যমে তোমাদের সম্মান দান করেছেন, জাহেলিয়াতের বিভ্রান্তি দূর করেছেন, কুফরি থেকে মুক্তি দান করেছেন আর পরস্পরের মাঝে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন!

এবার আউস ও খাজরাজের মুসলমানগণ বুঝতে পারল, এটা ছিল শয়তানের একটি চক্রান্ত।[৭৬৩]

মদিনার এই দীর্ঘ বসবাসকালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফিক ও ইহুদিরা ছিল একাট্টা, ঐক্যবদ্ধ। এমনকি কুরআনুল কারিম পরস্পরকে ভাই ভাই বলে উল্লেখ করেছে! আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি, যারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের সম্পর্কে কখনো অন্য কারও কথা মানব না। আর তোমাদের সাথে

2024/12/05 19:00

CS CamScanner

যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। (কিন্তু) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যুক! [সুরা হাশর : ১১]

ইহুদিদের হঠকারিতার বিষয়ে সিরাতের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত ঘটনাসমূহের এই হলো সামান্য কিছু নমুনা। তবে এখান থেকে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রদান করা জরুরি তা হলো :

এক. মদিনায় বসবাসরত এই সংখ্যালঘু ইহুদি সম্প্রদায় উত্তরোত্তর কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল, তা প্রমাণ করা।

দুই. এটা প্রমাণ করা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের অপরাধে তাদের অন্যজনকে পাকড়াও করেননি। এ ছাড়া দীর্ঘ দুইটি বছর যাবৎ এই রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে তিনি যা করতে সক্ষম ছিলেন, তেমন কোনো আচরণও তাদের সাথে প্রদর্শন করেননি। অথচ তিনি তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন।

৩. বনু কায়নুকা কী করেছিল?

এমনিতেই হৃদয়ভরা বিদ্বেষ, উপরন্তু বদরপ্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় দেখে বনু কায়নুকা তাদের স্নায়বিক উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারেনি। পরিণামে তারা প্রকাশ্যেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। তাদের এসব আচরণ দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদিনায় অবস্থিত তাদের বাজারে তাদেরকে একত্র করে নসিহত করলেন। তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, নিজেদের হঠকারিতার কারণে তাদেরকেও যেন কুরাইশের মতো বদরের পরিণতি বরণ করতে না হয়। (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নসিহত প্রমাণ করে যে, তিনি প্রায় প্রজ্বলিত যুদ্ধের আগুন প্রশমিত করার পক্ষে ছিলেন।) কিন্তু এর প্রতি-উত্তরে বনু কায়নুকার ইহুদিরা চ্যালেঞ্জের সুরে যুদ্ধের প্রতি উসকানিমূলক ভাষায় বলল, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ একটি দলকে হত্যা ও পরাজিত করেছ মাত্র। এটা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তুমি যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে, তাহলে বুঝতে পারতে আমরা কেমন লড়াকু পুরুষ। তখন আমাদের মতো কারও সাক্ষাৎ পাওনি বলেই বিশ্বাস করতে।'[৭৬৪]

---

[৭৬৪]. ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ৩/৮৯।

2024/12/05 19:00
CS CamScanner

এরপরও তাদের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের উসকানি প্রকাশ হতে বেশি দেরি হয়নি। একজন মুসলিম মহিলা একটি পণ্য নিয়ে এসে বনু কায়নুকার বাজারে বিক্রি করে। এরপর সে এক স্বর্ণকারের পাশে বসে। এ সময় ইহুদিরা সেই মহিলার চেহারা উন্মুক্ত করার কথা বলে, কিন্তু মহিলা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন গোপনে সেই ইহুদি স্বর্ণকার মহিলার কাপড়ের একটি প্রান্ত তার পিঠের দিকে বেঁধে রাখে। এরপর মহিলা যখন উঠে দাঁড়ায়, আচমকা তার সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইহুদিরা তখন মুসলিম মহিলাকে ঘিরে হাসিঠাট্টায় ফেটে পড়ে। আত্মসম্মানবোধে মহিলাটি তখন চিৎকার করে ওঠে। এটা শুনে একজন মুসলিম রাগে-ক্ষোভে সেই ইহুদি স্বর্ণকারের ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর নিকটবর্তী ইহুদিরা মিলে সেই মুসলিম ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। এবার মুসলমানরাও ইহুদিদের ওপর আক্রমণের জন্য অন্য মুসলমানদের ডাকতে থাকে।

«فَغَضِبَ الْمُسْلِمُوْنَ فَوَقَعَ الشَّرُّ»

ফলে মুসলমানরাও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বিপর্যয় ঘটে যায়।[৭৬৫]

ঘটনার পরিণতি বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ 'الشَّرُّ' (বিপর্যয়) শব্দে এসে চোখ আটকে যায়। কিন্তু বাস্তবে এই ঘটনার পরিণাম ছিল (মুসলমানদের) জন্য কল্যাণকর। বস্তুত সিরাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ ইত্যাদি ইসলামি গ্রন্থাবলিতে রচয়িতাগণ ইসলামি আবেগ-অনুভূতির কলমে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, যেন এর মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

যাই হোক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টির ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে পৌঁছার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের এক বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন এবং আল্লাহ তাআলার আদেশে বনু কায়নুকার সাথে কৃত চুক্তিও প্রত্যাহার করে নেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

আপনি যদি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেন, তবে আপনিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুড়ে মারুন। স্মরণ রাখুন, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। [সুরা আনফাল : ৫৮]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কায়নুকার ইহুদিদের পনেরো দিন অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে মদিনা থেকে তাদের বহিষ্কারের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখন বলুন, এমন একটি হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়কে বহিষ্কারের কারণে কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে?! অথচ বর্তমান সমাজগুলোতে এ ধরনের হঠকারী আচরণের জন্য এরচেয়ে আরও কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। এমনকি এ কারণে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রে জরুরি অবস্থাও জারি করা হয় এবং শাস্তির জন্য ব্যতিক্রমী বহু আইন প্রণয়ন করা হয়!

৪. বনু নাজিরের ইহুদিরা কী করেছিল?

বনু নাজিরের ইহুদিরা তাদের স্বধর্মীয় ভাই বনু কায়নুকা যা করেছে, তারচেয়েও মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। এ ছাড়া তাদের দুরাচারটি প্রকাশ পায় বনু কায়নুকার সময়ের চেয়ে আরও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে। বনু কায়নুকা যেখানে একজন মুসলিম মহিলার সম্মানহানি এবং একজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড ঘটায়, বনু নাজির সেখানে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার অপচেষ্টা চালায়! বনু কায়নুকা যেখানে বদরপ্রান্তরে মুসলমানদের বিজয়ের পর শত্রুতা প্রকাশ করে, বনু নাজির সেখানে শত্রুতা প্রকাশ করে মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর আপতিত ধারাবাহিক কিছু বিপর্যয়ের পর। এই বিপর্যয়ের সূচনা ঘটে ওহুদযুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। মুসলমানদের এই পরাজয় আশপাশের কিছু গোত্রকে ইসলামি রাষ্ট্রকে নির্মূল করতে দুঃসাহসী করে তোলে। যেমন বনু আসাদ ও বনু হুজাইল। তদ্রূপ মুসলমানরা তখন রাজি এবং বিরে মাউনার ঘটনাদ্বয়ে প্রতারিত হওয়ার মাধ্যমেও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল।

এ ছাড়া বনু কায়নুকার মতো বনু নাজিরও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ ঘটায়। তাদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কিছু কর্মকাণ্ড পরিস্থিতিকে অবশেষে যুদ্ধ পর্যন্ত নিয়ে যায়। চুক্তির ধারা অনুযায়ী ইহুদিদের জন্য আবশ্যক ছিল তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো মুশরিককে সাহায্য করবে না।

2024/12/05 19:00
CamScanner

কিন্তু বনু নাজিরের নেতা সালাম ইবনে মিশকাম আবু সুফিয়ানকে মদিনার ওপর পরিচালিত একটি হামলায় স্বাগত জানায়, অবশ্য হামলাটি ব্যর্থ হয়। এ ছাড়াও বনু নাজির মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য কুরাইশদের প্ররোচিত করত। মদিনার সামরিক গোপন তথ্যাবলি কুরাইশদের নিকট পাচার করত।[illegible] সম্ভবত তারা ধারণা করেছিল, মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এ কারণে তারা এটাকে সমূলে বিনাশ করার অপচেষ্টায় নেমে পড়ে।

এসব দুরাচারী কর্মকাণ্ডের পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকে পাকড়াও করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এলো। ঘটনার বিবরণ এরকম :

একজন মুসলিম ভুলক্রমে দুজন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। মদিনা সনদের ধারা অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে এর দিয়ত (রক্তপণ) পরিশোধের কথা ছিল। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের নিকট গমন করেন। তারা তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায় এবং অর্থ নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ করে। তারা বলে, 'আবুল কাসেম[illegible], তুমি তোমার প্রয়োজনে আমাদের নিকট এসে তা জানিয়েছ। তুমি একটু বসো, আমরা তোমার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছি এবং তোমার চাওয়া অর্থও নিয়ে আসছি।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গৃহের একটি দেয়ালের নিকটে উপবেশন করলেন। ইহুদিরা যখন তাঁকে এভাবে বসতে দেখল তখন তারা তাঁকে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করে ফেলল। বনু নাজিরের নেতা বলল, এখনকার চেয়ে এত নিকটবর্তী আর কখনো তোমরা তাঁকে দেখবে না। তোমরা তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলো! তাহলে তোমাদের আর কোনোদিন অনিষ্ট দেখতে হবে না। তখন তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নিক্ষেপের জন্য বড় একটি (জাঁতাকলের) পাথর আনতে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের চক্রের অনিষ্ট থেকে তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আগমন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু

[illegible]. ইবনে হাজার আসকালানি : ফাতহুল বারি : ৭/৩৩২।

[illegible]. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপনাম।-সম্পাদক

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে) সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান।[৭৬৮]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বনু নাজিরের ইহুদিদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, চুক্তি ভঙ্গ করা এবং প্রতারণার ইচ্ছা পোষণের কারণে তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হলো। এজন্য তিনি তাদেরকে দশদিন সময় প্রদান করলেন। ইহুদিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং মদিনা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের মদিনায় অবস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সংবাদ প্রেরণ করে। সে কিছুতেই তাদের বহিষ্কার মেনে নেবে না বলে জানায়। এমনকি যদি সে বাধ্য হয়, তবে তার আরব মিত্রদের নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে বলে ইহুদিদের আশ্বাস দেয়।

এই প্ররোচনায় পড়ে ইহুদি নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও জানিয়ে দেয়, তারা কিছুতেই এখান থেকে প্রস্থান করবে না। এভাবে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে যুদ্ধপরিস্থিতির সূচনা ঘটে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পনেরো দিন যাবৎ অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তাদের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল, তা ভঙ্গ করে। পরিণামে তারা প্রস্থানের সুযোগ চেয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজি পেশ করে। তিনি তাদের সেই আরজি গ্রহণ করেন। অনুমতি পাওয়ার পর তাদের জন্য যত সম্পদ বহন করা সম্ভব ছিল, সব নিয়ে তারা বের হয়ে যায়। এমনকি যেগুলো বহন করার সাধ্য তাদের ছিল না, যাওয়ার সময় সেগুলো তারা পুড়িয়ে দিয়ে যায়। যেন মুসলমানরা এগুলো দিয়ে উপকৃত হতে না পারে।[৭৬৯]

এভাবে (বনু কায়নুকার মতো) বনি নাজিরের মতো একটি অবাধ্য, দুরাচারী দলকেও তার প্রাপ্য শাস্তির চেয়ে অত্যন্ত কম শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়। ভেবে দেখুন, এই অবাধ্যরা বহুবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে,

---

৭৬৮. তাবারি : *তাফসিরে তাবারি* : ১০/১০২।
৭৬৯. *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা* : ২/৬৬৩।

2024.12.05 19:0
CamScanner

মদিনার গোপন তথ্য কুরাইশদের জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, কৃত চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে, এমনকি পরিশেষে মদিনার শাসক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে!

এখন এই শাস্তির মাঝে কি কোনো নিষ্ঠুরতা বা নির্দয়তার সাদৃশ্যটুকুও দেখা যায়?! এখানে কি জুলুমের কোনো স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয়?! বর্তমান যুগের সাথে মিলিয়ে আমরা তাদের এইসব ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা একটু কল্পনা করে দেখতে পারি। বলুন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এতসব অপরাধ ঘটানো কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের আচরণ কেমন হতো?!

৫. বনু কুরাইজার ইহুদিরা কী করেছে?

মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে বনু কুরাইজার ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেয়েছে। হিজরতের পঞ্চম বছরে যখন কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের নেতৃত্বে সমগ্র আবর অঞ্চলের দশহাজার লড়াকু সৈনিক একত্র হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, মদিনার ইসলামি রষ্ট্রকে চিরতরে বিলীন করে দেওয়া।

অন্যদিকে ইসলামি রাষ্ট্রটি প্রথমবারের মতো এমন একটি ভয়াবহ সংকটের মুখে আপতিত হয় এবং সমূলে ধ্বংসের হুমকিতে পড়ে। মদিনার সকল জনসংখ্যার চেয়েও এই শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেশি। তাই এই বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে খন্দক খনন করে আত্মরক্ষা করা ব্যতীত তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। খন্দক খননের এই ধারণা প্রদান করেন হজরত সালমান ফারসি রা.। পারস্যজাতি নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এমনটা করত, কিন্তু আরবরা ছিল এ ব্যাপারে অজ্ঞ।

এই খন্দক খনন করা হয় মদিনার উত্তর দিকে। কারণ, মদিনার এই প্রান্তটিই ছিল শত্রুদলের জন্য উন্মুক্ত। শত্রুদের পক্ষে শুধু এই দিক দিয়েই মদিনায় প্রবেশ করা এবং তাকে হুমকির মুখে ফেলা সম্ভব ছিল। মদিনার অন্য দিকগুলো ছিল সুউচ্চ (পাহাড়ের কারণে) নিরাপদ ও সুরক্ষিত। শত্রুপক্ষের যেকোনো অভিযান প্রতিহত করতে সক্ষম। যেমন, মদিনার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ছিল শক্ত শেকলের মতো সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। আর পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দুটি প্রস্তরময় ভূমি প্রাকৃতিক দুর্গের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। আর বনু কুরাইজার দুর্গগুলো অবস্থিত ছিল দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। মুসলমানদের পৃষ্ঠপ্রান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। মদিনা

CamScanner

সনদেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বনু কুরাইজার মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যে, তারা কখনোই মুসলমানদের বিপক্ষে কারও পক্ষ নেবে না এবং কাউকে সাহায্য করবে না।[৭৭০]

শক্তিধর এই বিশাল সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধের মধ্যে তখন মদিনা অত্যন্ত কঠিন দিন অতিবাহিত করছে। তাদের সামনে প্রচণ্ড ক্ষুধা, ভীতি এবং শীত। এমনকি কুরআনুল কারিম এই অবস্থাটাকে ব্যক্ত করেছে الزِلْزَال الشَدِيد বা 'প্রচণ্ড কম্পন' বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾

> স্মরণ করো, যখন তারা তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল ওপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকেও, যখন চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল এবং প্রাণ মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।
>
> [সুরা আহজাব : ১০-১১]

এই ভয়াবহ মুহূর্তে বনু কুরাইজা যখন মদিনার দক্ষিণ পাশের সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং মদিনার শত্রুদের সাথে হাত মেলায়। ফলে মদিনাকে ধ্বংস করার জন্য এই বিশাল বাহিনীর সামনে তার দক্ষিণ পাশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। উপরন্তু এই প্রাণান্তকর যুদ্ধে বনু কুরাইজা মদিনা রাষ্ট্রের সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে নিজেদের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ, সম্মিলিত বাহিনীর জন্য বনু কুরাইজা বিশটা উটবোঝাই খেজুর, যব এবং ডুমুর প্রেরণ করে।[৭৭১]

এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যদি সম্মিলিত বাহিনীর অন্তরে ভীতি ঢেলে না দিতেন, তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে না দিতেন এবং তারা তাদের লক্ষ্য অর্জিত হওয়া ব্যতীত ফিরে না যেত, তাহলে অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে

---

[৭৭০]. মুহাম্মাদ ফারাজ : *আল-আবকারিয়্যাতুল আসকারিয়্যাহ ফি গাজওয়াতির রাসুল* : ৪৪২।
[৭৭১]. *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা* : ২/৬৪৭।

যেত। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধ থেকে অবসর হতে না হতেই আল্লাহ তাআলা তাকে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেন। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবরোধ করেন এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। এমন রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে এ ধরনের শাস্তিকে কোনো ঐশী শরিয়ত অপছন্দ করে না এবং পার্থিব কোনো রীতিও এটাকে অস্বীকার করে না।

এই হলো মদিনায় বসবাসরত ইহুদিগোষ্ঠীর ঘটনাবিবরণী। এবার বলুন, তাদের সাথে কৃত আচরণে এতটুকুও কি নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতার আলামত রয়েছে?!

এই বিষয়টি আমরা আরও স্পষ্ট চিত্রে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন আমরা কল্পনা করে দেখি, ইহুদিরা ঠিক এই কাজগুলোই ইউরোপের কোনো দেশে সংঘটিত করল, তখন সেই রাষ্ট্র তাদের সাথে কেমন আচরণ করত? যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই সেই জাতির সাথে কেমন আচরণ করা সম্ভব, যারা রাষ্ট্রের দুর্গগুলোতে ঢুকে পড়ার জন্য শত্রুদের সাহায্য করে এবং রাষ্ট্র দখলের জন্য এবং তার অধিবাসীদের হত্যা করার জন্য শত্রুদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়?! এগুলোর সদুত্তর দিতে পারলে তখনই কেবল আমরা প্রকৃত ইতিহাস ও বস্তুনিষ্ঠতায় পৌঁছাতে সক্ষম হব এবং সেটা এই যে, ইহুদিরা তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো অবস্থা উপভোগ করেছে ঠিক তখনই, যে দিনগুলো তারা ইসলামি শাসনের ছত্রছায়ায় অতিবাহিত করেছে।

* * *

24/12/05 19:01
CamScanner

শেষকথা

আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ বার্তার মাধ্যমে গোটা মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন। তিনি এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

(হে নবী) আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। [সুরা সাবা : ২৮]

আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠিয়েছেন, যেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন, যেন তিনি মানুষকে বের করেন মানুষের ইবাদত থেকে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে, (ভ্রান্ত) ধর্মের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে ইসলামের ন্যায়পরতার দিকে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা কাটিয়ে প্রশস্ত এক জাগতিকতার দিকে।

পরকথা হলো, এই গ্রন্থে আমরা অকাট্যভাবে রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করেছি। অতএব, এবার সমাপ্তিতে এসে আমাদের মনের দুয়ারে একটি প্রশ্ন নিয়ে স্থির দাঁড়ানো দরকার এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল একনিষ্ঠ মানুষের উচিত আমাদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণার। অতঃপর নিজেদের প্রশ্ন করি, তবুও কেন কিছু অমুসলিম ইসলামের এমন বিরোধিতা করে? অথচ ইসলামের রয়েছে অপূর্ব মূল্যবোধ ও মহান মানবিকতা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার ওপর রয়েছে বহু অকাট্য দলিল ও প্রমাণ। তারা শুধু অস্বীকার এবং মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রবল বিদ্বেষী হয়ে ইসলামকে গালিগালাজ

করে, নিন্দামন্দ করে এবং তার ওপর বিভিন্ন ধরনের দোষত্রুটি আরোপ করে!

এ কারণে বহু বিবেকবান ব্যক্তি অনেক সময় ভীষণ আশ্চর্যবোধ করেন, কেন তারা ইসলামের প্রতি এত আক্রমণপ্রবণ! কেন তারা জগতের শ্রেষ্ঠ মানব এবং বনি আদমের শ্রেষ্ঠ নেতার প্রতি এমন দোষারোপ করে! বিজ্ঞজনরা খুবই আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, এই সমুজ্জ্বল আলোও তাদের চোখগুলো কেন দেখে না? এই উদ্ভাসিত সত্যও তাদের বিবেক কেন অনুধাবন করে না?

তবে আমরা যখন এসব অস্বীকারকারী, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী এবং অপবাদ আরোপকারীদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি প্রদান করি, তখন এই বিস্ময় ও বিমূঢ়তা বিদূরিত হয়। কারণ তাদেরকে আমরা দেখতে পাই, তারা হয়তো হিংসুক কিংবা মূর্খ।

১. হিংসুক শ্রেণি

তাদের জানাশোনা কিংবা জ্ঞানবুদ্ধি কম নয়। খুব স্পষ্টভাবেই তারা সত্যকে জানে। কিন্তু স্বেচ্ছায় অসত্যের পথ অনুসরণ করে চলে। কিন্তু কেন তারা সত্যের বিরোধিতা করে এবং তা অস্বীকার করে? এটা করে কয়েকটি কারণে। যেমন, হয়তো তারা তাদের দুনিয়ার জীবনকেই ভালোবাসে, নিজেদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। আর কেউ কেউ অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে। আর কেউ সত্যকে অস্বীকার করে হিংসা ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে। তারা বিকৃত মানসিকতার অধিকারী এক জাতি। প্রমাণাদিও তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। তারা কোনো যুক্তিরও ধার ধারে না। এই শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে

নিয়েছিল। সুতরাং দেখে নাও ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। [সুরা নামল: ১৪]

মানুষদের এই শ্রেণিটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং বুনো উল্লাসের সাথে সর্বদা ধর্মের বিরোধিতা করে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনেশুনেই সকল ভালো গুণ ও নৈতিকতার বিরুদ্ধাচরণ করে।

২. সাধারণ মূর্খ শ্রেণি

তবে প্রথম শ্রেণিটির সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণির তুলনায় খুবই কম। দ্বিতীয় শ্রেণিটির সমস্যা হলো, ধর্মের সঠিক উৎস থেকে তারা ধর্ম সম্পর্কে অবগত হয়নি। এ কারণে তাদের ধারণায় প্রবিষ্ট হয়ে আছে, ধর্ম হলো মন্দে ঘেরা নবসৃষ্ট কিছু বিশ্বাস ও প্রাচীন কিছু প্রথার সমষ্টি। তারা এমন কিছু মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষ, যাদের জানাশোনা নেই। কিংবা রয়েছে এমন কিছু সহজ-সরল ব্যক্তিও, যাদের নিকট ধর্মের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজন রয়েছে। এমন কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও রয়েছেন, যাদের প্রয়োজন ইসলামের অকাট্য দলিল ও প্রমাণ।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির (সাধারণ মূর্খ) ব্যক্তিদের ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। যাতে তারা ইসলামের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যেভাবে ইসলামকে জেনেছে এবং গ্রহণ করেছে পারসিক, শামীয়, মিশরীয় ও উত্তর আফ্রিকীয় জাতি। এমনকি আন্দালুস, আনাতোলিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার খ্রিষ্টানগণ। যেমন জেনেছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত উপমহাদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ। এখন আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইসলামের যে বার্তা নাজিল করেছেন, এইসব ব্যক্তিদের নিকট সেই বার্তা উপস্থাপন করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা, তাঁর অনুপম চরিত্র এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করা। যা এই বিশাল পরিমাণ সাধারণ জনগণের হেদায়েতের জন্য হবে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

আজকের গোটা পৃথিবী যেসব ভয়াবহ সমস্যা ও স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আক্রান্ত, তার সঠিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাসুলুল্লাহ

CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগত ঐশী নির্দেশনা প্রয়োগের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের সময়ে বিশ্বের যে অবস্থা হয়েছিল, আজকের পুরো বিশ্বও সেই একই অবস্থায় এসে উপনীত। নিশ্চিত যে, শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত পদ্ধতিই আমাদেরকে আজকের এই মূর্খতা ও উদাসীনতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম, যেভাবে নিয়ে গিয়েছিল অতীতের আক্রান্ত পৃথিবীকে। আমাদের যুগের মানুষ আজ একজন সঠিক আদর্শ এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিশূন্যতায় ভুগছে, এমনকি তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ, হয়ে গেছে উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো অর্থহীন আদর্শহীন। এ কারণে গোটা বিশ্বই আজ সর্বক্ষণ একটি উন্নত এবং অনুসরণীয় আদর্শের অনুসন্ধান করছে। যা পাওয়া যাবে একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, ইসলাম থেকে দূরে পশ্চিমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও এই মর্মটি অনুধাবন করেছেন। যেমন বিখ্যাত (সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক) জর্জ বার্নার্ড শ এবং (নাট্যকার) জোহান গ্যোটে প্রমুখ। তারা বিশ্বের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নির্বাচন করেছেন। কেননা, তিনি এমনটা হওয়ারই উপযুক্ত।

কিন্তু গোটা বিশ্ব কিছুতেই ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বের কল্যাণপ্রত্যাশী একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনচরিত পাঠ ও গভীর অধ্যয়নের আহ্বানে অবতীর্ণ হন। যে পাঠ ও অধ্যয়ন হবে ধীরস্থিরতা ও অনুসন্ধানের সাথে। যাতে করে গোটা বিশ্ব অবগত হতে পারে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য এমন কিছু মর্মবাণী ও মূল্যবোধ রেখে গিয়েছেন, যেগুলো বাস্তবেই তাদের উন্নতি, অগ্রগতি ও সভ্যতার সোপান।

এই কথাগুলোই পশ্চিমের বহু পণ্ডিত, সুবিবেচক চিন্তাবিদ স্বীকার করেছেন। যেমন আমেরিকান চিন্তাবিদ উইল ডুরান্ট রাসুলুল্লাহ

2024/12/05 09:01
CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, আমরা যদি মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তারের বিচারে মহৎ মানুষের মহত্ত্ব নিরূপণ করতে চাই, তাহলে আমাদের বলতেই হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এমন একটি জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে, যাদেরকে আকাশের উষ্ণতা এবং মরুভূমির অনুর্বরতা বর্বরতার গহিন অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। অথচ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এমনভাবে সফল হয়েছিলেন যে, মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে কোনো সংস্কারক তার কাছাকাছিও পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।[৭৭২]

---

৭৭২. উইল ডুরান্ট : *কিসসাতুল হাজারাহ* : ১৩/৪৭।

পরিশেষে

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই গ্রন্থে আরও বহু বিষয় সংযুক্ত করা যেত, কিন্তু আমি তা করতে সক্ষম হইনি হয়তো সময়ের স্বল্পতার কারণে, কিংবা পুনরাবৃত্তির ভয়ে, কোনো ঘটনা ভুলে যাওয়ার কারণে, কিংবা আমার না জানার কারণে। তবে আমার কৈফিয়ত হলো আমি একজন মানুষ। মানুষের বৈশিষ্ট্যই হলো অসম্পূর্ণতা। এ ব্যাপারে কত সুন্দরই-না বলেছেন ইমাম শাফি রহ.। আমি তার সে কথা দিয়েই আমার এই আলোচনা শেষ করতে চাই। ইমাম শাফি রহ. রচিত বিখ্যাত কিতাব আর-রিসালাহ। এটি তিনি আশিবার সম্পাদনা করেছেন। অবশেষে একদিন তার প্রিয় ছাত্র মুজানিকে বললেন, ছাড়ো! আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব ব্যতীত কোনো কিতাব একেবারে বিশুদ্ধ হওয়ার নিয়মই রাখেননি![৭৭৩]

হে আল্লাহ, দরুদ ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং বরকতময় করুন সকল জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

—ড. রাগিব সারজানি

৭৭৩. হাশিয়াতু ইবনে আবিদিন : ২/২৭।

2024/12/05 19:01
CamScanner

পরিশিষ্ট

পাশ্চাত্যের অনেকেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে সুবিবেচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাদের এই সুবিবেচনার কারণ হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও জীবনী নিয়ে তাদের সুগভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা। তারা তাদের এই অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে আধুনিক তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুগভীর পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা ও গবেষণার ওপর। পরিশেষে তাদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল এসেছে। এভাবে তাদের এই স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যগুলো এমন কিছু আলোর মশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, পশ্চিমের অনেক সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি এর দ্বারা সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। আমরা এই পরিশিষ্টে সুবিবেচকদের সেই সাক্ষ্যগুলো উপস্থাপন করেছি, তবে তা মূলত সিন্ধু থেকে তুলে আনা কিছু বিন্দুমাত্র, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র সিরাত সম্পর্কে তাদের পক্ষ থেকে যত লেখা হয়েছে, তার খুব অল্পই এখানে বলা হয়েছে। তবে এই স্বল্প উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে সেটা হলো, অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্র।

2024/12/05 19:01
CamScanner

আর্নল্ড টয়েনবি[৭৭৪] বলেন,

আরবের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার তাঁর অনুসারীদের অন্তরগুলোকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে তুলেছিল। তাদের নিকট তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থান ছিল অনেক উচ্চ ও ঊর্ধ্বে। এ কারণে তারা তাঁর রিসালাতের প্রতি এমনভাবে ঈমান এনেছে যে, তাঁর নিকট যা ওহি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তার কাজকর্ম (যা সুন্নি মুসলিমদের নিকট ইসলামি বিধানের একটি উৎস) তারা তার সবকিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে। এগুলো শুধু মুসলমান সমাজের জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতি বর্ণনাতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং অমুসলিম প্রজাদের সাথে বিজয়ী মুসলিমদের কেমন আচরণ হবে, সে সম্পর্কেও সুবিন্যস্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।[৭৭৫]

---

৭৭৪. আর্নল্ড টয়োনবি (Arnold Tynbee) : একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ (১৮৮৯-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)।

৭৭৫. টয়োনবি : *মুখতাসারু দিরাসাতিন লিত-তারিখ* : ৩/৯৮। (বইটির আসল নাম, *A Study of History*)-অনুবাদক

2024/12/05 19:02
CamScanner

হেনরি ডি কাস্ট্রিজ[৭৭৬] বলেন,

ইসলামের অনুসারীদের মাঝে ইসলামের প্রসার ঘটেছে (ধর্মীয় বিধানের সাথে তাদের) সংমিশ্রণ, ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে। এই প্রসারে না ছিল কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা বা খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রমের (মতো) কোনো তৎপরতা। বস্তুত একজন মুসলিম কোন মুহূর্তে যে প্রকৃত মুসলিম হয়ে ওঠে, নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন; কেননা, তার ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে।[৭৭৭]

---

৭৭৬. হেনরি ডি কাস্ট্রিজ (Henry de Castries 1850-1927) : একজন ফরাসি খ্রিষ্টান লেখক এবং ফরাসি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

৭৭৭. হেনরি ডি কাস্ট্রিজ : *আল-ইসলাম : খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ* : ৫।

CamScanner

লিও তলস্তয়[৭৭৮] বলেন,

ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি দিক হলো, ইসলাম খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের প্রতিও কল্যাণের উপদেশ প্রদান করছে, বিশেষ করে প্রথম যুগের ধর্মীয় পাদরিদের ক্ষেত্রে। ইসলাম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি এই ধর্ম তার অনুসারীদেরকে খ্রিষ্টান ও ইহুদি নারীদের বিবাহের পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করেছে, যদিও সেই নারীরা তাদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৭৭৯] বস্তুত এর মাঝে যে বিশাল উদারতা ও সহনশীলতা বিদ্যমান, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট তা অগোচর নয়।[৭৮০]

---

৭৭৮. লিও তলস্তয় (Leo Tolstoy) : তিনি ছিলেন একজন রুশ লেখক ও ঔপন্যাসিক (১৮২৮-১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ)। তাকে সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক, শান্তিকামী এবং গভীর চিন্তাবিদ।

৭৭৯. কিছু শর্ত সাপেক্ষে আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা ইসলামে বৈধ। তবে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন, বর্তমানে ফিতনার আশঙ্কা ও শর্তের অনুপস্থিতিতে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করা অনুত্তম।-সম্পাদক

৭৮০. তলস্তয় : *হুকমুন নবী মুহাম্মাদ* : ৪৪।

CamScanner

থমাস ওয়াকার আর্নল্ড[৭৮১] **বলেন,**

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামি সম্প্রদায়ের শাসনের অধীনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মতের এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের এই ব্যাপক উপস্থিতিই ইসলামের সেই উদারতা ও সহনশীলতা প্রমাণ করে, যা এই খ্রিষ্টানরা উপভোগ করেছে। একটি ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, এত বিপুল মানুষের ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে তরবারির শক্তিই ছিল প্রধানভাবে কার্যকর, তবে এই কথার মাঝে কোনো সত্যতা নেই। ইসলামধর্ম অন্য ধর্মানুসারীদের জন্যও উদারতা প্রকাশ করে এবং তাদের ধর্মীয় জীবনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।[৭৮২]

---

[৭৮১]. থমাস ওয়াকার আর্নল্ড (Thomas Walker Arnold) : বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ এবং ইতিহাসবেত্তা। জন্ম : ১৯ এপ্রিল ১৮৬৪। মৃত্যু : ৯ জুন ১৯৩০।

[৭৮২]. থমাস ওয়াকার আর্নল্ড : *আদ-দাওয়াতু ইলাল ইসলাম* : ১০২।

24/12/05 19:02
CamScanner

গান্ধীজি[৭৮৩] বলেন,

আমি এমন সেই মহাপুরুষের গুণাবলি জানতে আগ্রহী ছিলাম, যিনি কোনোরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই কোটি কোটি মানুষের অন্তরকে শাসন করেছেন। আমি সর্বদিক দিয়ে নিশ্চিত যে, আজকের ইসলাম তরবারির মাধ্যমে তার এই মহান অবস্থান অধিকার করেনি। বরং এটি সম্ভব হয়েছে নিজের প্রতিপালক ও রিসালাতের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান সেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরলতার ও অকৃত্রিমতার কারণে। বস্তুত এইসব বৈশিষ্ট্যই ইসলামের রাস্তা প্রস্তুত করেছে এবং তার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে, এখানে তরবারির কোনো ভূমিকা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠের পর আমার কেবলই আফসোস ছিল তাঁর মহান জীবন সম্পর্কে আরও অধিক জ্ঞান ও পরিচিতি অর্জনের (কোনো সূত্র) না পাওয়ার কারণে।[৭৮৪]

---

৭৮৩. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) : ভারতীয় (হিন্দু সমাজের) আধ্যাত্মিক নেতা এবং অহিংস আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তার এই আন্দোলন ভারতকে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৭৮৪. *ইয়ং ইন্ডিয়া* নামক একটি পত্রিকার আলোচনার অংশ।

CS CamScanner

উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট[৭৮৫] বলেন,

আমি আশা করি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে এই অধ্যয়ন, গবেষণা নতুনভাবে বনি আদমের একজন মহান পুরুষের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানে সহায়তা করবে। নিজের ধর্মবিশ্বাসের কারণে অন্যদের সকল অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার জন্য তাঁর নিঃশঙ্ক প্রস্তুতি, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং তাঁকে নেতা ও নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি তাঁর উন্নত নৈতিক আচরণ এবং তাঁর পরম সাফল্যসমূহ এই সবকিছুই তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার প্রমাণ বহন করে।[৭৮৬]

---

৭৮৫. উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট (William Montgomery Watt) : তিনি একজন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ (১৯০৯-২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রভাষক। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির আরবি বিভাগে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো, *মুহাম্মাদ ফি মাক্কা*, *মুহাম্মাদ আন-নাবি ওয়া রাজুলুদ দাওলা*, *আল-ইসলাম ওয়াল-মাসিহিয়্যাহ ফিল আলামিন মুআসির*।

৭৮৬. উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট : *মুহাম্মাদ ফি মাক্কা* : ৫২, ৫২১ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

বসওয়ার্থ স্মিথ[৭৮৭] বলেন,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একই সময়ে একজন রাজনৈতিক নেতা এবং ধর্মীয় প্রধান। অথচ তাঁর নিকট না ছিল ধর্মীয় নেতাদের মতো কোনো অহংকার-অহমিকা, আবার না ছিল সম্রাটদের মতো বড় কোনো সেনাদল। তাঁর নিয়মিত প্রশিক্ষিত কোনো সেনাবাহিনী ছিল না, ছিল না নিজস্ব কোনো দেহরক্ষী। ছিল না সুউচ্চ-সুরম্য কোনো প্রাসাদ কিংবা নিয়মিত কোনো রাজস্ব। যদি বিশ্বের কারও ক্ষেত্রে বলা হয় যে, তিনি শুধু ঐশী ক্ষমতাবলে পৃথিবীতে শাসন পরিচালনা করেছেন, তবে সেটা শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই বলা সম্ভব। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শাসনের বাগডোর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন অথচ অন্যদের মতো শাসনের বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করেননি এবং দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাধরের সাহায্য গ্রহণ করেননি।[৭৮৮]

৭৮৭. বসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith 1839-1908) : তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক। শিক্ষাদান এবং ইতিহাস বিষয়ে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রয়েছে। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর একটি হলো, *মুহাম্মাদ ওয়াল-মুহাম্মাদিয়্যাহ*।

৭৮৮. বসওয়ার্থ স্মিথ : *মুহাম্মাদ ওয়াল-মুহাম্মাদিয়্যাহ* : ৯২।

CamScanner

লরা ভেকিয়া ভাগলিরি[৭৮৯] বলেন,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ ঐশী বিধান মেনে চলেছেন। ছিলেন অত্যধিক উদার, বিশেষ করে একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের প্রতি। তা ছাড়া এটাও পরিজ্ঞাত হয়েছে যে, তিনি মূর্তিপূজকদের ক্ষেত্রেও কতটা বেশি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সাথে সদা বিনয় ও নম্রতার আচরণ করেছেন। কারণ, তিনি এই বিশ্বাস রাখতেন যে, সময়ের অতিবাহন অচিরেই তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখাবে, একদিন তারাও সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা (মানুষের জন্য প্রেরিত এই শেষবার্তা) মানুষের অন্তরে একসময় প্রবেশ করিয়েই দেবেন।[৭৯০]

---

৭৮৯. লরা ভেকিয়া ভাগলিরি (Laura Veccia Vaglieri 1893-1989) : ইতালীয় নারী প্রাচ্যবিদ।

৭৯০. ভেকিয়া ভাগলিরি : *দিফাউন আনিল ইসলাম* : ৭৩।

2024/12/05 19:03

CamScanner

গুস্তাভ লি বোন[৭৯১] বলেন,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সীমাহীন ধৈর্য ও অন্তরের উদারতায় নিজের ওপর আপতিত সকল কষ্ট ও অত্যাচার সয়ে নিয়েছেন।[৭৯২] যে কুরাইশ দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ তাঁর সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করেছে, তিনি তাদের সাথেও কোমলতা ও সহনশীলতার আচরণ করেছেন।[৭৯৩]

---

৭৯১. গুস্তাভ লি বোন (Gustave Le Bon) : তিনি ছিলেন একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ (১৮৪১-১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ)। তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থ হলো 'হাজারাতুল আরব'। আরবের ইসলামি সভ্যতার প্রতি ন্যায়বান আলোচনার ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটাকে একটি প্রধান গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭৯২. হাজারাতুল আরব : ১০৪-১০৫।

৭৯৩. গুস্তাভ লি বোন : হাজারাতুল আরব : ১০৮।

2024/12/05 19:03
CamScanner

উইল ডুরান্ট[৭৯৪] বলেন,

আমরা যদি মানুষদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের বিচারে মহৎ মানুষের মহত্ত্ব নিরূপণ করতে চাই, তাহলে আমাদের বলতেই হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[৭৯৫]

---

৭৯৪. উইল ডুরান্ট (Will Durant 1885-1981) : বিখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক, তার বৃহৎ গ্রন্থ হলো ৪২ খণ্ডে সমাপ্ত *কিসসাতুল হাজারাহ*-এর পেছনে তিনি পূর্ণ পাঁচ যুগ সময় ব্যয় করেন।-অনুবাদক

৭৯৫. উইল ডুরান্ট : *কিসসাতুল হাজারাহ* : ১৩/৫৯।

2024.12.05 19:03
CamScanner

আলফোনস ডি ল্যামারটিন[৭৯৬] বলেন,

মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় বর্তমান ইতিহাসের কোনো মহান ব্যক্তিকে কেউ কি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তুলনা করতে দুঃসাহস দেখাবে? বিশ্ব-ইতিহাসের এসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের হয়তো কেউ অস্ত্র তৈরি করেছে, কেউ সংবিধান প্রণয়ন করেছে কিংবা কেউ প্রতিষ্ঠা করেছে সাম্রাজ্য। তারা তো অস্থায়ী জীর্ণ কিছু গৌরব অর্জন করেছে, যা তাদের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এই মহান পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন, শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে শাসন করেছেন, শাসকদের অনুগত করেছেন। শুধু এগুলোই নয়, বরং সেইসাথে তৎকালীন মিলিয়ন-মিলিয়ন মানুষকে পরিচালিত করেছেন, যা ছিল বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আর শুধু এটাই নয়, তিনি সকল মূর্তি, লটারির তির এবং ভ্রান্তধর্ম, ভ্রান্তচিন্তা ও বিশ্বাসকে অপসারিত করেছেন।... এখন সর্বপ্রকার মহৎ মানবীয় মাপকাঠির আলোকে আমাকে বলুন, বিশ্বের আর কেউ কি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে![৭৯৭]

---

৭৯৬. আলফোনস ডি ল্যামারটিন (Alphonse de Lamartine 1790-1869) : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও কবি।

৭৯৭. ডি ল্যামারটিন : *তারিখু তুর্কিয়া* : ২৭৬-২৭৭। (ঈষৎ পরিমার্জিত)

CS CamScanner

থমাস কার্লাইল[৭৯৮] বলেন,

কিছু গোড়াপন্থী এবং নাস্তিক দাবি করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কর্মের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি, পার্থিব সম্মান ও কর্তৃত্বের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, তিনি কিছুতেই এগুলোর ইচ্ছা করেননি। বরং এই মহান পুরুষের অন্তর ছিল বিশাল ও বিস্তৃত। তাঁর ছিল উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং মহান হৃদয়। অন্তর পরিপূর্ণ ছিল দয়া, রহমত, কল্যাণ ও সহানুভূতিতে। সদাচার প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা পাণ্ডিত্য এবং বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার কিছুতেই তাঁর লোভ ছিল না।[৭৯৯] বরং ছিলেন পার্থিব কোনো কর্তৃত্ব ও সম্মানের ঘোর বিরোধী। আর আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বিশ্বের সর্বাধিক প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি দেখেছি। তাঁর মাঝে পরিস্ফুট হতে দেখেছি অগ্রগণ্য বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণ দৃষ্টি এবং শক্তিমান মেধাবী পৌরুষ। তিনি ইচ্ছা করলে (তাঁর এই মেধা, বুদ্ধি ও শক্তিমত্তা নিয়ে) একজন বিদগ্ধ কবি হতে পারতেন। কিংবা একজন অসীম সাহসী অশ্বারোহী বীরযোদ্ধা হতে পারতেন, অথবা হতে পারতেন প্রতাপশালী কোনো বাদশাহ বা সম্রাট। কিংবা হতে পারতেন যেকোনো শ্রেণির নায়ক।[৮০০]

---

৭৯৮. থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle 1795-1881) : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক, তার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো, *আল-আবতাল*। তিনি এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে চমৎকার একটি অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন।

৭৯৯. *আল-আবতাল* : ৬৮-৬৯।

৮০০. থমাস কার্লাইল : *আল-আবতাল* : ৮২।

CS CamScanner

উইলিয়াম ম্যুর[৮০১] বলেন,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখযোগ্য গুণের মধ্যে ছিল তাঁর সাথিদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার। এ ছাড়া উদারতা, বিনয়, দয়া ও অনুগ্রহ যেন তাঁর অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট। তাঁর চারপাশের মানুষদের অন্তরেও তাঁর মুহাব্বত ও ভালোবাসা গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছিলো। তিনি তাঁর সবচেয়ে কঠিন শত্রুর সাথেও উদারতা ও সহনশীলতার আচরণ করেছেন, এমনকি সেই মক্কাবাসীদের সাথেও, যারা বহু বছর অবিরাম তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে গেছে এবং তাঁকে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করতে বাধা প্রদান করেছে। এভাবেই তিনি জয়-পরাজয় সকল অবস্থাতেই ক্ষমা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন।[৮০২]

---

[৮০১]. উইলিয়াম ম্যুর (William Muir 1819-1905) : তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ। স্কটল্যান্ডের বংশোদ্ভূত। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির প্রধান লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তার গ্রন্থাবলির মাঝে রয়েছে *শাহাদাতুল কুরআন লি-আম্বিয়ায়ির রহমান*। এ ছাড়া তিনি ইংরেজিতে সিরাত, ইসলামি খেলাফতের ইতিহাস, মিশরের মামলুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরব কবিদের নিয়ে তার বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে।

[৮০২]. উইলিয়াম ম্যুর : *হায়াতু মুহাম্মাদ* (আব্দুর রহমান আযযাম বিরচিত *বাতালুল আবতাল* থেকে উদ্ধৃত : ৪৪-৪৫।)

2024/12/05 19:04

CamScanner

মাইকেল এইচ হার্ট[৮০৩] বলেন,

(আমার গ্রন্থে) ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম নির্বাচন করায় অনেক পাঠক হয়তো চমকিত ও বিস্মিত হতে পারেন। এটা তাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। তবে আমার পুরো বিশ্বাস, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব দুটি দিকেই সমানভাবে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উচ্চ পর্যায়ের সফলতা অর্জন করেছেন।[৮০৪]

---

[৮০৩]. মাইকেল এইচ হার্ট (Michael H. Hart) : তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ এবং সামসময়িক আমেরিকান একজন ইতিহাসবিদ। আমেরিকান স্পেস এজেন্সির কর্মী প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-খালিদুনাল মিআহ* (অমর একশজন)। এতে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসের প্রভাবশালী একশ ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

[৮০৪]. মাইকেল এইচ হার্ট : *আল-মিয়াতুল আওয়ায়িল*। (বাংলায় এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী*) : ২৯।

গ্যোটে[৮০৫] বলেন,

আমি গোটা ইতিহাসে মানবজাতির সবচেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উদাহরণ খুঁজে বেড়িয়েছি, অবশেষে তা পেয়েছি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে।[৮০৬]

PDF Boier Somahar

---

৮০৫. ইয়োহান ভল্ফগাং ফন গ্যোটে (Johann Wolfgang Von Goethe 1749-1832) : বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক। আরব চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *আদ-দিওয়ানুশ শারকি লিল-শায়িরিল গারবি*।

৮০৬. গ্যোটে : *আদ-দিওয়ানুশ শারকি লিল-শায়িরিল গারবি*।

2024/12/05 19:04
CamScanner